বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 645. May, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।—

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৫ সংখ্যা।	বৈশাখ, ১৩২৪। মে, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নববর্ষ।

অতিথি আজিকে দুয়ারে এসেছি,
খোলো ওগো খোলো দ্বার;
গিয়াছে যে চলে, তাহার লাগিয়া
ফেলিও না আঁখি-ধার।
আন গো বরণ-ডালা,
মুছে আঁখি,—দাও নবাগত-গলে
নবফুলে গাঁথা মালা।

আমারি আজিকে এই রাজাসন,
আমারি এ অধিকার,
হাত ধরে মোরে বসাও আসনে,
পিছনে চেয়ো না আর।
কাল ছিল তারি সব;
বিশ্ব-বিধিতে আজ মোরি তরে,
ঘরে ঘরে কলরব!

সব বাধা ফেলে, এস ওগো চলে;
কি হবে চাহিয়া পিছে?
যে গেল, তাহারে যেতে দাও সুখে;
কেন তারে স্মর মিছে?
কত লাভ, কত ক্ষতি,—
কি হবে খতায়ে! শেষ কর শুধু
মৌনে সন্ধ্যারতি।

পূর্ণ কলস শোভিতেছে,
দোলে আম্রপত্রমালা,
মঙ্গল গান গাহিতেছে, দেখ,
ঘরে ঘরে কুল-বালা!
রুদ্ধ শুধু এই দ্বার;
রাজা হ'য়ে তবু যাচকের বেশে
যাচি নিজ অধিকার!

ফুরাবে যে-দিন আমার,
সে-দিন চলিয়া যাব গো ধীরে,
কে চাহে, কেই বা নাহি চাহে,
তাহা দেখিতে চা'ব না ফিরে।
আজ নহে অবহেলা ;—
আশার তরুণ দুয়ার খুলিয়া
খেলিতে এসেছি খেলা!

নিজ-হাতে গড়া ওই মালাখানি
দাও রাণি, গলে মোর,
বরষ ধরিয়া বহিয়া বেড়া'ব
ওই তব ফুল-ডোর।

চলে যাব তার পরে,
তোমার স্মৃতির শুষ্ক কুসুম শূন্য হৃদয়ে ধ'রে।

পিপাসী তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
দান কর তারে মধু ;
হাত ধরে আজ তোমারি পাশেতে
লও মোরে লও বধু!
ভরে দাও আজি প্রাণ ;
চির-জীবনের সম্বল যাচে,
দাও ভিখারীরে দান।

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

অবতরণিকা।

কর্ম্মবহুল কোলাহলপূর্ণ সংসারের কঠোর আবল্য হইতে দেহ-মনকে একটু অবসর দিবার মানসে, শারদীয় অবকাশে পুণ্যতীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলাম। ভ্রমণে এত আনন্দ, এত অনাবিল তৃপ্তি, পূর্ব্বে একবার কল্পনায়ও আসে নাই। ব্যাধি-জর্জ্জরিত দুর্ব্বলদেহে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলাম, বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবিতে ভাবিতে আত্মশক্তির প্রতি একটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। নিতান্ত কাপুরুষের মত কর্ত্তব্যরাশি [illegible] দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম। [illegible] অজ্ঞাত শক্তি পরোক্ষে আমার এই [illegible]নের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। অত্যল্প-কাল-মধ্যেই হৃদয়ের সমস্ত [illegible] ভ্রমণে কেন্দ্রীভূত হইল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কলিকাতা-মহানগরীর কোনও এক ছাত্রাবাসে উপনীত হইলাম। প্রথমে প্রবাসী বন্ধুবর্গের সরল উদার ব্যবহারে ভারাক্রান্ত মন মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। তাহার পর মহানগরীর বিচিত্র কোলাহল, অহোরাত্র-ব্যাপী বিপুল জনস্রোত, ফেরিওয়ালাগণের বিকট চীৎকার, মুহুর্মুহুঃ ট্রামগাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি, হাওগাড়ীর অদ্ভুত গতিবিধি, গগনস্পর্শী রম্য হর্ম্ম্যনিচয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে করিতে কোন্ সুদূর অতীতে নীত হইলাম! সুবর্ণময় ছাত্রজীবনের পুণ্যস্মৃতি প্রাণে জাগিয়া উঠিল!

এমন একদিন ছিল, প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ এবং সাহস লইয়া কর্ত্তব্য

সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম; সহায়-সঙ্গীর অভাব ঘটিত না। চতুর্দ্দিকে উল্লাস, হাসির তরঙ্গ! সকলেই উদার, সরল,—সকলেরই জীবনের লক্ষ্য এক; পরস্পর প্রীতিপাশে বদ্ধ সকলেই উচ্চভাবে প্রীতি-পুলকিত। দৈনন্দিন জীবন বিধিবদ্ধ কর্ত্তব্য-রাশি পালনে পর্য্যবসিত হইত। অতীতের এই পুণ্যময় প্রভাব বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! ছাত্রজীবনের সীমান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের এক উজ্জ্বল, মহিমমণ্ডিত, লোভনীয় প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভোগবিলাসিতা, অর্থাগম, সাধারণ্যে ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, প্রত্যেকে আমায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, আর আমি পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিলাম;—মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইলাম। কিয়দ্দূর চলিয়া দেখি, প্রত্যাবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। অভিনব এই রাজ্য!—এ-স্থানে বাসনার তৃপ্তি নাই, কর্ম্মের অবসান নাই;—ভাবনারাশি নিতান্ত অসংযত; প্রতিকূল ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন ছিন্ন-ভিন্ন; ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সব অস্পষ্ট! নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—দারুণ পিপাসা—দারুণ অতৃপ্তি! ইচ্ছাশক্তি কিয়দ্দূর চলিয়াই পতিত হয়। আবার সব শিথিল। এ-রাজ্যে প্রদর্শক নাই,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে যে-দিকে চলিবে, সে-দিকেই অজ্ঞেয় অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিঘ্ন আছে, কিন্তু লঙ্ঘন করিতে মন সরে না। কোথা হইতে আবিলতা আসিয়া দেহ-মনকে তন্দ্রাবিজড়িত করিয়া রাখে! চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা—সব যেন কুয়াসা-সমাচ্ছন্ন! অনুভূতি আছে—কখনও তীব্র, কখনও মধুর! পদার্থ আছে, কিন্তু সব বিকৃত,—কাহারও সহিত কাহারও সংসক্তি নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে এই বিশাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে একটু শৃঙ্খলা, একটু মধুরতার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, তাহা ক্ষণিক,—নিমেষ-মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া যায়! দয়াময়, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অক্ষম, দুর্ব্বল! এই বিচিত্র প্রহেলিকা আমার দুর্ব্বোধ্য!' এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

হাবড়া ষ্টেশন।

এতাদৃশ ভাবনারাশি লইয়া মহানগরীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। অভিনব দৃশ্যাদি আমায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না;—সব শূন্যময় প্রত্যক্ষ করিলাম! অগত্যা ২রা অক্টোবর দুর্গানাম স্মরণ করিয়া ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অগতির গতি হাবড়া-ষ্টেসন রেল-পথে যাতায়াতে ভারতের কেন্দ্রস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীপালোক-পরিশোভিত সুবৃহৎ ষ্টেসন-গৃহ প্রতিক্ষণে যাত্রিকুলকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়াই উজ্জ্বল আলোকে নয়ন ঝলসিয়া গেল। তাহার পর অবিরাম পদ-সঞ্চার-শব্দ ও গতিশীল জনসঙ্ঘ! বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের স্থানে-স্থানে টিকিট বিক্রয়ের 'কেবিন'; ক্ষুদ্র গবাক্ষ-দ্বারে টিকিট-ক্রয়ার্থী মূল্য স্থাপন করিতেছে, আর থাকিয়া থাকিয়া শ্বেতাঙ্গীগণের সুবর্ণ-কঙ্কণ-পরিশোভিত ক্ষিপ্রহস্তের পুরোভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তথায় গোলযোগ নাই—বাদানুবাদ নাই।

সকলেই আলোকের সাহায্যে স্ব স্ব টিকিট পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। যিনি নিরক্ষর, তিনি অপরের সাহায্যে তৃপ্ত হইতেছেন। তাহারপর সকলেই দ্রব্যজাত- ও সঙ্গি-সমভিব্যাহারে 'প্ল্যাটফরমে'র দিকে ধাবিত হইতেছে।— সহযাত্রিগণকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন; কেহ বা ক্রোড়স্থিত রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রীড়া-পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া দিতেছেন। কেহ পয়সা লইয়া কুলীর সহিত বাদানুবাদ করিতেছে; কেহ বা প্ল্যাটফরমের একটী বেঞ্চে বসিয়া
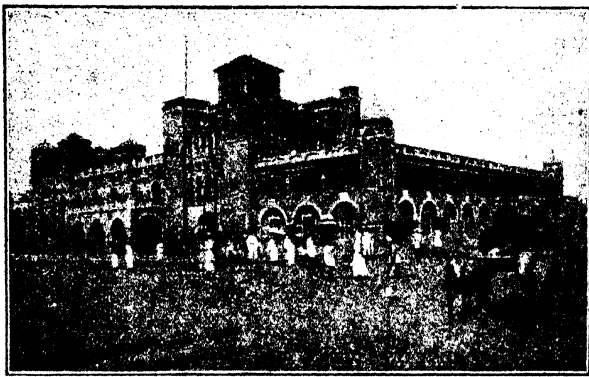
হাবড়া ষ্টেশন।

প্রবেশ-পথে নিরীহ-নির্য্যাতনকারী অজাতশ্মশ্রু সাক্ষাৎ যমদূত! দর্পভরে, রূঢ় ব্যবহারে তিনি উৎকণ্ঠা ও ভীতির মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছেন। তাহারপর লৌহবেষ্টনী-সুরক্ষিত প্ল্যাটফরমের অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ছুটাছুটী! গাড়ী ছাড়িবার বেশী দেরী নাই—এই ভাবিয়া, সময়ের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করিয়া, কেহ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে; কেহ বা কক্ষে প্রবেশ-কালে অভ্যন্তরস্থ আরোহিগণের বিদ্রূপাত্মক আমন্ত্রণে আপ্যায়িত হইতেছে; কেহ অবগুণ্ঠিতা সঙ্গিনীদিগের ধীর-মন্থর পাদ-বিক্ষেপে উত্যক্ত হইয়া বিকৃত মুখভঙ্গী করিতেছে, এবং কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অপেক্ষা করিতেছেন;—এ-দিকে ভারবাহী দ্রব্যজাত লইয়া দ্রুতগতিতে বহুদূর চলিয়া গেল। কোনও বৃদ্ধ একটু বসিবার স্থানের জন্য সদ্যঃক্রীত "এমপায়ার"-নামক সান্ধ্য সংবাদ-পত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন ও হস্তে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট থাকিয়া থাকিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পঞ্জাব-মেলে স্থানাভাব ঘটিল। যাত্রাকালীন বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া পঞ্জাব-মেল চলিল; কত সুখ-দুঃখ, আশা-উৎকণ্ঠা বহন করিয়া লইয়া গেল! কত সঞ্চিত ভাবনারাশি, কত রুদ্ধ আবেগ দূর-দূরান্তে ছুটিল!

বারাণসীর পথে।

বারাণসীর একখানি টিকিট ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি বোম্বে-মেলে বসিয়া পড়িলাম। আমাদের কামরায় দুইজন বাঙ্গালী।—এক-জন দার্শনিক ও মিতভাষী; তিনি উপরিস্থিত বেঞ্চে বসিয়া, বোধ হয়, দার্শনিক তত্ত্বে মনো-

নিবেশ করিলেন; অপর ভদ্রলোকটী আমার পার্শ্বে বসিয়া নানারূপ কথোপকথনে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। যদ্যপি তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কোমল আমন্ত্রণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ছাত্রাবাস হইতে আমার পরমহিতৈষী বন্ধুবর বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন; তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। গাড়ী ছাড়িবার অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রাণে একটু কষ্ট হইল; তিনি আমার অসময়ের বন্ধু; আমার অজ্ঞাতে আমার জন্য যে কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি আজ পর্যন্ত তাঁহার কোনও উপকার করিতে পারি নাই—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত বল নাই। তাঁহার কথা ভাবিতে ভাবিতে হাবড়া ষ্টেসন ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া আসিলাম।

নিবিড় তমসাচ্ছন্ন রজনী—বহিঃপ্রকৃতির কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। সঙ্গিগণের অনুকরণে দেহ বিস্তার করিবা-মাত্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

অতিপ্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, গয়া-ষ্টেসন আরও ১৷৽ ঘণ্টার পথদ্বারা ব্যবহিত; উষারাগ-রঞ্জিতা মধুময়ী প্রকৃতি মৃদু মৃদু হাসিতেছে! কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য! প্রভাত-সমীরণ উভয়পার্শ্বস্থ নিবিড় শালবন কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, মৃদু হিল্লোলে নাতিদীর্ঘ-তরুরাজি বেপথুমতী—বুঝি, একে অন্যের নিকট অস্ফুট-কণ্ঠে প্রাণের আবেগ জ্ঞাপন করিতেছিল! অরুণোদয়ে বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সোনার কিরণ ছড়াইয়া পড়িল, আর তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি অনতিদূরে মধুচক্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র, মধ্যে ঘন-সন্নিবিষ্ট পর্ব্বতরাজি;—যেন বিশ্রাম-প্রয়াসী অর্দ্ধশয়ান করিযূথ! আবার বহুদূরে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় পর্ব্বত-গুলি কৃষ্ণ-নীরদবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অক্লান্ত গতিতে আমাদিগের গাড়িখানি দীর্ঘ বিসর্পিত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া ছুটিতেছে—বিরাম নাই। অকস্মাৎ সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ! সেই বাল-রশ্মি-বিধৌত বালুকাময় প্রান্তর—বুঝি বা, সমস্ত জগৎ—মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও করালবক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাই এই বিচিত্র অনুভূতি! বোধ হইল, যেন আমরা এক ভয়াবহ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলাম। সেই নিবিড় অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য দৈত্যকুলের ভৈরবনাদের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অরিকুলকে যেন ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়-গর্ব্বে আমাদের গাড়ী-খানি দ্বিগুণতর বেগে বাহিরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। এবম্প্রকার অভিনব অভি-জ্ঞতার মধ্য দিয়া আমরা তিনটী 'টানেল' অতিক্রম করিলাম।

প্রাতে ৬টার সময় আমাদের গাড়ি গয়া-ষ্টেসনে উপনীত হইল। অমনি ফেরিওয়ালার দল, "চাই পুরী, কচুরী", "চাই গরম চা" ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকট শব্দে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিল। যাত্রিকুল এ-দিক্ ও-দিক্ ছুটাছুটি করিতেছিল। কোনও কোনও আরোহী অবতরণ করিবামাত্রই দুর্দ্দান্ত পাণ্ডার কবলে কবলিত হইলেন। কেহ বা তাড়াতাড়ি

মুখ-হাত ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

আমাদের কামরায় ইত্যবসরে তৎপ্রদেশীয় পাঁচজন অভ্যাগত আসিয়া স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ব্যস্ত; সকলেই থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আধার হইতে তাম্বূল-রচনান্তে চর্ব্বণ করিতেছিলেন;—সকলেই প্রৌঢ়, অথচ বেশ বিলাসী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিস্তীর টুপী তাঁহাদের শিরোদেশের মধ্যভাগ অতিসন্তর্পণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—অনাবৃত স্থানে নাতিদীর্ঘ কেশরাশি বক্রাকারে শোভা পাইতেছে। এই বেশ-বিন্যাসে তাঁহাদের যে একটী একতার আভাস পাইয়াছিলাম তাহা বঙ্গদেশে অতিবিরল।

গয়া-ষ্টেসন ছাড়িয়া ট্রেন দ্রুত-গতিতে চলিল। সৌরকরতপ্ত বালুকারাশি উত্তাপ বিকীরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ ট্রেণের গতি সংযত হওয়ায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিলাম, একটী সুবৃহৎ সেতুবন্ধ; নিম্নে প্রশান্ত শোননদ দেহ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে;—তাহাতে গর্জ্জন নাই, কল্লোল নাই, তরঙ্গের উৎক্ষেপ নাই, তরঙ্গভঙ্গ নাই; উভয়পার্শ্বে বালুকাময় বিস্তীর্ণ পুলিন। বহুদূর পর্য্যন্ত স্বচ্ছ-সলিল ও বালুকারাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। অমিত বলে বলীয়ান্ হইয়া ধীর-গম্ভীরভাবে শোননদ যেন বিশ্রাম লাভ করিতেছে! তাহাতে তাহার উৎকণ্ঠা বা আবেগ নাই। কিন্তু প্রাবৃট্-সমাগমে এই শোন-নদই নিতান্ত অসংযত হইয়া পড়ে এবং দুকূল প্লাবিত করিয়া ভীম-বেশে সজ্জিত হয়! নদীর এই বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে আমরা বহুদূরে চলিয়া গেলাম, কিন্তু তথাপি সেতুবন্ধের শেষ নাই! এতাদৃশ সুদীর্ঘ সেতু-বন্ধ আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় সম্ভব হয় নাই।

বেলা ৯॥টার সময় মোগলসরাই-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী সুবিখ্যাত জংসন। এ স্থানে আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথ সহ মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে অহোরাত্রব্যাপী যাত্রি-কুলের কোলাহল এবং ব্যস্ততা! আমরা বোম্বে-মেল হইতে অবতরণ করিয়া, ওভার-ব্রীজ (overbridge) দিয়া ষ্টেসনের অপর-পার্শ্বস্থ প্লাট্‌ফরমে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর জনতা ঠেলিয়া বহুকষ্টে একটী মধ্যম-শ্রেণীর কামরার নিভৃত কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলাম।

এইবার সঙ্গিগণ সব বাঙ্গালী। গাড়ী অনেকক্ষণ প্লাটফরমে দাঁড়াইল। ইত্যবসরে অনেকেই সন্দেশাদি ক্রয় করিয়া গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। আমি নিশ্চেষ্ট; ভাবিলাম, লোকগুলি বড়ই উদর-পরায়ণ। একজন বৃদ্ধ একটী রোরুদ্যমান শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গিনীদিগের দূরত্বের জন্য নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, তাঁহার পরিবারাদি সকলেই স্ত্রীলোকদিগের কক্ষে।

এই সময় এক প্রামাণিক আসিয়া এক সুন্দরদর্শন যুবকের চিবুকে ফেন-তুলিকা-ঘর্ষণান্তে ক্ষৌর-চালনা করিয়া দিল। কিয়ৎকাল-মধ্যেই যুবকের বদনাকৃতি সংশোধিত হইল। আমার মনে পড়িল, দ্বিচক্র-

বাবুর কথা। বর্দ্ধমান ষ্টেসনে এমনই ভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। ধন্য কবিবর, ধন্য তোমার স্বাভাবিকী কল্পনা! তুমি নূতনভাবে যে হাসির উৎস ছুটাইয়া দিয়াছ, তাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া বঙ্গের প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রবাহিত থাকিবে।

গাড়ী মোগলসরাই ছাড়িয়া দ্রুতবেগে ছুটিল। রাস্তার দুইধারে কত কি দেখিলাম, মনে নাই; তখন উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ক্ষণকাল পরেই সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে পাইব, নয়ন-মন সার্থক হইবে! যে পুণ্য তীর্থের নামস্মরণে মুমূর্ষু পুলকিত হয়, বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বলসঞ্চার হয়—পাপী তাপীর প্রাণ শীতল হয়, আজ কত সুকৃতির ফলে প্রাণ ভরিয়া তাহা দেখিব, জীবন ধন্য হইবে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে আমরা গন্তব্যস্থানের মধ্যবর্ত্তী ডফ্‌রীন সেতুর উপর আসিয়া পড়িলাম। গঙ্গার উপর সেই ডফ্‌রীন সেতু। তথা হইতে কাশীধামের দৃশ্য অতীব রমণীয়! দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূত-সলিলা জাহ্নবী পুণ্যতীর্থকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট শুভ্র হর্ম্ম্যাবলী দেবাধিদেব বিশ্বনাথের পবিত্র হাস্যরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। স্থানে স্থানে পবিত্র মন্দির-চূড় ত্রিদিবের সহিত পুণ্যতীর্থের নৈকট্য প্রতিপাদন করিতেছিল। গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় গতিশীল জনস্রোত! পবিত্র সলিলে অসংখ্য তরণী নাচিতেছে! এই পরম-রমণীয় দৃশ্য সন্দর্শনে প্রাণমন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল; বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

অদূরে কাশী-ষ্টেশন (রাজঘাট)। ষ্টেসনের উপকণ্ঠে একটী ধরমশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া এই ষ্টেসনেই অবতরণ করিলাম। অমনি দানবরূপী পাণ্ডাকুলের ভীষণ উপদ্রব। তাহাদের হস্তে নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। এই নিরক্ষর অর্থগৃধ্নু পাণ্ডাগণ শান্তিধামকে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ করিয়া তুলিতেছে; তাহাদের তাড়নায় ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যায়—প্রাণে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

যাহা হউক, তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একজন কুলীকে প্রদর্শক নির্ব্বাচনান্তে দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ধরমশালায় উপনীত হইলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কুলীপ্রবর দ্বিতলের একটি কক্ষে দ্রব্যজাত রক্ষা করিয়া, ঘরটী পরিষ্কার করিয়া দিল এবং ধরমশালার একজন ভৃত্যকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থলে এরূপ সহানুভূতি বিশেষ কার্য্যকরী, সন্দেহ নাই। ভৃত্যকে পুরস্কারের আভাস দিয়া, যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ধরমশালাটী একটী সুবিস্তীর্ণ দ্বিতল চক্‌মিলান। প্রায় তিনশত লোক একত্রে অবস্থান করিতে পারে, এরূপ সুবন্দোবস্ত আছে। ভিতরে একটী প্রাঙ্গণ, তাহাতে যাত্রিদলের ব্যবহারার্থ কুসুমোদ্যান এবং জলের কল আছে। এই ধর্ম্মশালায় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অতিবিরল।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভৃত্যের উপদেশানুসারে কক্ষদ্বারে তালা বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গঙ্গার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক্ ধূলি-সমাচ্ছন্ন। সৌরকরতপ্ত রাজপথে ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গা খুঁজিয়া পাইতেছি না; অবসন্ন হইয়া যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সকলেই গঙ্গার নৈকট্য জ্ঞাপন করে। অবশেষে প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক সঙ্কীর্ণ গলিমুখে উপনীত হইলাম ও আরও কত দূর যাইতে হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে অগণিত প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিতে করিতে কেদার-ঘাটে নামিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম।

নগর-রাজবাটী! রাজপ্রাসাদ গঙ্গাগর্ভের কিয়দ্দূর অধিকার করিয়া অচল-অটলভাবে দণ্ডায়মান।

এই স্থানে গঙ্গা অত্যন্ত বেগবতী। অবগাহনে তৃপ্ত হইলাম—ক্লান্তি বিদূরিত হইল, প্রাণ-মন শীতল হইল। যে গঙ্গার মাহাত্ম্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারতে কীর্ত্তিত হইতেছে—যে নাম কীর্ত্তনে হিন্দুর গৃহকোণ অনুক্ষণ পবিত্র হইতেছে,—অন্তিম-শয্যায় ঘোরপাতকী যাহার আশায় উৎফুল্ল হইতেছে,—যাহার বারি বিন্দুমাত্র পান করিয়া মুমূর্ষু
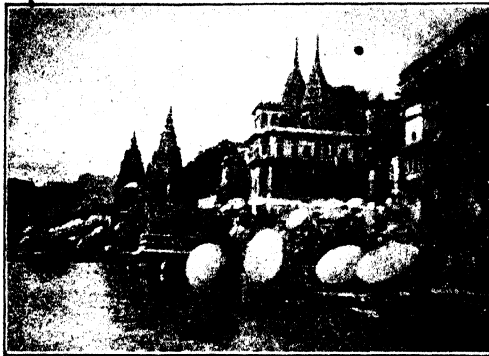
কাশীর গঙ্গা-তীর।

সহর হইতে গঙ্গা বহু নিম্নে। এজন্য তাহাকে নিকট হইতেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অত্যুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর ও সোপানাবলীতে সহরটী সুরক্ষিত। খরস্রোতা গঙ্গা সীমাবদ্ধা। পাছে এই অমূল্য রত্নকে মা গ্রাস করিয়া ফেলেন, এইজন্য মানবের এত শ্রম এবং অধ্যবসায়। গঙ্গার অপর পার্শ্বে গঙ্গাপুলিন অতিক্রম করিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে—কোনও গ্রাম বা জনপদ তথায় নয়ন-গোচর হয় না! অদূরে রাম-

মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেছে, জন্মাবধি যাঁহার পুণ্যপ্রভাব প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, আজ সেই পূত-সলিলা গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণে বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম।

কেদার-ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে কত দেব মন্দির দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও ঘণ্টা বাদিত হইতেছে, মন্দিরাভ্যন্তরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, ধূপধূম বিনির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে; সদ্যঃস্নাত যাত্রিকুল অবিরাম

চলিতেছে ;—সর্ব্বত্র ব্যস্ততা এবং সজীবতা ! সকলের মুখে 'হর হর'-রব, সকলেই ভক্তিরসে পরিপ্লুত ।

ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ১টা বাজিয়া গেল ; স্থান-মাহাত্ম্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা অনুভব করিলাম । দগ্ধোদরের জন্য বহুতর কায়িক ক্লেশ স্বীকার করিয়া রন্ধন করিলাম । জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।

ভারত-ভূমি ।

ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি ভারত-ভুবন,
অনন্ত রতন যাহে, সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার !
না আছে কোথাও আর এমন তুলন,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী আমার !

পবিত্র এ পুণ্য-ভূমে লভিয়া জনম,
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি মায়ের সন্তানে ।
জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য, বীর্য্য যতেক করম,
না দেখি ভারত-বিনা অন্য কোন স্থানে !

অতীত কালের গর্ভে কত বর্ষ গত !
যখন আছিলা মাতা সৌভাগ্যশালিনী,
ছুটিত সীমান্ত-পথে যশোরাশি যত,
মলয়-অনীল-সম অতি-গরবিণী !

অমর-বাঞ্ছিত হেথা সুন্দর-নগরী ;
অধিষ্ঠিতা রাজ-লক্ষ্মী ভারত-আসনে !
হেরিয়ে মায়ের এই অপূর্ব্ব মাধুরী,
বিস্ময়ে চাহিত সবে প্রীতির নয়নে !

জ্ঞানজ্যোতিঃপূর্ণ এই ভারত-ভবনে,
অতুল বীরত্ব রাখি আর্য্য-সুতগণ
লভিল অমর কীর্ত্তি যশো-মান-ধনে ;—
স্মরিলে হৃদয় হয় আনন্দে মগন ।

সতীর আদর্শ-স্থল ভারত-ভুবন ;
না আছে জগত-মাঝে তুলনা ইহার ;
হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ সতীত্ব ভূষণ,—
হেলায় জীবন দেয় ধর্ম্ম করি সার !

তুমি মা জনম-ভূমি, রত্ন-প্রসবিনী !
কে বলে ভারতবাসী হইয়াছে দীন,
জননী যা'দের চির-সৌভাগ্যশালিনী,—
মাতৃস্নেহে সমতুল সুদিন-কুদিন ?
ভবিষ্য আঁধারে যদি গিয়াছে মিশিয়া,
আছে মাত্র আর্য্যভূমে গৌরব-কাহিনী !
কাল-নীরে স্মৃতি কভু না যাবে ভাসিয়া ;
দেখিবে ভারত-মাতা চির-গরবিণী ।

এই আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে উচ্ছ্বাস-লহরী
ছুটেছে ত্রিদিব-পথে উজল প্রভায়,
ভকতি-প্রসূন ল'য়ে অমর-নগরী,
গাহিছে বন্দনা-গীতি মধুর ভাষায় ।

শ্রীহেমাঙ্গিনী দেবী ।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

আজকাল ভারতবর্ষের পুরুষদিগের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং এই বিষয়ে অনেক মতভেদও হইতেছে। অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষ যে, এখন স্ত্রী-শিক্ষার অতিপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-সম্বন্ধে সকলেই ভীত। আচ্ছা, শিক্ষা ও স্বাধীনতা, এই দুইয়ের তাৎপর্য্য কি?

অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা কেবল উপার্জ্জনের জন্য, এবং তাহার অর্থ, কেবল গোটা কতক পাশ দেওয়া; এবং স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা। সেইজন্য কেহ কেহ স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহারা বলেন, 'মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? তাহারা ত আর চাকুরী করিবে না? স্বাধীনতা দিলেই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িবে।' কিন্তু এই লেখাপড়া কি শুধু চাকুরীর জন্য? অথবা, কতকগুলি নভেল পাঠ করিতে ও প্রবন্ধ লিখিতে শিখিলেই কি শিক্ষার সমাপ্তি? পুরা-কালে কি কেহ লেখা-পড়া জানিতেন না? এবং যাহারা জানিতেন, তাঁহারা আপনাদের অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনও সৎকার্য্য করেন নাই কি?

কি পুরুষ, কি নারী, শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় বস্তু। যাহা শিখিলে মানব-জাতির অন্তঃকরণে বিশুদ্ধতা আনয়ন করিতে পারে, যাহাতে আমাদের মনের পঙ্কিলতা ধুইয়া যায়, এবং যাহাতে আমরা অন্তরের সকল প্রকার ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের ভিতরে যাইতে পারি, সেইই শিক্ষা। যখন মানবের মনে স্বার্থত্যাগ ও একতা-জ্ঞান জন্মাইবে, ও যখন মানব সকল জাতির উপর সমভাবে প্রেম বিতরণ করিতে পারিবে, তখনই শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, মনে হইবে।

তাহার পর, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছা-চারিতা নহে। কারণ, স্ব অর্থে আপন; সুতরাং স্বাধীন অর্থাৎ আপনার অধীন। তাহার অর্থ এই যে, আপনার ইন্দ্রিয় এবং মন নিজের বশে রাখা। তাহা হইলেই সে স্বাধীন। অতএব ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়। যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে ক্রুর, উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী হয়, সে-স্থলে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক অপরাধী হইবে না। কারণ, বিধাতার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি ন্যায়বান্ বিচারক। অতএব তিনি কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয়কেই সমদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

যদি আমরা আমাদিগের বাসনা ও রিপু-সমূহের দাস্যবৃত্তি না করিয়া, সেইগুলিকে আপনাদিগের অধীনে রাখিতে পারি, যদি আমরা চিত্ত দমন করিতে শিখি, ইন্দ্রিয়-সকল সংযত হয়, তবে আমরা অধীন কোথায়? আর তখন স্বাধীনতায় কি ভয়? সে-স্থলে স্বাধীনতার প্রভাব সর্ব্বত্র। সুতরাং, স্বাধীন

হইতে হইলে আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আত্মরক্ষা প্রধানতঃ শিক্ষণীয়। এই উপরি উক্ত বিষয়গুলি সকলই শিখিবার বিষয়। ইহা আপনা হইতেই হয় না। পুরুষ-মাত্রেই স্বাধীন; কিন্তু অনেক পুরুষও এরূপ দুর্ব্বলচিত্ত, যাহাদিগকে হয় ত, সমাজ ও লোকচক্ষে শিক্ষিত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া জানা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা সে পদের যোগ্য নহে। কারণ, যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে যথার্থ শিক্ষিত ও স্বাধীন-পদবাচ্য হয়, তাহাদিগের মধ্যে সে সকল গুণ নাই; তাহারা এ সকল শিক্ষা করে নাই।

অতএব দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পরস্পর সমসূত্রে গ্রথিত। শিক্ষা না পাইলে স্বাধীনতার ফল ভোগ করা যায় না; এবং যে স্বাধীন নহে, সে মনুষ্যত্বও লাভ করিতে পারে না। সংশিক্ষা ও সাধু আদর্শই স্বাধীনতালাভের একমাত্র প্রধান উপায়। আমরা যেরূপ দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগের বেশবিন্যাস করিয়া থাকি, দর্পণে প্রতিবিম্বিত আকৃতি দেখিয়া আমাদিগের সুরূপতা-কুরূপতা বিবেচনা করিয়া, সুরূপ-গ্রহণে যত্নশীল হই, সেইরূপ জগতের লভনীয় উচ্চ সাধু আদর্শগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া নিরন্তর সদসদ্‌ বিচার ও আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা আমাদিগের স্ব-স্ব জীবন গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—আমরা এই সংশিক্ষা ও স্বাধীনতা কোথা হইতে পাইব? শিক্ষাহীন ব্যক্তির জ্ঞান জন্মায় না; এবং যে অজ্ঞানী সে হতভাগ্য। মানব তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ হারাইলে যেরূপ অন্ধ হইয়া থাকে, যে হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক নাই সে ব্যক্তিও তদ্রূপ অন্ধ। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ, তাহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয়। যাহার অন্তর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, যেখানে জ্ঞানের আলোক প্রবেশের বা প্রকাশের পথ নাই, তাহার উন্নতির পথও চিররুদ্ধ। যে জীবন উন্নতির সোপানে না উঠিয়া অবনতির দিকে নামিয়া যাইতে চাহে, সে কেবল ধ্বংসেরই লক্ষণ। যে মানব আপনার অন্ধত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা না করিয়া জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, সে সর্ব্বদা অবনতির মুখে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে মাত্র। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু প্রকৃতির নিয়মাধীন। সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে বিধাতৃ-বিধি অমান্য করা হয়। আমাদের অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা আবশ্যক। গীতায় আছে, 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।—ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।' জ্ঞানই উন্নতির মূল সোপান। এই জ্ঞানের আধার শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উৎপত্তি। শিক্ষার প্রধান পথ বা উপায় বিদ্যার্জ্জন।

আমরা গুরূপদেশ, সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ, ও সদালোচনা প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারি, তাহাকেই বিদ্যার্জ্জন করা বলে। এই বিদ্যা-বলেই মানব-সমাজ আজ পৃথিবীর সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আপনাকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাইতে হইলে, বিদ্যার্জ্জন তাহার সদুপায়। কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্ম, সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের বিদ্যাদ্বারা লাভ হয়। বিদ্যা-দ্বারাই আমরা আমা-

দিগের আদর্শ খুঁজিয়া পাই, বিদ্যা সদ্বিবেচনা আনয়ন করে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে দেশের লোকেরা এখনও অশিক্ষিত ও অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য-নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিহীন অবিবেচক নর পশুর মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। স্থূলকথা,—মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র বিদ্যাই আশ্রয়ণীয়। বিদ্যা ভিন্ন শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে মনুষ্য-জীবন গঠিত হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই যে শিক্ষা, ইহা কি কেবল পুরুষের জন্যই? সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে শুধু পুরুষের শিক্ষালাভই কি যথেষ্ট? নর ও নারী উভয়কে লইয়াই মানবজাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, মনুষ্য বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। অতএব পুরুষের যদি শিক্ষা-লাভের আবশ্যকতা হয়, তবে স্ত্রীর হইবে না কেন? নারীজাতি কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? আর যদি নারীজাতি অন্য কোনও জাতীয় জীবের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে ধারণা হইয়া আসিতেছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, তাহা কিরূপে সম্ভব হইত? অতএব কি নারী কি নর—মনুষ্যত্ব-লাভের সার্থকতা পাইতে হইলে, শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব রক্ষাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ও মনুষ্য-পদের যোগ্য হই।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নারীদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া পুরুষ একা জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোকে অগ্রসর হইলে কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীঅমলা দেবী।

লক্ষ্মী-পূজা।

নমি পদযুগে হে মহালক্ষ্মি, রত্ন-আকর-সুতা,
বিশ্বরূপের প্রেয়সী গৃহিণী, বিশ্ব-বিভব-যুতা।
সম্বলহীন ধ্যান গায়ত্রী, আমি মা অধম দীন,
কুণ্ঠিত হৃদি বহিয়া এনেছি করিতে চরণে লীন!
সংগ্রহ করি শত উপচার, আয়োজনে
ঢালি প্রাণ,—
গরবে ছলিতে, আসি নি দেখাতে
কপট পূজার ভান!
ভরিয়া এনেছি নিঃস্ব হৃদয় অকপট প্রয়োজনে,
শূন্য দু'হাত পাতিয়া এসেছি,
নিলাজ পীড়িত মনে!
ধরার ক্ষুধা সে, ঈর্ষা ও দ্বেষে ক্রূর
ছলনায় হাসি'

আনে মা জীবনে শত অতৃপ্তি, প্রমাদ,
জড়তা-রাশি !
বাহ্য বিভব কামনায় তাই,
তৃষিত হৃদয়-ভাষা
ফুটে না ফুটে না ; সে শুধু ছলনা,
সে যে মিছা মুঢ়-আশা !

চাহে না যে-সব ক্ষুধাতুর দীন, শুষ্ক মলিন প্রাণ;
হে ধন-ধান্য-অধিষ্ঠাত্রি, দেহ মোরে শ্রেয় দান !
আত্মার কাছে নিত্য যা আছে,
দাও সে বিত্ত প্রাণে,
চিত্তের ক্ষুধা, তৃপ্ত কর মা, চির অমৃত দানে !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক ছিলুম সিদ্ধি কলিকায় সাজিয়া লইয়া, ভাল করিয়া উহাতে এক দম্ টানিয়া নন্দী ত্রিশূল-হস্তে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ রে, আয়—আয়। যাত্রার সময় হোলো—কে যাবি এই বেলা আয়।"

মা একখানি গৈরিক বসন পরিয়া, হাতে, কাণে, গলায় ও মস্তকে কেবলমাত্র ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া, সিংহবাহিনী হইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বিষাদে ভরা, মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন নাই—অঙ্গে একখানিও রত্ন-অলঙ্কার নাই।

ভৃঙ্গী ও ষাঁড়টী তাঁহার পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িতেই তাঁহার চক্ষু এইবার কেমন সজল হইয়া উঠিল। অদূরে শিবের সাধনভূমি, কয়েকটী কেতকী-বৃক্ষের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প লক্ষিত হইতেছিল। শিবের চরণচিহ্ণটী তখনও মেঘ-লুক্কায়িত নবারুণের মত সেইখানে জলিতেছে—দৃষ্ট হইল। সতী লুব্ধনেত্রে বারংবার সেই দিকেই চাহিতে চাহিতে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সিংহকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভূতপ্রেতগুলি, কেহবা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, কেহ বা মড়ার হাড় লইয়া, কেহ-বা ডমরু, শিঙা ও ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাকোলাহলে পার্ব্বত্যভূমি কাঁপাইয়া চলিল।

এ-দিকে এই কাণ্ড। ও-দিকে দক্ষের আলয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবাধ্য জামাতার উপরে রীতিমত প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও দক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে বাকী রাখেন নাই। ত্রিদিবের বড় বড় সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দক্ষের আত্মীয়-দিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অসংখ্য কন্যার মধ্যে সতী ছাড়া সকলেই

দিগের আদর্শ খুঁজিয়া পাই, বিদ্যা সদ্বিবেচনা আনয়ন করে এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। যে দেশের লোকেরা এখনও অশিক্ষিত ও অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে অসভ্য-নামে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধিহীন অবিবেচক নর পশুর মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। স্থূলকথা,—মানুষকে মনুষ্যত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে একমাত্র বিদ্যাই আশ্রয়ণীয়। বিদ্যা ভিন্ন শিক্ষা হয় না। অতএব প্রকৃত শিক্ষা না পাইলে মনুষ্য-জীবন গঠিত হয় না, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই যে শিক্ষা, ইহা কি কেবল পুরুষের জন্যই? সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে শুধু পুরুষের শিক্ষা-লাভই কি যথেষ্ট? নর ও নারী উভয়কে লইয়াই মানবজাতির সৃষ্টি; অর্থাৎ, মনুষ্য বলিতে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝায়। অতএব পুরুষের যদি শিক্ষা-লাভের আবশ্যকতা হয়, তবে স্ত্রীর হইবে না কেন? নারীজাতি কি মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে? আর যদি নারীজাতি অন্য কোনও জাতীয় জীবের মধ্যেই পরিগণিত হয়, তবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে যে ধারণা হইয়া আসিতেছে যে, নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, তাহা কিরূপে সম্ভব হইত? অতএব কি নারী কি নর—মনুষ্যত্ব-লাভের সার্থকতা পাইতে হইলে, শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব উভয়েরই বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব রক্ষাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি ও মনুষ্য-পদের যোগ্য হই।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নারী-দিগকে অন্ধকারে রাখিয়া পুরুষ একা জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোকে অগ্রসর হইলে কখনই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীঅমলা দেবী।

লক্ষ্মী-পূজা।

নমি পদযুগে হে মহালক্ষ্মি, রত্ন-আকর-সুতা,
বিশ্বরূপের প্রেয়সী গৃহিণী, বিশ্ব-বিভব-যুতা।
সম্বলহীন ধ্যান গায়ত্রী, আমি মা অধম দীন,
কুণ্ঠিত হৃদি বহিয়া এনেছি করিতে চরণে লীন!
সংগ্রহ করি শত উপচার, আয়োজনে
ঢালি প্রাণ,—
গরবে ছলিতে, আসি নি দেখাতে
কপট পূজার ভান!
ভরিয়া এনেছি নিঃস্ব হৃদয় অকপট প্রয়োজনে,
শূন্য দু'হাত পাতিয়া এসেছি,
নিলাজ পীড়িত মনে!
ধরার ক্ষুধা সে, ঈর্ষা ও দ্বেষে ক্রূর
ছলনায় হাসি'

আনে মা জীবনে শত অতৃপ্তি, প্রমাদ,
জড়তা-রাশি !
বাহ্য বিভব কামনায় তাই,
তৃষিত হৃদয়-ভাষা
ফুটে না ফুটে না ; সে শুধু ছলনা,
সে যে মিছা মূঢ়-আশা !

চাহে না যে-সব ক্ষুধাতুর দীন, শুষ্ক মলিন প্রাণ;
হে ধন-ধান্য-অধিষ্ঠাত্রি, দেহ মোরে শ্রেয় দান !
আত্মার কাছে নিত্য যা আছে,
দাও সে বিত্ত প্রাণে,
চিত্তের ক্ষুধা, তৃপ্ত কর মা, চির অমৃত দানে !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক ছিলুম সিদ্ধি কলিকায় সাজিয়া লইয়া, ভাল করিয়া উহাতে এক দম্ টানিয়া নন্দী ত্রিশূল-হস্তে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কৈ রে, আয়—আয়। যাত্রার সময় হোলো—কে যাবি এই বেলা আয়।"

মা একখানি গৈরিক বসন পরিয়া, হাতে, কাণে, গলায় ও মস্তকে কেবলমাত্র ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া, সিংহবাহিনী হইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু বিষাদে ভরা, মুখে উৎসাহ বা আনন্দের কোনও চিহ্ন নাই—অঙ্গে একখানিও রত্ন-অলঙ্কার নাই।

ভৃঙ্গী ও ষাঁড়টী তাঁহার পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়িতেই তাঁহার চক্ষু এইবার কেমন সজল হইয়া উঠিল। অদূরে শিবের সাধনভূমি, কয়েকটী কেতকী-বৃক্ষের ফাঁক দিয়া অল্প অল্প লক্ষিত হইতেছিল। শিবের চন্দ্রশদ্ধ'টী তখনও মেঘ-লুক্কায়িত নবারুণের মত সেইখানে জ্বলিতেছে—দৃষ্ট হইল। সতী লুব্ধনেত্রে বারংবার সেই দিকেই চাহিতে চাহিতে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সিংহকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিলেন। ভূতপ্রেতগুলি, কেহবা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, কেহ বা মড়ার হাড় লইয়া, কেহ-বা ডমরু, শিঙা ও ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া মহাকোলাহলে পার্ব্বত্যভূমি কাঁপাইয়া চলিল।

এ-দিকে এই কাণ্ড। ও-দিকে দক্ষের আলয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবাধ্য জামাতার উপরে রীতিমত প্রতিশোধ লইবার জন্য, প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকেও দক্ষ নিমন্ত্রণ করিতে বাকী রাখেন নাই। ত্রিদিবের বড় বড় সকল দেবতা, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দক্ষের আত্মীয়-দিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। অসংখ্য কন্যার মধ্যে সতী ছাড়া সকলেই

পতিপুত্র ও অন্যান্য পরিজনসহ উপস্থিত। জামাতারা প্রত্যেকেই এক এক দিকে এক এক কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ যম, চন্দ্র ও অগ্নি—ইঁহারা সকলেই দক্ষের জামাতা;—তাঁহাদের ছুটাছুটিতে ও হাকে-ডাকে দক্ষপুরী সরগরম! কেহ নিমন্ত্রিতদের আহার্য্য পরিবেশন করিতেছেন, কেহ যজ্ঞ-স্থলের জিনিষপত্রাদির খবর্দ্দারি করিতেছেন, কেহ-বা আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে মন দিয়াছেন।

চন্দ্র নিতান্ত সুশীল; তিনি অভ্যাগত-দিগের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে যজ্ঞের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল, সেই খবর লইতেছেন। যমরাজ শাসনকার্য্যে অত্যন্ত পটু;—তিনি চারিদিকের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। অগ্নি আমোদ-প্রমোদাদির সুশৃঙ্খলা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনগণ আরও অসংখ্য কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

নিমন্ত্রিতেরা একে একে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলে দক্ষ কহিলেন, "আর দেরী কেন? এইবার যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইতে পারে।"

ভৃগু প্রভৃতি কয়েক জন ঋষি এই শিবহীন যজ্ঞে দক্ষের প্রধান সহায়। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ও ভগবান্ প্রজাপতি কি কহেন, তাহা জানা দরকার।"

বিষ্ণু চুপ করিয়া একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। শিবের অভাবটা তাঁহার চক্ষে যজ্ঞভূমিটাকে নিতান্তই অসহ্য ও অপ্রীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ঈষৎ মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তাই তো! ভগবান্ প্রজাপতি কি বলেন?"

ব্রহ্মাও নিরানন্দ এবং অন্যমনস্ক ছিলেন। বিষ্ণুর কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশেষ কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, আর দেরী কেন? যজ্ঞ আরম্ভ হোক্।"

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল। মহাসমারোহে ভৃগু অন্যান্য কয়েক-জন হোতার সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। দক্ষ আসিয়া সদম্ভে নিকটে বসিলেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আবার ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, "নারদের সহিক একটু বাক্যালাপ করিয়া আসি, ক্ষণিক অপেক্ষা কর।" সে কথা শুনিয়া দক্ষ ঈষৎ ভ্রূকুটী করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।—সকলেই স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে সুগভীর 'কিচিমিচি' শব্দ উত্থিত হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া মাথা তুলিতেই দক্ষ দেখিলেন—এক অদ্ভুত দৃশ্য। দক্ষ দেখিলেন, দর্শকদিগের সেই বিষম জনতার মধ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া কয়েকটা কাল কাল কি! কি-বা উহাদের চেহারা, এবং কি-বা উহাদের বিকট আনন্দোচ্ছ্বাস! হি হি করিয়া তাহারা হাসিতেছে, আর দর্শক-দিগকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া, আপনাদের জন্য যতটা পারে, সম্মুখে জায়গা করিয়া লইতেছে! দক্ষ আরও দেখিলেন, কয়েকটা আসিয়া পা ছড়াইয়া একবারে সম্মুখেই আরাম করিয়া বসিল। সমস্ত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা ও অপ্সরাদের মধ্যে তাহাদের বিকটমূর্ত্তিগুলি অতিশয় অদ্ভুতভাবে 'চিক্‌মিক্' করিতে লাগিল।

দক্ষ বুঝিতে পারিলেন, কোন্ রাজ্যের মহামান্য আগন্তুক ইহারা। যদিই-বা প্রথমে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, কিন্তু বাহিরের

দুই একটী কলরবে অবিলম্বেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাগে তাঁহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কোথা হইতে আসিল ?"

সে উত্তর করিল, "সতী আসিয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

দক্ষ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না; রাগিয়া কহিলেন, "কি ? এত বড় স্পর্দ্ধা ! নিমন্ত্রণ করিলাম না, তবু আসিল ! আচ্ছা রসো, মজা দেখাইতেছি !" তারপর উচ্চৈঃস্বরে প্রহরীদিগকে হুকুম দিলেন, "সব আপদ্‌গুলোকে তাড়াইয়া দাও ; ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও।"

ভূতেরা অতশত জানে না। মায়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ ;—কত খাইবে, নাচিবে—মনে করিয়া আসিয়াছে। এখন খাদ্যের পরিবর্ত্তে কীল-ঘুষোর ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গেল ! কোন সভাতেই কেহ তাহাদের এমন "দূর দূর" করে না। আজ মায়ের সঙ্গে আসিয়া এই অপমান ! তাহারা বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিতে লাগিল, আর দুম-দাম করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে সতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

জননী প্রসূতির নিকট বসিয়া সতী অভিমানাশ্রু পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভূতেরা কহিল, "তাড়াইয়া দিল যে !"

দুর্-দুর্ করিয়া সতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কে তাড়াইয়া দিলে ? কেন তাড়াইয়া দিলে ?"

"যজ্ঞস্থল হইতে প্রহরীরা তাড়াইয়া দিয়াছে ; আর শুধু তাড়াইয়াই দেয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে মার-ধরও করিয়াছে !" এই বলিয়া ভূতেরা যে-যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইতে লাগিল। কেহ পীঠ দেখাইল, তাহার চামড়া উঠিয়া গিয়াছে ; কেহ নাক দেখাইল, অনেকটা নাই ; কেহ কান দেখাইল, টানের চোটে তাহা লম্বা হইয়া গিয়াছে !

সতীর অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভূত হইল। মাতার নিকটে ছেলেপিলে, যত কুৎসিত-কদাকারই হউক, যত অপদার্থই হউক, অতুল স্নেহের পাত্র ! সতীও ইহাদিগকে তেমনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "ওকি মা অমন করিলে কেন ? ভাবিও না ; আমি মিটাইয়া দিতেছি ! ও-সব কিছু নয়। জামাতারা কোথা গেল ?"

অভিমানের বহ্নি সতীর অন্তরে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। শিবকিঙ্করদের উপায় করিবেন ওই জামাতারা ? এতই তুচ্ছ শিব ? ছি ! ছি ! ছি !

প্রসূতি চলিয়া গেলেন। সতী আস্তে আস্তে যজ্ঞভূমির দিকে চলিলেন। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেই আরও একটী দৃশ্য তাঁহার নয়ন-সম্মুখে পতিত হইল।

সতীকে নামাইয়া দিয়া সিংহটা গাছতলায় পড়িয়া আরাম করিতেছিল ; একটা অনুচর তাহাকে খোঁচা লইয়া তাড়িয়া আসিল। তাহা দেখিয়া সে-ও কেশর নাড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সতী দেখিলেন, একটীমাত্র

শূলের খোঁচা খাইতেই সে একেবারে লাফাইয়া, তাহার ঘাড়ের উপর পড়িবার উপক্রম করিয়া দিয়াছে আর কি! সতী তাড়াতাড়ি সিংহকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

সিংহের চক্ষু রক্তবর্ণ, লেজ প্রসারিত, কেশরগুচ্ছ অসম্ভবরূপ স্ফীত। গায় হাত বুলাইয়া সতী তাহাকে কহিলেন, "ছি! ছি! পশুরাজ, ও কি!—ছি!" তারপর অনুচরটীর সম্মুখে যাইয়া সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়াইলেন। অনুচর সতীকে সম্মুখে দেখিয়া, হঠাৎ, "মা, আমার দোষ নাই; প্রজাপতির হুকুম আমি পালন করিয়াছি মাত্র," এই বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল। সতী কথা কহিতে না পারিয়া এইবার যজ্ঞবেদীর নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন। দক্ষ মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সতীকে দেখিয়া কহিলেন, "ভাঙ্গড়ের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তোরও লজ্জা-সম্ভ্রম গেল, দেখিতেছি! ছি! ছি! ছি! সতি, কে তোকে এই সব জন্তু ও লোকদের লইয়া আসিতে বলিল?"

সতী পিতা ও অন্যান্য গুরুব্যক্তিকে অভিবাদন জানাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পিত্রালয়ে কন্যা আসিবে, তাহার আবার অনুমতি কি পিতঃ? আমি নিজের ইচ্ছাতেই এইখানে আসিয়াছি, এবং ইহাদিগকেও আমার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। ইহাতে কি অপরাধ হইয়াছে?"

লজ্জায় ও ঘৃণায় দক্ষ মুখ বিকৃত করিলেন; কহিলেন, "সে জ্ঞান তোর থাকলে হ'ত! তা'হলে কি তুই ভাঙ্গড়ের সেবা করিস্? না, শিবের কথাতেই এইসব ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে এইখানে আস্তে সাহস পাস্?"

দারুণ মনস্তাপে সতী কহিয়া উঠিলেন, "যিনি কোনও দোষে দোষী নন্, দোষ-গুণের যিনি অতীত, কল্পনা করিয়া কেন তাঁহাকে বৃথা কটূক্তি করেন, পিতা? শুনিলাম, শিবহীন যজ্ঞ করিতেছেন। ইহা কি আপনার উচিত? না, ইহা নিরাপদ? শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে পারে? সে তো দেবতাদেরও অসাধ্য।"

দক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি? কন্যা হইয়া এত বড় বড় লম্বা লম্বা কথা কহিস্! আমার সাক্ষাতেই ভাঙ্গড় স্বামীর গর্ব্ব! আচ্ছা, রোস্; তোর শিবের অহঙ্কারটা ভাঙিতেছি। একবার তার কাহিনীটা বলি তবে—শোন্।"

এই বলিয়াই দক্ষ সদম্ভে মস্তক তুলিয়া সেই সম্মিলিত দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক শিবনিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গায়ের জ্বালায় শিবের কত কুৎসাই দক্ষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—শিব ভাঙ্গড়—ভাঙ্ খায়; শিব অনাচারী—যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকে; শিবের মানসম্ভ্রম-জ্ঞান নাই, যত ছোট লোকের সঙ্গেই তার মেলা-মেশা;—নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূত-প্রেতগুলা তার নিত্যসাথী; শিব আস্ত জন্তু;—ব্যাঘ্রছাল পরে—সাপের হার কণ্ঠে দেয়।"—এইরূপ আরও কত কি বলিয়া দক্ষ যে শিবের কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন তাহা বলা সুকঠিন।

দক্ষ বলিয়া যাইতেছেন, আর সভাস্থিত সকলে মগ্ন হইয়া শুনিতেছে; এমন সময় অকস্মাৎ সতীর দিকে চাহিয়া নিষ্ঠুর বক্তা হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। দক্ষের বাক্য-রোধের সঙ্গে সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের দৃষ্টিও সেই দিকে পড়িল;—তাঁহারাও তখন স্তব্ধ

হইয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে দিতে হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চাহিয়া একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন! তাঁহাদের হস্তস্থিত পাত্র আর নামিতে চাহিল না! একটা কি শক্তিতে চরাচর যেন এক মুহূর্ত্তে স্পন্দনহীন হইয়া গেল!

সকলে দেখিলেন, দেবী নিশ্চল পাষাণবৎ আকাশ-পথে দৃষ্টি স্থির করিয়া করযোড়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহার সামান্য বস্ত্রাঞ্চলটীও যেন যোগমগ্ন হইয়া স্থির হইয়া আছে! শীর্ণ কাঞ্চনপ্রভ-কায়, অঙ্গস্থিত কুসুমরাশির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর সহিত মিলিয়া, পবিত্রতার আলোকে চারিদিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেই পবিত্রতার মধ্যে, তাঁহারই প্রাণের মত, সকল মূর্ত্তিই ধ্যান-মগ্ন! বাহিরের কোন কিছুতেই যেন সে মূর্ত্তির কোন অনুভূতি নাই। চক্ষের দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ হইলেও অন্তরের মধ্যেই তাহার সাধনার বস্তু পাইয়া সে তন্ময়! দেহের ও অন্তরের মধ্যে একখানি যেন সুস্পষ্ট আবরণ টানিয়া দিয়া দেবী যজ্ঞাগ্নির পার্শ্বে ক্রোধে রঙ্গ দেখিতেছেন!

সতীর এই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া, দূরে গবাক্ষ-সমীপে দাঁড়াইয়া প্রসূতি আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সতি, সতি, মা আমার! চলে আয়; বুকের ধন আমার, বুকে আয় মা! আয়, ওখানে থাকিস্ নে; বুকে আয়!" একটা আশু বিপদের সম্ভাবনা জননীর স্নেহকাতর হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহার সেই কাতর আহ্বান যজ্ঞস্থলে অনেকেই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু সতীর ধ্যান-মগ্ন অন্তরের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া উহা তাঁহাকে কিছুতেই সচেতন করিয়া তুলিতে পারিল না। সতী ক্রমেই অসাড় —আরও অসাড় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অতিবিচিত্র ব্যাপারই সংঘটিত হইল।

সতীর দেহ ক্রমে নমিত হইল ও চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। একটী রেখার মত জ্যোতিঃ হঠাৎ সেই দেহ হইতে নির্গত হইয়া আকাশে ধূপশিখার মত যজ্ঞাগ্নিতে মিলাইয়া গেল! এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহটিও কুণ্ডের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া গেল।

চারিদিকে প্রবল আর্ত্তনাদ উঠিল। গবাক্ষপার্শ্বে প্রসূতি, "সতি, সতি" বলিয়া এইবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দর্শকগণ, "এ কি হইল, এ কি সর্ব্বনাশ," বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। দ্বারে নন্দী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ব্যাপার দেখিতেছিলেন; এক্ষণে এক গগনভেদী হুঙ্কার ছাড়িয়া তিনিও ত্রিশূল-হস্তে লাফাইয়া উঠিলেন। সিংহ ব্যাপার কি, এতক্ষণ ভাল বুঝিতে পারে নাই; সকলকে সমবেত-স্বরে চীৎকার করিতে এবং দেবীর দেহকে ঐরূপভাবে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে লম্ফপ্রদানে কুণ্ডের সম্মুখীন হইল। পিশাচেরা 'কিল্ বিল্' করিয়া যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ করিয়া মহাগোলযোগ বাধাইয়া দিল। এমন কি, এমন যে দক্ষ, তাঁহারও মুখ হইতে অলক্ষ্যে একটা আর্ত্তস্বর নির্গত হইল।

কিন্তু এ সবই এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র! —তাহার পরেই এক মহামারী কাণ্ড! নন্দীর হুঙ্কারে ও ত্রিশূল-চালনায়, সিংহের দাপটে ও ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে, তেমন যে যজ্ঞস্থল, তাহাও মুহূর্ত্তে পিশাচ-ভূমিতে

পরিণত হইল। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেবতা— প্রাণভয়ে সকলেই পলায়নপর হইলেন। সাহস করিয়া প্রতিবাদ বা সম্মুখীন হইবার মত কাহাকেও পাওয়া গেল না। দক্ষ নিরুপায় হইয়া সশঙ্কে ভৃগুর দিকে চাহিলেন।

যজ্ঞ পণ্ড হয় দেখিয়া, (ভৃগু তাড়াতাড়ি কি করিবেন!)—যজ্ঞরক্ষার কামনায় যজ্ঞাগ্নিতে একটা প্রকাণ্ড আহুতি দিয়া বসিলেন। সেই আহুতি হইতে হঠাৎ এক উজ্জলাকৃতি বীরের উদ্ভব হইল। উহার নাম ঋভু! হস্তে প্রকাণ্ড এক খড়্গ! দক্ষের ইঙ্গিতে সে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রবল বিক্রমে সকলকে যজ্ঞভূমি হইতে তাড়াইতে লাগিল; এবং যজ্ঞভূমি ক্রমশঃ পরিষ্কার করিয়া দিল। তাহার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া নন্দী ও ভূতের দলকেও অবশেষে প্রস্থান করিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

মিশ্র সাহানা—কাওয়ালি।

বরিষ আশিস্-কণা য়ুরোপের মাঝে!
প্রীতির মঙ্গল ভেরি প্রতিপ্রাণে বাজে!
য়ুরোপের ঘরে ঘরে
দীপ জ্বলে পুণ্য-করে,
প্রতি আঙ্গিনায় তব হেম-পীঠ রাজে,
সিঞ্চহ নির্ব্বাণ-বারি উহাদের মাঝে॥

মুছে যাক্ দ্বেষ-দ্বন্দ,
যত মোহ যত সন্দ,
উঠুক্ সকল চিত্তে সাধনার মহানন্দ;
সাজাও য়ুরোপ-চিত্ত ধর্ম্মময় সাজে।
প্রেমের আলোকে সব,
থাক্ শান্তি অভিনব,

হে রাজাধিরাজ! বুঝি' তব বৈভব
বিরক্ত হয় যেন ভ্রাতৃ-হিংসা কাজে॥*

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ৩ ॥
II {ম্মা ম্মা ঋা ম্মা। ঋা ঋা সা সা। ঋা -া পা মপা। ম্মা ম্মা জ্ঞা -া} I
ব রি ষ আ শি স্ ক ণা য়ু ০ রো পে র মা ঝে ০

০ ১ ২´ ৩
I ম্মা -পা পা পা। গণা -ধণা পা -ধা। ম্মা পা -র্সা র্সা। মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা I
প্রী তি র ম ঙ্গ ল ০ ভে রি প্র তি প্রা ণে বা ০ জে ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II {না -া -া না। -া -া না -া। র্সা র্সনা র্সা র্ঋা। না -া র্সা র্সা I
য়ু ০ ০ রো ০ ০ পে ০ ০ র ০ ০ ঘ রে ০ ঘ রে

---

* মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের জনৈক ছাত্র-কর্ত্তৃক বিরচিত।

I না -র্সা র্রা র্রজ্ঞা । র্রা -ার্স র্সা -ার্র । -া -র্সাণ র্সণা র্ণা । -ধা ণা ধা পা} I
দী • • প • • ০ জ • • ০ লে • ০ পু ণ্য • ক রে

I মা -পা পা পা । পা পা পা পা । মা -পা পা না । না র্সা র্সা র্সা I
প্র • তি আ ঙ্গি না য় ত ব ০ হে ম পী ঠ রা জে

I নর্সা-র্রা র্সা ণা । ধা পা পা পধা । মা -পা পধা পধপা । মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা II
সিন্ চ হ নি র্ব্বা ণ বা রি ০ উ হা দে ০ র মা • • ঝে •

II { মা পা -া ণা । -ধা ণা ধা পা । -া পা ধা মা । পা পা পা পা I
মু • • ছে • ০ যা ০ ০ কৃ ০ • দ্বে ষ দ্ব ন্দ্ব

I মা পা -া র্সা । -া -া র্সা -া । ণা ধা পা -ধা । মপা -ধা পমা মজ্ঞা I
য ০ ০ ত ০ ০ মো • • হ ০ ০ য • ত স • ০ ন্দ

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা মা । রা রা রা সা । রা রা সা সা I
উ ঠু ক্ স ক ল চি ত্তে সা ধ না র ম হা ন ন্দ

I রা মা মা পা । পা পা পা -া । ণা -ণা ধা মা । পা পা পা -া } I
সা জা ও য়ু রো প চি ০ ত্ত ধ র্ম্ম ম য় সা জে •

I {না -া -া না । -া -া না -া । র্সা -না র্সা র্রা । না না র্সা র্সা I
প্রে • ০ মে ০ ০ র • • আ ০ ০ লো কে স ব

I না র্সা র্রা র্রা । -া র্জ্ঞা র্রা র্সা । -া না র্সা র্রা । র্সা ণা ণা ধা } I
পা • • কৃ • ০ শা ০ ০ স্তি ০ • অ ভি ন ব

I ণা -ধা ণা-ধা । পা -া পা পা । মা পা পা পা । র্সা -া র্সা র্সা I
হে • রা জা ধি • রা জ বু ঝি ত ব বৈ • ভ ব

I র্রা র্সর্রর্সা ণা -ধা । ণা ধা পা পধা । মা পা ধা পধপা । মজ্ঞা -া -জ্ঞমা -পা II
বি র ০ ত • হ য় যে • ন ভ্রা তৃ হিং ০ সা কা • • ঙ্ক্ষে •

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৫

শীলা শয়ন-কক্ষে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে কোন্ সৌভাগ্য-বলে এ কয় দিন এমন সুখী হইয়াছিল! কেন সে সুখ চিরদিন থাকিল না? সুপ্রকাশ আসা পর্য্যন্ত সে কি হোটেলে থাকিতে পারে না? —না। তাহা হইলে সে পাগল হইয়া যাইবে। সে তাহা কোনও মতে পারিবে না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্স খুলিয়া সেই পুরাতন প্যাকেটটি,—যাহাতে 'লীলাবতী দাস' লেখা ছিল,— খুলিয়া দেখিল, একখানি পত্র। পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা।—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অর্থ পাইলাম। ধন্যবাদ। আপনি কি আর এখানে আসিবেন না? আপনাকে একবার দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছি। আপনি দুঃখিনীর প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। আমার ছেলে-দুইটি ভাল আছে। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন। ইতি।

আপনার দাসী—

লীলাবতী।"

পত্রে এমন কোনও কথা নাই, যাহাতে মনের ভাব বিকৃত হয়। যদি কাগজে মকদ্দমার কথা না পড়িত, শীলা ইহাতে কিছুই মনে করিত না। এই নির্জ্জন স্থানে সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে কি করিবে! সে তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিল। তাহার স্বামীকে এই সে প্রথম পত্র লিখিতেছে। সে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোনও ভাবই মনে স্থির করিয়া আনিতে পারিল না; উঠিয়া চিঠি লিখিতে বসিল :—

"আমি লক্ষ্ণৌ যাইতেছি; কাকাবাবুর বাটীতে থাকিব। মিঃ সুব্রত বসু আসিয়া এই কাগজ ও চিঠি দিয়াছেন; দিলাম, দেখিও। আমি জানি না, কি করা উচিত বা কি বলা উচিত। তুমি যাহা বুঝাইতে পার, বুঝাইও। এখানে কোনও মতে থাকিতে পারিতেছি না—"

পত্র অসমাপ্ত রহিল,—আর লেখা হইল না। শীলার মাথার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, সে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আয়া পার্শ্বের ঘরে ছিল; ছুটিয়া আসিয়াই শীলাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

দুখ্‌মন বেহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া আয়াজী?"

আয়া। আরে মেম্‌সা'ব কা হো গিয়া! জল্‌দি ডাগ্‌দার বোলাও। সাহেব কিধর গিয়া?—কব আয়েগা? *

দুখ্‌মন। সা'ব কাল আয়েগা। হাম্ জানেসে হোগা নেই। হোটেলকো ডাগ্‌দারকে বোলানেসে হোগা। †

* আরে, মেমসাহেব কি-রকম হয়ে গেছেন! শীঘ্র ডাক্তার ডাক। সাহেব কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?

† সাহেব কাল আসিবেন্। আমি যাইলে হইবে না। হোটেলের ডাক্তারকে ডাকিলে হইবে।

সুব্রত পূর্ব্বের সেই কক্ষেই বসিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বের ঘরে চীৎকার প্রভৃতি শুনিতেছিলেন, কিন্তু কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় ডাক্তারকে লইয়া দুখ্‌মন সেই স্থানে আসিল। ডাক্তার ইংরাজ। তিনি সুব্রতকে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? তদুত্তরে সুব্রত বলিলেন, "আমি জানি না। আমি এইমাত্র আসিয়াছি; তবে, মিসেস্ রায় কোনও দুঃসংবাদ পাইয়াছেন।"

ডাক্তার আয়ার সহিত গিয়া শীলাকে শয্যার উপর তুলিয়া শয়ন করাইলেন। জ্ঞান কিছুতেই হইল না দেখিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, 'পুনরায় আসিয়া দেখিব' এই বলিয়া ডাক্তার যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, শৈলেন আসিয়াছেন। শৈলেন সেই তৎক্ষণাৎ আসিয়াছেন। ডাক্তার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "Where is Mr. Roy?" *

শৈলেন। He has gone to Kalka; will return tomorrow. †

ডাক্তার বলিলেন, "Mrs. Roy is very ill. The case looks serious. You ought to send a telegram to Mr. Roy to come positively by tomorrow's train. I hope that somebody will look after her. I will come by and by." ‡ এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

শৈলেন সুব্রতকে দেখিয়া বলিলেন, "ম'শায় কি এইখানেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ, আমি মিসেস্ রায়ের পরিচিত।

শৈলেন। হঠাৎ পীড়িত হইবার কারণ কি?

সুব্রত। কারণ—? হয় ত, আমিই কারণ! আমি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কোন একটা কথা বলেছিলাম।

শৈলেন। সুপ্রকাশ রায়ের বিরুদ্ধে কথা! আপনি, বুঝি, তাঁকে জানেন না?—সর্ব্বনাশ কোরেছেন!—

এমন সময় আয়া চীৎকার করিয়া "দুখ্‌মন! দুখ্‌মন!" বলিয়া ডাকিল। শৈলেন ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, শীলা একেবারে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সে শয্যায় স্থির থাকিতেছে না; খুব জ্বরও হইয়াছে। আবার ডাক্তারকে ডাকা হইল। ডাক্তার বলিলেন, একজন 'নার্স' না হইলে চলিবে না। নর্স একজন এখনই চাই। শৈলেন নর্স আনিতে চলিয়া গেলেন ও টেলিগ্রামে সুপ্রকাশকে শীঘ্র ফিরিতে বলিলেন।

সুব্রত সেই হোটেলেই একটী কক্ষ লইয়া রহিলেন। শীলার এই সাংঘাতিক পীড়া! আর তাঁহার জন্যই পীড়া! এই সকল ভাবিয়া তাঁহার অন্তর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল!

শৈলেন একজন 'নর্স' আনিয়া দিলেন ও

---

* মিঃ রায় কোথায়?

† তিনি কাল্‌কা গিয়াছেন; কাল আসিবেন।

‡ রায়-ঠাকুরাণী অত্যন্ত পীড়িতা; তাঁহার রোগ সাংঘাতিক দেখাইতেছে। মিঃ রায়কে কল্যকার ট্রেনে নিশ্চয় আসিবার জন্য আপনার টেলিগ্রাম করা উচিত। আশা করি, ইঁহাকে কেহ দেখিবেন। আমি এখনই আসিতেছি।

নিজে সারারাত্রি সেইখানে থাকিয়া সংবাদাদি লইলেন।

সকালে ট্রেন নাই; বেলা একটায় ট্রেন আসে। ততক্ষণ সকলেই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন। শীলার জ্ঞান হইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার 'ব্রেন ফিভার' বলিয়া জানাইলেন যে, হটাৎ অত্যন্ত আঘাত পাইয়া এ পীড়া হইয়াছে। শৈলেন ১০ টার পর কলেজে চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন যে, আবশ্যকতা হইলেই যেন 'নর্স' সংবাদ দেয়। সুব্রত তখন বসিবার কক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন; শৈলেন চলিয়া গেলেন, তিনি দেখিলেন।

১টার পরই সুপ্রকাশ আসিয়া উপস্থিত। টেলিগ্রাম পড়িয়াই তাঁহার মন এমন অস্থির হইয়াছিল যে, তিনি কি ভাবে যে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুব্রতকে দেখিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি এখানে! শীলা কেমন আছে?"

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আমার দোষেই শীলার প্রাণ যেতে বসেছে। আপ্‌নার কাছে কি সব বোল্‌বো?"

সুপ্রকাশ। (ব্যস্ত হইয়া) কি বোল্‌বেন? শীগ্‌গির বলুন, আপনি কি করেছেন?

সুব্রত। শীলাকে আপ্‌নার সেই 'ডাইভোর্স কেসের' বিষয় জানিয়েছি। আপনি যে তাকে সে কথা না বোলে বিয়ে কোরেছেন, তাই জানিয়েছি। এখনো যে লীলাবতী দাস এখানে আছেন, তাকে যে আপ্‌নি মাসহারা দেন, তাও সব জানিয়েছি। আর আপ্‌নার আশ্রয় ছাড়্‌তে পরামর্শও দিয়েছিলাম। শীলা অন্নদাবাবুর কাছে লক্ষ্ণৌ যাবে বোলে বস্ত্রাদি ঠিক্ কর্ত্তে গিয়েছিল; আমায় বোলেছিল, আপ্‌নি আস্‌লে এই পত্র ও কাগজ দিতে; সেইজন্যে আমি বাধ্য হ'য়ে এখানে আছি। শীলা আপ্‌নাকে যে পত্র লিখ্‌তেছিল, দেখুন। ডাক্তার-সাহেব আমায় এ দিয়ে গেছেন।

সুপ্রকাশ পত্রখানি হস্তে লইয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি অতিমূর্খের মত কি অন্যায় কোরেছেন! যাক্, এ কথা পরে হবে; শীলাকে আগে দেখে আসি।"

সুব্রত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নি কি বলেন, এ-সব কিছু নয়? এ-সব কথা কি উড়িয়ে দেওয়া উচিত? শীলা আমাদের ঘরের বৌ হ'লে, তার পক্ষে কত ভাল হ'ত!"

সুপ্রকাশ অবিচলিত নেত্রে সুব্রতর প্রতি চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; আপ্‌নার কি মনে হয়, আমি এই অপরাধে অপরাধী? ঠিক্ কোরে বলুন ত!"

সুব্রত তাঁহার সেই নির্দ্দোষ মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "যদি মুখের ভাবে মানুষ চিন্‌তে হয়, তা হ'লে আপ্‌নি নির্দ্দোষী; কিন্তু এত যে প্রমাণ!"

সুপ্রকাশ। সে কথা পরে হবে। বলুন, আমার দিকে চেয়ে বলুন, আপ্‌নার কি মনে হয়?

সুব্রত। আমার মনে হয় বটে, আপ্‌নি নির্দ্দোষ। যদি নির্দ্দোষ হন্, আমি আপ্‌নার কাছে চিরকালের জন্যে বাধিত হব। আপ্‌নি আমায় প্রমাণ দেখান, তা হ'লে

আপনার ওপর আমার যে ভাব, সব চলে যাবে।

সুপ্রকাশ। দেখাব, এইখানে বসুন। আর দেরী করা নয়। আগে শীলার জীবন ফিরিয়ে পাই, তবেই নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ কোর্ব্বো; তা নয় ত নয়।

এই বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুতপদে শীলার কক্ষে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, তথায় একজন নর্স আছেন এবং আয়াও আছে। তিনি যাইবা-মাত্র নর্স বলিল, "মিঃ রায়, আপ্‌নি কথা বল্‌বেন না। রোগী যেন হঠাৎ জেগে না উঠে।" সুপ্রকাশ নর্সের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া তাহার তুষারশুভ্র ললাটদেশ স্পর্শ করিলেন; ললাট জ্বলন্ত-বহ্নিসম উত্তপ্ত। সুপ্রকাশ শয্যার পার্শ্বে ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া শীলার দুইটি হস্ত নিজ-হস্ত-মধ্যে ধারণ করিয়া শয্যোপরি মস্তক স্থাপন করিলেন। নর্স ও আয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ সেইস্থানে একমনে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া শীলার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার সেই কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের নিকট বিফলে গেল না। শীলা সুপ্রকাশের স্পর্শে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইতেছিল। সে একবার অন্যদিকে ফিরিল। সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে সেই সুন্দর ললাটদেশে পুনরায় করস্পর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া নর্সকে ডাকিয়া, ডাক্তারকে ডাকিতে বলিলেন।

নর্স ডাক্তার ডাকিয়া আনিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "She is much better. I hope she will gain her strength soon. Be careful, don't talk too much. Try to keep her quiet."*

সুপ্রকাশ ডাক্তারের সহিত বাহিরে আসিলেন, এবং কি কি করিতে হইবে, সব জানিয়া লইলেন। তাহার পর সুব্রতকে বলিলেন, "আপ্‌নি কি এই হোটেলেই আছেন?"

সুব্রত। হাঁ।

সুপ্রকাশ। অনুগ্রহ কোরে আরও কয়েক দিন থাকুন। আপ্‌নার মনের ভাব দূর কোর্ত্তে চেষ্টা কোর্ব্বো।

এমন সময় শৈলেন আসিয়া পড়িলেন। শৈলেন ব্যস্তভাবে বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দা বৌদি কেমন আছেন?"

সুপ্রকাশ। একটু ভাল ত, ডাক্তার বল্লেন। শৈলেন, তুমি এসেছ, বড়ই ভাল হয়েছে। এখন মিঃ বসুকে তোমায় আমার সব কথা বোল্‌তে হবে। আমি ভাই, তোমার স্ত্রীর জীবনের জন্যে অনেক দিন ত সয়িছি; অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিয়িছি।

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া ভয়-চকিত-নেত্রে সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া) কিন্তু সুষমা ত, জান, সব সময়ই আমার ওপর সন্দিগ্ধ; আমার বিষয় কিছু শুন্‌লেই তার রসাতল! সে যদি এ-সব শোনে, তবে সে ত আর বাচ্‌বে না। আমি কি শেষে স্ত্রী-হত্যাকারী হব!

সুপ্রকাশ। এ-দিকে, ভাই, আমার শীলা যে যায়! আমায় কি ভাই, এই বোঝা

---

* ইনি অনেকটা ভাল। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই ইনি বল লাভ করিবেন। সাবধান, বেশী কথা বলিবেন না। ইঁহাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করুন।

নিয়ে চিরকাল থাকতে বল? তোমার একটু বিবেচনা করা ত উচিত। (সুব্রতর প্রতি) আচ্ছা, মিঃ বসু, আপ্‌নি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যা শুন্‌বেন তা কাউকেও বল্‌বেন না, শুধু শীলাকেই বল্‌বেন, তবেই সত্যি কথা শুন্‌তে পাবেন। তা নয় ত, থাক্ আমার ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা! কেন মিছে বেচারা শৈলেনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা!

সুব্রত ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপরিসীম আশ্চর্য্যে অভিভূত হইতেছিলেন। কৌতূহল- ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "ম'শায় আমি শপথ কোরে বল্‌ছি যে, আমি আর কাউকেও বোল্‌বো না, আপ্‌নি আমায় বলুন। আমিই শীলার এই দশা করিছি। আমার এ বিষয় জানা নিতান্ত দরকার।

সুপ্রকাশ শৈলেনের প্রতি চাহিলে, শৈলেন অস্পষ্ট হইতে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর কণ্ঠে বলিলেন, "মিঃ বসু! সে মকদ্দমা সুপ্রকাশ-দার নামে হয় নি; আমার নামেই হয়েছিল। আমার নাম শৈলেন রায়,—এস, রায়। কাগজে ভুল কোরে 'এস রায়, জমীদার', লিখেছিল। মাসীমা যখন এখানে হাওয়া বদ্‌লাতে আসেন, সুপ্রকাশ-দা তখন এদেশে ছিলেন না; কোল্‌কাতায় জমীদারীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাসীমার কাছে আমিই ছিলাম। তখন আমার বিবাহের এন্‌গেজমেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাসীমার সেবার জন্যে আমি মিসেস্ দাসকে নিযুক্ত করি। তিনি মাসীমার কাছে প্রায়ই তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নানা কথা বোল্‌তেন যে, তাঁর স্বামী অত্যন্ত মাতাল ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কোন খানে কাজ নিলেও তাঁকে নানা কথা বলেন, কাজ না করলেও প্রহার করেন ইত্যাদি। একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে তিনি মিসেস্ দাসের কাছে টাকা চান। টাকা না পাওয়ায়, তিনি মিসেস্ দাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করায়, আমি মাসীমার আদেশ-মত চাকর দিয়ে তাঁকে আমাদের বাড়ী থেকে বাহির করিয়ে দিই। শেষে সেই অবস্থায় সেই লোক আমাকে মিঃ রায় জমিদার, মনে কোরে, আমার নামে ১০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে, আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-ভঙ্গের জন্যে নালিস করেন। পরে আমি টেলিগ্রাম কোরে সুপ্রকাশ-দাকে আনাই। আমার স্ত্রীর দিদিমা তখন এলাহাবাদে ছিলেন। তিনি কেমন কোরে এই সব কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে এখানে আসেন। তিনি সব জানেন। সুপ্রকাশ-দা যখন দেখ্‌লেন যে মিঃ এস রায়-জমীদার, বোলে নালিশ করেছে, তখন হেসে উঠ্‌লেন। মাসীমা কিন্তু তাঁকে আদালতে দাঁড়াইতে হয়, তা চাইতেন না। সুপ্রকাশ-দা বল্লেন, 'শৈলেন বেচারির বিয়ের ঠিক্ হয়েছে, তার নামে কথাটা উঠ্‌লে, নানারকম গোল হবে; বিয়ে হয় ত হবে না! ওকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দেব। আমার নামে বল্লে কি হবে? আমি গ্রাহ্য করি না।' তখন সুপ্রকাশ-দা বিয়ে কোর্ব্বেন না, স্থির করেছিলেন। মকদ্দমার দিন ঠিক্ হয়ে গিয়েছিল। হটাৎ তার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সময় মিঃ দাস আমাদের বাড়ীর গেটের পাশ থেকে আমাকে লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছুঁড়্‌তে গিয়ে, কেমন ভাবে বন্দুক টানেন যে, তা

তাঁর মাথা ভেদ কোরে চলে যায়। সে কি কাণ্ড!—পুলিশ-এজাহার!—এখনো মনে হ'লে কি রকম মনে হয়! সুপ্রকাশ-দা আমার জন্যে সব সহ্য করেছেন। আজ, আমার জন্যে তাঁর নির্দ্দোষ নামে এত কলঙ্ক! আজ আমার জন্যে তাঁর স্ত্রী যায় যায়! এ-সব শুনলে হয় ত আমার স্ত্রীও বাঁচ্‌বে না।" এইসব বলিতে বলিতে শৈলেন সেইস্থানে বসিয়া দুই হস্তে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

সুব্রত সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া, তাঁহার দুইটি হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি দেবতা; আপ্‌নার মত যে মানুষ হয়, তা আমি জানতুম না। পরের জন্যে আপ্‌নার এত ত্যাগ-স্বীকার! আপ্‌নার পায়ের ধুলো দিন্, আমি মাথায় নিয়ে ধন্য হব। শীলাকে আমি এখন নিজের বোনের মতই দেখি, আর দেখ্‌বোও। আপ্‌নি আজ থেকে আমার নিজের বড় ভাইয়ের মত হ'লেন। আমায় যা যখন আদেশ কোর্‌বেন, আমি পালন কোর্‌বো।"

সুপ্রকাশ সুব্রতর প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আগে শীলাকে ফিরিয়ে পাই, নতুবা সব বৃথা হবে। যাই হোক্, এ কথা আর জানাজানি কর্‌বার অবশ্যকতা নেই; শুধু আপ্‌নি নিজে শীলাকে বোল্‌বেন। আপ্‌নি এখন এখানেই থাকুন্। আপ্‌নি আজ থেকে আমার অতিথি।" তারপর শৈলেনের প্রতি চাহিয়া তিনি বলিলেন, "শৈলেন, ওঠ ভাই, তোমার কোনও দোষ নেই। একথা সুষমাকে কেউ বোল্‌বে না। বল্লেও কোন ক্ষতি নেই।"

শৈলেন। (সুব্রতকে) আসুন, আপ্‌নাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।

তাঁহারা উঠিলেন। এমন সময় আয়া দ্বারের নিকট হইতে বলিল, "হুজুর মেমসাহেব-কো হোঁস্ আনে পর হুয়া—।"

সুপ্রকাশ দ্রুতপদে আয়ার সহিত চলিয়া গেলেন। সুব্রতকে লইয়া শৈলেন হোটেলের বাহিরে গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

অজ্ঞাতাভাস।

মুক্ত করি ত্রস্ত করে দক্ষিণ-দুয়ার,
মলয় বহিছে আজি বসন্ত-সথার
যেন কি সন্দেশ ল'য়ে! নিভৃত-প্রাণের
গোপন মরমতলে কা'র চরণের
মধুর নূপুর বাজে! পুলকে ব্যথায়
চকিতে শিহরি চিত্ত উন্মত্তের প্রায়
করে কা'র অন্বেষণ! উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
ক্ষণে ক্ষণে সারা হৃদি, হারায়ে দু'কূল
অকূলে ভাসিতে চায়! স্বপনের কোলে
বেজে উঠে বাঁশী যেন মদির-হিল্লোলে
কেড়ে লয়ে প্রাণ-মন! অতৃপ্ত যৌবন
মাধবী পুষ্পের মত বিকশি কেমন,
চেয়ে রয় কা'র করে সঁপি আপনায়
শোভিবে কোমল বক্ষ চুম্বন-মালায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রীতি-উপহার।

তোমাতে আমাতে সখি,
রহিলেও ব্যবধান,
তোমারি মধুর স্মৃতি
রহে পূর্ণ সারা প্রাণ।
মরমের তালে তালে
নিরলে নিভৃতে নিতি,
তোমারি রাগিণী বাজে
অবিরত ঢেলে প্রীতি।

এ নব বরষে আজি
লইয়া নবীন আশা,
অরপিনু তব করে
"উপহার ভালবাসা।"
যদিও বা অতিতুচ্ছ
সৌরভ-বিহীন ফল,
তবু আশা,—হৃদি-নভে
দিবে আলো তারা তুল।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উনবিংশ অধ্যায়—আকস্মিক দুর্ঘটনা।

মনুষ্য-জীবনে অনেক সময় অনেক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই দুর্ঘটনাগুলির প্রতিবিধান জানা থাকিলে, তাহা সময়ানুসারে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। মহিলাগণের এ-সকল বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য নিম্নে কতকগুলি দুর্ঘটনার প্রতিবিধান লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

আহত স্থানের চিকিৎসা।

কখনও কখনও বালক-বালিকাদিগের হস্তে ছুরিকা লাগিয়া বা কাচ ফুটিয়া রক্তস্রাব সঙ্ঘটিত হয়। এইরূপ সময়ে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(ক) ক্ষতস্থান শীতল জলের দ্বারা ধৌত করিয়া, তাহার ভিতরের ময়লা,—ভগ্ন কাচখণ্ড বা অন্য কোনও পদার্থ, যাহা কিছু থাকে—পরিষ্কার করিয়া দিবে। নতুবা, ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হইবে না।

(খ) বর্দ্ধিত মুখ-দুইটী নিকটবর্ত্তী করিয়া তাহাতে মলম দিয়া ষ্টিকিং প্লাসটার লাগাইয়া দিবে। ষ্টিকিং প্লাস্টারের টুকরা অতিক্ষুদ্র হওয়া চাই।

(গ) ক্ষত-স্থান এরূপ-ভাবে রাখিবে, যেন তাহাতে নড়্ চড়্ না লাগে। নড়্ চড়্ লাগিলেই ক্ষত-মুখটীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ঘটিলে ক্ষত জুড়িতে বিলম্ব হয়।

(১) ধমনীর রক্তস্রাব।—ধমনীর রক্ত দেখিতে উজ্জ্বল, ইহার স্রাব পরিমাণে অধিক হয় এবং নিঃসৃত হইবার কালে বেগে বহির্গত হয়। এবম্বিধ রক্তস্রাব ভয়ানক বিপজ্জনক। মূল-ধমনী হইতে যদি রক্তস্রাব হয়, তবে অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে রক্তবমনকারী স্থানকে উচ্চে ধারণ করিয়া, তাহার উপর স্থূল বস্ত্রখণ্ড বা তদ্রূপ কোনও পদার্থ, যাহা সেই সময়ে প্রাপ্ত হইবে, রক্ষা করিয়া, রুমালদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে।

(২) শৈরিক রক্তস্রাব।—কৃষ্ণবর্ণের রক্তস্রাব দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা শিরা হইতে বহির্গত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রেও স্রাব ক্রমাগত হইয়া থাকে। ইহার প্রতিকার পূর্ব্বোক্তরূপ।

মূর্চ্ছা।

মস্তকে আঘাত লাগিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইলে, অথবা শরীরের শোণিত উত্তমরূপ অক্সিজন না পাইলে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালনীয়।

(১) রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার মস্তকটী উচ্চে স্থাপন করিবে।

(২) গলার চতুঃপার্শ্বের কাপড় খুলিয়া দিবে।

(৩) রোগীর চতুঃপার্শ্বে বিশুদ্ধ হাওয়া খেলিতে দিবে; এবং

(৪) রোগীকে শীঘ্রই নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে বা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবে।

মূর্চ্ছা হইলেই রোগীকে তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া শয়ন করাইয়া শরীরের সমান উচ্চতায় তাহার মস্তকটী রক্ষা করিবে; যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া শোণিত সহজে প্রবাহিত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ড যখন মস্তিষ্কে রক্ত চালিত করিতে না পারে, তখনই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছাকালে Eau-de-Cologne অথবা নিসাদল নাকের সম্মুখে রাখিতে পারা যায়। কিন্তু মস্তকটী যেন শরীরের সমান উচ্চতায় থাকে;—এ বিষয়ে যেন ভুল না হয়। শীতল জলের ঝাপ্‌টা মুখে দিলেও রোগীর মূর্চ্ছারোগ ভাল হয়। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাকালে রোগীকে কখনও কিছু খাইতে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

জলে ডুবা।*

জলনিমজ্জিত ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্থাপনা করিবার চেষ্টা করিবে।

---

* আজকাল জলে ডুবিলে, ডাক্তার সেফারের প্রণালীটিই (Dr. schafer's method) সহজ-সাধ্য ও অধিক ফলদায়ক বোধে অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে জলমগ্ন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেওয়া হয়। রোগীর মুখটী সেবকের পরীক্ষার সুবিধার জন্য, ঈষৎ বাম বা দক্ষিণ দিকে (যে দিকে সেবক বসিবেন, সেই দিকে) ফিরাইয়া রাখা হয়। তাহার পর সেবক তাহার সুবিধামত রোগীর দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রোগীর উভয় পাঁজরের উপর নিজের দুইটী হাত স্থাপন করিয়া, অল্প অল্প চাপ দিয়া তাহা উপরে বগলের কিছু নীচ অবধি উঠান। হাত দুইটী উপরে উঠাইবার সময় চাপ অল্প অল্প বাড়াইতে হয়; এবং হাত যখন বগলের কাছে আসে, তখন চাপ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিমিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপ করিলেই যথেষ্ট। এইরূপ করিতে করিতে, কিছুক্ষণ পরে রোগীর নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে এবং তখন তাহার নাকের কাছে হাত দিলেই উহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস

(১) তাহার অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিয়া তাহার মুখের আবিলতাকে পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(২) মস্তকের নিম্নে বালিশ রাখিয়া মস্তকটীকে সামান্য উচ্চ করিয়া দিবে।

(৩) রোগীর বাহুদ্বয় (তাহার কনুই-য়ের নিকট) ধারণ করিয়া, তাহা সোজা উত্তোলিত করিয়া মস্তকের পশ্চাতে লইয়া যাইবে ও পরে মস্তকের পশ্চাৎ হইতে সেই-দুইটীকে সম্মুখে লইয়া আসিয়া বক্ষে সংলগ্ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়া চারি সেকেণ্ড পরে পরে করিবে ; শীঘ্র শীঘ্র করিবে না। এইরূপে কৃত্রিম নিঃশ্বাস স্থাপিত হইবে। স্বাভাবিক শ্বাস লইতে রোগীর ১৫।২০ মিনিট, এমন কি অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত সময়ও লাগে।

(৪) শরীরের উষ্ণতা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য জলনিমজ্জিত ব্যক্তির গাত্রে কম্বলাদি আচ্ছাদিত করিয়া দিবে ও রক্তের গতি নিয়মিত করিবার জন্য শরীর ও পদ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

গলায় জিনিস আট্‌কান।

দুর্ভাগ্য-বশতঃ বালকেরা যদি মটর বা মার্ব্বেল খাইয়া ফেলে ও তাহা গলায় আটকা-ইয়া যায়, তবে প্রথমতঃ, তাহার গলায় অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বমন করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ফললাভ না হইলে সন্নিকটবর্ত্তী কোনও ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইবে।

যখন বেশ পড়িতে থাকে, তখন উক্ত ব্যাপার ধীরে ধীরে কমাইয়া, ক্রমে থামাইয়া দিতে হয়। এই প্রণালীতে উপকার না হইলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণীয়।

হুল-ফুটা।

শরৎকালে বোল্‌তা ভীমরুল প্রভৃতি প্রায়ই দংশন করে। এরূপ স্থলে হুলটীকে নিষ্কাসিত করিয়া laudanum লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। হুল তুলিয়া লইয়া লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলেও যন্ত্রণা লোপ পায়।

দগ্ধ হওয়া।

দগ্ধ হইয়া যাইলে, স্থানটীর বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া, রেড়ির তেল ও চূণ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার উপর তৎক্ষণাৎ লাগাইয়া দিবে। চর্ম্মের যে-সকল স্থানে বস্ত্রাদি লাগিয়া গিয়াছে তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিও না।

(২) সোডা বাই-কার্ব্বের জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া দগ্ধ স্থানে বাঁধিয়া দিবে। ৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা পরে ফোস্কাগুলি সূচ-দ্বারা গালিয়া দিয়া, তাহা বসাইয়া দিবে ; কিন্তু ফোস্কা উঠা-ইতে চেষ্টা করিও না। পরে দগ্ধ স্থানটীতে ভেসিলিন লাগাইয়া দিবে।

চক্ষু ও কর্ণে বাহ্য বস্তুর প্রবেশ।

চক্ষে ধূলিকণা পতিত হইলে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল নিঃসৃত হইয়া ধূলিকণা বা উত্তেজক পদার্থকে দূর করিয়া দেয়। যদি পতিত পদার্থ চক্ষে না দেখা যায়, তবে সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষুতে দিয়া কিয়ৎ-কাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে, যন্ত্রণার উপ-শম হয়। চক্ষে চূণ পতিত হইলে ভয়ানক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। তখন সির্কায় উত্তমরূপে জল মিশ্রিত করিয়া, তদ্দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া ফেলিবে। চূণের কণাগুলি অপসারিত হইলে, সামান্য রেড়ির তৈল চক্ষে দিলে কষ্টের উপশম হইবে।

কর্ণে কোনও বস্তু প্রবেশ করিলে, যদি তাহা অঙ্গুলি-দ্বারা নাগাল না পাওয়া যায়, তবে সোন্না দ্বারা তাহা বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান, যেন কর্ণঢক্কায় কোনরূপ আঘাত না লাগে। কারণ, আঘাতের ফল অতিভয়ানক।

কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু যদি ক্ষুদ্র হয়, তবে ঈষদুষ্ণ জল কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আহত কর্ণটী নীচের দিকে রাখিয়া উপরিস্থিত কর্ণকে চাপড়াইলেই কর্ণপ্রবিষ্ট বস্তু পড়িয়া যায়।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

স্নেহের ব্যথা।

(গল্প)

(১)

করুণার মা মৃত্যুর সময় স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার করুণা যেন কখনও কষ্ট না পায়।" নরেন্দ্রবাবু পত্নীর শেষ অনুরোধটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া আসিয়াছিলেন। করুণা কখনও মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা-সমর্পণ করিয়া অল্পদিন পরেই যখন নরেন্দ্রবাবু পরলোক গমন করিলেন, তখন লোকে বলিল যে, কর্ত্তব্যপালনের জন্যই যেন নরেন্দ্রবাবু এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন; তাই মুক্তি পাইবামাত্র তাঁহার উন্মুখ প্রাণ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

করুণার স্বামী নূতন ডেপুটি হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। করুণা ছেলেমানুষ, এখনও সংসার করিতে শিখে নাই; তাই সে বিধবা শাশুড়ীর কাছে রহিল। শাশুড়ীর মৃত্যু হওয়ায়, করুণার স্বামী তাহাকে নিজ কার্য্যস্থানে লইয়া গেলেন। ইহার পূর্ব্বে করুণা স্বামীকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পায় নাই। যখন তাহার কল্পনার দেবতাকে সম্মুখে পাইয়া সে সবে পূজার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছে, তখন নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে সেটুকু হইতে বঞ্চিত করিলেন। পনের বছর বয়সে স্বামী হারাইয়া করুণা সংসার অন্ধকার দেখিল। কোথাও আশ্রয় দিবার মত কাহাকেও দেখিতে পাইল না। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অনেকে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অধিক কিছু দিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। একজন বলিলেন, "মা, তোমার আত্মীয়-স্বজনকে তোমার অবস্থা জানাও; এখানে বিদেশে একলা মেয়েমানুষ ত থাক্‌তে পার্‌বে না। ঠিকানা দিলে, আমাদের বাবু তোমার আপনার লোকের কাছে টেলিগ্রামও কর্‌তে পারেন।"

করুণা অনেক চিন্তা করিয়াও শ্বশুর কিংবা পিতৃকুলের কোনও নিকট আত্মীয়ের কথা স্মরণে আনিতে পারিল না! অবশেষে তাহার মনে হইল যে, তাহার এক মাতুল কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করেন। তিনি একটু অধিক সাহেবী-ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহার সহিত করুণাদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। যাহা হউক, এমন বিপদের সময় করুণা তাঁহাকেই

পত্র লেখা স্থির করিল। তিন-চারি দিন পরে পত্রের উত্তরে এক টেলিগ্রাম আসিল যে, করুণার মামাতো ভাই যতীন্দ্র তার পরদিনই তাহাকে লইয়া আসিবে! আশ্রয়-লাভের আশা সত্ত্বেও করুণা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রক্তের সম্পর্ক থাকিলেও মাতুল অমরেন্দ্র তাহার নিকট একপ্রকার অপরিচিতই ছিলেন। নিতান্ত ছেলেবেলায় করুণা দুই-একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিল। তারপর তাহার বিবাহের সময় তিনি একখানি বহুমূল্য বারাণসী শাড়ী উপহার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজে দেখা করিতে আসেন নাই; সহর ছাড়িয়া গেলে কাজের ক্ষতি হয়, এইকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

যতীন্দ্র সেইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া ছুটিতে বাড়ী বসিয়াছিল। সে গিয়া করুণাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। অমরেন্দ্রবাবুর বিশাল ভবনের এককোণে একটুখানি আশ্রয় পাইয়া করুণা বাঁচিল।

ঘোরতর বিষয়ী লোক বলিলে যাহা বুঝায়, মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, অর্থাৎ অমরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নী, তাহাই ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা করুণাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুবিধবা—যে সাতেও নাই পাঁচেও নাই, একমুঠা অন্নের পরিবর্ত্তে যে অন্নদাতা আত্মীয়ের সংসারে দাসীপনা করিতে প্রস্তুত,—তাহাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত না হইবারই কথা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অবশ্য, করুণাকে কাজ করাইবার জন্য গৃহে আনেন নাই। তাঁহার দাসদাসীর অভাব ছিল না। করুণার জন্য তাঁহার অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল না; কাজেই, তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার অল্প একটু দয়াতে যদি অনাথা ভাগিনেয়ীটি একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার জায়গা পায়, তবে মন্দ কি? মাতুলগৃহে আসিয়া করুণা নিতান্ত সুখে না হউক, নিতান্ত দুঃখেও রহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি একটু অধিক সাহেবীভাবাপন্ন ছিলেন। "সাহেব" না বলিয়া কেহ তাঁহাকে "বাবু" বলিলে তিনি বিলক্ষণ চটিতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার পূরাদস্তুর সাহেবী রকম ছিল। কিন্তু গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব-আমোদগুলি বাদ যাইতে পারিত না। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির এ-সব অনুষ্ঠানে কোনও আপত্তি ছিল না; কারণ, হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প, তাঁহার কোন কালেও ছিল না; তবে, তিনি একটু সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অধিক বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইবে যে, তিনি Reformed Hindu দলের একজন নেতা ছিলেন।

এইসব সাহেবী ধরণ-ধারণের মধ্যে আসিয়া করুণা প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। সময় ও অভ্যাসের গুণে সবই সহিয়া যায়; করুণাও ইহাদের আচার-ব্যবহারে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল।

একটা কথা এতক্ষণ বলা হয় নাই। করুণা মুখে মামা, মামী ও দাদা বলিলেও এবাড়ীর লোকের প্রতি বিশেষ একটা প্রাণের টান সে অনুভব করে নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির দশমবর্ষীয়া কন্যা মৃণালিনী বা মনু একমুহূর্ত্তেই তাহার হৃদয়খানি করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। মনুকে

ভালবাসিয়াই সে ক্রমে মামা, মামী, ও যতীন-দাদাকে আপনার জ্ঞান করিতে শিখিল। প্রথম দিন মন্নু একটু দূরে দূরে ছিল, কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই সে এই নূতন দিদিটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

(২)

করুণা ছেলেবেলা হইতেই একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। পিতা তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতেন না, তাই সে কখনও অন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু পায় নাই। চিররুগ্ন৷ শাশুড়ীর কাছে থাকিতে, তাহার সেবা করিয়াই তাহার সব সময় কাটিয়া যাইত, পাড়ার সমবয়স্কা বৌঝিদের সঙ্গে বিশেষ ভাব করিবার সুযোগ ঘটে নাই। তাহার পর স্বামীর নিকট যে সামান্য কয় দিন ছিল, তখনও বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা মিশিতে পায় নাই।

বাল্যকাল হইতে করুণা বড়ই ভক্তিমতী; যখন সে সম্মুখে সৌম্যমূর্ত্তি স্বামীকে দেখিল, তখন তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্ত তাঁহার পদে লুটাইয়া দিয়া সে কেবল পূজা করিতেই ব্যস্ত রহিল। স্বামীর প্রেমস্পর্শে তাহার প্রণয়-কোরকটী যখন সবে দলগুলি মেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিধাতা ঠিক্ সেই সময়ে সেটিকে বৃন্তচ্যুত করিলেন। সন্তানের জননী হইলে, হয় ত, করুণার ভক্তিপ্রেমপূর্ণ চিত্তটি বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত, কিন্তু বিধির বিধানে তাহা ছিল না।

যাহাই হউক্, মন্নুকে পাইয়া করুণার হৃদয়ের সুপ্ত স্নেহরাশি জাগিয়া উঠিল। সে পূর্ব্বে কখনও কাহাকেও এত ভালবাসে নাই। এই স্নেহোচ্ছ্বাসের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া সে একদিন মন্নুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি আর জন্মে আমার বোন্ ছিলি, মন্নু?" মন্নু একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, "কেন দিদি? এ জন্মেই ত আমি তোমার বোন্!" করুণা মনে মনে বলিল, "যদি মায়ের পেটের বোন্ হতিস্ রে, তবে তোকে কেউ দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর্‌ত না।"

করুণা কয়দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তাহার মামা-মামী তাহার প্রতি মন্নুর এতটা টান পছন্দ করিতেছেন না; কারণ, মন্নু দিদির আদর্শে সাহেবীভাবের বিরোধী হইয়া পিতার শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতেছিল। তাই, তাঁহারা সুবিধা পাইলেই, কোনও ছুতায় মন্নুকে করুণার নিকট হইতে সরাইয়া লইতেন। এইজন্যই মন্নুর প্রীতি আজ ঐ প্রশ্ন।

একদিন দুপুর-বেলা, করুণা নিজের ঘর-টিতে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার মামী আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। মামীর আগমনে সে একটু বিস্মিত হইল; কারণ, প্রয়োজন হইলে তিনি করুণাকে ডাকিয়া পাঠান, কখনও নিজে তাহার ঘরে আসেন না। বইখানা সরাইয়া রাখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "এই একটু গল্প করতে এলুম।" তাহার পর দুই চারি কথার পর বলিলেন, "দেখ, করুণা, তুমি আমাদের নিজের লোক, তোমাকে সব বলাই ভাল। ওঁর ইচ্ছে, মন্নুকে কোন বিলেত-ফেরতের হাতে দেন। ওর শিক্ষাদীক্ষাও সেইরকম ভাবেই দেওয়া হচ্ছে। এখন ও কিন্তু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে! তোমাকে ও খুব

ভালবাসে, তা' ত জানই; সেইজন্যেই, বোধ হয়, পড়াশুনা গান-বাজনায় একটু অমনোযোগী হয়ে পড়েছে।"

করুণা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ত কখনও মন্নুকে পড়া, গান, এ-সব বন্ধ কর্‌তে বলি নি। তা-ছাড়া আমি নিজেই ত চাই যে, মন্নু ঐ সব বেশ করে শেখে। আমার জন্যে ওর এ-সব দিকে ক্ষতি হচ্ছে কেমন কোরে, বুঝ্‌তে পারলুম না ত মামী-মা?"

তাহার মামী তখন বলিলেন, "না, না, আমি ত বলি নি যে, তুমি বারণ করেছ। তবে মন্নু থেকে থেকে সব কাজকর্ম্ম ফেলে এসে বলে, 'মা, দিদির কত কষ্ট! আমি ওর সঙ্গে গল্প কর্‌লে ও ভাল থাক্‌বে; আমি যাই, একটু গল্প করি গে।' এই জন্যেই বল্‌ছিলুম যে, অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে।"

মন্নুর গভীর প্রীতির কথা শুনিয়া করুণার চোখে জল আসিল, সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,"আমাকে কি কর্‌তে বলেন, মামী-মা?" মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "আমি বল্‌ছিলুম যে, তুমি ওর গল্পপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দিও না। ও তোমাকে এত ভালবাসে, তোমারও উচিত নিজের একটু স্বার্থ ত্যাগ কোরে ওর ভাল দেখা। তুমি বুঝিয়ে বল্লেই, মন্নু শুন্‌বে, এই আমার বিশ্বাস। ওর সব খামখেয়ালী চল্‌নে, উনি বড় বিরক্ত হন। এই দেখ না, আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মেমেরা আসেন। সেইজন্যে উনি চান যে, মন্নু জুতা-মোজা পরে থাকে। পরন্তু কিনা সে একেবারে খালি-পায়ে মিসেস্ স্মিথের সাম্‌নে গিয়ে হাজির। উনি যখন বক্‌লেন, তখন আবার বল্‌লে 'দিদি ত খালি পায়ে থাকে। এতে কি দোষ?'" এই সময় মন্নু সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার জননী উঠিলেন।

করুণা মামীর সহানুভূতির অভাবে একটু আঘাত পাইলেও, মনে মনে একটু আনন্দ লাভ করিল যে, তিনি তাহাকে নিতান্ত পর মনে করেন না। জোর করিয়া মন্নুকে তাহার নিকট হইতে না সরাইয়া, তিনি যে তাহার সহিত মন খুলিয়া সে-বিষয় কথা বলিলেন, ইহাতে সে অনেকটা আরাম অনুভব করিল। সে মনুকে কাছে বসাইয়া বলিল, "মনু, তুমি আমার সব কথা শুন্‌বে?" মনু উৎসাহপূর্ব্বক সম্মতি জানাইল। করুণা বলিল, "তুমি আজকাল দুষ্টু মেয়ে হয়ে যাচ্ছ, কেন বল দেখি? মামীমা বল্‌ছিলেন, তুমি মন দিয়ে পড়া-শুনা কর না!" মন্নু করুণার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তোমাকে ছেড়ে মন লাগে না যে দিদি! বাবাকে বোলে আমার পড়ার সময় তোমাকে সেই ঘরে বসিয়ে রাখ্‌ব, তা হ'লে পড়া হবে।" করুণা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগ্‌লী! আমাকে দেখে তোমার মেম শিক্ষয়িত্রী ভাব্‌বেন এ একটা জন্তু না কি! আমি কি তাঁর সাম্‌নে বেরোতে পারি ভাই!" মন্নু সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ইস্ মিসেস্ রো কখ্‌খনো কিছু মনে কর্‌বেন না।" করুণা সে কথা চাপা দিয়া বলিল, "মন্নু, লক্ষ্মী বোন্‌টী আমার, তোমার বাবা-মা যা বলেন, তাই শুনে চলো। তাঁদের অসন্তুষ্ট করো না। তুমি ভাল মেয়ে হোলে আমার কত আনন্দ হবে, বল দেখি! মন্নু সংক্ষেপে "আচ্ছা" বলিয়া করুণার চুল ঘাঁটিতে লাগিল। মন্নুকে কাছে পাইলে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু পাছে মামী বিরক্ত হন,

তাই করুণা বলিল, "এবার তুমি যাও, আমার অন্য কাজ আছে।" মনু বলিল, "তোমার আবার কি কাজ? আমাকে তাড়াবার ফন্দি, না?" করুণা হার মানিয়া চুপ করিল।

(৩)

মনু আজকাল বাপ-মায়ের কথামত সব করে। করুণার দেখাদেখি সে মাছ-মাংস খাওয়া ছাড়িয়াছিল, কিন্তু তাহারই অনুরোধে সে আবার তাহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম প্রথম করুণার সময় কিছুতেই কাটিতে চাহিত না। যে সময়টুকু মনু গান-বাজনা, পড়াশুনা বা চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি লইয়া থাকে, করুণা ততক্ষণ কি করিবে ভাবিয়া পায় না। একদিন সে মামীকে বলিল, "মামীমা, শুধু বসে বসে আমার ভাল লাগে না। ভাঁড়ার দেওয়া, খাবার জোগাড় করা, এ-সব চাকরদের হাতে না দিয়ে, আমাকে দিলে ভাল হয়। আপনাদের কি তাতে কোন আপত্তি আছে?" মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, "না, আপত্তি আবার কি? তুমি করলে ত ভালই হয়।" সেই দিন হইতে করুণা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একদিন মনু আসিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার কাছে ঘরসংসারের কাজ শিখ্‌বো।" করুণা তাহার গাল ধরিয়া বলিল, "তোকে এ-সব করতে হবে না। তোর যে একজন মস্ত সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বাড়ীতে কাজ কর্ব্বার ঢের লোক থাকবে।" মনু রাগ করিয়া বলিল, "আমার বিয়েই হবে না, তা আবার সাহেব!" করুণা হাসিয়া বলিল, "তোর যে তের বছর বয়স হয়েছে, কে বল্‌বে? প্রথম দিন যেমন ছেলে-মানুষটি দেখেছিলুম, আজও তেমনিটিই আছিস্। তোর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল, জানিস্!" মনু বলিল, "তা হোক্। আমার হবে না। বাবা বলেছেন যে, আমার পছন্দমত আমার বিয়ে হবে। তা আমার কিছুতেই কাউকে পছন্দ হবে না।" করুণা বলিল, "আমাদের গুণবতী রাজকন্যার যোগ্যবর, বুঝি, এ ভূভারতে মিল্‌বে না?" মনু তাহার আরক্ত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যাও,—তাই বুঝি!" তাহার পর হঠাৎ একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমায় ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে পার্ব্বো না। তুমি যদি সঙ্গে যাও ত বিয়ে কোর্ব্বো।" করুণা ছল্‌ছল্ চোখে মনুর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "ছিঃ, তা কি হয়? মামা থাক্‌তে আমি অন্য জায়গায় যেতে পারি কি? উপায় থাক্‌তে কে আবার পরের গলগ্রহ হয়?" মনু অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি তোমার পর, না?" করুণা সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল, "ভগিনীপতিটি ত পর। তিনি ত আর তোমার খাতিরে আমায় ভালবাস্‌বেন না।" মনু বলিল, "তবে আমি বিয়েই কোর্ব্বো না।" করুণা বলিল, "মেয়ে মানুষের কি বিয়ে না করলে চলে, পাগ্‌লী?" মনু বলিল, "আচ্ছা সে কথা থাক্। একটা গল্প বল না, দিদি!"

এই বলিয়া করুণার কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। তারপর করুণার একগুচ্ছ চুল সাম্‌নে টানিয়া আনিয়া বলিল, "দিদি, তোমার কি সুন্দর চুল! এমন আমি কোথাও দেখি নি। এই চুল তুমি কাট্‌তে চাচ্ছিলে! কি দুষ্টু! কখ্‌খন কাট্‌তে পাবে না। এখন

একটী গল্প বল।" করুণা হাসিয়া বলিল, "যা হুকুম।" তারপর সে সাবিত্রীর উপাখ্যান বলিতে লাগিল।

করুণার গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার মুখের ভাবে, কণ্ঠস্বরে, শ্রোতাকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া যখন সে পৌরাণিক কাহিনীগুলি মনুকে শোনাইত, তখন মনুর মনে হইত, সে যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারই বর্ণনা করিতেছে! মনু শুনিতে শুনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ত ঠিক্ সাবিত্রীর মত সতী; তুমি কেন তোমার স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লে না?" করুণা মনুকে বুকে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ছি মনু, ও কথা বলো না। তাঁদের দেবতার অংশে জন্ম ছিল। তাঁরা যা পার্‌তেন, আমরা পাপী মানুষ কি তাই পারি, বোন্!" মনুর চোখেও জল আসিয়াছিল; সে করুণাকে জড়াইয়া বলিল, "দিদি, তুমি পাপী ত, পুণ্যবতী কে?"

(৪)

করুণার হৃদয়ের প্রায় সবটুকু স্নেহ-ভালবাসা, মনু একাই দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইত, মনুর মত সুন্দর, বুঝি, বিধাতা আর কিছুই গড়েন নাই। মনু বড় হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এ-কথা মনে করিয়া করুণা কষ্ট অনুভব করিত। তখনই আবার লজ্জিত হইয়া মনে করিত, "ছিঃ, আমি কি স্বার্থপর!" মনু তাহার বুকের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত যেন মিশাইয়াছিল; তাই তাহাকে ছাড়িবার কথা মনে হইলে, করুণার বুক ফাটিয়া যাইত।

এই সময় একদিন মনুর দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই সতীশবাবু, সপরিবারে আসিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে অতিথি হইলেন। তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; সমস্ত পশ্চিমটা একবার ঘুরিয়া আসিবেন। তাঁহারা মনুকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। মনুর পিতা-মাতা সানন্দে অনুমতি দিলেন। করুণাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মনু দুই একবার "না" বলিয়াছিল, কিন্তু নূতন দেশ দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই শেষে জয়ী হইল। মনু তাঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। বিদায়ের দিন করুণা কিছুতেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সতীশবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মা গো, এ আবার কি? মায়ের চেয়েও দেখি যে, এঁর টান বেশী! একমাস মনুকে ছেড়ে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে আর কি!" করুণা এই কথা শুনিয়া দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া নিজের ঘরে গিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আঘাত লাগিল যে, মনু এত সহজেই চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, আহা, ছেলেমানুষ! তাহার কি কোন সাধ থাক্‌বে না! করুণার যেন সংসারে মনু ছাড়া কোন আনন্দ নাই, তাই বলিয়া মনুও কি সব সুখ ছাড়িয়া তাহারই কাছে পড়িয়া থাকিবে?

মনু প্রায় রোজই করুণাকে পত্র লিখিত। করুণা সেগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিত; দিনে শতবার করিয়া সেগুলি পড়িত। দেখিতে দেখিতে একমাস হইয়া গেল। সতীশবাবু লিখিলেন যে, তাঁহার ছোট ছেলেটিকে আর কিছুদিন পশ্চিমে রাখিতে পারিলে তাহার শরীরের পক্ষে বড়ই ভাল হয়,—তাই তাঁহারা

তিনমাসের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন ; তিন মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবেন। মন্নুও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সম্মতি জানাইয়া পত্রের উত্তর দিলেন। করুণা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দিন গণিতে লাগিল। করুণা ভাবিল, তিনমাসেই এত কষ্ট! মন্নুর বিবাহ হইয়া গেলে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে!

বাস্তবিকই দিন যেন আর কাটে না! তাহার উপর মন্নু আজকাল পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে। করুণা ভাবিল, এইবার অভিমান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে; কিন্তু তাহার পর মনে হইল, সেখানে বেড়াইতেই সময় কাটিয়া যায়, তাই বোধ হয়, মন্নু পত্র লিখিতে বেশী সময় পায় না।

তিন মাস পরে যে-দিন মন্নুদের আগমন-বার্ত্তা বহন করিয়া একখানি পত্র আসিল, সে-দিন আনন্দে করুণার সব কাজেই ভুল হইতে লাগিল। তাহার পর যখন একখানা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল, এবং মন্নুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তখন করুণার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। স্বাস্থ্যের প্রভায় মন্নুর স্বভাবসুন্দর মুখখানি দীপ্ত দেখাইতেছিল। করুণার ইচ্ছা করিতেছিল, শতচুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অত লোকের সাম্নে তা কি করা যায়? তাই এই তিন মাসের সঞ্চিত আদরটুকু লইয়া করুণা মন্নুকে নিজের ঘরে পাইবার অপেক্ষায় রহিল।

কেবল তিন মাস,—তার মধ্যেই এত পরিবর্ত্তন! করুণা দেখিল, মন্নু আর তেমন ভাবে তা'র সঙ্গে মেশে না। মন্নু সব সময়ই প্রায় সতীশবাবুর স্ত্রীর কাছে থাকিত। করুণা বুঝিতে পারিল না, কি অপরাধে মন্নু এমন পর-পর ব্যবহার করে! করুণা জানিত না যে, সতীশবাবুর স্ত্রী এই অল্প সময়ের মধ্যেই মন্নুকে বুঝাইয়াছেন যে, করুণার ভালবাসা কেবল স্বার্থ-প্রণোদিত,—ভবিষ্যতে মন্নুর ঘাড়ে চাপিবার ভূমিকা-স্বরূপ। মন্নু একবার বলিয়াছিল, "না বৌদিদি, তা কি হয়?" তাহার এই ক্ষীণ প্রতিবাদটি সতীশবাবুর স্ত্রীর অবজ্ঞার হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। অন্য কেহ হইলে, হয় ত, এত সহজে ভুলিত না, কিন্তু মন্নুর প্রকৃতি চিরকালই খামখেয়ালী, তাই তাহার মনে কোন ভাবই গভীরভাবে দাগ দিতে পারিত না। করুণার প্রতি তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস জোয়ারের জলের মত আসিয়াছিল, কাজেই তাহাতে আবার শীঘ্রই ভাঁটা ধরিয়া গেল।

সতীশবাবুর একটি শ্যালক সেই বৎসর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল। সতীশবাবুর স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা, ধনী পিতার একমাত্র কন্যা মন্নুর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় মন্নুর মাতাপিতাকে জানাইলেন। মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আগ্রহের সহিত সম্মতি জানাইলেন; কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, 'ভাল ছেলে' বলিয়া সতীশবাবুর শ্যালক সুবোধের বেশ সুনাম আছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাহার বুদ্ধি, চরিত্র ও লেখাপড়ার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল; বিলাত হইতে সে খ্যাতি মলিন না হইয়া, উজ্জ্বলতরই হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, সুবোধকে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য, অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত বিলাত-ফেরত পিতাই উন্মুখ

হইয়া আছেন। বিধাতা এমন রত্নটি অযাচিত ভাবে তাঁহাদের দান করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারা পুলকিত হইলেন।

মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "সুবোধকে বাড়ীতে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক্। সে এসে যেয়ে দেখুক; তারও ত একটা মতামত আছে।" সতীশবাবুর স্ত্রী মন্নুর মাকে বলিলেন, "মন্নুকে দেখে তার আর মত না হয়ে যায় না। অমন মেয়ে সে আর পাবে কোথায়?" কন্যার প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "বৌমা, তুমি দিন কয়েক থেকে যাও। তুমি থাক্‌তে থাক্‌তেই সুবোধ এলে, শীগ্‌গিই তার লজ্জা ভেঙে যাবে।"

করুণা সকলই শুনিল। সুপাত্রের সহিত মন্নুর বিবাহের আয়োজনে তাহার খুব আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি জানি কেন, তাহার মনের এককোণে একটু ব্যথা লুকাইয়া রহিল।

সুবোধের সম্পূর্ণ মত জানিয়া মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি সেই মাসের শেষেই মন্নুর বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে সুবোধ এক-এক-দিন দেখা করিতে আসিত। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণার সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু করুণা রাজি হয় নাই। সে আড়াল হইতে সুবোধের স্মিত-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিত, "মন্নু যেন সুখী হয়।" একদিন সে মন্নুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্নু, বর দেখেছিস্ ত? কেমন? পছন্দ হয়?" মন্নু, "যাও" বলিয়া পলাইয়া গেল। মন্নুর সলজ্জ অথচ আনন্দপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া করুণা বুঝিল যে, মন্নু সুবোধের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে উভয়ের কল্যাণকামনা করিয়া সে কার্য্যান্তরে গেল।

(৫)

বিবাহের আর দুই দিন বাকী। কাজের গোলমালে করুণা একরকম আছে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর দুই দিন পরে মন্নু চলিয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও কি তাহাকে আঁক্‌ড়াইয়া রাখিবার অধিকার করুণা পায় না? করুণা ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর আপনার স্বার্থপর ভালবাসার জন্য নিজেকে শতবার ধিক্কার দিল, কিন্তু তবুও যে মন মানে না! করুণা স্বামীর ছবিখানি বাহির করিল। অশ্রুজলে ভাল করিয়া স্বামীর মুখ দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, মন্নুকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়া সে বুঝি, স্বামীকেও ভুলিতে বসিয়াছে। সে তাঁহাকে গভীর ভক্তি দিয়াছিল বটে, তবে এমন করিয়া বুঝি, তাঁহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই! চোখের জল মুছিয়া ছবিখানা মাথায় ঠেকাইয়া করুণা আপন মনে বলিল, "ওগো, দাসীকে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাও। আমি যে এখানে থাক্‌তে পারি না। কেমন কোরে আমি সব ছেড়ে বেঁচে থাক্‌ব?" আবার তাহার দু'চোখ হ'তে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এই সময়ে সতীশবাবুর স্ত্রী তথায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি করুণার ঘরে ঢুকিয়া, তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন; মন্নুর কাছে গিয়া বলিলেন, "তোমার দিদি না, তোমায় বড় ভালবাসে! এই শুভকর্ম্মের

সময় কি-না, ঘরের কোণে বসে চোখের জল ফেলা হচ্ছে! আসলে, তোমার এত ভাল বিয়ে হচ্ছে, তাই সহ্য হচ্ছে না।" মনু মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোনও উত্তর করিল না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেলে মনু শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। কিছুদিন পরেই মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি কন্যাজামাতাকে আবার লইয়া আসিলেন। যে কয়দিন মনু ছিল না, করুণা সে কয়দিন অত্যন্ত কষ্টে কাটাইয়াছিল। প্রথম প্রথম ত একেবারে ঘুমাইতে পারিত না; বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ডাকিত, "মনু, মনু আমার! আমাকে তোর কাছে নিয়ে যা। আমার অত মান-অপমান দিয়ে কি হবে? আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারি না যে!" নিজের এই ভালবাসার আবেগ দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত। প্রণয়ীদের মধ্যেই ত এমন ভালবাসার কথা উপন্যাসে পড়া যায়! মনুকে সে কেন এমন ভালবাসে? প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে করুণা প্রার্থনা করিত, "হরি, আমায় শান্তি দাও।"

এবার সুবোধের সহিত করুণার আলাপ হইল। তবে করুণা তাহার সহিত বড় একটা কথা বলিত না। একদিন সুবোধ মনুকে বলিল, "মৃণাল, তোমার দিদিকে ডাক না, একটু গল্প করা যাক্‌। তোমার দিদিকে আমার বড় ভাল লাগে। দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একখানি দেবীপ্রতিমা।" মনু, বোধ হয়, কথাটা শুনিয়া একটু বিরক্ত হইল; বলিল, "এখন আর ডাকতে পারি না। সে হয় ত, কাজ করছে।" এই সময় করুণা তাহাদের ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, সুবোধ দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি, একটু আসুন না; মৃণাল আপনাকে ডাকছে।"

করুণার মাথার কাপড় পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার অযত্নবর্দ্ধিত জটাবদ্ধ উন্মুক্ত কেশরাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; সত্য-সত্যই তাহাকে একখানি দেবীপ্রতিমার ন্যায়ই দেখাইতেছিল। সে সুবোধকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

সুবোধ এত বড় হইয়াও স্বভাবের সরলতা হারায় নাই; সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "দিদি, আপনার কি সুন্দর চুল; ঠিক্‌ জগদ্ধাত্রীর মতন।" করুণা লজ্জিত হইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। সুবোধের আহ্বানে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডেকেছ মনু?" মনু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি ডাকি নি। উনি মিথ্যা কথা বলেছেন।" সুবোধ হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতেও মনুর মুখের অপ্রসন্নতা দূর হইল না দেখিয়া, "আমার একটু কাজ আছে, সেরে আসি," বলিয়া করুণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বাহির হইতে সে শুনিতে পাইল, মনু সুবোধকে বলিতেছে, "তুমি বিধবাদের চুল রাখা পছন্দ কর? আমি ত দু'চক্ষে ও-সব দেখ্‌তে পারি না;—তা আবার লোক-দেখানর জন্যে খুলে বেড়ান!"

করুণার বক্ষের মধ্যে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইল; সে কোনমতে আপনাকে সাম্‌লাইয়া চলিয়া গেল। সুবোধ যে বলিল, "ছিঃ, মৃণাল, তোমার দিদি দেবী, তাঁর বিষয় অমনি করে বলা উচিত নয়।" এবং তাহার উত্তরে মনু যে বলিল, "আমি এতদিনে যা না চিন্‌তে পেরেছি, তুমি দেখ্‌ছি দু'দিনে তাই

চিনে ফেলেছ।” এসব কথা আর করুণার কানে পৌঁছিল না। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চোখে জলও আসিল না। সতীশবাবুর স্ত্রীর শত গঞ্জনা সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু মনু! যে মনু তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া বিবাহ করিতেও অসম্মত ছিল, সে কেমন করিয়া এমন হইল! অতীতের স্মৃতিগুলি একে একে করুণার মনে পড়িতে লাগিল। মনুই তাহাকে চুল কাটিতে দিবে না বলিয়াছিল! মনু ভালবাসিত বলিয়াই না চুলের প্রতি তাহার মায়া! সেই মনু অমন করিয়া বলিল! করুণা বুঝিতে পারিল না, মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হয়। বাক্স হইতে কাঁচিখানি বাহির করিয়া সে তাহার আগুল্‌ফলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “মনু, মনু!” বলিতে বলিতে দুই বিন্দু অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, স্বামীর উদ্দেশে ভক্তি-অবনত-চিত্তে মাথাটি নত করিল।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি করুণাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি করুণা, তুমি চুল কাট্‌লে কেন?” করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, “অনেক দিন থেকেই কাট্‌ব কাট্‌ব ভাবছি মামীমা! যে গরম পড়েছে, আর সহ্য হয় না। কি বা হবে চুল দিয়ে!” মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আর কিছু বলিলেন না।

সে-দিন রাত্রে যখন করুণা মনুকে খাইতে ডাকিতে গেল, তখন তাহার মুখে বিষাদের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। সে মনুর আশ্চর্য্যভাব কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অত্যন্ত সহজ শান্ত স্বরে ডাকিল, “মনু, খাবে এস।”

এতদিন পরে ঠাকুর করুণার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তাহার স্নেহোচ্ছ্বাসপূর্ণ ব্যথিত হৃদয়খানি দেবতার করুণায় আজ শান্তিলাভ করিয়াছে!

শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১২)

নমিতা বিস্ময়ে স্তব্ধ থাকিলেও কৌতূহলী সুশীলের আগ্রহ অসংবরণীয়। সুতরাং, তাহার রসনা দ্রুততালে সশব্দে সঞ্চালিত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। “পত্র কে লিখিয়াছেন? কেন লিখিয়াছেন? কি প্রয়োজন?” সুশীলের ইত্যাকার প্রশ্নের উপর্য্যুপরি বর্ষণে বিব্রত হইয়া, নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল। মাত্র চারি ছত্রে সমাপ্ত ক্ষুদ্র অনুরোধ-লিপি:—

“মাননীয়াসু,

বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আপনার

কাছে উপদ্রব করিতে অগ্রসর হইয়াছি। সহৃদয়তা-গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সুবিধা-মত যে-কোনও সময়ে একবার এ বাটীতে আসিয়া পায়ের ধূলা দিলে; বড়ই উপকৃতা হইব। ইতি—

নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া—
শ্রীসরমা মিত্র।"

চমৎকৃতা নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—সরমা মিত্র!—নিশ্চয়ই ইনি ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!

ব্যগ্র ঔৎসুক্যে অধীর সুশীল, নমিতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, পত্রখানার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া, অবশেষে ডাকিল, "দিদি!"

পত্রের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তামগ্না নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল! পরক্ষণেই হাতের চিঠিখানা টেবিলের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া, অস্বাভাবিক অপ্রসন্নতার সহিত রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঢের বেলা হয়েছে; আর বাজে এক মিনিটও সময় নষ্ট করা নয়। শীগ্রী তেল নিয়ে আয়, মাখিয়ে দেব।" সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। গতিক ভাল নয় বুঝিয়া, বিনা বাক্যে সে দিদির আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। দিদির প্রতীক্ষায় এখনও সে স্নান করে নাই।

চঞ্চল চরণে কক্ষমধ্যে এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতে ঘুরিতে উন্মনা নমিতা চিন্তাকুল বদনে, ঘর্ম্মাক্ত পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। তাহার পর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিয়া, পরিত্যক্ত পত্রখানার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

পত্রখানা, ক্ষুদ্র পত্র। কিন্তু নমিতার মনের উপর এটা যে আশ্চর্য্য প্রহেলিকার তীব্র ঝাপ্টা হানিয়াছে! উপর-ওয়ালার স্ত্রীর আহ্বান! "বিশেষ প্রয়োজন"— ইহার অর্থ কি? নমিতার পক্ষে ইহা যে বড় বিষম অদ্ভুত ঠেকিতেছে! এ ভাষা যতই মার্জ্জিত ও কোমল হউক্, কিন্তু কে জানে, ইহার অভ্যন্তরে কোন্ জটিলতা অবস্থান করিতেছে! এ 'প্রয়োজনের' উদ্দেশ্য কি? ইহা অনুগ্রহের লাঞ্ছনা, না, দম্ভের পরিহাস?

নমিতার মস্তকের রক্তস্রোত ঝিম্ ঝিম্-শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—একসঙ্গে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা-স্মৃতি চিত্তপটে উদিত হইল; ডাক্তার মিত্রের আচার-ব্যবহারের সুতিক্ত প্রত্যক্ষ বিবরণের চৌহদ্দীগুলা, স্মৃতির দ্বারে উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!—চিত্ত সবেগে বক্র হইয়া উঠিল; অস্থির-ভাবে নমিতা কক্ষের বাহিরে চলিয়া আসিল।

অন্য দিনের অপেক্ষা বেশী শীঘ্র ও সংক্ষেপে পীড়িত বালকের তত্ত্ব সুধাইয়া, স্নানাহার শেষ করিয়া নমিতা শয়ন কক্ষে আসিল। পত্রখানা তখনও করুণ অনুনয়ের অক্ষরমালা বুকে করিয়া নিস্পন্দভাবে টেবিলের উপর পড়িয়াছিল; নমিতা বিরক্তভাবে তৎ-প্রতি চাহিয়া মুখ ফিরাইল। খোলা জানালার রৌদ্রের সন্নিধানে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে সেই চিকিৎসা-পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। আর্দ্র কেশরাশি আধ-ঘণ্টার মধ্যে রৌদ্রে শুখাইয়া লইতে হইবে; তাহার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া 'ডিউটী' খাটার দায়ে নিশ্চিন্ত হইবে।

নমিতা বই পড়িতে লাগিল বটে, কিন্তু পাঠ্য-বিষয়ে তাহার চিত্ত আদৌ নিবদ্ধ হইল

না। মনের কোণটায় কি যেন একটা অস্পষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্যের বেদনা ক্রমাগতই খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সকলের সহিতই চিরদিন সে সরল বিশ্বাসে সখ্য-সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। এখন দিনে দিনে তাহার সুস্থ সরলতার সুদৃঢ় বুকে, উদ্দাম বেদনার ক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে, দুঃখের ভঙ্গ ধরিয়াছে,—এখন পরিচিত অপরিচিত, সকলের পানেই হঠাৎ বিশ্বাসের দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতে তাহার শঙ্কা হয়, সন্দেহ হয়;—মনের মধ্যে রুদ্ধ ব্যাকুলতা অজ্ঞাত উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠে! ...এ বড় অস্বস্তিকর ক্লেশ!

চুলটা আধ্-শুক্‌না হইবার পূর্ব্বেই নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া চক্ষু বুজিল; কিন্তু চক্ষু বোজানই সার হইল মাত্র; ঘুম হইল না। মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ চতুর্গুণ ফেনাইয়া, তাহার বাহ্য-প্রকৃতিকে অতিমাত্রায় চঞ্চল করিয়া তুলিল। ঘুমের চেষ্টা ব্যর্থ বুঝিয়া, নমিতা গা-ঝাড়া দিল। কক্ষমধ্যে বার-কয়েক পায়চারি করিয়া, অন্যমনস্কভাবে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ও পত্রখানা তুলিয়া লইয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

সরমা মিত্র,—অর্থাৎ ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! তা হউক্; তবু ত তিনি নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া! আশ্চর্য্য রহস্য! সেই শিশুর মত সরল-স্নেহ-শ্রীমণ্ডিত সুন্দর যুবকের ইনি সম্মানস্থানীয়া সম্পর্কীয়া রমণী!

অজ্ঞাত কৌতূহলে ধীরে ধীরে নমিতার মন আগ্রহোন্মুখ হইয়া উঠিল!......ইনি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী! কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কটিকে 'বড়' করিয়া, ইহার অজ্ঞাত 'প্রয়োজন'টাকে সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে যথেচ্ছভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। কে বলিতে পারে, ইহাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব নাই? কে জানে, ইনি সংসারের নিকট 'কায়ার ছায়া'-রূপে প্রতিপন্ন হইলেও, ভিন্ন-ধাতু-গঠিতা জীবন্ত-প্রাণ-বিশিষ্টা রমণী নহেন? কে জানে, ইনি কি শুধু সদা-বিক্ষিপ্ত-চেতা ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী—কি সরলস্বভাব প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক নির্ম্মলবাবুর ভ্রাতৃজায়া ও বটেন!

দূর হউক্, অবস্থা-চক্রের উৎপীড়নে নিজের দুঃখ-দ্বন্দ্বের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, নমিতা মূর্খ দৌর্ব্বল্যে এমন শিষ্ট সংযত প্রীতির আহ্বানকে কঠিন ভ্রূভঙ্গীতে উপেক্ষা করিয়া, শুষ্ক রূঢ়তার আশ্রয়ে আত্ম-মর্য্যাদার নামে আত্ম শ্লাঘার আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছলনা করিবে না! হউক্ অসম্মান; ইনি যাহা ভাবিয়া যে উদ্দেশ্যেই ডাকিয়া থাকুন, নমিতা কেন কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে? বাহ্যিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে কেন অনর্থক অভ্যন্তরটা তীব্র অস্বস্তির বিষ-বাষ্পে ভরাট করিয়া তুলিতেছে? এ কি মতিচ্ছন্ন!

অসময়ে সদ্যঃ-স্কুল-প্রত্যাগতা সমিতা আনন্দোৎফুল্ল-বদনে কক্ষে ঢুকিয়া উৎসাহ-মুখর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"দিদি, ভাই, আজ আমাদের এগ্‌জামিনের খবর বেরুলো; আমি এবার ফাষ্ট হয়ে ক্লাশে উঠেছি!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 646. June, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪। জুন, ১৯১৭।	১১শ কল্প।
৬৪৬ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

মিলনে।

সে-দিন প্রভাত-বেলা
তেয়াগি' শয়ন,
তোরণ-দুয়ার খুলি',
দেখিনু নয়ন মেলি',
সে শান্ত মূরতি তব,
প্রিয়-দরশন!

মোহন-তুলিকা তব
নয়নে আমার
সাদরে বুলায়ে দিলে,
সব দুঃখ লুটে নিলে!—
দেখিনু হৃদয় মাঝে
স্বরূপ তোমার!

তোমারে পূজিতে নাথ,
কত আকিঞ্চন!
নিমেষে সকল ভুলি',
লইনু হৃদয়ে তুলি',
করিনু আদর কত
ওগো প্রাণধন!

সে-দিন সে মধুপ্রাতে
আঁচল ভরিয়া
কুড়া'য়ে বকুল জাতি,
সাধের মালাটী গাঁথি'
আনিনু পরাতে গলে
যতন করিয়া!

হাসিয়ে ভ্রমনিংগলে
চুমিলে আমারে;
আমারে আপন জানি
বুকে নাথ, নিলে টানি',
চির-বাঞ্ছিতের মত
কি সোহাগ ভরে!

বিফল হৃদয় মাঝে
হে জীবন-স্বামী!
আশার আলোক-রেখা
ধীরে ধীরে দিল দেখা;
আঁধার কোথায় গেল
নীরবেতে নামি'!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২৬)

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, শীলার মুখের ভাব অন্যপ্রকার হইয়াছে। সে শয্যায় শুইয়া এ-ধার ও-ধার করিতেছে। সুপ্রকাশ নিকটে গিয়া শীলার সেই শুভ্র ললাটে কর স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ললাট অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল। তিনি তাহার করস্পর্শ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন, "শীলা! শীলা আমার!" শীলা সেই করস্পর্শে চমকিত হইয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি কখন এলে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" সুপ্রকাশ তাহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "এখন কেমন আছ, শীলা?"

শীলা। কেন, আমার কি হয়েছে? মাথাটার মধ্যে বড় বেদনা। আমি কি অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছি?—রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম।

সুপ্রকাশ সে কথায় উত্তর না দিয়া 'নর্শ'কে ডাকিলেন ও শীলাকে একটু দুগ্ধ দিতে বলিলেন। শীলা বিস্মিতভাবে নর্শের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ কে? এ আমায় কেন দুধ দিচ্ছে?"

সুপ্রকাশ। আজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তোমায় ফিরিয়ে পেয়িছি। তোমার ভয়ানক অসুখ করেছিল! এখনো তোমায় অতিসাবধানে থাকতে হবে। বেশী কথা বোলো না; ডাক্তার-সাহেব নিষেধ কোরেছেন।

শীলা বিস্মিতভাবে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া রহিল! সুপ্রকাশ দুই-একটী কথার পর উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

এদিকে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সুব্রত বলিলেন, "এখন কোথায় যাচ্ছেন্?"

শৈলেন। আসুন, আপ্নাকে একটা জিনিস দেখাব।

তাঁহারা দ্রুত-পদে পথ-সকল অতিক্রম করিয়া সহরের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শৈলেন সুব্রতকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিতে, সুব্রতও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—একটি সুন্দর মৃত্তিকালিপ্ত অঙ্গন; তাহার মধ্যস্থলে একখানি দড়ির খাটিয়াতে একজন বৃদ্ধা শয়ন করিয়া আছেন; তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত। শৈলেন সেই স্থানে ডাকিলেন,—"মিসেস্ দাস!" দুই-চারিবার আহ্বানের পরেই ভ্রমরকৃষ্ণবিনিন্দিত-কান্তি আরব্ধবার্দ্ধক্যা একটী নারী বাহিরে আসিলেন; তাঁহার ললাটদেশে একটি গভীর কাটার চিহ্ন; বেশভূষা এতদ্দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোকদের ন্যায়। তিনি আসিয়াই শৈলেন রায়কে সম্ভ্রমের সহিত নমস্কার করিলেন। শৈলেন হাসিয়া সুব্রতর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মিঃ বসু! মিসেস্ লীলাবতী দাস।" সুব্রত দুই-এক পদ পিছাইয়া গেলেন।

মিসেস্ দাস বলিলেন, "আমায় কি বল্‌ছেন?"

শৈলেন। মিঃ রায় সম্প্রতি বিবাহ করেছেন, তা আপ্‌নি বোধ হয়, জানেন। ইনি সম্প্রতি এসে সেই মকদ্দমার কথা-সব মিঃ রায়ের স্ত্রীকে বলেছেন। তিনি এ-সকল কিছুই জান্‌তেন না; হঠাৎ এই কথা শুনেই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা এঁকে সকল কথা বলিছি, আর আপ্‌নার কাছে এনেছি। এঁরা কাগজের কথাই বিশ্বাস কোরেছেন।

মিসেস্ দাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "মিঃ রায় আমাদের জীবন-দাতা। তাঁর দয়াতেই আমরা আজ জীবন ধারণ কোরে আছি। আমার এই বৃদ্ধা মাতার ও দুটি সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার আমার উপর। আমার চাক্‌রী যাবার পর থেকেই মিঃ রায় আমায় ২০টি টাকা মাসহারা দেন; তাতেই আমার কোন প্রকারে চল্‌ছে। যা সামান্য একটু কাজ কোর্ত্তে পার্‌তাম, আমার মায়ের এই অবস্থার জন্যে, তাও কিছুই কর্‌তে পার্‌ছি না।

শৈলেন। মিসেস্ দাস, আপনার ললাটের ঐ চিহ্নের বিষয় মিঃ বসুকে একটু বলুন।

মিসেস্ দাস। এটি আমার সুকৃতির ফল। সে-দিন যদি আপ্‌নি আমার স্বামীর হাত থেকে আমায় রক্ষা না কর্‌তেন, তা হলে আমার ইহলীলা সাঙ্গ হ'ত। আমার মোলেই ভাল ছিল। তবে, দুটি শিশু! তাদের জন্যেই ভগবান্, বুঝি, আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন, এখন দেখ্‌ছি। যখন সকল কথা স্মরণ হয়, সদাশয় মিঃ রায়ের উপর কলঙ্কের কথা যখন মনে করি, তখন জীবনে ঘৃণা আসে। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠা সাহোদরার বয়সী, তাঁর মায়ের সমান। আর কি বল্‌ব? আপ্‌নি ত সবই জানেন।"

সুব্রত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে সুপ্রকাশ রায়ের প্রতি তাহার যে ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল, ক্রমে তাহা যেন চলিয়া যাইতে-ছিল! বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা-ভালবাসা যেন মিঃ রায়ের প্রতি ধাবিত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শৈলেন সুব্রতকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে আসিতে আসিতে সুব্রত বলিলেন, "আপ্‌নি আপ্‌নার স্ত্রীকে সব কথা বলেন না কেন?"

শৈলেন। আমার স্ত্রীর স্বভাব অন্য-রকম। বিলেতে যখন ছিলাম, তখন আমার নামে উপহাস কোরে আমার এক বন্ধু কি লিখেছিল; তা শুনেই ত তিনি শয্যাগত হয়ে যান-যান হয়েছিলেন, আর আমাকে বিবাহ কোর্ব্বেন্ না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বিবাহের পরেও দেখ্‌ছি, বড়ই সন্দিগ্ধ-মন; একটু উত্তেজিত হ'লেই সর্ব্বনাশ হবে। আমার দিদি-শাশুড়ী সব জানেন; তিনি বারবার কোরে আমায় তা'র কাছে কোন কথা বল্‌তে মানা ক্যেরেছেন। ছেলেটির মৃত্যুর পর থেকে তার 'হার্ট' অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে; ডাক্তারেরা বোলেছেন, একটু উত্তেজনায় সাংঘাতিক ফল হ'তে পারে।

শৈলেন রায়ের কথায় ও মিসেস্ দাসকে দেখিয়া সুব্রতর মনের ভাব অন্যপ্রকার হইয়া গেল। সুপ্রকাশের চরিত্র তাঁহার চক্ষে আদর্শ-চরিত্র মনে হইল। পরের জন্য কে এত ত্যাগ-স্বীকার করে! নিজের নিষ্কলঙ্ক

চরিত্রে কে কলঙ্ক অর্পণ করে! তিনি স্থির করিলেন, সুপ্রকাশ রায়ের নিকট গিয়া বিশেষ-ভাবে ক্ষমা চাহিবেন।

যখন সুব্রত ও শৈলেন হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সুপ্রকাশ বসিবার কক্ষেই ছিলেন। সুব্রত গিয়াই তাঁহার নিকট, দুঃখিত অন্তরে, অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে, বিনীত বচনে বলিলেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন। আপ্‌নার উপর আমি বিশেষ অবিচার কোরেছি।"

সুপ্রকাশ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "না, আপ্‌নি কোনও অবিচার করেন নি। আপনারই ত সঙ্গে শীলার বিবাহ হ'বার কথা হচ্ছিল; আমি মাঝ্‌ থেকে এসে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হয়িছি। আমার সঙ্গে শীলার বিয়ে হ'লে, আমি যে আপ্‌নার মনঃকষ্টের কারণ হ'ব, তা আমি জান্‌তুম; সেইজন্যে আমি শীলার কাছ থেকে দূরে-দূরেই থাক্‌তুম। শীলা যদি আমায় ভাল না বাস্‌ত, তা হ'লে আমি কখনও কোনও দিন আপ্‌নার পথের সম্মুখে আস্‌তুম না।"

সুব্রত। সে যাই হোক্‌, আমি যদি এই সব সংবাদ না জানাতাম, তা হ'লে মিসেস্‌ রায় এ-রকম সাংঘাতিক-ভাবে পীড়িত হ'তেন না। আমি এজন্যে বড়ই অনুতপ্ত।

সুপ্রকাশ। বড়ই সৌভাগ্য যে, শীলার জ্ঞান হ'য়েছে। সে এ-সব কথা ভুলে গিয়েছে। তবে, ক্রমেই সব তার মনে পড়্‌বে। আমার একান্ত অনুরোধ, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত, আপ্‌নি এখানে থাকুন্‌। তা হ'লে শীলা আপ্‌নার কাছ থেকেই সব শুনবে।

সুব্রত। আপ্‌নি আমাকে যা বোল্‌বেন, আমি তাই কোর্ব্বো।

সুপ্রকাশ। আমার বড় সৌভাগ্য, এই পরীক্ষার মধ্যেও জগদীশ্বরের কৃপায় আপ্‌নাকে সুহৃদ্‌ পেলাম।

সুব্রত করমর্দ্দনার্থ স্বকীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমাকে আপনার নিজের ভাই বোলেই জান্‌বেন, এই আমার অনুরোধ!"

সুপ্রকাশ দৃঢ়-মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "তাই হোক্‌। তুমি আমার ছোট-ভাই হ'লে। আশা করি, আমাদের এ-প্রকার মনের ভাব চিরস্থায়ী হ'বে।"

শৈলেন বিদায় লইয়া বিষণ্ণ-মনে বাট্যভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আহা! যদি সুষমা সব বুঝিত, যদি সুষমাকে সব বলা যাইত, তাহা হইলে আজিকার দিন কত সুখের হইত!—আমাদিগের অবস্থা কি সুখময়ী হইত! একত্রে জীবন যাপন করিয়াও, আজ সে আমার হৃদয় অজ্ঞাত বলিয়া, আমাদিগের পরস্পরের অবোধ-জনিত কি দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তাহার ও আমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে! আমি আজ তাহার নিকটে থাকিয়াও কত দূরে! শারীরিক সান্নিধ্য কি করিতে পারে? মনের সহিত মনের সংযোগই, দূরত্বের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া, দুইটী হৃদয়কে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া নৈকট্য সম্পাদন করে। পরস্পরের জীবন পরস্পরের হৃদয়ে স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত থাকিলে, সে জীবন-দ্বয়ের মধ্যে সরিৎ-সাগর-ভূধরের ব্যবধান থাকিলেও, তাহারা পরস্পরের অতিনিকটেই বাস করে! মৃত্যুর পরপারেও তাহাদিগের এই প্রীতির সংযোগ কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না!"

সুপ্রকাশ শীলার কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা তাঁহারই জন্য পথ চাহিয়া আছে। তিনি যাইবামাত্রই সে তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি ঈষৎ উন্নমিত করিয়া বলিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

সুপ্রকাশ। এখানেই ছিলাম। ডাক্তার যে বেশী কথা বোল্‌তে তোমায় বারণ কোরেছেন।

শীলা। তুমি আমার কাছেই থাক। দূরে গেলে আমার বড় ভয় করে; কেবলই মনে হয়, আর বুঝি, দেখা হ'বে না!

সুপ্রকাশ। তোমায় ছেড়ে কি আমি স্থির থাক্‌তে পারি? শীলা! তুমি শিগ্‌গির সেরে ওঠ, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

শীলা। আমি তো বেশ ভাল আছি। আর কোথাও যাব না। এবার কটকেই চল।

সুপ্রকাশ। সেই ভাল। সেখানে বেশ দু'জনে নির্জ্জনে থাক্‌ব। আমি তোমার কাকাকে লিখে দেব।

শীলা। অমির খুব আহ্লাদ হবে। আবার তেমনি কোরে বোটে কোরে বেড়াতে যাবে; কেমন? সেই নদীর ধার আমার বড় ভাল লাগে। সেই সেখানে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম! তোমায় দেখে পর্য্যন্ত কেবল তোমার মুখই চোখের সামনে দেখ্‌তাম; ঘুমোলে তোমায় স্বপ্ন দেখ্‌তাম; তুমি আমায় যাদু করেছিলে!

সুপ্রকাশ শীলার ললাটের কেশরাশি সস্নেহে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আর তুমি! যে-আমি কখনও কারো দিকে ফিরে চাই নি, সেই আমি তোমায় প্রথম দেখেই যে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলাম! কিন্তু সত্যি, তখন মনে করি নি যে, তুমি আমার হবে! সুব্রত—।"

শীলা। (ব্যস্তভাবে) আবার ও-সব নাম কেন? আমার তাঁর নামে ভয়ানক ভয় করে; আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তিনি এসে জোর কোরে আমায় তোমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে, দূরে ফেলে দিচ্ছেন।

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আহা, বেচারা সুব্রত! সে নিশ্চয়ই তোমাকে খুব ভালবেসেছিল। তা'র নামে ভয় পেও না। কারো সাধ্য নেই, আমাদের ভিন্ন করে। ঈশ্বরের এ বন্ধন কেউ ছিন্ন কর্‌তে পারে না।

শীলা। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, সুব্রত এখানে এসেছেন। আমার সে কথা মনে হ'লে, ভয় করে।

সুপ্রকাশ। ও সব কথা ভুলে যাও; না হ'লে, আমি চলে যাই। ডাক্তার তোমাকে বেশী কথা বল্‌তে মানা করেছেন। তোমার 'ব্রেন-ফিবার' হয়েছিল। শান্ত হ'য়ে থাক। আর একটু ভাল হও, তখন স্বপ্নের কথা বোলো। আমি তো স্বপ্ন নই; আমি কাছে আছি। দেখ, আমি স্বপ্ন কি-না?

এই বলিয়া সুপ্রকাশ শীলার হস্ত স্পর্শ করিলেন।

শীলা। আচ্ছা, আমি কথা কইব না; কিন্তু তুমি আমার কাছে থাক। না, তুমি একটী গান কর। ওই পাশের ঘরে বাজ্‌না আছে। এই দরজা খুলে দাও, আর গান কর; আমি শুন্‌ব। অনেক দিন তোমার গান শুনি নি। গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমিও তা হ'লে ঘুমিয়ে পড়্‌ব।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে গমন

করিলেন ও পিয়ানোতে হাত দিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে গাহিলেন—

"যখন তুমি ছিলে দূরে,
দাও নি মোরে দেখা ;
সে সব দিনের কথা-ব্যথা
সব সয়েছি একা।
পলে পলে দিনে দিনে,
গেঁথে তুলে স্মৃতির সনে,
মনের দুঃখে চোকের জলে
হার করেছি তার ;
প্রতিদিনের কথা যেন
হার সে মুকুতার !
কবে কোথায় হেসেছিলে,
যেতে যেতে চেয়েছিলে,
কবে কখন তোমার চোকে
ছিল প্রণয়-লেখা ;
তাই সে সকল কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবছি বসে একা !
কভু হৃদয় আশায় হাসে,
কভু নয়ন জলে ভাসে,
সেই ব্যথার দুঃখের মাঝে
কেবল বার-বার
চোকের জলে গেঁথেছি এ
মুকুতার হার !"

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে এই গানটী গাহিলেন। শীলার হৃদয় যেন অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিল! তাহার রোগশ্রান্ত নয়ন-দুইটি আপনিই মুদ্রিত হইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

গান শেষ করিয়া যখন সুপ্রকাশ শীলার শয্যাপ্রান্তে আসিলেন, দেখিলেন, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেই রোগশীর্ণ মুখ দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, শীলা ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেই বসিয়াছিল। জগদীশ্বরের অসীম করুণায় তিনি যে আবার তাহাকে পাইয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল ও দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

হুতাশের গান।

তোমারি তরেতে জ্বলিছে দেহ,
তোমারি তরেতে পুড়িছে প্রাণ
তোমারি জ্বালায় আঁখি বরষায়,
বাহির হয়েও হয় না, 'জান'।
যদিও এ দেহ অক্ষম দুর্ব্বল,—
তোমারি তরেতে খাটিছে ;
যদিও এ হস্ত রোগেতে মলিন,—
তোমারি গহনা আনিছে !
যদিও মাহিনা এত কম, তা'তে
কিছুই তোমার হয় না ;—
তবুও প্রেয়সি, দিই তা আনিয়া,
কানাকড়িখানি নিজে না রাখিয়া !
যদি হাসি ফুটে, ও অধর-পুটে
এই আশে করি সকলি দান,
(তবু, এমনি কপাল, অভাগার হায়,
ভেঙেও ভাঙে না ও পোড়া মান !)

শ্রীলতিকা দেবী।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যার অব্যবহিত-পূর্ব্বে ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন-মানসে একটী এক্কা ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। এ অদ্ভুত যান বঙ্গদেশে অতিশয় বিরল। পূর্ব্বে ইহার নাম শুনিয়াছিলাম মাত্র; আজ আরোহণে কৃতার্থ হইলাম। শীর্ণাবয়ব অশ্ববর, ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত চালক, মলিন-কন্থা-সমাচ্ছাদিত উপবেশনের স্থান, ইত্যাদি দেখিয়া প্রথমে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া নিতান্ত বিরক্তির সহিত সেই শকট আরোহণ করিবামাত্র অশ্ববর শ্লথ-গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। তীর্থক্ষেত্রে নিরন্তর বাস করিয়া তাহার যেন অন্তরাবেশ-হেতু বাহ্য বিষয়ে একটা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে! চালকের সঘন কশাঘাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। জিতেন্দ্রিয় অশ্ববর ক্রোধ-রিপুকে যেন সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে। মনে হইল, যোগসিদ্ধ হইয়া বসিবার তাহার আর বেশী দেরী নাই; তাহার পরই তাহার সশরীরে স্বর্গলাভ!

হায়, অশ্ববর! তুমি জন্মান্তরে কি ছিলে, জানি না। তুমিও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত! তুমি অবিরাম একভাবে চলিতেছ! তোমার অদ্ভুত গতিতে যে আরোহিগণের অসহনীয় কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তোমার কর্ম্ম-ফলে যে কত ভক্তপ্রাণ সুদূর-সমাগত যাত্রিকুল তীর্থভ্রমণান্তে দীর্ঘকাল পরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তীব্র বেদনা অনুভব করে, তাহা কি একবার ভবিতেও তোমার মন সরে না! তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছ, তাই জীবের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে না। এই বিশাল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তুমি কঠোর-কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত, ফলাফলের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও কর না! ধন্য তোমার সাধনা!

একবার ভাবিলাম, কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে দেবদর্শন ভাগ্যে ঘটে না, তাই যাত্রীদের জন্য এ অত্যদ্ভুত যানের বিদ্যমানতা! বসিবার স্থানের উপরে বা পার্শ্বে কোনওরূপ আচ্ছাদন নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি, ধূলা, ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব সহ্য করিতে পারিলে, তবে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারা যায়। অশ্ববরের গতির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর শিথিল অবয়বের পরস্পর-সংঘর্ষে এক কর্কশ নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে। নিরিবিলি বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। পার্শ্বস্থিত বংশখণ্ড সজোরে ধরিয়া না রাখিলে, প্রতিমুহূর্ত্তেই পতন-ভীতি! তাহার পর সেই ঝন্‌ঝনায়মান শকটের ইতস্ততঃ চালনে শরীরের সমস্ত অবয়ব থাকিয়া থাকিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া পতন-নিবারণ-জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিলাম। এবম্প্রকার নানাবিধ তীব্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কোনমতে দশাশ্বমেধ-ঘাটের সমীপে এক্কা হইতে অবতরণ করিলাম।

তাহার পর সঙ্কীর্ণ গলিমুখে জনতা দেখিয়া সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম,

পবিত্র-মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে জনস্রোত মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পথি-পার্শ্বে পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকান সাজাইয়া কেহ কেহ বসিয়া রহিয়াছে। কত অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ পথে গড়াগড়ি যাইতেছে; যাহাদের দয়া আছে, যাহাদের মর্ম্মে সকরুণ আর্ত্তনাদ আঘাত করিতেছে, তাহারা যৎকিঞ্চিৎ বিতরণ করিতেছে। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে, মানুষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না;—চতুর্দ্দিকেই মানুষ! কি সুন্দর মিলন! ধনি-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিৎ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সুখী, দুঃখী, যুবক-বৃদ্ধ, সবল-দুর্ব্বল, সকলেই বিশ্বেশ্বর-দর্শন-মানসে একভাবে অনুপ্রাণিত! ক্ষণেকের তরে হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান, আত্মপরতা ভুলিয়া সকলেই একলক্ষ্যের দিকে ধাবিত! সকলেরই সমান উৎসাহ, সকলেরই সমান অধিকার! এ-ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ইতর-ভদ্র পৃথক্ করিবার সুযোগ নাই, এ স্থানে বেশভূষার পারিপাট্য নাই!—সকলের প্রাণেই এক ভাব, সকলের মুখেই এক তান!

যাইতে যাইতে বিপুল জনস্রোত মন্দির-দ্বারে উপনীত হইল। অবাধ-গতি প্রতিহত হওয়ায় একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইল। তখন সন্ধ্যার ঘনান্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ক্ষীণালোকে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ-কোণে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র এবং পরিম্লান পুষ্পরাশি ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। দেখিতে দেখিতে জনস্রোত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল; প্রস্তর-নির্ম্মিত পবিত্র-মন্দির-দ্বারে তিল-ধারণের আর স্থান

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

নাই। সমবেত দর্শকমণ্ডলী সকলেই স্তব্ধ! বহু-চেষ্টায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিলাম, কতশত ভক্ত পুষ্পমাল্য- ও গঙ্গোদক-হস্তে দেবাদিদেবকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন! কেহ দেবের শিরোদেশে করস্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছেন, কেহ গঙ্গোদক ঢালিতেছেন, কেহ-বা দেবকে মাল্য-বিভূষিত করিতেছেন, আর কেহবা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! যুক্তকরে বহুসংখ্যক-নরনারী চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান! তন্মধ্যে কেহ-বা উৎকণ্ঠায় আকুল, কেহ-বা আশায় উৎফুল্ল,—সকলের মুখেই উদ্দীপনা!

অকস্মাৎ এই দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গেল; উজ্জ্বল দীপালোকে চতুর্দ্দিক্ ঝলসিয়া উঠিল! দেখিলাম, মন্দিরাভ্যন্তর জনশূন্য! অদূরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল! বিশ্বনাথের সেবকবৃন্দ

সদ্যঃস্নাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। কেহ তারস্বরে সুমধুর বেদগান করিতে লাগিলেন, কেহ দেবের নগ্ন-দেহে চন্দনানুলেপনে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া দিলেন। মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া ঘণ্টা-ধ্বনি হইতেছিল। ধূপধূমে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত! ক্ষণকাল-মধ্যেই দেবাদিদেব নববেশে সজ্জিত হইয়া এক অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। কি নয়নাভিরাম সে দৃশ্য! কি সুমধুর সেই বেদগান! তৎকালীন নহবতের মধুর ঝঙ্কার আজিও আমার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে ধ্বনিত হইতেছে! সেই দৃশ্য অবর্ণনীয়! ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে সমাগত ভক্ত-প্রাণ অসংখ্য নরনারী ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে সুদূর বারাণসী-ধামের এক পবিত্র ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে সমবেত! সকলের লক্ষ্য বিশ্বনাথের দিকে স্থির-নিবদ্ধ! পবিত্র স্থানের পুণ্য-প্রভাব সকলকে আরতিকালে প্রীতিপ্রফুল্ল করিয়া তুলিল; কাহারও মুখে বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইল না! এই পবিত্র ধামে ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়া যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রাণে কেমন একটা বিমল আনন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে! প্রাণ ভরিয়া এ দৃশ্য সন্দর্শন করিলাম,—জীবন ধন্য হইল!

আরতি-সমাপনান্তে জনতা ধীরে ধীরে কমিয়া গেল। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্ববৎ জনস্রোত মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের অভিমুখী হইতেছে! অদূরেই মায়ের সেই পবিত্র মন্দির! তাহার কোলাহলও শ্রুত হইতেছিল। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, প্রবেশ-দ্বারে ভীতিব্যঞ্জক ব্যস্ততা। বহু আয়াসে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। সুদৃঢ়-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে মায়ের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। যুগ-যুগান্তর-প্রবাহিত ভক্তির উৎসে সর্ব্বত্র যেন পুণ্যপ্রভাব চির-বিরাজমান! প্রাঙ্গণ-কোণে কোথাও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বেদ-পাঠে অভিনিবিষ্ট, কোথাও কোনও যোগিবর নিমীলিত-নেত্রে সমাসীন, কোথাও বা কোনও ভক্ত দূর হইতে মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিগদ্‌গদ-চিত্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন! মন্দিরের পুরোভাগে নাট-মন্দির দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অসংখ্য নর-নারী তথায় সমবেত হইতেছে, আবার মুহূর্ত্ত-মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! এই গতিবিধির বিরাম নাই!

নাট-মন্দিরের একটী কোণে কয়েকটী মৃগ নিঃসঙ্কোচে বিশ্রাম করিতেছিল। তাহাদের সেই অরণ্য-সুলভ চাপল্য নাই। স্থান-মাহাত্ম্যে শান্ত থাকিয়া তাহারা অপরিচিত যাত্রিগণ সহ পরিচয়-প্রসঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

মন্দির-মধ্যে মা অন্নপূর্ণা অলঙ্কার-ভূষিতা হইয়া হাস্যমুখে বিরাজ করিতেছেন! ভক্তজন-প্রদত্ত স্তূপীকৃত পুষ্পরাশি মায়ের পবিত্র চরণ-যুগল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের গলদেশে চন্দনলিপ্ত শোভন পুষ্পমালা।

নাটমন্দিরের এক নিভৃত প্রদেশে উপবেশন করিয়া মৃদুহাস্যময়ী মায়ের এই সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। মায়ের সেই অনধিগম্য গাম্ভীর্য্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার বদন-সরোজ হইতে করুণার- ধারা প্রবাহিত হইতেছে! যেন আজ সন্তানগণকে দেখিয়া দেখিয়া মাতার প্রাণে স্নেহের সঞ্চার

হইয়াছে। কতশত নরনারী প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিতেছেন, তবু তৃপ্ত হইতেছেন না! বুঝি, মায়ের এতাদৃশ সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শন আর ভাগ্যে ঘটিবে না! দেখিলাম, অগণিত নরনারী মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে, আর কতশত লোক তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছেন! মায়ের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশিতে স্নিগ্ধ মধুর লাবণ্য ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

একদিন আলুলায়িতকুন্তলা মায়ের সেই দানব-দলনী রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল;—ভাবিয়াছিলাম, এমন মায়ের প্রাণে বুঝি, কোমলতা স্থান পাইবে না। কিন্তু আজ কি অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি দেখিলাম! সন্তানপালিনী মা মলিন সন্তানগণকে স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন!—কি অপূর্ব্ব মধুময় সে দৃশ্য! মনে হইল, মাতৃস্নেহ কি এক অপার্থিব পদার্থ!

জন্মাবধি যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম, সেই স্নেহময়ী জননী আজ অনেক দিন ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে সেই স্নেহের অপূর্ব্ব প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ি—প্রাণে একটা দারুণ অভাব অনুভূত হয়! হায়, পুণ্যময়ি জননি! তোমার এই নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত আর যে খুঁজিয়া পাই না। এ সংসারে তুমি ভিন্ন অপর কেহ যে তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে না! তোমার অগাধ স্নেহ, অনুপম ত্যাগ-স্বীকার, সবই যে আজ কল্পনাতীত প্রতীত হইতেছে! তোমার পুণ্যময়-স্মৃতিতে আজ যে অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিতেছি না! তোমার অভাবে আজ যে তোমার গুণরাশির বিশালত্ব উপলব্ধি করিতেছি! মা! কে জানিত, তুমি অকালে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে! মনে আছে, তোমার অন্তিমকালে সেই জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণিমা নিশীথে আমাদের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে যে এক গভীর হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই! কি হৃদয়-বিদারক সে দৃশ্য! তখন মাতৃহীন ভ্রাতাভগ্নীগণ সমবেত হইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল,—কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া গেল; চেষ্টা করিয়াও একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে পারি নাই। কেমন একটা অজ্ঞাত কঠোরতা আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা হরণ করিয়া লইয়াছিল। তদবধি কাঁদিতে শিখি নাই, লোকের দুঃখে প্রাণ দ্রব হয় নাই। সে কেমন একটা ভাব কেমন করিয়া বুঝাইব। এইরূপ নানা চিন্তা চিত্তকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তারপর আজ এই মহাদৃশ্য দেখিলাম! এই মা বিশ্বজননীকে ইতর-নির্ব্বিশেষে সকলেই মাতৃ-সম্বোধনে পরিতৃপ্ত হইতেছে! মায়ের সর্ব্বজনীন স্নেহ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে! এই মাতৃস্নেহের গভীরতা ও বিস্তৃতি অপরিসীম! অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম! তাহার পর যখন জনতা খুব কমিয়া গেল, তখন শূন্য-মনে ধরমশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সোনার দেশ।

(গান)

সে যে আমার সোনার দেশ,
সে যে চির-পুরাতন নিত্য নূতন—
(তাহে) নাহিক দৈন্য লেশ!
সে যে মরতের মাঝে নন্দনভূমি
আমার সোনার দেশ!
সে যে আমার সোনার দেশ!
প্রকৃতি-ভূষণে ভূষিত সে যে
অতিমনোহর বেশ;
সে যে পরাণ-জুড়ান হৃদয়-মাতান
আমার সোনার দেশ!

কত বীর-প্রসবিনী ভারত-জননী
নাহিক তাহার শেষ;
ধন্য করিয়া গিয়াছেন যাঁ'রা
আমার সোনার দেশ।
সে যে আমার সোনার দেশ,
সেথা সবাই আপন ভায়ের মতন,
সেথা নাহি কোন বিদ্বেষ;
সে যে গৌরবময়ী তীর্থের ভূমি,
আমার আমারি দেশ!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীকে বিদায় দিয়া মহাদেব কত চিন্তাই করিতেছিলেন! চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অবশেষে তিনি যোগাসন অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তবুও দারুণ আশঙ্কায় ও উদ্বেগে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল! এমন সময় নন্দী ও ভূত প্রেতেরা হাহাকার করিয়া আসিয়া, সকল অবস্থা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শিব চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রলয়-মেঘের স্বরে শিব কহিলেন, "নন্দী, কি কহিলি?—সতী নাই?" নন্দী সহসা উত্তর করিতে পারিল না। শতসহস্র শিবানুচরের দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যক্ত হইল, সতী নাই!

তখন কষ্টে নন্দীও উত্তর করিলেন— "সতী নাই।" চারিদিকেই অসংখ্য প্রতিধ্বনি উঠিল,- "সতী নাই! সতী নাই!"

মহাদেব অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তুমুল আন্দোলনে তাঁহার নৃত্যানুরাগ আসিয়া পড়িল! মস্তকের জটা ছিঁড়িয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে, নৃত্য করিয়া করিয়া, তিনি কহিতে লাগিলেন, "সতী নাই! ও হো হো! সতী নাই!"

মহাকালের কালান্তক মূর্ত্তি ক্রমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যে প্রলয়-ঘোর-গর্জ্জনে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে, যে নৃত্যের তরঙ্গে আকাশ-পাতাল, পাহাড়-পর্ব্বত বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, মহাদেব সেই গর্জ্জন ও

সেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিক্ষিপ্ত জটাগুচ্ছের মধ্য হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মত পিল্‌পিল্ করিয়া কাল কাল প্রকাণ্ডদেহ বীরের উদ্ভব হইয়া চারিদিকে ঘনতমসার সূচনা করিল।

একটী প্রকাণ্ড জটা হইতে হঠাৎ আকাশপ্রমাণ এক বিরাট ভীষণ মূর্ত্তি উদ্ভূত হইতেই, শিব তাহাকে কহিলেন, "বীরভদ্র, দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দিয়া আইস; সতীর দেহত্যাগের প্রতিশোধ নাও। এই সব অনুচরদের সঙ্গে লইয়া যাও।—এই ধর আমার ত্রিশূল—।"

একখণ্ড প্রলয়বাহী মেঘের মত বীরভদ্র অগ্রসর হইয়া ত্রিশূল গ্রহণ করিল, এবং বিনা বাক্যব্যয়েই শিবকে প্রণাম করিয়া, অনুচরদিগকে ইঙ্গিতমাত্রে আহ্বান করিয়া দক্ষপুরীর দিকে চলিয়া গেল। তখন ভূত-প্রেত ও প্রমথাদি কৈলাসবাসিগণও তাহাদের অনুসরণ করিল।

নন্দী ও ভৃতের দলকে তাড়াইয়া দিয়া ভৃগু প্রসন্নভাবে হাস্য করিতেছিলেন এবং পুনঃ যজ্ঞের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিতেছিলেন; সতীর অকস্মাৎ দেহত্যাগে অত্যন্তই দমিত হইলেও, পাছে কেহ কিছু মনে ভাবে, এই ভয়ে দক্ষও যথাসাধ্য অন্তরের ভাবটী লুক্কায়িত রাখিয়া, সকলকে উৎসাহদানপূর্ব্বক শিবের ও শিবানুচরদের অকিঞ্চিৎকর শক্তির এই জ্বলন্ত নিদর্শনটীর দিকে পুনঃ পুনঃ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নানা কৌতুকবাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন; জামাতারাও সদ্যোমূর্চ্ছিতা প্রসূতির শোকাপনোদনের জন্য নিকটে বসিয়া নানাছলে নানারূপে শিবনিন্দা কীর্ত্তন করিতেছিলেন; এমন সময় অকস্মাৎ শত-সহস্র মেঘগর্জ্জনের ভীষণ রোলে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে চরাচর ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; এবং শিবকিঙ্করদের প্রমত্ত উল্লাসধ্বনি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

ভৃগু শঙ্কিতভাবে কহিলেন, "আবার কি?"

দক্ষের হৃদয়ে, কেন বলা যায় না, এক টুক্‌রা আশঙ্কা লাগিয়াই ছিল। এখন এই কোলাহল শুনিয়া সেই হৃদয় আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "এইবার বুঝি ভাঙ্গড় স্বয়ং আসিতেছে, প্রস্তুত হও!"

সকলেই সশঙ্ক-বিস্ফারিত-নেত্র! তেমন যে শিববিদ্বেষী ভৃগু ও দক্ষ, তাহারাও বিস্ফা-রিত-নেত্রে, স্থিরনির্ব্বাক্ বদনে আপনাদের সকল দেবশক্তি দৃষ্টির মধ্যে পুরিয়া নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিলেন। দক্ষপুরীর বৃক্ষপত্র-গুলিও এই সময়ে নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল। দেখিতে না দেখিতে, জোয়ারের জলের মত শিবকিঙ্করের দল একটা কাল ঢেউ খেলাইয়া আসিয়া যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। দেব-তারা প্রাণপণ শক্তিতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে দাঁড়াইতেও ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। দক্ষ মুদ্গর-হস্তে আঘাত করিতে উঠিতেছিলেন, কিন্তু এমন সময় পর্ব্বতপ্রমাণ বীরভদ্রের বিশাল হস্তখানি উপরে আসিয়া পড়ায়,—তাঁহার সঙ্কল্প ঘুরিয়া গেল! উপর হইতে বীরভদ্র তাহার চুলের মুষ্টি ধরিয়া তাঁহাকে অনেকখানি শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। বীরভদ্রের অপর হস্ত ভৃগুর গুম্ফ-রাজি "পট্‌পট্" করিয়া উৎপাটিত করিতে লাগিল। অন্যান্য শিবকিঙ্করেরা দেখিতে

দেখিতে, লাথি, চাপড় ও কীল-ঘুষোর চোটে যজ্ঞভূমিকে শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া তুলিল।

কেবল এক স্থানেই ইহাদের উৎপাত আত্মপ্রকাশ করিল না! সেখানে কাহারও একটীমাত্র নিঃশ্বাসের আঘাত পড়িতে পাইল না। যেথানে ছিন্ন-লতার মত সতীর বিগত-প্রাণ দেহ একস্তূপ নির্ম্মাল্যের গৌরবে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই স্থানটী পরম যত্নেই তাহারা ঘিরিয়া রক্ষা করিয়া রাখিল। নিকটবর্ত্তী যূপকাষ্ঠের উপরে বীরভদ্র দক্ষকে আনিয়া আবদ্ধ করিলেন এবং দক্ষ কোনও কথা কহিতে না কহিতে, কোনও দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে না ফিরাইতে, অকস্মাৎ একটী খড়্গাঘাতেই পশুর মত তাঁহাকে ছিন্নশির করিয়া ফেলিলেন। ছিন্নগুম্ফ ভৃগু ও অন্যান্য শিবদ্বেষীরা এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেবগণ ত্রাসে যে যে-দিকে পারেন পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অন্তঃপুরে প্রবল ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।

অত্যল্পকালের মধ্যে ধ্বংসক্রীড়া শেষ হইয়া গেল। তখন শিবকিঙ্করেরা ভৃগু-প্রভৃতি শিবদ্বেষীদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বেই জগতের একমাত্র বিরাটপুরুষের মত এক দীর্ঘ সৌম্যপুরুষ সেইখানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। প্রলয়ের পর পয়োধিবক্ষ যেমন এক প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, মহাদেবের বিশাল ধ্যানস্তিমিত আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয়েও সেই প্রলয়ঝটিকার পরে এখন একটা অপূর্ব্ব স্থির-ধীর ভাব লক্ষিত হইতেছিল! তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল নয়নপদ্ম-দুইটী যোগভরে একটু নিমীলিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিব-কিঙ্করেরা প্রভুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া গেল। ধীর-প্রশান্ত-গমনে শিব সতীর লুণ্ঠিত দেহের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রসূতি তখন সেইখানে বসিয়া করুণ আর্ত্তনাদে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন; শিবকে দেখিয়া, "এ কি কল্লে বাবা!" বলিয়া আবার তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

মহাদেব একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অদূরে দক্ষের দেহ রক্তাক্ত ও দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তেমন যে গর্ব্বিত মস্তক তাহাও এখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া অতিশোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! ভৃগুর গুম্ফশূন্য পাংশু মুখমণ্ডল ভয়- ও লাঞ্ছনা-মণ্ডিত হইয়া অতিশয় অদ্ভুত দেখাইতেছে! দেখিয়া দেখিয়া ভোলানাথের ভ্রমপ্রবণ হৃদয় আবার সকলই ভুলিয়া যাইতে চাহিল। ভোলানাথ বীরভদ্র ও অন্যান্য অনুচরদিগকে তখনই বিদায় করিয়া, ইঙ্গিতে নন্দীকে নিকটে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—"নন্দী, ঐ ছাগমুণ্ডটা তুলিয়া লইয়া এই দাম্ভিক প্রজা-পতিকে পুনর্জ্জীবিত কর; আর এইগুলোকে ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে এইবার সতীর দেহ স্পর্শ করিলেন এবং বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া পরম আদরে উঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। প্রিয়তমার দেহ-স্পর্শে অকস্মাৎ বিশ্বনাথের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। উন্মত্তের মত আবার মহাদেব অকস্মাৎ নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং সেই দেহলতিকা স্কন্ধ-দেশে স্থাপিত করিয়া স্পর্শসুখে উন্মত্তপ্রায়

হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে কেবলই চলিতে লাগিলেন। মুক্ত দেবতা ও ঋষিগণ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া শুধু মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

কিছু ক্ষণ পরে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু সেইখানে উপস্থিত হইয়া প্রস্থতিকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "মা, যাহা হইবার ত হইল; এইবার আসুন, যজ্ঞ পূর্ণ করি। প্রজাপতিকে লইয়া আপনি এই দিকে আসিয়া বসুন।"

দক্ষের দিকে চাহিয়া প্রস্থতি কাঁদিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, একি বিড়ম্বনা! বিধাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়াত্মজের এই নিদারুণ বিধিলিপি! এই মূর্ত্তি লইয়া অভিমানী প্রজাপতি কি করিয়া জীবন বহন করিবেন?"

বিষ্ণু কহিলেন, "সতি, মহেশ্বর ভগবানেরই বিনাশমূর্ত্তি; তিনি দেবদিগেরও দেব—মহাদেব! তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া দক্ষপ্রজাপতি মূঢ়ের ন্যায়ই কার্য্য করিয়াছেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় নয়!"

"নিশ্চয়ই নয়" বলিয়া দক্ষ অগ্রসর হইয়া, নিজেই এখন সেই কথার সমর্থন করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া গেলেন! দক্ষ কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, আপনি ঠিক্ কহিয়াছেন। জগতে আমার ন্যায় মূঢ় আর কে? যিনি দেবতারও দেবতা—সকলেরই নমস্য, যিনি ভগবানেরই প্রলয়মূর্ত্তি, নিমেষে যাঁহার ইচ্ছায় যুগপ্রলয় সংঘটিত হয়, তাঁহাকেই আমি জামাতা পাইয়া চিনিতে পারি নাই;—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে! দেহের এ বিকৃত অবস্থা এ দুর্ভাগ্যের সমতুল নয়। আজ আমি শিবকে যথার্থ চিনিতে পারিয়াছি। দেহ বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজই আমার অন্তর সম্যক্ পরিষ্কৃত হইয়াছে। যজ্ঞনাথ, আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করুন; আমি সকলকে দান করিয়া, যাহা কিছু যজ্ঞভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, সকলই আজ ভোলানাথকে প্রদান করিব, আজ আমি জামাতার যোগ্য আদর করিব।"

ভৃগু প্রভৃতি হোতৃগণ অগ্রসর হইয়া সেই কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, তাই করুন; আমরাও আজ স্বয়ম্ভুকে চিনিতে পারিয়াছি। আমরাও আজ তাঁহার যোগ্য সমাদর করিব।"

দেবগণ এবং দক্ষপুরীর অন্যান্য সকলেও অগ্রসর হইয়া সেই কথাই কহিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "যজ্ঞনাথ, আমাদেরও সেই কথা। আমরাও তাঁর সম্মান করিব,—আপনি যজ্ঞ পূর্ণ করুন।"

তখন যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু নিতান্ত প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া প্রজাপতি দক্ষের সেই যজ্ঞ মহোৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। দক্ষও তখন হোতৃগণ-সহ বিষ্ণুকে বন্দনা করিয়া, সকল দেবতাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট যাহা কিছু রহিল, সকলই সর্ব্বসমক্ষে ভোলানাথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

দক্ষপুরী অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব প্রভায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

উল্টা সৃষ্টি।

(গল্প)

অভিনয় চলিতেছিল। রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। ভ্রমর মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রঙ্গালয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রীর সেই হৃদয়-মন-ঢালা সেই করুণ ক্রন্দন, সাত দিনের ছেলেটীর জন্য সেই মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার, সকল দর্শকেরই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছিল। পর্দ্দা-ঘেরা স্ত্রীলোকদের আসনের ভিতর হইতেও একটা অস্ফুট ক্রন্দন ও গুঞ্জনের ধ্বনি নিম্নের দর্শকদিগের শ্রবণপথে আসিতেছিল। এমন সময় 'ড্রপসিন' পড়িয়া গেল।

দুই টাকার 'সিটে' দুইটী রমণী পাশাপাশি বসিয়াছিল। 'ড্রপসিন' পড়িতে, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "সত্যিই, এখানে যেমন সব রকমে স্বাভাবিক করতে পারে, এমন আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এখানে যেন সবই জীবন্ত, সবই সত্য।" অপরা উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার জীবনে এ সবই প্রকৃত সত্য।" তাহার হাসির সহিত যে একটা মৃদু-নিঃশ্বাসও পড়িল, সঙ্গিনী উষার চোখে সেটুকু এড়াইল না। সে একটু বিষণ্ণভাবে, পার্শ্ব-বর্ত্তিনীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখে, সেই বড় বড় কাল চোখের দিকে চাহিয়া, একটু আগ্রহান্বিত ভাবেই আরও একটু ঘেঁসিয়া বসিল। আপনার শুভ্র ফুলের মত হাত-দু'খানি দিয়া সঙ্গিনীর কোল হইতে ফুলের মতই সুন্দর মেয়েটিকে তুলিয়া চুম্বন করিল। তারপর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এমন রতন যা'র কোলে, তা'র আবার দুঃখু কি, ভাই?"

সঙ্গিনীর কথায় উমা মুখ তুলিয়া চাহিল। কিশোরীর অম্লান ললাটে সজ্জিত কেশ-গুচ্ছের দিকে চাহিয়া বলিল, "গৌরীর জন্যেই আরো বেশী কষ্ট হয়, ভাই। দু'দণ্ডের পরিচয় তোমার সঙ্গে; কিন্তু উষা, সত্যিই বল্‌চি, আমার মেয়ে বলে গুমর করে বল্‌চি না, এ রতন তোমার কোলেই মানায়। আমার মত কাল কুৎসিতের কোলে কি এ সোনার চাঁপা ভাল দেখায়? আমার জন্যেই ভগবান্ একেও শুদ্ধ অসুখী করলেন, ভাই! এইটুকু মেয়ে, কি কপাল বল দেখি, ওর? এতটুকু আদর কারো কাছে পেলে না!" গৌরীর মা'র চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

পরদুঃখ-কাতরা উষা তাড়াতাড়ি আপনার চোখ মুছিয়া, উমার হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ! ভাই উমা, এমন করে কি কাঁদতে আছে? নাই বা করলে আর কেউ আদর, তুমি তো কর? গৌরীর বাবা তো করেন?" উমা আবার হাসিয়া বলিল, "যা বলেচ ভাই! সেই কপালই যদি ওর হবে, তা হোলে আর আমিই বা দুঃখু কোর্ব্বো কেন, উষা! এমন কি ভাগ্য করেচে, যে গৌরী তাঁ'র কোলে স্থান পাবে!"

বিস্মিতা চিন্তা-পীড়িতা উষা উমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! উমা আবার হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যবতী, রাজরাণী, পতি-সোহাগিনী হ'য়ে বেঁচে থাক, বোন্! অভাগিনীর

দুঃখকাহিনী আর শুনতে চেয়ো না। ওই দেখ 'ড্রপ' উঠেছে, থিয়েটার দেখ্‌বে না?"

কম্পিত স্বরে উষা বলিল, "যদি বাধা দাও তো শুনতে চাই না: কিন্তু এও কি দুঃখ-কাহিনী দেখ্‌তেই আসিনি ভাই? নিজের মুখে বোন্ বলে ডেকেচ, সেইজন্যেই সাহস করে বল্‌ছি, দিদি, ছোটবোন্‌কে কি কোন কথা বল্‌তে দোষ আছে?"

উষার চোখেও বড় বড় দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিতা উমা তাড়াতাড়ি উষার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "ছিঃ তুমি কাঁদ্‌লে ভাই! এই সামান্য কথায় কাঁদ্‌বে, তা আমি মনে করি নি। স্বামী-সোহাগিনী তুমি বোন, এ পতি-পরিত্যক্তার কাহিনী শুনতে কি তোমার ভাল লাগ্‌বে? কেন ভাই তোমার সরল প্রাণে কষ্ট দোব? মিছে কেন, পরের ব্যথায় ব্যথা পাবে, উষা! এ ব্যথা তো মোছাবার নয়! সেইজন্যেই বল্‌তে চাই নি আমি। শুনবে তো শোন ভাই!—অভাগিনীর সবই অভাগ্য! যখন মা'র পেটে, তখনই বাবা চলে গেছেন। কোন্ বিদেশে চাক্‌রী কর্‌তে গেছ্‌লেন, প্লেগের ডাক্তারী; সেই প্লেগেই গেলেন; ফির্‌তে আর হোলো না। দু'বছর বয়সে মাও ফেলে রেখে বাবার কাছে গেলেন। সম্বলের মধ্যে মামা-মামী। তাঁরা যে ভালবাসেন না, তা নয়; তবে মামারও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে; আর গরীব তিনি। আমার বাবাও কিছু রেখে যান নি। মামারও একমাত্র সম্বল বাড়ীখানি। মামার আশ্রয়ই এখনও আমার আশ্রয়। আজো তিনি যাই, দু'বেলা দু'মুটো দিচ্চেন, তাই কারো দ্বারস্থ হ'তে হয়নি।"

কাতরা উষা বলিয়া উঠিল, "মাপ কোরো ভাই! কিন্তু এমনই যদি কর্‌লেন, তবে তোমরা কেন আদালত থেকে খোরাকী আদায় করে নাও না?"

উষা। দরকার কি ভাই! যে সকল বিষয়েই বঞ্চিত কর্‌লে, তা'র কাছে যেচে এ অপমান আর কেন? মামা বলেন, 'যে-কটা দিন আমি আছি, দু'মুঠো ভাত দোবোই, তারপর সতীশ আছে।' সতীশই মামার একমাত্র আশার স্থল; সে মামার বড় ছেলে; এইবারে বি এ দেবে। তারপর শোন, মা-বাপ-মরা মেয়েরও বিয়ের বয়স হোল। বরং একটু বেশীই হোল। সে সময়ে প্রকৃতই আমি মামা-মামীর গলগ্রহ হয়ে উঠেছিলুম। শেষকালে, আমার যখন তের উত্তীর্ণ হয়, তখন একটি পাত্র স্থির হোল। তিনি আফিসের নূতন কেরাণী; মাহিনা সাড়ে বার টাকা;—তাঁরি মূল্য নগদ পাঁচ শত, আর হাজার টাকার গয়না। মা'র যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে তের শ' টাকার যোগাড় হোল; বাকী দু' শ'র জন্যে মামা অস্থির হ'য়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। টাকা কোথাও পেলেন না, কেউ ধার দিলে না; সকলেই কিছু বন্ধক চায়। টাকার যোগাড় হোল না; কিন্তু বিয়ের দিন উপস্থিত হোল। বরকর্ত্তা টাকা কম দেখে চটে আগুন; বর ফিরিয়ে নিয়ে প্রকৃতই চলে গেলেন। আমার সরলবুদ্ধি মামা একেবারে জড়বৎ হয়ে গেলেন। মাথায় যেন তাঁর বজ্রাঘাত হোল। মামাকে এই অবস্থায় ফেলে সকলেই চলে

গেলেন ;—গেলেন না কেবল বরকর্ত্তার একটি বন্ধু,—বহরমপুরের একটি উকীল। তিনি সপুত্রক বরানুগমনে এসেছিলেন ; বন্ধুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে, এসে মামার হাত ধরে তুলে বল্লেন, 'আপ্‌নি কি অনুগ্রহ কোরে মেয়েটি আমার ছেলের হাতে দেবেন ?' মামা তো অকূল পাথারে কূল পেলেন। পুত্রের আপত্তি সত্ত্বেও আমার শ্বশুর জোর করে তা'কে এনে ছান্‌লা-তলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেই দিন,—লগ্ন তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—সেই অশুভ ক্ষণেই আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

উমা একবার চুপ করিল। সম্মুখে সজ্জিত রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের পর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতেছে! উজ্জ্বল তাড়িতালোকে, দামী চুরুট ও নানাবিধ এসেন্সের সম্মিলিত গন্ধে প্রপূরিত উৎসব-রজনীর ন্যায় সেই ভারাক্রান্ত বায়ুতে, উমার সেই বিবাহ-রজনী যেন একখানি সজ্জিত দৃশ্যপটের মতই আবার মনে পড়িয়া গেল। ছবির মত একদৃষ্টিতে সে 'ষ্টেজের' দিকে চাহিয়া রহিল। তখন একটা অঙ্কের শেষ দৃশ্য। গোবিন্দলাল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতেছে, "আমার ভ্রমর, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে শান্তি !—আমার ভ্রমর—।" উমা স্তম্ভিত হৃদয়ে শুনিতে লাগিল! গৌরী তাহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শেষে যেমন রোহিণীকে হত্যা করিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেল, তখন যেন সেই বন্দুকের শব্দে উমার চমক্ ভাঙ্গিল।

"বৌ-দিদিমণি !" হঠাৎ একটা পরিচিত গলার স্বরে চমকিত হইয়া উমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। তাহার শ্বশুর-বাড়ীর ঝির গলা না ? সে কেন তাহাকে এখানে ডাকিবে ? বাস্তবিক ঝি উমাকে ডাকে নাই। সে উষার কাছে আসিয়া আবার বলিল, "বৌ-দিদিমণি, দাদাবাবু এই পানগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর শুধোলেন তিনি, শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বে ? না, গাড়ি তৈরি করতে বল্‌বেন ? আহা, রাত জেগে যে সোনার পিতিমে মলিন হয়ে উঠেছে গা ? চোখ-দুটো ফুলে উঠেছে, লাল হয়েছে! দাদাবাবু এখনি সকাল না হ'তেই ডাক্তার আন্‌তে পাঠাবে। কাজ নেই বাবু, গাড়ী জুত্‌তে বলি গে।" ঝির স্নেহবাক্যে উষা লজ্জাবোধ করিল। পতি-পরিত্যক্তার কাছে পতিসোহাগিনী স্বামীর আদরের কথা লেশমাত্র প্রকাশ হইতেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, "না রে, না, এখন তৈরি করতে হবে না। খবরদার, আমার কথা কিছু বলিস্ নে। এ-রকম কান্নাকাটি দেখে কি মানুষ না কেঁদে থাক্‌তে পারে ? দিখ্‌চিস্ তো তুইও ?"

"দেখ্‌চি নে আর গা ? ঐ যে ভোম্‌রার জন্যে আমিই কি কম কেঁদিচি বৌ-দিদি! তা যাক্—আমি না হয় নাই বলনু, তানার তো চোখ্ আছে। গাড়ীতে উঠে আমাকেই কত বক্‌বে এখন।" এই বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

ঝি চলিয়া গেলে, উষা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উমার দিকে চাহিল ; দেখিল উমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া আছে। তবু ভাল, সে ঝির কথা শোনে নাই। উষা উমার হাতে পান দিয়া বলিল, "তার পর দিদি—?"

যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্য হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া উমা বলিল, "তার পর!

তারপর দিন-কতকের জন্যে, আমার এ অনন্ত অন্ধকারে চাঁদের আলো দেখা দিল। বুঝ্‌তে পারতুম্ বেশ, স্বামীর মনের মতো হই নি। এম-এ বি-এল্‌-পাশ স্বামীর উচ্চ আদর্শের অনুরূপা স্ত্রী আমি কি করে হব ভাই? আর প্রধান অন্তরায়, আমার এই রূপ। তাঁর দোষ কি? তবু বল্‌চি, সেই সময়ই আমার এ অন্ধকার জীবনের অমাবস্যা কেটে, প্রথম চন্দ্রোদয় হয়েছিল। শ্বশুরের আদরে, শাশুড়ীর স্নেহে, আবার আমি যেন আমাকে জগতের একজন বলে মনে কর্‌তে পেরেছিলুম। অতীত জীবনটা যেন আমি দুঃস্বপ্নের মতই ভুলে চলেছিলুম। শুধু একটা আশঙ্কা ছিল—স্বামী! সে আশঙ্কা সর্ব্বনাশের আশঙ্কা! মনে আন্‌তেও যেন ভয় হ'ত। জোর করে চোখের জল চোখে চেপে, তাঁর মনের মত হ'তে চেষ্টা কর্‌তুম। ভাল-বাসতেন্ না বটে, কিন্তু অনাদরও কর্‌তেন না। প্রেমে না হোক্, পত্নীর গৌরবে আমার আসন স্থিরই ছিল। নবজীবনের জ্যোৎস্নার মত দিনগুলিতে অসহনীয় কালি তুলি বুলাতে, আমি কোন রকমেই পারতুম না। চলেও যাচ্ছিল এক রকম। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্ট! সইবে কেন? সামান্য একটা পৃষ্ঠব্রণ হয়ে, অমন শ্বশুর হঠাৎ চলে গেলেন। ইন্দ্র-পুরী অন্ধকার হয়ে গেল। শাশুড়ী দিনরাত পড়ে থাক্‌তেন, আমিও ছায়ার মত তাঁরই কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াতুম। তিনিই আমার সংসারে একমাত্র ভরসা ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম! তিনমাস পরে কলেরা হয়ে, তিনিও চলে গেলেন। আমার সবই ফুরিয়ে গেল! তখন কিন্তু স্বামী কিছুমাত্র মন্দ ব্যবহার করেন নি। একটা বছর তিনি আমাকে সঙ্গে করে, এ-দেশ ও-দেশ করে বেড়িয়েছেন; সারাদিন অবশ্য বাইরেই থাক্‌তেন, তবু রাত্রিবেলাও তো তাঁকে দেখতে পেতুম। মনে মনে আশাও একটু যেন গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

"এমন সময় একদিন তিনি সঙ্গে করে আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে এলেন। মামার আনন্দ ধরে না! উকীল জামাইয়ের সমা-দরের ত্রুটি যেন কিছুতে না হয়, সেই চেষ্টায় একটা মানুষ যেন দশটা হয়ে ঘুরতে লাগ্‌-লেন। জামাতার মনের ভাব তখন সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। ভোরের বেলায় উঠে আস্‌চি, বল্লেন, 'উমা, দাঁড়াও।' আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালুম। তিনি মুখটি অল্প নীচু করে বল্‌লেন, 'আমাকে ক্ষমা কোরো উমা, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী।' ভূমিকা শুনেই আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে আস্‌ছিল, তবু আমি অবশিষ্ট কথা শোন্‌বার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি বাক্য-সমাপ্তি কর্‌লেন,—'আমি বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছি।' শুনে হা-হুতাশও করলুম না, মূর্চ্ছাও গেলুম না; তেমনি ভাবেই জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। যে সর্ব্বনাশের ছায়ার আভাসও মনে আন্‌তে সাহস হ'ত না, তাই চোখের উপর ঘটে গেল। তিনি চলে গেলেন!

"গৌরী তখন মাত্র তিনমাস তা'র মাতৃগর্ভে স্থান নিয়েছিল। যখন মামীমা জান্‌লেন, মামাকে দিয়ে চিঠি লেখালেন; কোনও উত্তরই এলো না। গৌরীর জন্মের পরেও একখানা চিঠি মামা লিখেছিলেন;

উত্তরে, হাজার টাকার একখানা নোট, প্রেরকের নামশূন্য অবস্থায় এসেছিল। মামা গরিব হলেও তৎক্ষণাৎ সে নোট ফেরত দিয়েছিলেন। তারপর আর কোন সংবাদই নেই।"

উষা বলিল, "তুমি কোন চিঠি লিখেছিলে দিদি?"

উত্তরে উমা বলিল, "আর কেন ভাই? সে স্বপ্ন-কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।—তিনি সুখে আছেন, এই আমার সুখ। আমি তো আর তাঁকে সুখী করতে পারি নি, ভাই!"

উষা সে কথা চাপা দিয়া, উমার ঠিকানা জানিয়া লইয়া মিনতির স্বরে বলিল, "আবার কবে দেখা হবে, দিদি? তুমি কি আমাদের বাড়ীতে একদিন আস্‌বে, ভাই? তা হোলে একদিন দুপুর বেলা গাড়ী পাঠিয়ে দোব। যাবে বল দিদি?"

উমা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "মামা যে কোথাও পাঠান না! যেতে দেবেন কি?"

উষা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, সে কথা নয়; তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে কর্‌চ, অজানা জায়গা, উষা ভাল-লোক কি না? এই সব, না ভাই? আমাকে দেখে কি ভাই অপবিত্র বলে মনে হয়? দেখ দেখি আমার মুখের দিকে চেয়ে? তা হোলে কি আমি সাহস করে বল্‌তে পারতুম, ভাই? পাঁচজনের মুখে, পাঁচ রকম গল্প শুনে, তুমি আমাকেও অবিশ্বাস কর্‌চ দিদি?"

উমা তাড়াতাড়ি বলিল, "না উষা, তা নয়, ভাই। জানতো, আমার স্বামীর চরণে আমি অপরাধিনী! আমার নামে, ভাই, মন্দকথা রট্‌তে বেশী ক্ষণ নয়। যাব ভাই আমি; সতীশ না যায়, কালোকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

উষা। তা হোলে রবিবার গাড়ী পাঠাবো। ঐ যে তোমার মাসীমাও উঠেছেন।

অভিনয় শেষ হইয়া গিয়াছে। উমার পশ্চাতে পশ্চাতে উষাও নামিতে লাগিল। দরজার কাছে একটী সুন্দরকান্তি যুবক দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, "আঃ, ঝিটা গেল কোথা? বাছা, বলে দাও, বৌবাজারের সুরেশ মিত্তিরের বাড়ী।" সহসা উমার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টির মিলন হইয়া গেল। যুবক চকিত হইয়া সরিয়া গেলেন, উমা যেন আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। উষা পিছনে দাঁড়াইয়া ইহা দেখিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কি হোল দিদি?" উমা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ঐ যে তিনিও এসেছেন। বোধ হয়, সস্ত্রীক এসেছেন। আহা, আর একটু আগে জান্‌লে যে, চেষ্টা কোরে সে ভাগ্যবতীকে দেখ্‌তুম। হিংসা করি না ভাই! একবার দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে করে।"

উষা বিবর্ণমুখে বলিল, "যাও, আর ও-রকম অদ্ভুত সাধ করে কাজ নেই। ওই বুঝি, তোমাদের ডাকৃচে দিদি! যেও ভাই, আমি গাড়ী পাঠাব। আচ্ছা দিদি, তোমার স্বামী এখন বৌবাজারে আছেন, বল্‌লেন না? তুমি সে বাড়ী চেনো?"

তদুত্তরে উমা বলিল, "না ভাই, আমি বহরমপুরেই ছিলুম।"

গাড়ী আসিয়া পড়িল। উমা উঠিলে পর উষা গৌরীকে চুম্বন করিয়া বলিল, "দিদি, এটীকে আমায় দেবে? এ তোমার স্বামীর মতো দেখ্‌তে হয়েছে, না?"

এইবার উর্মার মাসী-মা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, গৌরী ঠিক্ ওর বাপের মতন হয়েছে; জামাই যে সুন্দর।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া উষা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

(২)

যথাসময়ে উষা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। উমার মামার বাড়ীর সাম্‌নে বড়-মানুষের বাড়ীর বৃহৎ গাড়ীখানাকে লইয়া মস্ত দু'টা ওয়েলার ঘোড়া যখন দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন বিস্মিত-নেত্রে পাড়ার যত অকর্ম্মা ছেলে-গুলাও ঘুড়ি-লাটাই ফেলিয়া স্থিরভাবে গাড়ী দেখিতে লাগিল। তক্‌মা-ওয়ালা সহিস ও কোচ্‌ম্যানের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিতে ঘন ঘন অঙ্গুলি-চালনা, একটী দিগম্বর বালককে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল! ততক্ষণে তাহার ঘুড়ির সুতায় মাঞ্জা দিবার বেলের আঠাটী আর একটী ক্ষুদ্র তস্কর সরাইয়া ফেলিল।

উমা গৌরীকে টিপ্ কাজল পরাইয়া, একটী ফর্‌সা জামা পরাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল; সঙ্গে আট বছরের মামাতো ভাই কালো। সতীশ বাড়ী ছিল না।

মামী বলিতেছিলেন, "এলো-চুলটাতেই যাবি মা?" অবজ্ঞার সহিত চুলের রাশি বামহাতে করিয়া জড়াইয়া উমা বলিল, "তাদের কাছে তো আর বড়-মানুষি দেখাতে যাচ্ছি না মামীমা? আর আমার কি সেজে-গুজে কোথাও যেতে আছে?" মামীমা জামাতার কথা স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রুজল আঁচলে মুছিলেন; উমা গাড়ীতে উঠিল।

বড়মানুষের গাড়ীতে চড়িয়া গাড়ীর চাক্‌চিক্য দেখিতেই কালোর সময় কাটিয়া গেল। একবার এটা টানিয়া, একবার ওটা টানিয়া, আলোর সুইচ্ টিপিয়া, সে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। উমা সস্নেহে, ছোটভাইটীর এই খেলা দেখিতেছিল। সে ভাবিল, ভাগ্যে উষা ঝি পাঠায় নাই, তাহা হইলে কালোর লজ্জা রক্ষা দায় হইয়া উঠিত।

'কম্পাউণ্ডে'র ভিতর গাড়ী থামিতেই দ্বারবান নামিয়া গেল। হাস্যমুখী উষা আসিয়া, উমার হাত ধরিয়া নামাইল ও গৌরীকে বুকে টানিয়া লইল। উপরে উঠিতে উঠিতে উমা বলিল, "আগে বল্‌তে মনে ছিল না ভাই! আজকে রবিবার, গাড়ী পাঠালে? তোমার স্বামী তো বাড়ীতেই আছেন! যদি রাগ কর বলে, না এসে থাকতে পারলুম না।" উষা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিছু ভয় নেই দিদি! সে একপাশে পড়ে আছে, —নিরীহ জীব।"

উষার বসিবার ঘরে গালিচা পাতা ছিল। উমা বসিয়া বলিল,"তোমার ঘরে বুঝি, তুমিই গিন্নী? আর তো কাউকে দেখ্‌চি না?" উষা হাসিয়া বলিল, "গিন্নী আপাততঃ আমিই বটে; তবে ঘর আমার নয়, আর এক জনের। আমার এ অনধিকার প্রবেশ।"

উমা বুঝিতে পারিল না; বিস্মিত-ভাবে চাহিয়া রহিল। উষা পুনরায় বলিল, "দাও তো দিদি, গৌরীকে একবার দেখিয়ে আনি। দেখ্‌তে চেয়েছেন।"

উমা বলিল, "তুমি এরি মধ্যে গৌরীর কথা গল্প করেছ! বেশ তো! শীগ্‌গিরই নিজের কোলে হবে, দুঃখ কি?"

উষা মৃদু হাসিয়া গৌরীকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে স্বামীর ঘরের দিকে চলিয়া

গেল। উমা ভাবিতে লাগিল, কি পুণ্য করিলে, এ রকম স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজের স্বামীর ঘরে যাওয়া যায়।

নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে উষার স্বামী 'সোফা'য় বসিয়াছিল; উষা প্রবেশ করিতেই বলিয়া উঠিল, "তবু ভাল যে, হুজুরের দয়া হয়েছে! কে-আসবে বলে এতক্ষণ ধরে বারাণ্ডায় বসে থাকা হয়েছিল? এত রকম বার থাক্‌তে রবিবারটাই পছন্দ হোল? এ কেবল ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা, না উষা? ক্ষমতা যখন হাতে আছে, তখন তার ব্যবহারই বা না করবে কেন বল?" উষা বলিল, "সবাই যদি সেটা বুঝে চল্‌ত, তা হোলে সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট অশান্তি কমে যেত।"

উষার হাস্যাননে একবার যেন মেঘের ছায়া পড়িল: কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া বলিল, "সে-দিন যার কথা বলেছিলুম,—সেই গৌরী। দেখ না, কোলে নিতে ইচ্ছে করে না?" উষার স্বামী হাত পাতিল। গৌরী উচ্চ স্বরে হাসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উষা স্বামীর পাশে বসিয়া বলিল, "কি রকম নিষ্ঠুর এর বাপ, বল দেখি? কি করে এমন গোলাপ-ফুলটি ছেড়ে আছে? চোখে দেখে নি তাই! দেখ্‌লে বোধ হয়, ছাড়্‌তে পার্‌ত না।"

উষা নিঃশ্বাস ফেলিল, উষার স্বামীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। হাস্যময়ী উষা আবার হাসিয়া বলিল, "গৌরীকে কিন্তু আর আমি দিচ্চি না। ওর মার কাছে আমি চেয়ে নিয়েচি; ও আমারই মেয়ে।" উষার স্বামী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বটে! পিতৃসম্পর্কে, না, মাতৃসম্পর্কে?" উষা ঠাট্টাটা গায়ে মাখিল; উল্টিয়া জবাব দিল, "যা বল।" উষার স্বামী বলিল, "পাগলের মতো, কি যে বল! ঠাট্টাটাও বুঝ্‌লে না, উষা?"

এইবার উষা বিষণ্ণমুখে বলিল, "ঠাট্টার হ'লে ঠাট্টা বল্‌তুম। আর যদি সত্যি হয়?" উষার স্বামী চমকিত ভাবে উষার দিকে চাহিল;—উষা কি বলিতে চায়? উষা আবার বলিল, "কেন? দেখ দেখি, এর কোন্‌খানটা অমিল আছে, বল দেখি? মুখ, চুল, রং, গড়ন, সব দেখ। নিজের মেয়েকে কি নিজে চিন্‌তে পার না? চম্‌কে উঠো না। আমি যখন তোমার মুখে সব শুনেছিলুম, তখন তোমার কথায় তাকেই দোষী ভেবে-ছিলুম। তখন তো জানি না, তুমি সত্যিকার দেবী ভাসিয়ে দিয়েছ। প্রতিমার প্রাণ আছে কি না, দেখ নি; রঙের চক্‌চকানি ছিল না বলে, তোমার মনে ধরে নি। তুমি স্বামী, আমার দেবতা। তোমাকে ছোট করে দেখ্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি দোষ করতে চাইলেও আমি তোমাকে করতে দোবো না।" স্বামীকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া উষা বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত স্তম্ভিত সুরেশ কন্যাকে কোলে লইয়া তেমনই বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই আলো ও ছায়া, উষা ও উমা দুইজনে আসিয়া সুরেশকে প্রণাম করিল। দুইজনেরই চোখে জল।

সুরেশ তখনও নির্ব্বাক্ হইয়াছে দেখিয়া, তাহার লজ্জা ভাঙিবার জন্য উষা বলিল, "বেশ লোক তো তুমি! আমরা প্রণাম করলুম, একটা আশীর্ব্বাদও করলে না? (উমার প্রতি) দিদি, তখনই তো বলেছিলুম, এ-সব আমার

নয়। তোমারই সব দিদি! তুমি আপনার ঘরকন্না বুঝে নাও, আমায় তোমাদের পায়ের পাশে ফেলে রেখে দিও। আমি শুধু আমার গৌরী-মাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াব।"

অপরাধী সুরেশ তখনও কথা কহিতে পারিল না; শুধু সজলনেত্রে কন্যাকে চুম্বন করিল।

কম্পিতহৃদয়া, বিস্মিতা উমা বলিয়া উঠিল, "উষা, তুই কি ভাই, বিধাতার উল্টা সৃষ্টি! পথের কাঁটা সতীনকে আবার কে কোথায় কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে, ভাই?" উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

উষা জলভরা চোখে একমুখ হাসিয়া বলিল, "ও দিদি, তা বলে যেন এ পথের কাঁটাটাকে দূর করে দিয়ো না। উল্টাসৃষ্টি কি আমি একাই ভাই! স্বামী অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করচেন, জেনেও যে স্ত্রী তাঁর দোষ দেখতে পায় না, সতীনের সুখেই সুখ মনে করে, সে কি উল্টাসৃষ্টি নয়? আর আমাদের স্বামী? রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্! তাঁর এ চন্দ্রে কলঙ্ক কেন দিদি? গুণের আদর তিনিও কি বুঝলেন না? এও কি বিধাতার সোজা সৃষ্টি বলব?"

এতক্ষণে সুরেশ কথা কহিল, "মাপ কর আমায়; দু'জনেই মাপ কর। সত্যি এবার গৌরীকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমি তা পারব না। আজ বুঝচি সত্যই, তোমরা দেবী; এ মহাপাপীই বিধাতার উল্টো সৃষ্টি! গৌরী আমায় বুঝিয়েছে।"

সজলনেত্রে পতি ও সপত্নীর চোখের জল মুছাইয়া উষা বলিল, "আর গৌরী আমাদের সোনার সৃষ্টি, তিন জনেরই সোনার বাঁধন!"

শ্রীলতিকা দেবী।

আয় ফিরে আয়। *

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
দুঃখিনী জননী তোর
কেঁদে নিশি করে ভোর,
ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখি যামিনী কাটায়।
তুই যে বুকের ধন,
তোর মত কোন্ জন?
ভয়ে মরি, তোরে বাছা, রাখিব কোথায়!
সহস্র শ্বাপদে হায়,
লোলুপ কটাক্ষে চায়,
পিয়িতে বুকের রক্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

আমি যাদু চাহি তোকে
লুকায়ে রাখিতে বুকে,
রাক্ষসে পিশাচে যেন দেখিতে না পায়।
কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

থাকি চেয়ে তোর মুখ কত যে আশায়!
তুই মাতৃভক্ত ছেলে,
কি করে রে মাকে ফেলে
গেলি চলে কোন্ দেশে? কি কাজ তথায়?
আছে তোর ভাই যত,
ঈর্ষা-দ্বেষে সবে রত
চরণে দলিছে সদা অভাগিনী মায়!

---

* কোনও নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর উদ্দেশে লিখিত।

বুঝে না মায়ের ব্যথা,
বুঝে না নিজের কথা,
আপনি কুঠার হানে আপনার পায়!
নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে
তুমি যে তা'দের তরে
নিয়ত খেটেছ কত, বলা নাহি যায়।
আজ কেন গেলি ফেলে? আয় চলে আয়!

৩

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
কোন গিরি-গুহা-মূলে,
কাননে নদীর কূলে
নগরে প্রান্তরে কিবা আছিস কোথায়?
এখনো হয় নি সারা,
কি কাজ এমন ধারা?
কার ধ্যানে মগ্ন চিত কোন্ তপস্যায়?
সাধনা কি সিদ্ধ হবে?
অনন্ত মহিমা রবে
অটুট অক্ষয় হয়ে এ মর ধরায়?

৪

ডাকিছে জননী, "ঘরে আয় ফিরে আয়!
তুই যে কোলের ছেলে,
পারি নে থাকিতে ফেলে;
তোর তরে আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়!
উজল মধুর বেশে,
সহাস নিকটে এসে
'মা' বলে আবার কবে ডাকিবি—আমায়?
শুনি সে অমিয় তান,
পুলকে পূরিবে প্রাণ
বহিবে অমৃত-স্রোত শিরায় শিরায়!
কেন গেলি? কোথা গেলি? আয় ফিরে আয়!"

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মৃত-সংকার।

মৃত-সংকারের প্রয়োজনীয়তা আদি-মানবগণ অনুভব করুন, আর নাই করুন—পরবর্ত্তিযুগে যে ইহার আবশ্যকতা বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। যে দিন হইতে মানুষকে ভূতপ্রেতের ভয় বিড়ম্বিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মানুষও মৃতের স্থূল দেহটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রয়োজনীয়, মনে করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক, আদৌ ভূতপ্রেতের ভয় মানুষের মনটাকে কিরূপে অধিকার করিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

একজন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার অবোধ আত্মীয়স্বজন তাহাকে নির্জনে রাখিয়া দিল; আশা, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, সে পুনর্জীবন পাইতে পারে। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সুতরাং মৃতদেহ হয় 'মামি-ফায়েড' (mummified) অর্থাৎ মৃতদেহকে নানারূপ মসালা দিয়া শুষ্ক করিয়া রক্ষিত করা (যেমন Africa ও Peru দেশে) হইয়া গেল; নচেৎ তাহা গলিত হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। দেহ নষ্ট হইল বটে, তাহার আত্মীয়-স্বজন কিন্তু কত দিনই নানা স্বপ্নে, নানা মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল;—কখনও বা শান্তমূর্ত্তিতে, কখনও বা রুদ্রমূর্ত্তিতে, কখনও বা বীভৎস মূর্ত্তিতে! দেহ নষ্ট হইল,—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, তথাপি তাহাকে দেখা যায় কিরূপে?

এই স্বপ্নদৃষ্ট এবং মনঃকল্পিত মূর্ত্তি তদানীন্তন সরলবুদ্ধি পূর্ব্বপুরুষগণকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তখন মস্তিষ্ক- এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্যবিধি-সম্বন্ধে (actions of the Nervous System) কোন জ্ঞানই মানুষের অধিগত হয় নাই। স্বপ্নকল্পিত মৃত আত্মীয় দর্শনে মানব ক্রমে ক্রমে একটা পরলোকের বা মৃতরাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হইল। মৃতের গলিত দেহ এবং বীভৎস দৃশ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের সরল স্বপ্নকে ক্রমে কণ্টকিত করিয়া তুলিতে লাগিল— এবং ফল এই হইল যে, মানব ক্রমে ভূত বা বেতালের (Vampire) নামে ভীত হইতে লাগিল।

এই ভীতি হইতেই প্রেতাত্মার উপাসনার সূত্রপাত। কিন্তু তাহা যখন বিফল হইল, তখন মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল ; যাহাতে পুনরায় সে আর লোকালয়ে আসিয়া জীবিতগণের উপর উপদ্রব না করে। মহামতি Herbert Spencer নানা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ভূত বা Vampire বদ্ধ রাখিবার বহু অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত প্রকারের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য গুহায় বা মাটীর মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই "গোর" দিবার ব্যবস্থা বহুদেশেই প্রচলিত হইয়া গেল। জার্ম্মেনি বা শর্ম্মণ্য দেশে এখনও পর্য্যন্ত দুষ্ট ভূতের গোরের উপর পথিক-মাত্রকেই পাথর চাপাইতে হয় ; বিশ্বাস,—গুরুভার "গোর" ভেদ করিয়া উঠিতে ভূতের সামর্থ্যে কুলাইবে না। স্বর্গগত মহাত্মা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যেও প্রায় চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে গোর দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত প্রকারের দুরূহ কঠিন ব্যবস্থা সত্ত্বেও জীবিতগণের উপর ভূতের উৎপাত শেষ হইল না—জীবিতগণের কর্ম্মে, স্বপ্নে, বিপদে-সঙ্কটে মৃত এবং মৃত্যু-ভীতির অবধি নাই! ভূত (Revenant) যখন কিছুতেই "বাগ" মানিল না, তখন মানুষ একবার শেষ চেষ্টা করিল ;—মৃতদেহকে দগ্ধ করিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে বিশেষভাবে শান্তি দিবার চেষ্টা করিল। মানুষের বস্তি-প্রদেশের অস্থিটুকু (sacral region) কষ্টদাহ্য ; এইজন্য এই অংশটুকুর sacred বা পুণ্যময় বা পবিত্র নামকরণ করিয়া নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশা,—লোকালয়ের বাহিরে চলিয়া যাউক্।

মৃতদেহ দগ্ধ করিবার আধুনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক,—ইহা আদৌ যে ভূত জব্দ করিবার ব্যবস্থা, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু হায় হায়, মানুষের এত চেষ্টা সকলই বিফল হইয়াছে,—এত দুঃখ দেওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ সাধারণের নিকট ভূত যেমনকার অবাধ্য তেমনি অবাধ্যই আছে ;—কেবল মাত্র এখনকার দগ্ধ-ভূত একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী হইয়া পড়িয়াছে! আমাদের জন্মভূমি কিন্তু সর্ব্ব-বিষয়েই সকলের অগ্রগামী। আমাদের সোনার ভারত সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা অর্থাৎ সারগর্ভা, সুতরাং পৌরাণিক যুগে ঐ অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী দগ্ধভূতের উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে। সে ব্যবস্থা গয়ায় পিণ্ড-দান। বিশেষজ্ঞগণ কহেন,— ভূত-ভয়-নিবারণের

ইহা একেবারে চরম নিষ্পত্তি। গয়ার বিষ্ণু-পাদে বৃহৎ অসুরের সুবৃহৎ করোটীর উপর ক্ষুদ্র অসুরদিগের মুণ্ডপাত! ইহাতেও আর ভূতভীতি তিরোহিত হয় না? ইহা যে অষ্ট-বজ্রসম্মিলন-বিশেষ!

আমরা এতক্ষণ যাবৎ পরলোকবাসীদিগের physical অর্থাৎ দৈহিক দৃশ্যটার আলোচ-নাতেই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ইহার একটা spiritual বা আত্মিক দৃশ্যও আছে। আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ Cerebrum এর কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না জানি না—কিন্তু তাঁহারা দেহাতিরিক্ত একটা কিছুর সত্বা যে অনুভব না করিয়া-ছিলেন, তাহা নহে। সেই দেহাতিরিক্ত "কিছুর" যথার্থ অর্থ সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। Psycho-physiology এবং Psycho-Pathology অত্যন্ত আধুনিক এবং ইহা এখনও বাল্যাবস্থায় বলিলেও চলে। যাহা হউক্, প্রাচীনগণ তাঁহাদের অনুভূত অপরিস্ফুট দেহাতিরিক্ত "কিছুকে"---spirit, আত্মা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিশ্চিত অর্থে ব্যাখ্যাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঠিক্ করিয়া লইলেন যে, আমা-দের এই দেহটা spirit বা আত্মার বাসস্থান মাত্র;—দেহটা স্থূল বহিরাবরণ—সূক্ষ্ম আত্মাই সার পদার্থ। পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মৃত দেহটাকে শাস্তি দিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে-ছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই "আত্মবাদ" তাঁহাদিগকে একটা নূতন আলোক প্রদান করিল। এই "আত্মবাদ" বিশেষভাবে গ্রহণ করিলেন গ্রীস, আর আমাদের ভারতবর্ষ। উক্ত "আত্মবাদের" স্ফুটতর অবস্থায় ঐ দুই-দেশ হইতেই মৃতদেহের "গোর" দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা স্থান লাভ করিল। কারণ, দেহটাকে দগ্ধ না করিলে মৃতের সূক্ষ্ম আত্মা বহুকালের আবাসভূমি স্থূল দেহটার অণুপরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কিরূপে?

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

শোকাশ্রু।

(একান্ত স্নেহভাজন সাহিত্য-সেবক মহীন্দ্রমোহন চন্দের অকাল-বিয়োগ)

হে স্নেহভাজন!

এ কি নিদারুণ বাণী
আনিল এ পত্রখানি!
এ কি হায়, বজ্রধ্বনি, এ কি অভিশাপ!—
আমাদের নাহি ব'লে,
তুমি নাকি গেছ চ'লে,
নিঠুর পরের মত?—এ যে গো প্রলাপ!

সেই মুখ সেই হাসি
নেত্রে যে আসিছে ভাসি,
সে যুগ নয়ন ভরা কত অভিমান;
সেই মধুমাখা কথা,
ভুলায় ব্যথীর ব্যথা,
সেই উদারতা-ভরা সরল পরাণ!

অ"-মরি ! মধ্যাহ্ন-রবি,
অমন উজ্জল ছবি,
নরমল কাল রাহু গ্রাসিয়াছে তা'য় !
এ কি রে ভীষণ দৃশ্য,
আঁধার নিখিল বিশ্ব,
নবিয়াছে সব আলো ;—এ কি সহা যায় !

সেই জায়া আদরিণী,
তারে করি অভাগিনী,
হিমু, গুলু, শকুন্তলা, কাঁদায়ে সবায়,
সত্যই কি গেলে তুমি
ত্যজি এ মরত-ভূমি !—
সে পূজ্য শ্বশুরে দিলে পুত্র-শোক, হায় !

তুমি ত পরের ছেলে,
"মা" বলিয়া কেন এলে,
কেন বা মমতা মায়া দিয়াছিলে ঢালি ?—
জানেন অন্তরযামী
কিছুই চাহি নি' আমি,
তবু দিলে, সেধে দিলে হিয়া করি খালি !

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
সেই মুখ মনে আঁকি
র'ব সদা—মহীন্দ্র যে নহে ভুলিবার !
আহা ! সে দুরন্ত-পণা,
আবদার, ভঙ্গি নানা !—
সে যে কভু বুঝিত না পর আপনার !

তাই আজি বাঁধ টুটে,
শোকের লহরী ছুটে,
জানি না নিঠুর ছেলে বসি কোন্‌খানে,
দুরন্ত বালক-প্রায়,
দেখিছ হাসিছ হায় !—
নিলে এই প্রতিশোধ সেই অভিমানে !

সরস লেখনী তার,
গাঁথিত কবিতা-হার,
সে যে রে স্বভাব-কবি, সুপুত্র বাণীর !
বিজনে কুসুম ফুল্ল,
কে বোঝে তাহার মূল্য,
নিভৃতের নদ সে যে সুধা-মাখা নীর !

কত দিন "দুই ছত্র"
লিখিতে পারি না পত্র,
তাই কি করেছ রাগ হে প্রিয়দর্শন ?—
তাই কিছু নাহি ব'লে,
একেবারে গেছ চ'লে,
আঘাতিয়া শক্তিশেল ভেঙে চুরে মন ?

যাও বৎস ! থেক সুখে,
চির শান্তি পাও বুকে,
অজর অমর দেশে ;—তবু মনে লয়,
আমরা ত সেথা নাই—
ভাল কি লাগিবে তাই ?
সেথা কি পরের ছেলে আপনার হয় ? *

শ্রী'বীরকুমারবধ'-রচয়িত্রী।

* বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয় সুপরিচিত। ইনি এবং ইঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ বহুদিবসাবধি কবিতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বামাবোধিনীর উৎকর্ষ-সাধনে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল-বিয়োগে আমরা যার পর নাই দুঃখানুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদিরের একমাত্র প্রার্থনা। সঃ ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র বেহাগ—খাম্বাজ। একতালা।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো!
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো!
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ করে' শোন্ বাইরে এসে;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো!
সাঙ্গ আমার ধূলা খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা;
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

কথা ও সুর- ৺মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
পা ধা না। না না না ।I না না র্সা। না ধা ধা। ধা না ধা। পক্ষা-া গরা I
নী ল আ কা শে র অ সী ম ছে ০ য়ে ছ ড়ি য়ে ০ গে ০ ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I রগা রগা মপা। পক্ষা গা -া। রগা রগা পা। ক্ষা-া পা I
চাঁ০ দে০ ০র আ০ লো ০ ০আ বা০ র কে ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা। পা পা পা। ক্ষা ক্ষা ক্ষপা। গা রা -া I
ঘ রে র ভি ত র আ বা ০ র কে ন ০

২´ ৩ ০ ১
I রগা রগা ক্ষপা। ক্ষা -া গা। ঋা ঋা ঋা। ঋা ঋা ঋা I
প্র০ দী০ ০প জ্বা ০ লো রা খি স্ না আ র

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্রা র্রা। র্রা র্রা -া। রা র্গা র্রসা। না ধা না I
মা য়া য় ঘে রে ০ স্নে হে ০র বাঁ ধ ন

২´ ৩ ০ ১
I পধা০পধা র্সা। র্সা র্সা র্সর্রনা। না না র্সা। ধা ধা না I
ছিঁ০ ড়ে০ ০ দে রে ০০০ উ ধা০ ও হ য়ে ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা ধপা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা পা। ধা ঋা´ ঋা´ I
মি শি ০য়ে ০ যা ই এ ম ন রা ত আ

২´ ৩
I ঋা´ র্রা র্রা। -া র্রর্গর্রা র্সনধা II
র পা বো ০ না০০ লো০০

০ ১ ২´ ৩ ০
রা রগা রগা। পা পা পা II পা পা পা। ধা ক্ষা ক্ষক্ষা। ক্ষপা পক্ষা -া I
পা পিয়া ০র ঐ আ কু ল তা নে ০ আ কা০ ০শ ভু০ ০
সা ০০ ০ঙ্গ আ মা র ধূ লা ০ খে লা ০০ সা০ ০ঙ্গ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
গা রা রগা I রগা পা -া। পক্ষা গা -া। ধা না -া। না না না I
ব ন গে০ ল০ ০ ০ ভে০ সে ০ থা মা ০ এ খ ন
আ মা ০র বে০ চা ০ কে০ না ০ এ য়ে ছি ক ০ রে

২´ ৩ ০ ১
I না নর্সা র্সা। না ধনা সনধা। ধা না ধা। ধা পা রা I
বী ণা০ র ধ্ব নি০ ০ ০ ০ চু প্ ক রে ০ শো
হি সে০ ব নি কে০ ০ ০ শ যা হা র য ত পা

২´ ৩ ০ ১
I রা গা ধা। ধা ধা ধা। ধপা ধা ঋা´। ঋা ঋা -া I
ন বা ই রে এ সে ০রু ক এ গি য়ে ০
ও না ০ দে না ০ ০আ জি ব ড় ০ ই

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্রা -া। র্রা র্রা র্রা। র্গা র্রা র্সা। না না ধা I
আ সে ০ ম র ণ মা০ য়ে র ম ত ০
শ্রা ০ স্ত আ মি ০ ও০ মা ০ কো লে ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা র্সা। র্সা র্রা ননা। না না র্সা। ধা ধা না I
ভা লো ০ বে সে ০০ এ খ ন য দি ০
তু লে ০ নে না ০০ যে খা ০ নে ঐ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা ধা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা -া। ঋা ঋা -া I
ম র্ তে না পা ই ত বে ০ আ মা র
অ সী ম সা দা য় মি শে ০ ছে ঐ ০

২´ ৩
I র্রা র্রা র্রা। ঋর্গা ঋর্সা র্সনধপা II II
ম র ণ ভা০০ লো০০ ০০০০
অ সী ম কা০০ লো০০ ০০০০

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অকস্মাৎ আনন্দ-বেদনার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে নমিতার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিনের পর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অসঙ্কোচ আবেগে ক্ষুদ্র শিশুর মত সমিতাকে সে বুকে টানিয়া লইয়া, কম্পিত ওষ্ঠে তাহার ললাট চুম্বন করিল। অবাধ্য চক্ষের জল অজ্ঞাতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া সমিতার কেশরাশির উপর ঝরিয়া পড়িল। নমিতার কণ্ঠস্বর ভাল ফুটিল না, তথাপি সমিতা তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিতে পাইল,—"আজ যদি বাবা থাকৃতেন, সেলুন!"

সমিতা ছাত্রী-জীবনে এইবার সবে মাত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আনন্দ-উত্তেজনায় আজ তাহার মন দৃপ্ত প্রফুল্ল, আজিকার আহ্লাদের মধ্যে হয় ত স্নেহময় পিতার অভাব-বেদনা তাহার কিশোর চিত্তের নির্ম্মল অঙ্কে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু এতক্ষণে, বোধ হয়, নমিতার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-সংঘাতে সেই সুপ্ত বিয়োগ-বেদনা তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, চট্ করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জলটুকু শুষিয়া মুছিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিবার জন্য কাশিয়া, ভাঙ্গা গলায় সে বলিল, "দিদি, বইয়ের লিষ্ট এনেছি; খান-তিনেক নতুন বই চাই; বাকী ছোড়্‌দার কাছে পাব।"

নমিতা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে হাসি-মুখে বলিল, "আজই আনিয়ে দেব;—আর, এবার তোকে কি 'প্রাইজ' দোব, বল্ ত?—"

ব্যস্ত হইয়া সমিতা বলিল, "না দিদি, না;—তুমি যে হাতের রুলি দু'গাছা,—নাঃ, ও কিছুতেই খুল্‌তে পাবে না; গয়না ফয়না চাই নে;—যদি একান্ত কিছু দাও, তা' হ'লে—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তা' হ'লে কি—?"

ইতস্ততঃ করিয়া সমিতা কণ্ঠস্বর নামাইয়া সলজ্জভাবে বলিল, "যদি কোথাও বাড়্‌তি টাকা পাও ত আমায় ছোড়্‌দার মত একটা 'ফাউন্‌টেন্ পেন্' কিনে দিও,—।"

ন। তথাস্তু, আচ্ছা। মাকে পাশের খবরটা দিয়ে এসেছিস্?

স। আমি আগেই তোমার কাছে এসিছি। সুশীল সদর দুয়ার থেকে মার কাছে ছুটেছে; মা এতক্ষণ—।

সমিতার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া, সস্নেহ ভৎ‌সনার স্বরে নমিতা বলিল, "দিনে দিনে ভারী বোকা হয়ে উঠ্‌ছিস্! আগে মাকে খবর দিয়ে তবে আমাদের কাছে আস্‌তে হয়।—যা এখুনি—।"

লজ্জিতা সমিতা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দ্বারের বাহিরেই বিমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। বিমল কি এক-খানা বইয়ের জন্য স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াছিল। সমিতাকে অত ব্যস্তভাবে ছুটিতে দেখিয়া সে বলিল, "কি রে শেলী, খবর কি?"

সমিতা থমকিয়া দাঁড়াইল; উৎসুকভাবে ছোড়্‌দাকে সুখবরটা শুনাইতে উদ্যত হইয়া, তখনই দিদির কথা স্মরণ হওয়ায়, ঢোক্ গিলিয়া থামিল। তাহার পর দ্রুতস্বরে বলিল, "একটা খবর আছে, ছোড়্‌দা! এসে বল্‌ছি—।" দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার ছুটিল।

বিমল বিস্মিত হইয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই নমিতা সস্নেহে কৌতুকস্মিত-বদনে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি তার আগেই খবরটা বলে দিই :—ছোড়্‌দা অনেক খেটেছে; ওর গুরু-দক্ষিণাটা ফাঁকী দিলে চল্‌বে না।—সেলুন এবার ক্লাশের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে, বিমল!"

"বটে? তা' হলে ত মানুষ হয়ে গেছিস্ রে! আচ্ছা, আমি স্কুল থেকে ফিরে আসি, তারপর সব জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো।" সমিতাকে এই কথা বলিয়া বিমল ঘরে ঢুকিল ও তাহার বইয়ের আল্‌মারি খুলিয়া প্রয়োজনীয় পুস্তক-খানি লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা তাহার স্বভাবচঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের উপরকার চিঠিখানার উপর পড়িল। উৎসুক-ভাবে সে বলিল, "কা'র চিঠি দিদি?"

চিঠির কথা তখন নমিতা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বিমলের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তার মিত্রের—"। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিল ও ত্রস্তভাবে চিঠিখানা উল্টাইয়া হাতের নীচে চাপা দিয়া, খুব সহজভাবে উত্তর দিল—"এইখানকারই একটি ভদ্রমহিলা লিখ্‌ছেন; তাঁর কি দরকার আছে, তাই একবার সময়-মত গিয়ে দেখা কর্‌তে অনুরোধ করেছেন।"

নমিতা এমনই ভাবে কথা-কয়টি কহিল যে, উক্ত ভদ্রমহিলাটি যে তাহার কিছুমাত্রও পরিচিতা নহেন, এ-কথাটুকু বিমল আদৌ অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং, নিশ্চিন্ত হইয়া সে ছোট একটি "অ—" বলিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বিমল স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নমিতা নিজের মধ্যে কেমন যেন দ্বৈধগ্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘরের বা বাহিরের এমন কোনও পরামর্শ, এমন কোনও প্রয়োজন নাই, যাহা বিমলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বিমল বরং অনেক সময় পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়, কিন্তু তাহার ন্যায়ান্যায় বোধকে যথাযথভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য নমিতা নিজেই প্রায়শঃ উপর-পড়া হইয়া তাহাকে সেই ভিড়ের মধ্যে টানিয়া আনে। তবে আজ কেন নমিতা তাহার কাছে এই ব্যাপারটা চাপিয়া গেল? বিমলের প্রশ্নের উত্তরে সে বেশ সহজভাবেই পত্র-লেখিকার প্রয়োজনটুকু ব্যক্ত করিতে পারিল, কিন্তু তাঁহার পরিচয়টুকুর বেলা, কেন আপনা হইতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল?

ঠিক্। ঐ পরিচয়টাই শুধু যত কুণ্ঠার মূল! ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর নামে শুধু ডাক্তার মিত্রকেই মনে পড়িতেছে, ডাক্তার মিত্রের চরিত্রটাই স্মরণ হইতেছে!...যদিও ডাক্তার মিত্র এ-পর্য্যন্ত নমিতার সম্পর্কিত ব্যাপারে কখনও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করেন নাই, অথবা করিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তবুও তিনি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা নমিতার অগোচর নাই! তাই তাঁহার সম্পর্ক-সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হয় না!

নিজের চিন্তার মাঝখানে নমিতা নিজেই চমকিয়া উঠিল! এতবড় প্রকাণ্ড সত্যকে ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও অনুভব করিবার অবকাশ পায় নাই! ডাক্তার মিত্রকে সে ভয় করিয়া থাকে; তাই নিজের অজ্ঞাতে তাহার মন ডাক্তার মিত্রের সংস্রব এড়াইয়া যথাসম্ভব দূরে দূরে—অন্তরালে থাকিয়া চলে। তাহা না হইলে, তাহার দৃষ্টিতে অগ্রজ অনিলও যেমন, সুরসুন্দরও তেমনই; হাঁসপাতালের সত্যবাবুও তাই; এবং ডাক্তার মিত্রও তাহা ছাড়া আর কিছু অপূর্ব্ব বস্তু নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায়-বিগর্হিত ব্যবহারগুলাই তাঁহার স্বভাবকে অস্বাভাবিক ক্রূরতায় নিন্দনীয় ও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহা হইলেও রক্ষা ছিল,—ধৈর্য্যের তেজ থাকিলে মানুষের ক্রোধকে সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্রোধের ঊর্দ্ধস্থ দুরন্ত রিপুকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়া যে মানুষ পাশবিক আনন্দে—!

নমিতার চিন্তা এইখানে সহসা স্তম্ভিত হইল। তাহার আপাদ-মস্তকে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা যেন হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল! ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সমস্ত প্রফুল্লতা কোমলতা হঠাৎ উগ্র ধাক্কা খাইয়া বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!—অসহ্য, অসহ্য! মানুষের নির্ব্বোধ মূঢ়তার সব ত্রুটি ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা! না! একেবারে অসহ্য!

নমিতার চিন্তাশক্তি নিজের মধ্যেই ক্ষুব্ধ অপমানে স্তব্ধ হইয়া গেল; চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; উত্তেজনা-উষ্ণতায় অর্দ্ধ-আর্দ্র মস্তকের চুলগুলা আবার ঘামে পুরামাত্রায় ভিজিয়া উঠিল। ভীষণ চাঞ্চল্যে নমিতার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়ে, কিন্তু সে সঙ্কল্প-মাত্রেই সে তখনই যেন কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল! মনে হইল, এখনই যদি ভাই-বোনেরা কেহ আসিয়া সামনে দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই অবস্থায় কেমন করিয়া নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া তাহাদের সহিত চোখোচোখী করিবে!

অধীর কম্পিত চরণে নমিতা ঘরের বাহিরে আসিল; নিঃশব্দে বাড়ীর উঠান পার হইয়া বাহিরের নির্জ্জন বারেণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বারেণ্ডার সম্মুখে বৈশাখের তৃতীয় প্রহরের বিষম রৌদ্রতপ্ত পথ সম্পূর্ণরূপেই জন-মানব-শূন্য;—অদূরে মোড়ের মাথায় কাঁটাল গাছের তলায় শুষ্ক পত্রগুলা খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে মাড়াইয়া একটা ছাগল হেঁট-মুখে আহার খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; আর কোন দিকে কেহ নাই,—কিছু শব্দ নাই। দ্বিপ্রহরের অগ্নিজ্বালানিভ উষ্ণ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল।

পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে নমিতা অন্যদিকে চিন্তাগতি ফিরাইয়া বিক্ষিপ্ত মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ক্ষণেক পরে আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিল,—কি নির্ব্বোধ সে! সত্যই ত, তাহার এত রোখ্ কেন? ডাক্তার মিত্র ত নমিতার পিতাও নহেন, ভ্রাতাও নহেন; অধিক কি, রক্ত-সম্পর্কে ধরিতে গেলে, তিনি ত সম্পূর্ণই 'পর'! তাঁহার রুচি সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, নমিতার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে কেন তাঁহার চরিত্র-কুৎসা নমিতার মনকে ক্লিষ্ট ও নিষ্পীড়িত করে?

কিন্তু না, ঐ একটি মাত্র মুখ-চেনা মানুষ নহে। উঁহার মত প্রত্যেক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নর-নারীর জন্য নমিতার মন ঠিক্ এমনই ক্ষুব্ধ বেদনা অনুভব করে! মানুষের এ দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কে, হায়, মানুষ হইয়া কেমন করিয়া সে বলিবে—'আমার তাহাতে কি?' না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সংসার করিতে, না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সমাজে থাকিতে,—তবু তাঁহাদের হীনতার কাহিনী, নীচতার স্মৃতি নমিতার মনকে কতখানি বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে, তাহা নমিতা জানে, আর অন্তর্যামী জানেন!

শব-ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রাদি প্লেটের উপর সাজাইয়া রৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া পুড়িতে পুড়িতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁস্পাতালের লাল্লু ছুটিয়া আসিতেছিল। নমিতাকে দেখিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, "সেলাম মাইজী!"

নমিতা চমৎকৃতা হইয়া দাঁড়াইল! লাল্লুর অভিবাদনের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সভ্যতার খাতিরে হাঁসপাতালে সে নমিতা প্রভৃতিকে কখনও 'মেম্-সাব' বলিত, কখনও বা অভ্যাস-বশে 'মাইজী' বলিত। কিন্তু আজ সেই পুরাতন সম্ভাষণ নমিতার কানে হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও নূতন বোধ হইল! এমন মিষ্ট, এমন মনোরম অভিবাদন সে যেন আর কখনও শুনে নাই! তাহার সমস্ত হৃদয় অপূর্ব্ব স্নিগ্ধরসে ভরিয়া উঠিল। বয়সের অজুহাতে যুবক লাল্লুর নিকট তাহার যেটুকু সঙ্কোচের ব্যবধান ছিল, তাহা সহসা যেন উচ্ছল স্নেহের মুক্ত প্রবাহে কোথায় ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল! বিস্মিতা নমিতা চাহিয়া দেখিল, ঐ তরুণ বদনের কোনওখানে উদ্দাম যৌবনের উগ্র জ্বালা নাই;—কোন বিভীষিকা সেখানে তিষ্ঠাইবার স্থান পায় না! সেখানে শুধু কৈশোরের লালিত্য, শৈশবের কমনীয়তা স্নিগ্ধ আনন্দে বিরাজমান!—এক নিমিষে নমিতার সমস্ত প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল!—ক্ষুদ্র হউক, তবু এই ত মানুষ! অগ্রসর হইয়া সস্নেহে নমিতা বলিল, "কোথা যাচ্ছ এত রৌদ্রে, লাল্লু?"

নমিতার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই হউক্, অথবা বারেণ্ডার শীতল ছায়ায় কথঞ্চিৎ ক্লান্তি অপনোদনের আশাতেই হউক্, হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাল্লু বারেণ্ডায় উঠিল; প্লেটটা নামাইয়া, কোমরে জড়ান গামছা খুলিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, পুলীশের মারফাৎ একটা জলে ডোবা পচা মড়া আসিয়াছে। মৃত্যুটা উদ্বন্ধন কি বিষপান, না কি?—এইরূপ একটা সন্দেহজনক জনরব উঠিয়াছে! অতএব ব্যবচ্ছেদ-ব্যতিরেকে মৃতদেহটার সদ্গতি অসম্ভব। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মত মৃত দেহ অদূরে মাঠে, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে আনীত হইয়াছে। ডাক্তার মিত্রও শীঘ্র সেইখানে যাইতেছেন, তাই লাল্লু আগে আগেই যন্ত্রের বোঝা লইয়া ছুটিয়াছে। কি জানি, বিলম্বের ত্রুটিতে যদি খাপ্পা হইয়া ডাক্তারবাবু তাহার 'শিবুতোড়েঙ্গা' বলিয়া বায়না ধরিয়া বসেন, কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-কথা নমিতার স্মরণ হইল; বুঝিল, সেইদিনের পর হইতে লাল্লু সতর্কভাবে ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে, শুধু একহাত নহে,—পুরা একশত হাত মাপিয়া চলিতেছে। উদ্যত বজ্র যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপর যে অনিশ্চিতরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তাহা

সে সুনিশ্চিত বুঝিয়া লইয়াছে।—নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না, নীরবে সকরুণ ছল্‌-ছল্‌ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া লাল্লু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ চাহিয়া বলিল,"আপ্‌কো নোকর লোগ্‌ কাঁহা হৈ ?"

নমিতা প্রশ্ন করিল, "কেন লাল্লু ?"

সঙ্কুচিত হইয়া লাল্লু বলিল, "থোড়া পিয়াস্‌ লাগল্‌ ভৈ ; এক চুক্‌ পানি,—!"

সাগ্রহে নমিতা বলিয়া উঠিল, "আমি এনে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়াও—।"

ব্যস্ত হইয়া লাল্লু বলিল, "নেই নেই, আপ্‌কো নোকর্‌—।"

গমনোদ্যতা নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, লাল্লু ! হলেই বা, আমি এনে দিচ্ছি।—'মাই-জী'র হাতে কি পানি খেতে নেই ?"

শিশুর মত সলজ্জ বিনয়ে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া, লাল্লু সসোজন্যে বলিল, "বহুৎ, খুব।"

কৃতার্থ আনন্দে নমিতার সমস্ত বুক সুগভীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

শঙ্কর ও গৌরীপাঁড়ে ও-দিকের ঘরে ঘুমাইতেছে ; লছ্‌মীর মা ও অপর সবাই মাতার ঘরে কথা কহিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল ; কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে নমিতার ইচ্ছা হইল না। নিজেই এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিল, মাজা ঘটি বা গেলাশ একটাও পাইল না,—সব উচ্ছিষ্ট ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে ! দ্বিধা মাত্র না করিয়া নমিতা নিজেই একটা গেলাশ টানিয়া লইয়া, একমুঠা ছাই ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিল। পরে নিজের হাত-পা ধুইয়া, ঘরের কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "খাও লাল্লু—!"

হাঁসপাতালে প্রয়োজন-ব্যপদেশে অনেক সময় ইহাদের সহিত হাতে-হাতে জিনিস-পত্র নেওয়া-দেওয়া করিতে হয়। সুতরাং, অভ্যাস-বশে নমিতার এ-সম্বন্ধে সঙ্কোচ জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই, বোধ হয়, সে লাল্লুর হাতে দিবার জন্য গেলাশটা তুলিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু লাল্লু কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া গেল। পয়সার খাতিরে গোলামীর ক্ষেত্রে যে সম্মানকে সে বাধ্য হইয়া লঙ্ঘন করিয়া চলে, এখানে—মুক্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তাহার উচ্চতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে, বোধ হয়, তাহার প্রবৃত্তি হইল না ; নতশিরে পিছাইয়া ভূমির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"জী, হিঁয়া ধর্‌ দিজিয়ে।"

নমিতা ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিল ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিনা বাক্যে গেলাশটি নীচে নামাইয়া দিল। হাঁ, ঠিক্‌, মাতাপুত্রের সম্পর্ক !—যাহা সে কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ-ভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা শুধু অন্তরের সম্পত্তি ! বাহিরের লৌকিক ব্যবহার লোকাচার-সম্মত বিধানানুসারেই অবশ্য প্রতি-পাল্য ; ইহাকে লঙ্ঘন করা আদৌ শোভনীয় নহে।

বাঁ-হাতে গেলাশ ধরিয়া ডান্‌ হাতে জল ঢালিয়া, লাল্লু এক নিঃশ্বাসে চোঁ চোঁ করিয়া সমস্ত জলটুকু শুষিয়া লইল; তারপর গেলাশটা দ্বারের চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "আপ্‌কে তকলীফ দিয়া !"

ঘরের ক্লক্-ঘড়িতে টং টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। ব্যস্ত লাল্লু, "ডাংদার বাবুকা আনেকো 'টাইম' হো গিয়া ;—সেলাম মেম-সাব্", বলিয়া অভিবাদন জানাইয়া যন্ত্রের প্লেট তুলিয়া লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নমিতাও মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলামের প্রত্যুত্তর জানাইয়া, দ্রুতগমন-রত লাল্লুর পানে নীরবে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আহা রৌদ্রের বড় তেজ!

পরক্ষণে নমিতার মনে পড়িল, ঠিক্ এই রৌদ্রে অমনই ভাবে পুড়িতে পুড়িতে ডাক্তার মিত্রকেও ঐ পথে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতে হইবে! এই ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনের প্রচ্ছন্ন তিক্ততার উপর অজ্ঞাতে সুকোমল সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। বাস্তবিক, এমন সুন্দর শিক্ষিত, উচ্চাঙ্গের কৰ্ম্মঠ, গুণী ব্যক্তি। —ইঁহাকে কে না সম্মান করিবে? কিন্তু ইঁহার হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, নমিতার অন্তরের শ্রদ্ধা আপনা হইতেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, ইহাই যে বড় পরিতাপের বিষয়! সংসারে মূর্খের অভাব নাই, এবং তাহাদের মূর্খতা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, তাহাতে দুঃখের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও দুঃখ করিবার মত অবকাশ বেশী নাই। কিন্তু দেশের এই সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীনের মত নিরর্থক খেয়ালের বশে অনর্থক শয়তানী খেলা!—ইহা যে বড় মনস্তাপ!

গেলাশটি তুলিয়া লইয়া নমিতা ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

(১৩)

মিনিট পনের পরে চুল পরিষ্কার করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, মুছিয়া, জামা-কাপড় বদলাইয়া, নমিতা বহির্গমনের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কক্ষতলে মাদুরের উপর বসিয়া নমিতার মাতা সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন; সুশীল তাঁহার হাঁটুর উপর হেলিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। নমিতা তখন স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া পাশের ঘরে ঝাড়ন লইয়া বিছানা-মাদুরের সুব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল। লছ্মীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই মাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ক'টা বাজ্‌ল নমি? এর মধ্যে কি হাসপাতালে বেরুতে হচ্ছে?"

প্রসন্নমুখে খুব সহজভাবে নমিতা উত্তর দিল, "না, হাসপাতালে নয়। আমাদের ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছি।"

মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

নমিতা উত্তর দিল, "কি দরকার আছে, তিনি তাই ডেকে পাঠিয়েছেন!" সুশীলের মুখ-পানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "সিসিল, বেড়াতে যাবি?"

আগ্রহচ্ছন্দে, "হুঁ" বলিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পাশের ঘরে জামা-কাপড় পরিতে চলিয়া গেল। নমিতা মাদুরের প্রান্তে মাতার পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, সেলুনের বই কিন্‌তে হবে; বিমলেরও জুতো ছিঁড়ে গেছে! সংসার-খরচের টাকা থেকে এ-মাসে কিছু বাঁচ্‌বে কি?"

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা ম্লান

ভাবে বলিলেন, "কুলুবে কি মা! এ-মাসে বাড়্‌তি খরচ বড় বেশী হয়ে গেছে। তাই হিসেব কর্‌ছিলুম! ঐ ছেলেটির অসুখের খরচে,—বল্‌তে নাই, এবার চৌদ্দ টাকার ওপর পড়েছে। গেল মাসের কিছু ছিল, তাই টানাটানি করে কুলিয়ে গেছে; না হ'লে ধার ভিন্ন গতি ছিল না।"

নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, বাঁ-হাতের রুলি খুঁটিতে খুঁটিতে নমিতা বলিল, "কিন্তু এ খরচগুলো যে চাই-ই মা! মিস্ স্মিথ্ সময়-অসময়ে অনেক অনুগ্রহ কোরে থাকেন। কিন্তু আর ধার কোর্ত্তে পারিনে। আপ্‌নি যদি কিছু না মনে করেন, তা হ'লে এই রুলি দু'-গাছা—।"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "ঐ দু'গাছাই ত শেষ সম্বল আছে, নমি! কিন্তু ওর জন্যে ব্যস্ত হওয়া কেন? সংসারে সময়-অসময়ের জন্যে আপদ-বিপদের জন্যে কিছু সংস্থান রাখা চাই বই কি।"

সংসারে খরচের টানাটানির মুখে নমিতা আরও দুই-একবার নিজের ঐ অনাবশ্যক অলঙ্কারটা এইরূপে সদ্ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মাতার আপত্তিতে পারিয়া উঠে নাই। সে জানিত, তাঁহার এই সামান্য প্রস্তাবটা মাতার মনে কতখানি কঠিন আঘাত দান করে! কিন্তু উপায় নাই! অভাবের মুখে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে তাই বলিদান করিয়া চলিতে হয়। আজিও সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার মন্তব্য ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু মাতা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাতে সে সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ বলেছেন মা! আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি কিছু সংস্থান রাখা চাই। এই রুলি দু'গাছা কোন কাজের জিনিস নয়, হাতে গুটিয়ে কাজ কর্‌বার সময় ভারি অসুবিধা ঠেকে; একে অনর্থক রেখে কোন লাভ নেই। দিই একে বিক্রী করে। যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়, তা থেকে এদের জুতো আর বইয়ের খরচ কেটে নিয়ে, বাকী টাকা 'সেভিং ব্যাঙ্কে' জমা করে দিই।"

বড় দুঃখে মাতার মুখে একটু হাসি ফুটিল; বলিলেন, "কি দুষ্টু বুদ্ধি তোর নমি! তবু ওটা বিক্রী করবি-ই?—না। আমি ও বিক্রী কর্‌তে দোব না; 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে'র টাকা রাত-দুপুরে দরকার হ'লে পাবি? আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, সে সময় শুধু-হাতে কার কাছে মড়া ফেলার খরচ ভিক্ষে কর্‌তে যাবি বল্ ত?—আমি বলছি, ও দু'গাছা সেই জন্যে থাক্—।"

নমিতা বুঝিল ইহাই যথেষ্ট!—ঘাড় হেঁট করিয়া সে ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হাসির ছলে মনের বেদনা ঢাকা দিয়া বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে এত দিন এত অসুবিধে যখন আপ্‌নি কেটে গেছে, তখন এ-ক্ষেত্রেও তাই হবে।— আচ্ছা অন্য চেষ্টায় রইলুম।"

ঝাড়ন হাতে করিয়া সমিতা সুশীলের সহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ডাক্তার মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাচ্ছ? আচ্ছা, তিনি কি ছেলেটির কথা বল্‌বার জন্যে তোমায় ডেকেছেন?"

নমিতা বলিল, "অসম্ভব। ছেলেটি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা তো তাঁরা কেউ জানেন না! তেওয়ারীকে বারণ করা হয়েছে।

সে ভদ্রলোক এ কথা নিয়ে কখনই হৈ চৈ করবে না, এটা ঠিক্।"

সুশীল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু ও-বেলা, সে বিছানা ছেড়ে একা বাইরের ঘরে গিয়েছিল। নির্ম্মলবাবু তাকে দেখ্‌তে পেয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন যে!"

নমিতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সমিতা বলিল, "ডাক্তারবাবুর স্ত্রী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌বে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নমিতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ক্ষেত্রে কার্য্যং বিধীয়তে।" দেখা যাক্, দরকার হয়, সত্যকে চেপে যাব; কিন্তু মিথ্যে দিয়ে তাকে বিকৃত কর্ব্বো না, এটা নিশ্চয়। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক্।" (সুশীলের প্রতি) "আয় সিসিল!"—(সমিতার প্রতি) ওরে সেলুন, বেলা চারটের সময় ছেলেটিকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াস্, তার পর ঠিক্ ছ'টায়!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোকোচ্ছ্বাস।

এ কি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—
নাহি মম কাকাবাবু স্নেহ-পারাবার,
নাহি ব্যথিতের আর স্থান জুড়াবার!

আজ দুই মাস গত,
নূতন মণি অবিরত,
কাঁদেন সদাই পড়ে ভূমিতে লুটায়া,
তাঁহার যে কত কষ্ট দেখনা চাহিয়া॥

পুত্র-শোকে ভাঙ্গা বুক,
চাহিয়া তোমার মুখ,
সংসারের একধারে আছেন বসিয়া,
উচিত হ'ল না যাওয়া তাঁহারে ফেলিয়া॥

'ধ্রুব'-হারা হ'য়ে শোকে,
বড় বেজেছিলা বুকে,
তাই কি চলিলে দেব, পুত্র-সম্ভাষণে,
যেখানে বিচ্ছেদ নাই অনন্ত মিলনে!

বধূটী বাপের বাড়ী,
যাইলে তাহারে ছাড়ি,
কখন ও থাকিতে দেব, পার নিকো হায়,
কন্যা-সমা পালিতেন স্নেহ মমতায়॥

কত স্নেহ সবাকারে,
ছিল যে তব অন্তরে,
এমন মমতা দেব কিছু না রাখিলে,
ব্যথা দিতে সবাকারে ব্যথিত না হলে॥

যাইলে তোমার কাছে,
যেন কত তৃপ্তি আছে,
আয় মা "সুমনি" এলি আয় মাতা আয়,
বলিতে আদর করে স্নেহ মমতায়!

তোমার স্নেহের ডোরে,
বেঁধেছিলে সবাকারে,
শত্রু মিত্র সবে মিলে তব গুণ গায়,
আত্মীয় স্বজনগণ করে হায় হায়!

জ্ঞান-কর্ম্মে অনুপম,
কার নিষ্ঠা তব সম,
কে জানে শাসন হায় এমন করিয়া,
ভক্তি প্রীতি ন্যায় শান্তি দয়া স্নেহ দিয়া ?
সারাটী জীবনে আর—
দেখা কি দিবে না আর ?
অক্রূরের গৌরব-রবি চলিলে কোথায় ?
চেয়ে দেখ, সবে মিলে ডাকিছে তোমায়।

হে প্রভু মঙ্গলময়,
তুমি যে করুণাময়,
কি মঙ্গল সাধিবারে লইলে তাঁহারে,
দাও দেব বুঝাইয়া আমা সবাকারে॥

দুঃখিনী কন্যা সুহাসিনী

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ অধ্যায় পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

মানব সৃষ্টির রাজা। জগতের পশুপক্ষিগণের উপরেও ইহার প্রভুত্ব। দুর্দ্দান্ত মত্ত মাতঙ্গকে মানব স্বীয় আজ্ঞার অধীন করিতে পারে। মানব, কখনও আপনার কার্য্যসাধনের জন্য, কখনও বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, কখনও স্বর বা রূপজ মোহে অভিভূত হইয়া, কখনও বা ভক্ষনার্থ, কদাচিৎ বা আপনাদিগের সুখের সহিত ইহাদিগের সুখাল্পতা চিন্তা করিয়া আপনার সুখের আদর্শে ইহাদিগকে সুখী করিবার জন্য, কখনও বা সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে, কখনও বা পক্ষীর কণ্ঠে হরিনাম শ্রবণের আশায়, কখনও বা অপত্য-স্নেহের আধার প্রাপ্ত হইয়া অপত্যহীনতা দূরীকরণ মানসে এবং কখনও বা সম্পূর্ণ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, অসীম আকাশতলে বা বিস্তীর্ণ ধরাধামে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণশীল পশুপক্ষিগণকে নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষা করেন, বা পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন এবং আহার, পানীয় প্রভৃতি প্রদান করেন। কিন্তু যেঁদিন দেহ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পশুপক্ষীর জীবনবায়ু অসীম বায়ুমণ্ডলীতে মিশিয়া যায়, সে-দিন সেই মানব প্রেমের ক্ষুদ্রগণ্ডী সেই স্থানটী বা লৌহ-পিঞ্জর সেই পালিত জীবের শূন্য দেহপিঞ্জর লইয়া বসিয়া থাকে! পশু পক্ষী প্রভৃতি পালনের জন্য তাহাদিগের জীবন-বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত। এইজন্য কয়েকটী গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।'

খরগোস:—খরগোস পালন করিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। খরগোস-দিগের শরীর সাধারণতঃ মোটা; কিন্তু একবার পীড়িত হইলে ইহারা আর বাঁচে না। সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য শুষ্ক স্থানের প্রয়োজন। যে-স্থানে বারিপাত হয়, অথবা যেস্থানে সহজেই শৈত্য লাগিতে পারে, তাদৃশ স্থানে পরিহর্ত্তব্য। খরগোসের

গৃহে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। প্রস্রাবই এই দুর্গন্ধের কারণ। সুতরাং তাহাদিগের খুব্‌রিতে যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া উচিত। দুর্গন্ধ বাহির হইলেই সেই মৃত্তিকাকে ফেলিয়া দিয়া নূতন মৃত্তিকা দিবে।

খরগোসের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে প্রতি ছয়টী খরগোসীর জন্য একটি করিয়া খরগোস রাখা উচিত। নতুবা ত্রিশটী খরগোসীর পক্ষে একটী খরগোস যথেষ্ট। প্রত্যেক খরগোসীর জন্য দুইটী করিয়া কামরা রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য। এক সঙ্গে সকলকে রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। খরগোস-মাত্রেই খরগোসীকে বড়ই বিরক্ত করে এবং শাবক হইলে মারিয়া ফেলে। খরগোসেরা সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে; তন্মধ্যে পুং-জাতীয় খরগোস ১ হইতে ৫ বৎসর এবং স্ত্রীজাতীয় খরগোসেরা ৮ মাস হইতে ৫ বৎসর জীবিত থাকে। খরগোসী আটের অনধিক সন্তান প্রসব করে। আট মাসের না হইলে শাবকগণকে খরগোসের নিকট যাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা দুর্ব্বল সন্তান জন্মে। যে সকল সন্তান চৈত্র মাসে জন্মে তাহাদিগকে অগ্রহায়ণ মাসে খরগোসের নিকট যাইতে দিবে। খরগোসী সন্তানের সহিত ত্রিশ দিন থাকে। তৎপূর্ব্বে তাহাকে খরগোসের নিকট পাঠাইবে না। সন্তান জন্মের ১৫ দিন পরেই খরগোসী সুস্থ হয়। কিন্তু আরও ১৫ দিন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

খরগোসীর গৃহের উপর পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিবে যে কে কবে সন্তান প্রসব করিবে। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে গৃহটীকে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়া খড় বিছাইয়া রাখিবে। খরগোসী স্বীয় বক্ষের লোম ছিঁড়িয়া ও খড় লইয়া সন্তানের আবাস নির্ম্মাণ করে। খরগোসীকে শান্ত রাখিবে ও রীতিমত আহার দিবে। এই সময়ে যদি যত্ন না হয়, তবে খরগোসীর দুগ্ধ রোধ হইবার এবং সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনা।

খরগোসী সন্তান প্রসব করিলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত যেন সন্তানকে স্পর্শ করিও না। কারণ, স্পর্শ করিলে অথবা বাসা খুলিলে খরগোসী সকল সন্তানগুলিকে বধ করে। যদি আর্দ্রতার ভয় থাকে, তবে নবজাত সন্তানগুলিকে শুষ্ক কোণে লইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সমস্ত বাসাটা শুষ্ক হয়, তবে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়াই উচিত। যদি খরগোসী দ্বিতীয়বার সন্তান খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে বধ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধি।

খরগোস শিশু জন্মিবার কালে অন্ধ থাকে; কিন্তু পঞ্চম দিবসে তাহাদিগের চক্ষু ফুটে। সন্তানগণ ৫ দিনের হইলে তাহাদিগকে খাইতে শিখাইবার জন্য বাসা হইতে বাহিরের কামরায় তাড়াইয়া দিবে। যদি ইতঃপূর্ব্বে তাহারা বাহিরের কামরায় আসে, তবে উক্ত উপায়ের আবশ্যক হয় না; কারণ, তখন তাহারা স্বেচ্ছায় বাহিরে আসিবে।

জন্ম দিবস হইতে একমাস অতিক্রান্ত হইলে, যখন তাহারা উত্তমরূপে খাইতে শিখে তখন তাহাদিগকে মায়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে; নতুবা তাহারা তাহাকে অস্থিচর্ম্ম সার করিবে। যে-সকল খরগোস-শিশু তিন মাসের নহে, তাহাদিগকে অন্য কামরায় রাখিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে দিবে। খাদ্য পড়িয়া

থাকিলে, সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দিবে না; প্রত্যেক দিন তাজা খাদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি। চারি মাসের হইলে শিশুগুলিকে তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের সহিত রাখিতে পার, কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে পুংখরগোসগুলিকে অগ্রে কাটিয়া ফেলিবে। ছয় মাসের হইলে বলবান খরগোসগুলিকে সন্তান জননের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিবে এবং উপযুক্ত সময়ে পুং খরগোসের নিকট পাঠাইবে। পুং খরগোস শিশুগুলিকে ৫ মাস বয়সেই দূরে রাখা উচিত।

খরগোসদিগকে একবার প্রাতঃকালে ও একবার সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে। এতদরিক্ত খাওয়াইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পেট ভরিয়া দুইবেলা খাইতে দেওয়া বরং ভাল, তথাপি অল্প অল্প করিয়া সারাদিন খাওয়ান উচিত নহে। কোমল বৃক্ষ, শাখা পল্লবাদি খরগোসের উত্তম খাদ্য; কেবল মাত্র Geranium তাহারা খাইতে ভালবাসে না। যাহাদিগের উদ্যান আছে, তাহাদিগের খরগোস পুষিতে অতি সামান্য খরচ পড়ে।

বর্ষাকালে বা মেঘলা দিনে কাঁচা খাদ্য না দিয়া শুষ্ক খাদ্য দিবে। গ্রীষ্মকালে শাকশবজির সহিত ছোলা মিশ্রিত করিয়া একবেলা, বিশেষতঃ গর্ভিনী খরগোসীকে দিবে। এরূপ করিলে পুষ্ট ও বলবান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রচুর পরিমাণে তাজা খাদ্য দেওয়াই বিধি; পর্য্যুসিত খাদ্য নিষিদ্ধ। একই প্রকার বস্তু খাইতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহার দেওয়া উত্তম। ৯৭টী খরগোস শতকরা শৈত্য বা অনাহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শীতকালের জন্য আলু, জেরুজিলম আর্টিবোক, সালগম, মটর, সিম, ছোলা চোকর প্রভৃতি আহরণ করিয়া রাখিবে। যে সকল খরগোসীর সন্তান হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, খরগোস জলপান করে না। ইহা ভ্রম মাত্র। অন্যের পক্ষে যেমন জলের আবশ্যকতা খরগোসের পক্ষেও তাহাই! প্রসূতা খরগোসীর পক্ষে জলের অধিক আবশ্যক। কাঁচা খাদ্য জলের আবশ্যকতা হ্রাস করিয়া থাকে।

খরগোসকে বধ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুগন্ধ গাছ-গাছড়া তাহাকে খাওয়াইলে তাহার মাংস অধিকতর সুস্বাদু হয়।

খরগোসগুলিকে যত্নে রাখিলে তাহাদের রোগ হইতে পায় না। রোগ হইলে আরোগ্য করা অপেক্ষা, রোগকে বাধা দিবার চেষ্টা করা উচিত। খরগোসশিশুদিগের প্রায়ই চক্ষু উঠিয়া থাকে। অপরিচ্ছন্নতাই উক্ত রোগের কারণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নর্দ্দামার সাফাই, এবং স্থান পরিবর্ত্তন উক্ত রোগের প্রতিকার জানিবে।

যকৃতের রোগ অথবা উদরী খরগোসের প্রাণহা হইয়া থাকে। এ রোগের প্রতিকার করিতে যাওয়া বৃথা। হনন করাই প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে।

খরগোসকে ধারণ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ণ ধারণ করিয়া, বাম হস্তের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ধারণ করাই উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে ধারণ করিলে খরগোসের হানি হইতে পারে। প্রসূতা খরগোসীর বিশেষ যত্ন করিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পুস্তক সমালোচনা।

জীবন-সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বাঁধাই সুন্দর। উপরে সুবর্ণাক্ষরে গ্রন্থের নাম অঙ্কিত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি দেশপূজ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার পরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁহার 'পদ্যসার' 'সাহিত্যমঞ্জরী' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং 'ঘরের কথা' প্রভৃতি গৃহপাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক আছে। তিনি তাঁহার এই বার্দ্ধক্যনিপীড়িত, জরাজীর্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন দেহে, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি দুর্গতি নিবারণ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, তাঁহার ৬৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া উপন্যাসচ্ছলে এই উপদেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মূল্যবান। গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। দেশের আধুনিক অবস্থা প্রতিফলিত করিবার জন্য এবং পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ইহাতে যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে এবং অন্নসমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থকার গভীর গবেষণাও করিয়াছেন। কত প্রকার অজ্ঞানতা এখনও দেশবাসীর হৃদয় আবৃত করিয়া আছে, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে জ্ঞাতি-বৈরতার বিষম ফল এবং সাধুতা ও উদ্যমশীলতার পরস্পরের চিত্র অতিসুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের প্রধান চরিত্র ধীরোদাত্ত নরেন্দ্রনাথ, স্বার্থত্যাগী, বিদ্বান্, আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, উদার, কর্ম্মবীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরদুঃখকাতর, গম্ভীরপ্রকৃতি ও ঈশ্বরে ভক্তিমান ; সুতরাং, আদর্শ-স্থানীয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, হৃদয়ে বল হয়, এবং ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধিত হয়। ইহার ভাষা অতিশয় সরল। সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 647. July, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৭ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩২৪। জুলাই, ১৯১৭। ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

আসাতে—

তোমায় আমায় মিলন হ'ল
আজ্‌কে যখন, নাথ,
তখন গভীর রাত!

সাঁঝের বেলাই আস্‌বে তুমি
আমার এই ঘরে,
ছিলাম আশা ভরে।

জ্বালিয়েছিলাম গন্ধ-প্রদীপ
ধূপের সুরভি
অস্ত গেলেই রবি!

হাজার কানন ঘুরে ঘুরে
ভরেছিলাম ডালা,
গেঁথেছিলাম মালা!

পেতেছিলাম শয়ন যেথা
দখিন বাতাসে
মাতায় সুবাসে।

ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে এল,
গভীর হ'ল রাত,
কোথায় তুমি, নাথ!

মিলিয়ে গেল সুখের হাসি
অধর-কোণে মোর,—
নয়ন জলে ভোর!

কত আশায় যত্নে পাতা—
কোমল শয়নখানি
দূরে ফেলে টানি,

দ্বারের কোণে আঁচল পাতি
ঘুমে আছি ঢ'লে,
তখন তুমি এলে!

নিভে গেছে গন্ধ-প্রদীপ
সন্ধ্যা-বেলায় জ্বালা,—
শুক্‌নো ফুলের মালা!

বেসুর আমার বাজ্‌ল বীণা,
কণ্ঠে নাইকো তান,—
শুন্‌তে চাইলে গান!
কোথায় তোমায় বস্‌তে দিব—
আসন কোথা পড়ে?
আমার আঁচল 'পরে
মাটীর উপর লুটায় যেথা—
ঈষৎ মধুর হেসে
বস্‌লে, নাথ, এসে!

নয়ন-তারায় তারার মত
প্রেমের আলো জ্বেলে
প্রেমিক! দিলে ঢেলে
আঁধার হৃদয়-গহন-মাঝে;
নিয়ে বীণাখান
শুনাইলে গান!
দুঃখ ব্যথা মিলিয়ে গেল,
ভরে আমার বুক
তৃপ্তি এল, শান্তি এল, সুখ!

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশী-ধামের পবিত্র দৃশ্য সন্দর্শন-মানসে একটি ক্ষুদ্র তরণী ভাড়া করিলাম! কর্ণধার একজন বৃদ্ধ। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণও এবম্প্রকার নৌকা-চালনা করিয়া অনেকানেক অপরিচিতের দর্শন-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। কর্ণধার নিজ হইতেই প্রসঙ্গাদি সহ তীরবর্ত্তী প্রাচীন অট্টালিকা, দেবমন্দির, স্নানের ঘাট, ইত্যাদি দেখাইয়া চলিল।

গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে পবিত্র বারাণসী-ধাম। বরুণা ও অসীর সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া ইহার এতাদৃশ নামকরণ। স্রোতের বিপরীত দিকে আমাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি তীরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কিয়দ্দূর ব্যবধানে এক-একটি স্নানের ঘাট। তাহার সুদৃঢ় প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া কত শত নরনারী গঙ্গায় অবতরণ করিতেছে। অদূরে গঙ্গাগর্ভে এক-একটি শুভ্র প্রস্তর-মন্দির;—অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গঙ্গাজল কুণ্ডলীকৃত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তর ধৌত করিয়া দিতেছে!—তথায় কেহ কেহ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন,—কেহ বা তার-স্বরে পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। স্নানের ঘাটে তিল ধারণের স্থান নাই! কোথাও কেহ অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় নিমীলিতনেত্রে যুক্তকরে দণ্ডায়মান, কেহ বা নিরক্ষর পাণ্ডার উচ্চারিত মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া গঙ্গার জলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। গঙ্গাবক্ষে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইতেছে, আবার স্রোতের টানে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! গঙ্গার কল্লোল নাই—শব্দ নাই! ব্যস্ততা-সহকারে নিঃশব্দে সে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুনৃপতি-নির্ম্মিত এক-

একটি রম্য হর্ম্ম্য গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে শির তুলিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!—তাহাদের দৃঢ়তা এবং স্থাপত্য সমধিক প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে পুরাতন প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে চিরশান্তি লাভ করিতেছে এবং অপরাংশ পতনোন্মুখ হইয়া নৌযাত্রীদিগের ভীতি উৎপাদন ক'রতেছে;—বুঝি বা, সঙ্গীর নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে! কোথাও বা অতিপ্রাচীন একটি নিম্ব-বৃক্ষ সমূলোৎপাঠিত হইয়া নদী-পুলিনে পড়িয়া রহিয়াছে,—কোনও মতেই গঙ্গাগর্ভে যাইতে পারিতেছে না;—বোধ হয়, এখনও তাহার সময় হয় নাই। দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না, তাই বুঝি, ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে ধূলায় লুটাইতেছে! কোথাও বা গঙ্গা দুই একটি জীর্ণ শীর্ণ আবাসের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ যে দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা অতীব বিস্ময়কর! কাশীধামে দেহত্যাগ হইলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাই কত বৃদ্ধ অন্তিমে শিবত্ব-কামনায় কত কাল ধরিয়া কাশীবাস করিতেছেন—কত সাধের পুত্র-পৌত্রকে জন্মের তরে বিদায় দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, কত সাধের অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, ভোগবিলাস সমুদয় পশ্চাতে ফেলিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহা ভাবিতেও প্রাণে কষ্ট হয়। এ প্রলোভন ত সামান্য নয়! আজন্ম কঠোর সাধনায়ও ত এই ফল লাভ হয় না! হৃদয়ের কি অসীম বল, কি অটল বিশ্বাস! দেখিলাম, প্রস্তরময় মহাশ্মশানের তিনদিকে প্রবাহিতা উদার-গঙ্গা নিমেষ-মধ্যে চিতাভস্ম কোথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে! এ স্থানে মানবের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শ্মশানের দৃশ্য সন্দর্শনে প্রণয়িনীর মর্ম্মভেদী হাহাকার, জননীর সকরুণ বিলাপ, পুত্রের গভীর শোকোচ্ছ্বাস, কিছুই মনে পড়ে না; প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয় না,—জীবন-মরণের কিছুই পার্থক্য অনুভূত হয় না!—যেন সব ভুলিয়া যাইতে হয়! কোথা হইতে অনির্ব্বচনীয় ভাবনারাশি আসিয়া প্রাণের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দেয়!

যে শ্মশানে জীবের সমস্ত শেষ হইয়া যায়,—মান-মর্য্যাদা, অভিমান-অহঙ্কার, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়,—এমন কি পার্থিব যাহা কিছু, সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই শ্মশানে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে প্রাণে স্বতঃই একটা অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা জন্মে। মনে হয়, হায় জীব, কোথায় তোমার সুখ-দুঃখানুভূতি! এই সুকোমল দেহে অগ্নি-সংযোগ করিল, আর তুমি নীরবে তাহা সহ্য করিয়া রহিলে! তোমার আদেশে কত লোক কত কঠোরভাবে প্রপীড়িত হইত, কি প্রভূত ক্ষমতা তোমার ছিল!—তোমার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া কত শত লোক তোমার দ্বারদেশে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত,—তোমার ভ্রূ-কুটিতে কত জনের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইত, তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে কত অসাধ্য কার্য্য সাধিত হইত! আর আজ তোমার এই পরিণাম! কত জন ভাবিত, তুমি বিধাতার এক সুন্দর সৃষ্টি, আর আজ তাহা

ভস্মীভূত হইয়া গেল! আজ তোমার ও পথের ভিখারীর একই পরিণাম!

কিন্তু মহাশ্মশানের উদার উন্মুক্ত দৃশ্যে প্রাণ-মন বিস্ময়-বিজড়িত হইয়া যায়! মনে হয়, যেন সব সত্য। মহাশ্মশানের পার্শ্বদেশে চণ্ডালগণ অপূর্ব্বরূপে সংসার রচনা করিয়া মনের সুখে কালযাপন করিতেছে। তাহারা নির্ব্বিকার-চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে! প্রলয়ের পাশাপাশি সৃষ্টির সূচনা অতীব বিস্ময়ব্যঞ্জক। পুত্র-শোকাতুরা জননী হইতে তাহারা অপত্য-স্নেহ শিক্ষা করিতেছে, দুঃখ হইতে তাহারা সুখের কল্পনা করিয়া লইতেছে। গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ মহাশ্মশানের দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বহুদূরে চলিয়া আসিলাম। ধীরে ধীরে শ্মশানের প্রস্তর-স্তম্ভগুলি দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। সম্মুখ দিয়া গঙ্গা প্রবল-বেগে চলিয়া যাইতেছিল! আমি ভাবিলাম, এমনই করিয়া সংসারের সকলই চলিয়া যাইবে,—কেহ কাহারও অপেক্ষা করিবে না!

কাশীর মহাশ্মশান।

দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসিয়া কর্ণধারকে বিদায় দিলাম। ঘাটের উপর লোকে লোকারণ্য! বহুকষ্টেও দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম না। অগত্যা অদূরবর্ত্তিনী সৈকতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পবিত্র মন্ত্র-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছিল! গঙ্গায় অর্দ্ধনিমজ্জিত যাত্রিকুলের বাহুৎক্ষেপ-সঞ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল বীচিমালা সৌর-করে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। তথায় যেন কি মহান্ এক পুণ্য-প্রভাব চির-বিকশিত! সংসারের সীমাবদ্ধ সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা নিমেষে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবগাহনে ভক্তের ব্যাকুলতা, বৃদ্ধার আত্মপ্রসাদ, ব্যথিতের তৃপ্তি, চিরদুঃখীর দুঃখ-ভ্রান্তি পরিস্ফুট হইতেছে! সকলেই অপার্থিব যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। ভাবিলাম, এইজন্যই মায়ের নাম সন্তাপহারিণী।

মণিকর্ণিকার ঘাটটীও ঠিক্ দশাশ্বমেধ-ঘাটের ন্যায়;—আকৃতিগত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। ঘাটের নিকটে লৌহবেষ্টনী-পরিবৃত মণিকর্ণিকা-কুণ্ড। তাহাতে যাত্রিগণ সর্ব্বপ্রথমে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হয়। নাতিবৃহৎ কুণ্ডে

অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে,—বিরাম নাই! এজন্য জল কর্দ্দমাক্ত। অসীঘাট, কেদারঘাট, প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, তাহাতে সর্ব্বদাই লোকের ভিড়।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভাস্করানন্দস্বামীর আশ্রম সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল মহাত্মার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন তিনি আশ্রমে সশরীরেই বিরাজমান। মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত তুষার-ধবল একটি মন্দির ; তাহার চারিদিকে বৃক্ষরাজি। মন্দিরে মহাত্মার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তথায় প্রতিদিন মহাত্মার আরতি ও পূজা-আরাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানটির নাম আনন্দবাগ। মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে মহাত্মার ব্যবহৃত পুস্তক, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অতিযত্নে সুরক্ষিত। এই মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জীর্ণ একটি দ্বিতল ইষ্টকালয় ; তাহাতে মহাত্মা ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।—আরোহণের সোপান-গুলি স্থানে স্থানে ভগ্ন এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে ; কাহারও উপরে উঠিবার অধিকার নাই। এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া দেখিলাম, স্বচ্ছন্দজাত পুষ্পবৃক্ষাদি বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে! কোনটি অতিস্থবির এবং স্বীয় জীর্ণ শীর্ণ দেহের ভার রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গুল্মের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার নিম্ন দেশ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; যেন কেহ সম্মার্জ্জনী-দ্বারা সদ্যঃ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বত্র নীরবতা, নিস্পন্দতা,—একটি বৃক্ষ-পত্রের পতন শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না! যেন কেহ পরোক্ষে থাকিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন! মন্দিরের এক প্রান্তে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সুশীতল আনন্দবাগ কি শান্তিপূর্ণ এবং গম্ভীর! জ্বালাময় সংসারের পাপ-তাপ এস্থানে আসিতে পারে না।

আনন্দবাগের অনতিদূরেই দুর্গাবাড়ী। এই দেবতালয় বহু-প্রাচীন। ইহার পার্শ্বে একটী নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা ;—প্রাঙ্গণে স্থবির বৃক্ষরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। অগণিত শাখামৃগ দলে-দলে আসিয়া আগন্তুকের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে! তাহাদিগের অত্যাচার অত্যন্ত অধিক। ছোলাভাজা বা অন্য প্রকার খাদ্য তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে উপ-ঢৌকন প্রদান না করিলে, সে-স্থান হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন একপ্রকার অসম্ভব। তাহারা আগন্তুককে নানাপ্রকারে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং গমনের ক্ষিপ্রতা অতীব প্রশংসনীয়।

অদূরে নিবিড় অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত শঙ্কটমোচন শিবের মন্দির। ইহা যেন একটী মুনির পবিত্র আশ্রম। বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থানটীর গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে ; শ্যামশষ্প ও তৃণগুল্ম তরু-রাজির পাদদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে ;—সর্ব্বত্রই এক স্নিগ্ধ ভাব চির-বিরাজমান। ফল-ভারাবনত বিটপী-শ্রেণী মন্দিরটীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ;—প্রচণ্ড তপনের প্রখরতা তথায় অনুভূত হয় না ;—মৃদু মারুত-হিল্লোলে তাপিত দেহ-মন শীতল হইয়া যায়!

প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে সেণ্ট্রাল হিন্দু কালেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস দেখিয়া আসিলাম। বহুদূর-বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, গগনস্পর্শী

অট্টালিকা স্থাপয়িত্রীর প্রশান্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের উপরে বীণাপাণির পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সুরক্ষিত। প্রাঙ্গণে কুমুদ-কল্‌হার-পরিশোভিত সুবৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়ে নানাবর্ণের বিচিত্র মৎস্য নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; ফোয়ারা হইতে সহস্র ধারায় সলিলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুশীতল শান্তি বর্ষণ করিতেছিল।

কাশীধামে অবস্থানকালে সংসারের তীব্র যাতনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সুকৃতির ফলে কিয়দ্দিবসের জন্য দেবদুর্ল্লভ এক শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়াছিলাম। এ স্থানের সব নিত্য, সব সুন্দর—সব স্নিগ্ধ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈরাগ্য।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে।)

আমার গর্ব্বিত মন! হয়ো না চঞ্চল,
আপন গৌরবে কভু হইয়া বিহ্বল।
কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?—
কভু কি ভেবেছ মনে নির্জ্জনে উষায়?
"আমার" "আমার" কর, কি রহে তোমার?
ভেবেছ কি কভু তুমি, তুমি যে কাহার?

জীবনে রহিবে যদি তব অধিকার,
বিপদে কেন বা বল, "কি হবে আমার?"
কেন বা রাখিতে নার প্রাণ-প্রিয়জন,
যা'রে বিনা অন্ধকার নিরখ ভুবন?
কেন বা সৃজিতে নার যা' ভাব যখন,
কেন বা অভাবে কর হতাশে রোদন?

যে তুমি তোমারে ভাব মহাগরীয়ান্,
সেই তুমি হও ভবে ধূলির সমান!
নিয়ত দলিত হও ভবাঘাতে কত,
তোমার উন্নত শির হয় ক্ষণে নত!
তোমার সকল দর্প নিমেষে ফুরায়,
তথাপি গৌরব কর, নাহি লাজ তায়?

তুমি যে আলেয়া হও, নিশার স্বপন,
তুমি যে চপলা-প্রায়, ক্ষণিক তেমন!
তুমি পত্রে ধারা-সম হও যে ধরায়,
ফুৎকারে উড়িয়া যাও নিমেষে কোথায়!
তুমি হও দীপ-সম সহসা নির্ব্বাণ,
'রাখ নিজে' নহ তুমি হেন বলীয়ান্।

ওরে মন! যাও ভুলে "আমার" "আমার";
কিছুই তোমার নাহি, যা' হের ধরার।
এ দেহ জীবন মন যাহা সমুদয়
লভিয়াছ,—"উপহার"; কিছু নিজ নয়।
তুমি যে 'যাত্রিক' হও অনন্ত পথের,
জান না ঠিকানা আজো আপন ঘরের!

ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হয়ে ভাব আপনায়,—
"কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?"
এ জীবন খেলা নহে, তপস্যা-প্রধান,
এসেছি পশরা শিরে করিতে প্রদান।
বিনিময়ে যেতে হবে লয়ে "সার ধন",
তবেই গৌরব তব, সার্থক জীবন!

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৪)

মাতার নিকট হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেও, রাস্তায় নামিতেই কিন্তু নমিতার মুখের সেই হাসি মিলাইয়া গেল। সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতার জটিল সমস্যাটা যে, কোনও উপায়ে সুমীমাংসিত হইবে, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নমিতা খুঁজিয়া পাইল না। মাতার কাছে রুলী বিক্রয়ের প্রস্তাব তুলিয়া, তাঁহাকে আঘাত দিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে নিজের হৃদয়কেও অনেকখানি আঘাত দিয়া সতর্ক ও সাহসী করিয়া লইতে হইয়াছিল ; নচেৎ এ প্রস্তাব উল্লেখের কুণ্ঠাটুকু কাটানই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার সব চেয়ে বেশী সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, রুলী-দুই-গাছা তাহার নিজের নহে ;—উহা চিরদিনই সমিতার নিজের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য ছিল। কয়দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত পছন্দ হওয়ায় নমিতা উহা সমিতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজের চুড়িগুলা তাহাকে দান করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য, নমিতার মত পছন্দ-জ্ঞানহীনা নির্ব্বোধের পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত পর-দ্রব্য-লুব্ধতার মূলে যে একটুখানি ইতিহাস না ছিল, তাহা নহে ; কিন্তু নমিতা তাহা সকলের নিকট চাপিয়া গিয়াছিল। কারণ, প্রকাশ হইলে, উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হইত। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে :—সে-দিন বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, পার্শ্বের ঘরে নির্জ্জন-বিশ্রান্তালাপ-রত সুশীল ও সমিতার কথা কিছু কিছু তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল। বিদ্যালয়ের মেয়েরা সমিতার ক্ষয়া, ময়লা-ধরা রুলী-দুইগাছা মান্ধাতৃ-মহারাজের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া, সে-দিন খুব কৌতুক-বিদ্রূপ করিয়া সমিতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। সেই কথাই দুঃখের দুঃখী ছোট ভাইটির কাছে ব্যক্ত করিয়া সমিতা মনের ভার লাঘব করিতেছিল। সেই দুঃখ-কাহিনীর দুই-চারিটা টুক্‌রা আসিয়া সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিতা নমিতার কাণে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া সে হাঁসপাতালে চলিয়া যায়। পরদিন সকালে বাড়ীতে সকলের সহিত 'চা' পান করিতে করিতে নমিতার হঠাৎ মনে পড়ে যে, তাহার হাতের চুড়িগুলা সম্প্রতি অত্যন্তই উপদ্রব-পরায়ণ হইয়াছে ; চুড়ির ঘ্যাঁস লাগিয়া তাহার প্রায়শঃ জামার কফের বোতাম ছিঁড়িয়া যায়।—তা ছাড়া, আকস্মিক ঝনৎকার-শব্দে নিদ্রিত রোগী-দের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হাঁসপাতালের কাজে আরও নানারকম অসুবিধা হইতেছে··· ইত্যাদি। সুতরাং, তৎক্ষণাৎ চুড়িগুলা খুলিয়া ফেলিয়া সমিতার রুলী-দুইগাছার জন্য জরুর তাগাদা জানাইয়া বসে। হাঁসপাতালের কাজে যাহারা ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে হাতের চুড়ি ও মাথার সুদীর্ঘ চুল যে কতদূর বিড়ম্বনা-জনক, তাহা সে যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিল এবং কাজের সুবিধার জন্য তাহার মাথার চুলগুলা যে সময় সময় ছাঁটিয়া ফেলিতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা

হয়, তাহাও জানাইতে ত্রুটি করিল না। চুলগুলার কথা অবশ্য খুব নিম্নস্বরে বলিল; কারণ, মাতা বাহিরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। পাছে তিনি শুনিতে পান, তাই সে ভয়টা বাঁচাইয়া—সে সন্তর্পণে নিজের মাম্‌লা শেষ করিল। করুণহৃদয়া সমিতা দুঃখছল্‌ছল্‌ চক্ষু-দুইটা তুলিয়া অবাক্‌ হইয়া দিদির পানে চাহিয়া রহিল; তারপর দিদির সুবিধায় সহায়তা করিবার জন্য বিনাবাক্যে নিজের রুলী-দুইগাছা খুলিয়া, সাবান ও ব্রুসে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিদিকে দিল। বলা বাহুল্য, কাজেই দিদির চুড়িগুলিও নিজে পরিতে বাধ্য হইল।

মা এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। কয়দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার সেই অত্যন্ত পছন্দের অলঙ্কার যখন অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া নমিতার মনে পড়িল, তখন সে সাহসে ভর করিয়া মাতার কাছে কথাটা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাব টিকিল না। সহজ পন্থাটা যত সহজে মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল,—ততোধিক সহজেই তাহা মন হইতে অন্তর্হিত হইল। নূতন উপায় অন্বেষণে নমিতা নূতন দুর্ভাবনায় মনোযোগ দিল। কিন্তু দুর্ভাবনা যতই বাড়ান হউক্‌, উপায়ের চিহ্ন কোথাও নাই!

নমিতা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, এমন সময় ও-দিকের পথ হইতে হাঁসপাতালের মিস্‌ চাম্পিয়ান ডান-হাতে ছাতা ও বাঁ-হাতে পরিচ্ছদের পশ্চাদ্ভাগ গুটাইয়া ধরিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল নমস্কার করিলে, প্রসন্না আনন্দময়ী চাম্পিয়ানের তুষার-শুভ্র বদনমণ্ডলে উৎফুল্ল হাস্য অজস্র কৌতুকে উছলিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত ধরিয়া একটু ঝাঁকনি দিয়া—"হ্যালো লিট্‌ল মিটার্‌," বলিয়া তিনি সুশীল, সুশীলের মা, সুশীলের দিদি, দাদা, ছাগল-ছানা, কুকুর-বাচ্ছা এবং অন্যান্য সকলের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল একনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন। সপ্রতিভ সুশীল ঘাড়-মুখ নাড়িয়া, হাত ভাঙ্গা হিন্দী ও পা-ভাঙ্গা বাংলাকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত সৌজন্য বাঁচাইয়া যথাযথ উত্তর দিল। স্বভাব-সিদ্ধ-কৌতুকোৎসারিত-হৃদয়া চম্পিয়ান্‌ আজেবাজে মাথা-মুণ্ড নানাকথা কহিয়া, শেষে নমিতার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এত রৌদ্রে ভাইকে নিয়ে বেড়াতে চলেছ নাকি?"

নমিতা বলিল, "কতকটা তাই। ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছি।"—পাছে চম্পিয়ান, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' প্রশ্ন সুধাইয়া বসেন বলিয়া, পরক্ষণে নমিতা তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি এমন সময় বাড়ী গিয়েছিলে না-কি?"

স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মির মত শান্ত মাধুর্য্যময়ী নমিতার পাশ ঘেঁসিয়া উগ্রদীপশিখার মত উজ্জ্বল সুন্দরী চম্পিয়ান্‌ চলিতে চলিতে বলিলেন, "হাঁ, আমার আহার্য্য প্রস্তুতের দেরী ছিল ব'লে, তখন তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে চলে এসেছিলুম। এখন বেহারা গিয়ে খবর দিলে, তাই পণের মিনিটের জন্য তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারকে বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি সাহায্য না কর্‌লে এখন আসা দুর্ঘট হ'ত।—লোকটি বড় ভদ্র, বড় সহৃদয়!

নমিতা কোন উত্তর দিল না। তেওয়ারী

কম্পাউণ্ডারের নামটা সুশীলের কাণে পৌঁছিয়াছিল; সে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া আগ্রহোন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তেওয়ারী—কম্পাউণ্ডার? হেড্ কম্পাউণ্ডার?—তিনি আছেন হাঁসপাতালে?—এখন আছেন?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন, "আছেন। হাঁ ভাল কথা, কৈ সিসিল, তুমি এখন তাঁর কাছে সিরাপ খেতে যাও না?"—

নমিতার পানে চাহিয়া সুশীল সঙ্কুচিত হইল। এমন গুপ্ত রহস্যটা দিদির কর্ণগোচর করা তাহার ইচ্ছা ছিল না;—এমন কি, এইজন্য সে সুরসুন্দরকেও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ছেলেমানুষীটা খুব ভালবাসে। সে-ই সর্ব্বপ্রথমে সুশীলের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া, সিরাপের মিষ্ট-সরবতের সাহায্যে কিশোর বন্ধুটিকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সুরসুন্দরের সহিত আলাপ হওয়ার পর হইতে সুশীল এখন সমুদ্রপ্রসাদের খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন ভুলিয়াছে; এখন সুরসুন্দরই তাহার অত্যন্ত আপন-জন!

তা সে যাহাই হউক, বাহিরের বন্ধুত্বের সেই গুপ্ত গৌরব-মহিমা যে এমনভাবে, ঘরের লোক, দিদির কাছে অতর্কিতে ফাঁশ হইয়া যাইবে, ইহার প্রত্যাশা সুশীল মোটেই করে নাই। লজ্জায় পড়িয়া নমিতার মুখপানে তাকাইয়া কুণ্ঠিত-ভাবেই সে বলিল, "আমি ত প্রতিদিনই যাই না, এক-আধ দিন যাই। তেওয়ারীর কাছে আমি কখনো সিরাপ চাই নি; তিনিই নিজেই ধর-পাকড়্ করে খাওয়ান, কিছুতেই ছাড়েন না।......তিনি নিজে খুব ভাল লোক কিনা......!" অর্থাৎ, তেওয়ারীর ভালমানুষীটা সুশীলের এই ত্রুটি ও অপরাধের হেতু!

নমিতা হাসি চাপিতে পারিল না। চার্ম্মিয়ানও সকৌতুকে খুব খানিক হাসিয়া লইলেন ও তারপর নমিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা সবাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট বলে ডাক্তার মিত্র কাল দত্তজায়ার কাছে তাঁকে 'মহিলাগণের মনোরঞ্জনকারী' বলে বিদ্রূপ করছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুর মনোরঞ্জন করায় তাঁর কি স্বার্থ আছে বল ত? ডাক্তার বোঝেন না। ওটা তার স্বভাব, ওতেই তাঁর আনন্দ!"

নমিতা মনে মনে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। চার্ম্মিয়ান পুনরায় বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র আদৌ সুবিধার লোক ন'ন্। তাঁর দৃষ্টিও যেম্‌নি ছিদ্রান্বেষণে সূক্ষ্মদর্শী, রসনাটিও তেমনি তীব্র-কুৎসা-পরায়ণ। ভাল কথা, মিস্ মিত্র, তোমার উপর তিনি কেমন সন্তুষ্ট?"

নমিতার সমস্ত মুখমণ্ডল উচ্চ শোণিতোচ্ছ্বাসে রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "অব্যবস্থিত-চিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।—তাঁর সন্তোষ অসন্তোষ আমার পক্ষে সমান লোভনীয়।"

চার্ম্মিয়ান্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বোঝ না; তুমি কাজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াও না, তোমার নাগাল ধরা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, স্মিথ্ তোমার মুরুব্বি আছেন বলে, ডাক্তার বাধ্য হয়ে তোমায় খাতির করে চলেন। আর এক কথা, 'হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আজকাল তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখ্‌ছি; কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা ক'ন্ না!—ডাক্তার সত্যবাবু আর 'হেড্ কম্পাউণ্ডারের'

ওপর, মনে হয়, যেন খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কি জান?"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; শুধু কাশিতে লাগিল।

চার্ম্মিয়ান্ কয়মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, পর-ছিদ্রান্বেষণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হোক্, কিন্তু নিজের ব্যবহার-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! এক এক সময় তাঁকে বেত্রাঘাত করে, তাঁর পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়!... .."

চার্ম্মিয়ানের রূঢ় সদিচ্ছার সংবাদ নমিতার কানে ঢুকিল কি না—ঈশ্বর জানেন; কিন্তু নমিতার কাশি অত্যন্তই বাড়িয়া উঠিল! চর্ম্মিয়ান্ চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। নমিতার কাশি থামিলে তিনি বলিলেন, "তুমি ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে তাঁর দেখা পাবে না ত! তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গেছেন—।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা বলিল, "সে জানি। আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—।"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন "ওঃ! আচ্ছা যাও।—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপ আছে। তিনি বেশ শিষ্ট-স্বভাবের ভদ্রমহিলা। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আমার জানা-শুনা আছে, তার মধ্যে তোমার মাকে আর ডাক্তারের স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লাগে—।"

শেষের কথাগুলি চার্ম্মিয়ান্ ভাঙ্গা বাঙ্গালাতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, সুশীল তাহার অর্থ বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সোৎসুকে বলিল, "আর আমার দিদিকে—?"

হো-হো-শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া চার্ম্মিয়ান্ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার দিদিকে? আরে রাম! আমি আদৌ পছন্দ করি না, একেবারেই পছন্দ করি না!"

নমিতা হাসিতে লাগিল। সুশীল অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ ফশ্ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা আপ্‌নিও আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আস্‌বেন চলুন না?"

"ধন্যবাদ" উচ্চারণ করিয়া, হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া চার্ম্মিয়ান্ সহাস্যে বলিলেন, "অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না ভাই, ক্ষমা কর। পনের মিনিটের জায়গায় সাড়ে পনের মিনিট খরচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! তোমরা যাও।"

চার্ম্মিয়ান্ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন, নমিতা ও সুশীল মোড় ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইল। বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া প্রবেশোদ্যতা নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য একবার থামিল। তাহার বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহোন্মত্ত হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইল!—আত্মসম্বরণের জন্য হঠাৎ সে হেঁট হইয়া ব্যস্তভাবে জুতার গোড়ালীর কাছে ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিতে লাগিল ও মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিল:—ছিঃ! শিষ্টতা ও সৌজন্যের অনুরোধে এখনই যাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রসন্ন-মুখে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া সে মনের মধ্যে গুপ্ত অন্ধকারে অপ্রসন্ন বিদ্বেষ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিবে? নাঃ, এ

চাতুরী অসহ্য! ডাক্তার মিত্র যাহাই হউন্, নমিতা নিজের আত্মনিষ্ঠা বিসর্জ্জন করিবে কেন? পৃথিবীর যেমন অসীম হিংসা, অসীম বিদ্বেষ, অসীম ক্রূর নিষ্ঠুরতা আছে—তেমনই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণা দিয়াছেন! নমিতা কিসের দুঃখে সে সব মূল্যবান সম্পত্তির অপব্যবহার করিয়া, কোন্ দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় কেন প্রতারক দরিদ্রের মত দেউলিয়া খতে নাম সহি করিয়া নিজের মর্য্যাদা ডুবাইবে,—পরকেও অশান্তিতে মজাইবে?—না, সে হইতে পারে না। নমিতাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে,—সে কোন্ পিতার কন্যা!—সংসারের সহস্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে সে যে আজিও নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া চলিতেছে, সে শুধু ঐ একটিমাত্র অমর মন্ত্রের জোরে! —জীবনের যেখানেই কোনও দৈন্য-দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়কে হীনতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই সেই স্বর্গীয় স্মৃতি তাহাকে নীরব শক্তি-মন্ত্রে, তেজস্বিনী ও প্রাণবতী করিয়া তুলিয়াছে! সকল বিপদে, অক্ষয়-কবচের মত তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, প্রতি-মুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে চেতনায় জাগ্রৎ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদণ্ডে তাহাকে স্মরণ করাইয়া চলিতেছে,—সে শুধু এই বাহিরের রক্ত-মাংসে গঠিতা দেহসর্ব্বস্ব, নমিতা-নামধারিণী একটা সামান্যা নারী নহে,—সে জগতের শ্রেষ্ঠশক্তি-সমবায়ে সংগঠিতা, একটা জীবন্ত প্রাণী! তাহার জীবনের উদ্দেশ্য —আত্মোন্নতি! সে আত্মোন্নতি সাধনে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে জলে ডুবিতে, আগুনে পুড়িতে,—নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না! সে-সাধনার জন্য সে সব করিতে পারিবে,—সব! একজন অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয়, সকলের ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্রকে শ্রদ্ধা-সম্মান তাহার পক্ষে—তাহার ব্রতের পক্ষে—করা কি এতই কঠিন কাজ! কখনই না।

এক নিমেষে নমিতার সমস্ত মন অকপট প্রসন্নতায় পরিষ্কার নির্ম্মল হইয়া গেল! বাহ্যিক অবস্থা-বৈষম্যের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ও উৎপীড়নের হাত হইতে, এতক্ষণের পর সে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল,—আপনাকে ফিরাইয়া পাইল! আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সিসিল, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে নমস্কার করতে ভুলিস্ নি যেন!"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া বুদ্ধিমান সুশীল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "যদি কথা বল্‌বার দরকার হয়, তা' হ'লে তাঁকে কি বলে ডাকবো দিদি?"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "দিদিমণি।—"

(১৫)

নমিতা ও সুশীল উভয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সম্মুখে উঠান। ও-পাশে রান্নাঘরের রোয়াকের উপর দিয়া, খর-চরণে একজন মাঝারি রকমের সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবা রমণী চলিয়া যাইতেছিলেন; নমিতাকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন ও বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তুমি কেগা?"

নমিতা এ-কথার উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং, অম্লান-বদনে বলিল, "আমি হাঁসপাতালের 'নার্শ'। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী কোথায়?"

অসন্তোষের সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই রমণী বলিলেন, "জানি নে কোথায়! ঐ ঘরে আছেন বুঝি, দেখো গে—।" মুখ ফিরাইয়া তিনি নিজের কাজে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার নমিতাকে কিছু বিপন্ন করিয়া তুলিল। রমণীর তীব্র অবজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টি নমিতার সহিষ্ণুতাকে একটা জোর ধাক্কা হানিয়া গেলেও, তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করিল, "উঁহার দোষ নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সকলেই অল্প-বিস্তর ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হন।—ইহার জন্য ধৈর্য্যহারা হইব কেন?" খুব শান্তভাবে, সবিনয়ে সে পুনরায় বলিল, "যদি অনুগ্রহ কোরে একবার তাঁকে ডেকে দেন—!"

ঘোরতর তাচ্ছিল্যের সহিত চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তি-কর্কশ কণ্ঠে রমণী ডাকিলেন, "ওগো, অ—বৌদিদি! বেরিয়ে দেখসে বাবু, কে এসেছে—!" এই বলিয়া রমণী দ্রুতপদে অন্য ঘরে গিয়া ঢুকিলেন; দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন না।

নমিতা প্রমাদ গণিল। তাহার দুর্ভাগ্য! এই অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির সুস্থ মেজাজ্‌কে ব্যস্ত করিয়া, সে ইঁহার সম্বন্ধে ত বড়ই অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এখন আর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিবার পথ নাই! যখন গৃহে ঢুকিয়াছে, তখন গৃহকর্ত্রীর সহিত না দেখা করিয়া ফিরিবার উপায় নাই।

অনতিবিলম্বেই ও-দিকের বারেণ্ডায় একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত গৃহদ্বার-পথে দুইটি উৎসুক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিয়া নমিতার কানে পৌঁছিল—"কে গা?"

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া নমিতা বিস্মিত হইল!—ইনিই কি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী!—আশ্চর্য্য সুন্দরী ত!......না, গায়ের চাম্‌ড়াটা কটা নহে; কিন্তু কি স্নিগ্ধ কমনীয়তা উঁহার শ্যামোজ্জ্বল অবয়বের উপর শান্ত মধুর রূপের ছটা বিছাইয়া দিয়াছে! যান্ত্রিক নির্দ্দেশ-মত পরিমাপ করিতে গেলে, উঁহার মুখের গঠন, হয় ত, নিখুঁত সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, কিন্তু কি নম্র কি ললিত ভাবের অভিব্যক্তি ঐ তরুণ মুখের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! কি হৃদয়গ্রাহী সুন্দর একটা বিষণ্ণ করুণার ম্লান ছায়া ঐ শান্ত দৃষ্টির মাঝে নির্লিপ্তভাবে মিশিয়া রহিয়াছে! কি চমৎকার, কি অপরূপ রূপসী! নমিতার দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল! রমণীর 'কে গা—'প্রশ্নের উত্তরে সে আপনার পরিচয় দিতে ভুলিয়া গেল!

রমণী ক্ষণেক পরেই উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিলেন, "ও, আপ্‌নি কুমারী মিত্র!—চিনিছি চিনিছি! মাপ করুন। নমস্কার!—আসুন!" এই বলিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া রমণী নমিতার হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞ-কোমল কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নি আজই এখানে কষ্ট করে যে পায়ের ধূলা দেবেন, এত সৌভাগ্যের আশা ত আমি করি নি! আপ্‌নার অনুগ্রহকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো?"

এই উচ্ছল আদরপূর্ণ অভ্যর্থনা-স্রোতে নমিতা যেন নূতন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল! সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, "এ কি

কথা! আপ্‌নি আমায় স্মরণ করেছেন, এ ত আমার গৌরবের বিষয়!—এ আনন্দে কষ্ট আবার কি?"

নমিতা মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু কথাটার সহিত পরিপূর্ণ আন্তরিকতার যোগ হইল কি না, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিল না।—মনে মনে অনুতাপবিদ্ধ হইয়া, আত্ম-সংশোধনের চেষ্টায় প্রসঙ্গান্তর টানিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি আমায় দেখ্‌বামাত্র চিন্‌লেন কি করে—?"

সলজ্জ হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি রাস্তা দিয়ে হাঁসপাতালে যান আসেন, আমি জানালা থেকে প্রায়ই দেখি!"

সুশীল বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রমণীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল;—এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া অযাচিত আগ্রহে প্রশ্ন সুধাইয়া বসিল,—"আপ্‌নিই কি কুমার আর কিশোরের মা?"

রমণী সরল হাস্যের সহিত খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ ভাই, তা'রাই আমাকে 'মা' বলে।—আর তোমার নাম ত সুশীল? তোমাকেও আমি এর আগে দেখিছি। ছেলেদের কতদিন বলিছি, তোমাকে একবার ডেকে আন্‌তে, কিন্তু ওরা ত কথার বাধ্য নয়!"—এই বলিয়াই তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া লইয়া নমিতার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আসুন, কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

উক্ত সুমধুর আহ্বান করিয়াই তিনি সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতার সহিত বারেণ্ডা পার হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নমিতা এই সুযোগে তাঁহার সম্পূর্ণ আকৃতিটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।—শীর্ণ, দীর্ঘ, সুগঠিত ঋজু অবয়ব,—স্নায়ুপ্রধান-প্রকৃতির মানুষের স্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত। শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবণ্যোজ্জ্বল ক্ষীণ তনুটির চলন-ফেরন সমস্তই যেন ঈষৎ ক্লান্তি-অলস। ক্ষীণশক্তি ফুস্‌ফুস্‌-দুইটী বাক্যোচ্চারণের জন্য শক্তিব্যয় করিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতে চাহে; কণ্ঠস্বরের মাত্রা হ্রাস হইয়া যায়, নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া আসে, রক্তহীন মুখে পাণ্ডু বিবর্ণতা অধিকতর ম্লান হইয়া ঘনাইয়া উঠে। শীর্ণ দুর্ব্বল হাত-পাগুলা যেন নিজের শক্তিতে সচল নহে। তাহাদিগকে শুধু জবরদস্তি করিয়া খাটাইয়া যেন কাজ আদায় করা হইতেছে,—এমনই লক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য পার্থক্য তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল শোভাময় চক্ষু-দুইটিতে! তাঁহার নিস্তেজ ক্ষীণ আকৃতির মধ্যে এই আশ্চর্য্যজনক তেজস্বী দীপ্তিময় করুণা-সজল চক্ষু-দুইটি বড় চমৎকার বিশেষত্বপূর্ণ! ইঁহাকে ঠাহর করিতে হয়, শুধু যেন ইঁহার চক্ষু দেখিয়া;—নচেৎ ইহার মধ্যে আর কিছু লক্ষণীয় আছে বলিয়া বোঝা যায় না। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানি সাড়ী ও সেমিজ। গলায় প্রকাণ্ড মোটা 'নেক্‌লেশ';—ক্ষীণ কণ্ঠ ও অপ্রশস্ত বক্ষের উপর সে কণ্ঠহার যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ও ভারজনক হইয়া উঠিয়াছে। হাতে মোটা মোটা জল-তরঙ্গ চুড়ি; খুব টক্‌টকে গিনি সোণার জিনিস বটে, কিন্তু শীর্ণ প্রকোষ্ঠের উপর তাহার বৃহৎ আয়তন ও বিপুল পুষ্টতা আদৌ শোভনীয় মনে হইতেছে না।

নমিতা দেখিল, যে ঘরটায় তাহারা ঢুকিয়াছে, সে ঘরখানি বসিবার ঘর; অল্প

পক্ষে পোষাকের ঘরও বলা চলে। দেয়ালের গায়ে হুকে কতকগুলা 'কোট্' 'প্যান্ট' ঝুলিতেছে ; ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কতকগুলা বস্ত্রাদি স্তূপাকার করা রহিয়াছে। বোধ হয়, সেগুলা এই মাত্র 'ব্রাস্'-মার্জ্জনা করিয়া, গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এক পাশে পোষাকের দেরাজ ; তাহার উপর আয়না চিরুণী ব্রাস্ সাজান রহিয়াছে। পাশে টেবিল, খান-দুই চেয়ার, একটা বেতের মোড়া। দেয়ালের গায়ে খানকতক বাঁধান ছবি ও ফটো। একটা টেনিস ব্যাট্ এক পাশে ঝুলিতেছে। আরও দুই-চারিটা খুচ্‌রা জিনিস আছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সুশীলকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। নমিতা মোড়াটা টানিয়া লইয়া, অন্য চেয়ারখানি ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর দিকে টানিয়া দিলে, তিনি হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বসুন! কিছু মনে করবেন না। আগে এই পোষাকের বোঝাটা সাম্‌নে থেকে সরাই, তারপর...।"

তিনি পোষাকগুলা লইয়া দেরাজে তুলিতে তুলিতে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নাকে এমন ভাবে গায়ে-পড়ে জ্বালাতন করার জন্যে আপ্‌নি কি মনে কর্‌ছেন, জানি নে ; কিন্তু আমি পরিচয় পেয়িছি, আপ্‌নি আমাদের 'পর' নন্। আপ্‌নার দাদা অনিলবাবু,—যিনি এখন বিলেতে রয়েছেন, তাঁর সহপাঠী বন্ধু অক্ষয় সেনের নাম, বোধ হয়, শুনে থাক্‌বেন।"

উৎসুক হইয়া নমিতা বলিল, "বিলক্ষণ! অক্ষয়-দা ত আমাদের বাড়ীর-লোক ছিলেন ; আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আপনার—?"

দেরাজটা পোষাক বোঝাই করিয়া, ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সস্মিতবদনে বলিলেন, "তিনি আমার মামাত ভাই। এবার মামার বাড়ী গিয়ে সব খবর শুন্‌লুম্।"

তিনি নমিতার খুব কাছে আসিয়া মেঝের উপর বসিলেন ও সলজ্জভাবে বলিলেন, "আমার ভয় হয়েছিল যে, যে-সম্পর্কের ছুতোয় আপ্‌নার উপর উপদ্রব কর্‌তে যাচ্ছি, আপ্‌নি, হয় ত, তা ভুলে গেছেন। সেই জন্যে চিঠিতে সব খুলে লিখ্‌তে পারি নি ; ক্ষমা কর্‌বেন। আপনার বাবার কথাও সব শুন্‌লুম ; তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।"

নমিতার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, চোখ-দুইটা অনিচ্ছায় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি নমিতার হাতখানি টানিয়া লইয়া, বেদনা-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আপ্‌নাদের সংসারটার বড় ক্ষতি হয়েছে! আপ্‌নি পড়াশুনা ছেড়ে এখন 'নার্সে'র কাজ কর্‌ছেন শুনে অক্ষয়-দা কত দুঃখ্ কর্‌লেন।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "বাবার মৃত্যুর পর অবস্থা মন্দ হওয়ায়, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের সংস্রব থেকে আমরা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।—তা ছাড়া দূর-দেশে চলে আসাও হয়েছে! আমি যে 'নার্সে'র কাজ কর্‌ছি, এ কথা অক্ষয়-দা'র মত

অনেকেই জানেন না। আমি ইচ্ছে করেই জানাই নি ; জানি, তাঁরা শুনে শুধু দুঃখিত হবেন।”

বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, “আপ্‌নাদের ভাই বোনের ছেলেবেলার বুদ্ধি-প্রশংসা যা শুনে এলুম, সে সবই দেখ্‌ছি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক্‌! আপ্‌নাকে ভক্তি কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।”

অপ্রস্তুত নমিতা, পরিহাসের অন্তরালে লজ্জার দায় এড়াইবার জন্য, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, “ও ইচ্ছাটা আপাততঃ মূলতুবী রাখুন। আমাদের সেই ছেলেবেলার দাদা অক্ষয়বাবুর আপ্‌নিও যেমন ছোট বোন্‌, আমাকেও তাই মনে কোরে নিন্‌।”

নমিতার হাতখানা ঈষৎ পীড়ন করিয়া তিনি বলিলেন, “সে ত নিয়িচিই; দেখুন না, কত দূরের সম্পর্ক খুঁজে টেনে নিয়ে এলুম!”

নমিতা বলিল, “ভাগ্যেশ, খুঁজে টেনেছিলেন! আমি ত কিছুই জানতুম না। আমার মা শুন্‌লে কত সুখী হবেন—!”

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ বিচলিত ভাবে বলিলেন, “কিন্তু আপ্‌নাদের ডাক্তারবাবু এখনো কিছু জানেন না।”

নমিতা চমকিয়া উঠিল! নতুন পরিচয়ের আনন্দে পুরাতন কথা সে যেন এক নিমেষে সব ভুলিয়া গিয়াছিল; ডাক্তার বাবুর নাম পর্য্যন্ত! সহসা অতর্কিত খড়্গাঘাতের মত এই আনন্দের মাঝে একটা কড়া ঘা পড়িয়া যেন তাহাকে ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। নমিতার মনে পড়িল, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, তিনি তাহাদের হাঁসপাতালের ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!—সেই ডাক্তার প্রমথ মিত্র—! যিনি—! সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, একটা গুপ্ত উদ্বেগ যেন তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল! নমিতার মনে হইল, “উঠিতে পারিলে বাঁচি! আর এখানে এক মুহূর্ত্তও নয়!”

নমিতার আভ্যন্তরিক চাঞ্চল্য, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বুঝিলেন কি না, বলা যায় না; কিন্তু বোধ হইল, তিনি যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া তিনি বলিলেন, “আপ্‌নি ত অনেক দিন আগে অক্ষয়-দাকে দেখেছেন। এখন তাঁর ফটো দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন?—দ্যালের গায়ে ঐ ফটোখানায়—!”

নমিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, অত্যাবশ্যক আগ্রহে ফটোর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে দৃষ্টি সংযত করিয়া একাগ্র মনোযোগে ফটো দেখিতে লাগিল। তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে এই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়!—পাছে তিনি তাহার মুখ দেখিয়া অন্তরের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ টের পান্‌!...... ছি, ছি, সে বড় লজ্জা, বড় দুঃখের বিষয়! নমিতার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

পরক্ষণে, তাহার মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপ যেন স্নেহার্দ্র সৌহৃদ্যে বিগলিত করিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “অক্ষয়-দাকে চিন্‌তে পারেন্‌ নি? এই দেখুন, তাঁর চেহারা!” এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। নমিতা এতক্ষণে ফটোর উপর যথার্থ মনোযোগ দিবার শক্তি পাইল। প্রসন্ন হাস্যে সে বলিল, “হাঁ চিনিছি; অনেক বদ্‌লে

গেছেন। এ-খানা কত দিন আগে তোলা হয়েছিল?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তিন বৎসর। আর এই দেখুন, এরা সব আমার মামার বাড়ীর ছেলে; এদের কাউকে চিন্‌তে পারবেন না।—আর এ পাশে ইনি আমার মা—!"

"বিধবা!—"এই বলিয়া বিস্ময়-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা ডাক্তারের স্ত্রীর পানে চাহিল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাবার কথা ভাল মনেও পড়ে না।"

নমিতার মন অভিভূত হইয়া পড়িল! নিজের পিতার কথা মনের ভিতর জল্‌-জল করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মাতার বর্ত্তমান অবস্থাও স্মরণ হইল। বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সে চিত্রের সেই জীবন্ত বেদনাঙ্কিত বিধবা-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল! তাহার বুকের উপর যেন গভীর বিষাদ চাপিয়া বসিল!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, এ চেহারাটা কা'র বল্‌তে পারেন্?—এই যে কোলে কচি ছেলে? যার পাশে ব'সে,—এই যে এক হাতে পাখা—?"

নমিতা মূর্ত্তিটা দেখিল; তাহার পর ডাক্তারের স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "আপ্‌নার কি?—না, ও চেহারা যে বড্ড ছেলেমানুষের বোধ হচ্ছে! আপ্‌নার ছোট বোন্ বোধ হয়।"

হাসিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না, আমি-ই—।"

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "বলেন কি! তিন বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! আপ্‌নার বয়স এখন--?"

তিনি বলিলেন, "উনিশ বছর! ষোল বছরে ঐ ছেলেটি আমার হয়েছিল। মাস-তিনেক বেঁচেছিল, কিন্তু এক দিনের জন্যে সে সুস্থ ছিল না। দেখ্‌ছেন, কত কাহিল চেহারা...!"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "তা'হ'লে কি কুমার-কিশোর আপ্‌নার ছেলে নয়? তারা আট-দশ বছরের করে হবে, নয়?"

সুকোমল হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমি তাদের বিমাতা!—দেখুন, ও ছেলেটা এত সকাল সকাল গেছে বলে, আমার কিছু দুঃখু নেই;—কিন্তু আমার মত স্বাস্থ্যহীনা দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, ও যে পৃথিবীতে একদিনের জন্য সুস্থতার মুখ দেখ্‌তে পায় নি, এটা আমার বড় দুঃখু আছে!"

ব্যথিতা নমিতা ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। অথচ একটা কিছু বলা চাই; তাই কোন মতে আত্মদমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তারপর আর আপ্‌নার ছেলে হয় নি?"

উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া, মুখে সেই পূর্ব্বের স্নিগ্ধ কোমল হাস্যমাধুরীটুকু জোর করিয়া টানিয়া ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না! একজনের জীবনের ওপর দিয়ে যথেষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিছি; আর অপরাধের মাত্রা বাড়াতে কামনা নেই। শ্বশুরের বংশধর যারা বেঁচে আছে, তারা দীর্ঘজীবী হোক্, আপ্‌নারা এই আশীর্ব্বাদ

করুন।” হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “আপ্‌নারা বসুন ;—আমি চা করে আনি। আপ্‌নার হাঁসপাতাল যাওয়ার আর বেশী দেরি নেই, সেটা ভুলে যাচ্ছিলুম।”

নমিতা ‘হাঁ,’ ‘না,’ কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নমিতা ফাঁফরে পড়িল ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা আবার আসিয়া নিজের স্থানে বসিল।

সুশীল নমিতার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, “দিদিমণি বেশ ভাল লোক, নয় দিদি? আচ্ছা, কুমার আর কিশোরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন বল দেখি? নির্ম্মলবাবুই বা কোথায়?”

অন্যমনস্কা নমিতা বলিল, “কি জানি—!”

সুশীল। এবার দিদিমণি এলে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো?”

“কর্‌তে পারিস্—” এই বলিয়া নমিতা অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল!

সহসা দ্বারের নিকট হইতে তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝঙ্কার হানিয়া কে বলিয়া উঠিলেন, “বৌদিদি, ওগো বৌদিদি! বলি সারা-ক্ষণই কি গল্প নিয়ে—!”

নমিতা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—সেই তিনি!—বাড়ী ঢুকিয়াই প্রথমে যাহার সুমধুর অভ্যর্থনায় সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল! তখন দূর হইতে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, এবার ভাল করিয়া দেখিল :- রমণীর কঠিন ভ্রূভঙ্গীটুকু অত্যন্ত ভয়ানক বটে! তাঁহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অকারণে যেন একটা ক্রূর-বিদ্বেষ ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছে। রমণীর দৃষ্টি-সঞ্চালনে রমণীয়তার লেশমাত্র নাই ; আছে শুধু, কঠোর শাসন ও কর্ত্তৃত্বের দম্ভ! নমিতার মুখের উপর সেই কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, “ঠাক্‌রুণ গেলেন কোথা? ঢং করে উনুনে আগুন দিতে বলে, উনি—! এখানে নেই?”

নমিতা দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, “না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।”

এতখানি শাসন-কর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়াছে, দেখিয়া রমণী নিজের প্রতি ক্ষুণ্ণ হইলেন। অনাহতচিত্তে নিরাপদে প্রস্থিতা শাসিতার উপর রাগও, বোধ হয়, কিছু বাড়িল। কিন্তু আপাততঃ সেটা চাপিয়া যাওয়া ভিন্ন গতি নাই দেখিয়া, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘরে ঢুকিয়া নমিতার সম্মুখে দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তুমি, বুঝি, হাঁস্‌পাতালে দাদার কাছে চাক্‌রী কর?”

নমিতা বুঝিল, ‘দাদা’, অর্থাৎ প্রথম মিত্র! কিন্তু কাহার কাছে চাকুরী করে, তাহার সবিশেষ সংবাদ খুলিবার দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা ইহার কথায় সায় দিয়া সুস্থ হওয়াই বেশী সুবিধা, বুঝিয়া নমিতা সংক্ষেপে বলিল, “হুঁ!”

শূন্য চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া, প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্ত্তির মত রমণী সগর্ব্বে উঁচু হইয়া জাঁকিয়া বসিলেন। রান্নাঘরের ধোঁয়ার গন্ধে সুগন্ধ ও বহুদিনের সঞ্চিত তৈল, কালী ও হলুদের রঙে সুচিত্রিত পরিধেয়ের আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহে নমিতার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নমিতা

ও-পারেতে ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে ;
এস এস শ্রান্তি-হরা,
এস শান্তি-সুপ্তি-ভরা ;
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´ ৩
II { গা ক্ষা পক্ষা। গা গঋা সঋসা। ন্‌া -সন্‌া সা। ঋা গা -া } I
বে লা গে ০ ল ০ তো মা ০ র প ০ ০ থ চে য়ে ০

০ ১ ২´ ৩
I গক্ষা -গক্ষপা পা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষপা গা -া I
শূ ০ ০ ০ ০ ন্য ঘা টে ০ এ ০ কা ০ ০ আ ০ মি ০

০ ১ ২´ ৩
I গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা গা -া। গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা গা -ঋা I
পা ০ র্‌ ক রে ০ ল ও পা ০ র্‌ ক রে ০ ল ও

০ ১ ২´ ৩
I গা -ক্ষগা ক্ষা। পক্ষা পনা -ধনধা। পা ক্ষা -পক্ষা। গক্ষা গক্ষপাঃ-ক্ষাঃ II
পা ০ র্‌ ক রে ০ ০ ল ও ০ ০ খে য়া ০ র নে ০ ০ ০ য়ে ০

০ ১ ২´ ৩
II { -া -া গপা। গা পা ধা। ধা র্সা -নর্সর্রা। র্সা র্সা -া I
০ ০ ভে ঙ্গে এ লাম খে লা ০ ০ র বাঁ শি ০

০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা নর্সা। না ধা -া। ধা -না ধনর্সা। নধা পধপাঃ -ক্ষাঃ } I
চু কি ০ য়ে এ লে ম কা ০ ০ ন্না ০ ০ হা সি ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
I গক্ষা -গক্ষপা পা। পা পা -া। পা -ক্ষপা ক্ষপা। ক্ষপা গা -া I
স ০ ০ ০ ০ ন্ধ্যা বা য়ে ০ শ্রা ০ ০ ০ ন্ত কা ০ য়ে ০

০ ১ ২´ ৩
I ক্ষা পা -ক্ষপনা। ধা পা -া। ক্ষপা গাঃ -ক্ষঃ। গক্ষা গক্ষপাঃ -ক্ষঃ I
ঘু মে ০ ০ ০ ন য় ন ০ আ সে ০ ছে ০ ০ ০ য়ে ০

[র্সা র্সা -পা]　১　২´　৩
I { গা গক্ষা -গক্ষপা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষা গা -া I
ও পা ০ ০ ০ ০　রে তে ০　ঘ রে ০ ০ ০　ঘ রে ০

০　১　২´　৩
I গা -া ঋা। গক্ষা -পা পক্ষা। গা গক্ষা -গক্ষপা। ক্ষপা গা -া I
স ০ ন্ধ্যা　০ দী ০ ০ প　জ্ব লি ০ ০ ০ ০　ল ০ রে ০

০　১　২´　৩
I -া -ঋা ঋা। গা ঋা ঋা। সা -া সা। সন্া -সা সা I
০ ০ আ　র তি র　শ ০ ঙ্খ　বা ০ ০ জে

০　১　২´　৩
ক্ষ　গ -স
I সা সা -পা। পা পা -ক্ষা। গা -মা গঋা। ঋা ঋা সা } I
সু দূ ০　র ম ০　ন্দি ০ র ০　প ০ রে

০　১　২´　৩
I -া -া গা। গা পা ধা। ধা র্সা -নর্সর্রা। র্সা র্সা -া I
০ ০ এ　স এ স　শ্রা ন্তি ০ ০ ০　হ রা ০

০　১　২´　৩
I -া র্সা নর্সা। না -ধা ধা। ধা -না ধনর্সা। নধা পধপাঃ -ক্ষঃ } I
০ এ ০ স　শা ০ ন্তি　সু ০ প্তি ০ ০　ভ ০ ০ ০ রা ০

০　১　২´　৩
I গা গক্ষা -পা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষা গা -া I
এ স ০ ০　এ স ০　তু মি ০ ০ ০　এ স ০

০　১　২´　৩
I ক্ষা পা -ক্ষপনা। ধা পা -া। ক্ষপা গাঃ -ক্ষঃ। গক্ষা গক্ষপাঃ -ক্ষঃ II
এ স ০ ০ ০　তো মা র　০ ত রী ০　বে ০ য়ে ০ ০ ০

সুর-সহযোগে তালের বোল্।

০　১　২´　৩
I সা র্সর্রা র্সা। র্সা ণা ধা। মা পা ণধা। পমগা -গা ঋা I
I খুব তার নাম্। বেশ্ ধুম্ ধাম্। কয় দিন্ পরে। সকলি সুম্ সাম্ I
I ধিন্ ধিন্ ধা　ধা থুন্ না　ক ত্তে ধাগে তেটেকেটে ধিন্ ধা I

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিষ্টার জন ওয়ানামেকার (Mr. John Wanamaker—a cabinet officer of America) ভারতবর্ষে আগমন করিলে, লক্ষ্ণৌ-সহরে কলেজ-গৃহে তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তখন একখণ্ড খড়ি লইয়া বোর্ডে লিখিয়া দিলেন—

India Needs
Heads to think,
Hearts to feel,
Hands to work.

অর্থাৎ, ভারতবর্ষে এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি, হৃদয়বান্ ব্যক্তি এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির অভাব। তিনি নানাকথা-প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, নিজ-নিজ উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য *Infra dig*—ashamed to dig—অর্থাৎ মৃত্তিকা-খননে লজ্জা বোধ করিলে চলিবে না। 'There is no honest work that can degrade me'.—সাধুতার সহিত কার্য্য করিলে, আত্মোন্নতির জন্য যে কোন কার্য্যই করি, তাহাতে লজ্জা নাই।

বাঙ্গালা-দেশের উন্নতির জন্য বঙ্গের সন্তানগণকে খাটিতে হইবে। যেখানে ছোট ছোট-লোকেরা অগ্রসর হয় না, সেখানে ভদ্রসন্তানগণ নিজেরাই বনজঙ্গল কাটিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইবেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে-সকল উপায় গ্রহণ আবশ্যক, ভদ্রসন্তানেরা তাহা নিজ-হস্তে করিয়া দেখাইবেন ও ছোট-লোকদিগকে তাহা করিতে শিখাইবেন। গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে গ্রামের উন্নতির জন্য নিজে খাটিয়া সাধারণ লোককে উৎসাহিত করিতে হইবে।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি হইলে, বঙ্গের ম্যালেরিয়া চলিয়া গেলে, বাঙ্গালা-দেশ আবার সত্যই সোনার বাংলা হইবে। তখন তাহার সহিত শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতি আপনা হইতেই আসিবে।

বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা আবশ্যক।

১। প্রজাসত্ত্ব-বিষয়ক আইন।

কৃষকগণ যে জমী লইয়া চাষ-আবাদ করিবে, তাহাতে তাহাদের সত্ত্বসম্বন্ধে গোলযোগ থাকিলে, তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। একজন কৃষকের হয় ত ১০ বিঘা জমী আছে, কিন্তু সে অপর জমী ক্রয় করিয়া জোত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে, নানাপ্রকার গোলমালে পড়িয়া থাকে। কোন জমীদারের আম্‌লা ক্রেতার নিকট চৌথ চাহিবেন, কেহ কেহ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই চৌথ চাহিবেন, কেহ বা রসিদ ক্রেতার নামে দিবেন না, কেহবা পৃথক্ সেলামী চাহিবেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। একজন প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিসের নাম খারিজ করিতে কোন কোন জমিদারের আম্‌লাগন কতই ওজর-আপত্তি করিয়া থাকেন। কোন প্রজা উইল করিয়া গেলে, জমিদারের আম্‌লাদের অনেক স্থলে গোলমাল বাধাইবার একটা পন্থা হয়। এই প্রকার বিভ্রাট অনেক স্থলে দেখা যায়। আইন-আদালতে প্রজাকে কত সময় যাইতে হয় ও কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া মকদ্দমা

লইয়াই থাকিতে হয়! ইহা বাঙ্গালা-দেশে বিরল নহে।

প্রজাসত্ত্ব-সম্বন্ধে পরিষ্কার আইন না থাকিলে, কো-অপারেটিব সোসাইটির কার্য্যেও নানাপ্রকার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বেহার অঞ্চলের কো-অপারেটিব বিভাগের সরকারী রিপোর্টে (১৯১৩-১৪) এই বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে :—

"Another subject discussed at the conference was the importance from the co-operative point of view of settling once for all the question of transfer of occupancy right...... It was agreed that the leaving of this right to be governed by local custom has proved disastrous to both landlord and ryot alike, since it is responsible for a large proportion of agrariculitigation, which involves all classes whether they will or no."——

"কন্‌ফারেন্সে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, যাহাতে প্রজাসত্ত্ব বিক্রয়-সম্বন্ধে সকল প্রকার কথার একেবারে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে, স্থানীয় প্রথার উপর প্রজাসত্ত্ব বিক্রয়ের প্রশ্ন ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রজা এবং জমিদার উভয়ের পক্ষেই ভয়ানক কুফল ফলিয়াছে। কারণ, ইহার ফলে গ্রাম্য মকদ্দমা অধিক পরিমাণে হইয়াছে, যাহাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেককে জড়িত হইতে হইয়াছে।"

অতএব প্রজাসত্ত্ব-আইন-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন :—

(ক) প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিস বা যাহার নামে উইল হইয়াছে, কলেক-টরিতে দরখাস্ত দিলেই, জমিদার তাহার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(খ) প্রজাসত্ত্ব ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারিবে। জমিদার কেবলমাত্র খাজনার দ্বিগুন,—বা যেরূপ গবর্ণমেণ্ট উচিত মনে করেন,—সেলামী পাইবেন। এই ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কলেকটরিতে দরখাস্ত ও টাকা জমা দিলেই জমিদার ক্রেতার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(গ) কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের শস্য উভয়ই আইনের মধ্যে বাধ্য থাকিবে; তবে, জমি-দারের ও গবর্ণমেণ্টের পাওনার নিমিত্ত তাহা সর্ব্বপ্রথম বাধ্য বিবেচিত হইবে।

(ঘ) প্রজা নিজের জমি যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

নীরা।

(গল্প)

শরতের সন্ধ্যাগমের অনতিপূর্ব্বে নদী-তীরবর্ত্তী উদ্যানে দাঁড়াইয়া কিশোরী নীরা সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘের দিকে চাহিয়াছিল। আর সেই নবীনার নব-সৌন্দর্য্য-বিভাসিত অপূর্ব্ব মুখের দিকে চাহিয়া-ধীরেন তাহার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল।

কোমল স্নেহপূর্ণ-স্বরে ধীরেন আবার প্রশ্ন করিল, "বল নীরা!" নীরার উন্নত দৃষ্টি এবার নত হইয়া ভূমি-সংলগ্ন হইল। কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "তুমি ত সবই জান; নীরার হৃদয়ে যদি কেহ স্থান পায়, সে কেবল তুমি—"

ধীরেন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "নীরা! তোমার কথা শেষ কর।"

তখন নীরার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। সে সেই তৃণাশনে ধীরেনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "মার্জ্জনা কর, তোমার নীরাকে মার্জ্জনা কর।—তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি তুচ্ছ ধূলীকণা; তোমার চরণের রেণুরও যোগ্যা নহি, প্রভো! অবলাকে প্রলুব্ধ করিও না। আমি স্বর্গের দেবতাকে কোন্ প্রাণে ধূলার আসনে লুটাইব? আমি এ উন্মত্ত ভালবাসা চিরদিন বক্ষে লুকাইয়া জীবন কাটাইব। তুমি নীরাকে পরিত্যাগ কর—।" নীরার অশ্রুধারা কণ্ঠ-রোধ করিল।

ধীরেন সেই অবনত মুখ দুই হাতে তুলিয়া বক্ষে স্থাপন করিল; বস্ত্রে নীরার চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "নীরা, আমিও তো জগতে আর কিছু চাহি না; শুধু তোমারই আশায় জীবন ধরিয়া আছি! বল নীরা, তুমি আমারই—।"

ধীরে ধীরে নীরা ধীরেনের বক্ষ হইতে মুখ উঠাইয়া একটু সংযত হইয়া বসিল। পরে সেই শান্ত স্থির নীল চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা। কিন্তু তোমার বিবাহিত-পত্নীরূপে তুমি নীরাকে পাইবে না।"

বিস্মিত ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নীরা কহিল, "কেন! তুমি কি নীরাকে এতই হেয় মনে কর? তাহার এই ভালবাসা কি এতই নীচ, স্বার্থপরতাপূর্ণ মনে কর যে, সে নিজের সুখ-লালসায় তোমার সর্ব্বনাশ করিবে? মনে করিয়া দেখ, তুমি কে, আর আমি কে! তুমি রাজ্যেশ্বরের পুত্র, মাতাপিতা তোমারই মুখ চাহিয়া জগতে আছেন। তোমার সন্তানের উপর তোমার এই বিপুল বংশের সুখ-সম্মান নির্ভর করিবে। সেই তুমি যদি আজ অজ্ঞাতকুলশীলা মাতা-পিতৃহীনা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা নীরাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাও,—ভাবিয়া দেখ, সমাজ কোন্ থানে তোমায় স্থান দিবে! তোমার অবাধ-সুখময় গৃহের দ্বার চিরদিনের জন্য তোমার চক্ষে রুদ্ধ হইবে। তোমায় ভালবেসে নীরা শেষে রাক্ষসী সাজিবে!

বাধা দিয়া ধীরেন বলিল, "যাক্ নীরা, সব যাক্; আমি ত কিছুরই প্রত্যাশী নহি; কেবল তোমাকেই চাহি। পাষাণী, তোমার ভালবাসায় আমার ভালবাসায় অনেক তফাৎ। তুমি অনায়াসে আমাকে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য আমার প্রাণ কি আকুল বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! নীরা, কেন তোমায় দেখিয়াছিলাম—!"

নীরা বলিল, "সত্যই! কেন আমাদের দেখা হইয়াছিল, জানি না!"

তখন চন্দ্রদেব মাথার উপর অনেকখানি উঠিয়াছিলেন। নৈশ কুসুমকোরকগুলি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে-ছিল! বহুক্ষণ উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল!—সহসা কে ডাকিল, "নীরা!" চকিত

হইয়া নীরা উত্তর করিল, "যাই—।" গমনোদ্যতা নীরার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরেন বলিল, "কাল আবার দেখা দিবে?"

উত্তরে নীরা কহিল,"দেখ, আমাদের আর বেশী দেখা হওয়া কি ভাল? অবলার কতটুকু হৃদয়বল!—তাহাকে আর এরূপ করিয়া আঘাত করিও না।"

ধী। নীরা, জানি না, তুমি কি পাষাণে গঠিত! কিন্তু তুমি যাহাই হও, ধীরেন তোমারই।

নীরা চলিয়া গেল।

রাত্রে পিতার আহারের নিকট বসিয়া নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাদের বসন্তপুরের বাটী একেবারে কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে?"

পিতা কহিলেন, "কেন রে? সে খোঁজ তোর কেন আসিল?"

নী। কি জানি বাবা! এক জায়গায় ভাল লাগে না। দুই দিন কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে।

পিতা। গৃহাদি ভাঙ্গিলেই বা কি! মা আর ছেলেটী ব্যতীত আর ত কেহ নাই! ভিটের উপর একখানি কুটীর তুলিয়া কয়দিন কাটাইয়া আসিতে পারিব। কিন্তু সম্মুখে এমন নদীটি আর ফুলের বাগানটি ত আর নাই মা! স্নান করিয়া আসিয়াই বৃদ্ধ পুত্রের পূজার আয়োজন করিবে কিরূপে? তাহার উপর জমীদার-বাটীর বিবাহটা দেখিয়া যাইবে না?

নীরা কহিল, "ঐ বাবার যত ছুতা! বাবা! এখান হইতে এক পা নড়িতে চাহ না কেন, বল দেখি?"

মুষ্টিবদ্ধ আহারের গ্রাস হস্তে রাখিয়া, বৃদ্ধ একবার স্নেহভরা সজল চক্ষুদুইটি নীরার মুখের দিকে তুলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ মা! জগদম্বা এইস্থানে আবার নূতন করিয়া সংসার-বিরাগীর পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছেন কিনা! তাই এখানকার মায়ার টান বড় বেশী হইয়াছে! আচ্ছা মা, তোমায় লইয়া আমি একবার বসন্তপুর বেড়াইয়া আসিব।"

(২)

বৃদ্ধ কন্যাকে লইয়া বসন্তপুর যাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রাতঃকালেই যাত্রার কথা। গ্রামের মাধব ঘোষের গো-যান ঠিক্ করা হইয়াছে। ধীরেন ইহা শুনিতে পাইয়া অতিপ্রত্যুষে নীরার নিকট আসিয়া বলিল, "নীরা! এ কি!" ঈষৎ হাসিয়া নীরা উত্তর করিল, "কি হইয়াছে?"

ধী। কি হইয়াছে! যাওয়া হইতেছে কোথায়?

কৌতুকপূর্ণ চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখের দিকে ফিরাইয়া নীরা বলিল, "বসন্তপুর, বসন্তপুর!"

"নীরা, তুমিই সুখী! তোমার অন্য চিন্তা, অন্য সুখ আছে। হায়! আমিই শুধু অভাগা! জগতে আমারই আর কিছুই নাই!" এই বলিয়া অভিমানী ধীরেন দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। হাতের ফাঁক গলাইয়া অশ্রুজল বহিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া নীরা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "একটি কথা বলি; সত্য উত্তর দিবে?"

ধীরেন বলিল, "এতদিন পরে জানিলে কি আমি মিথ্যাবাদী!"

নীরা কহিল, "ভাবিলে ত বাঁচিতাম! তোমার এ কথার বাঁধনে আমায় শতপাকে আর জড়াইতে পারিতে না।"

ধী। তবে বল কি?

নীরা বলিল, "অমলার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় নাই কি?"

ধীরেন বলিল, "হইলেই বা? কে তাহাকে বিবাহ করিবে? আমার জগৎ একদিকে, আর তুমি নীরা,—তুমি একদিকে!"

সবিস্ময়ে নীরা বলিয়া উঠিল, "এ কি কথা!"

ধীরেনের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "ঠিক্ কথা নীরা! সব ত্যাগ করিয়া তোমায় গ্রহণ করিব।"

দৃপ্তা ফণিনীর মত নীরা বলিয়া উঠিল, "কখনই নহে! তুমি যাও! আমায় আর ডুবাইও না। নীরা কখনও তোমার স্ত্রী হইবে না।"

নীরা ফিরিত, কিন্তু উন্মত্ত ধীরেন তাহার পায়ের উপর যখন আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল, "নীরা! তুমিও বিমুখ হইলে!" হতভাগী তখন সেইস্থানে বসিয়া পড়িল ও অশ্রুসিক্ত মুখে ডাকিল, "উঠ উঠ।—নীরার তুমিই সর্ব্বস্ব।"

কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া নীরা ধীরেনের নিকট বসন্তপুর গমনের জন্য বিদায় লইল। কিন্তু দূরে আসিয়া এ কি কষ্ট! এ কি যাতনা! কিন্তু যাহাই হউক্ না, নীরা সকলই সহিয়া থাকিবে! ধীরেন তাহাকে ভুলুক্! ধীরেন কি তাহাকে ভুলিতে পারিবে? না।—কেন পারিবে না?—সে যে পুরুষ।

দারুণ মনঃকষ্টে দুইমাস কাটিয়া গেল। একদিন পিতা বলিলেন, "নীরা, আর ত মা, এখানে থাকা যায় না!" নীরা কহিল, "কেন বাবা?"

কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু সস্নেহ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা কন্যা বড় হইলে পিতার কন্যা-দায় হয়, তাহা ত তুমি জান!"

নীরা কিয়ৎক্ষণ লজ্জিতার ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমি জানিতাম আমার পিতার কন্যাই আছে, দায় নাই।"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল কোথাকার!"

নী। বাবা, একটা কথা বলিব?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "কি মা?"

নী। বাবা, তোমার মেয়ে ত অনেকদিন বড় হইয়াছে! আজ তোমার এত দায় হইল কিসে? আর তোমার যদি-বা দায় হইয়া থাকে, তোমার এ কুড়ানো মেয়ে লইতে লোকের তো দায় নাই!

বৃদ্ধ কহিলেন, "এতদিন ছিল না; এখন লোকেরও দায় হইবে।"

উৎসুক ভাবে নীরা পিতার মুখের প্রতি চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "শোন মা! আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, এই বসন্তপুরের ভিটায়, আমার সংসারের আপনার বলিতে যাহা কিছু, সকলই কালের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমি বাহির হইয়া পড়ি ও কেবল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। শেষে ধীরেনের পিতা তাঁহার গ্রামে আমাকে জমী দিয়া বাস করান। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিব ও অবশিষ্ট কাল তাঁহারই নামগুণ-গানে

কাটাইব, সংকল্প করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন মহামায়া তাঁহারই চরণের আশীর্ব্বাদের মত নদীগর্ভ হইতে তোমাকে তুলিয়া আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। মা! সে-কথা সকলই তোমায় বলিয়াছি। তুমি তখন দুই-বৎসরের অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা! জলে পাইয়াছিলাম বলিয়া 'নীরা' বলিয়া তোমাকে ডাকিতাম। প্রথম প্রথম তোমার মাতাপিতার অনেক সন্ধান করিয়া, শেষে হতাশ হইয়া তোমার প্রতিপালনে আমি মন দিয়াছিলাম। দিবারাত্র আমার মনে জাগিত—"যাহার কেহ নাই, তাহারই সব" হইবার জন্যই জগন্মাতা বালিকারূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন!"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিলে, নীরা বলিল, "এ-সব তো শুনিয়াছি বাবা!" বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ মা, এইবার শেষটুকু বলি। আজ ৪।৫ দিন হইল, সংবাদপত্রে তোমার মাতাপিতার সন্ধান পাইয়াছি!"

নীরার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল! আকুল আগ্রহে সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "শোন মা, অত অধীর হইও না; তাঁহারা ইহ-সংসারে নাই। তবে তাঁহাদের পরিচয় জানিয়াছি। নীরা, তুমি সৎকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমার পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তোমার জনক-জননী তোমাকে লইয়া যখন ত্রিবেণীতে নৌকা করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, তখন তুমিই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান! দৈবক্রমে নৌকা ডুবিয়া যায় ও আমার এই স্থলপদ্ম-মাকে আমি কুড়াইয়া পাই! তোমার জননীরও, বোধ হয়, তাহাতেই মৃত্যু হয়; কেন না, তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার পিতা অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া কর্ম্মস্থানে যান ও তোমাদের সন্ধান করেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি অগাধ সম্পত্তি ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। যদি প্রথমা স্ত্রী বা কন্যা জীবিতা থাকে, এই ভাবিয়া তোমাদের জন্য ও তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তোমার সেই বৈমাত্র্য ভ্রাতাই এখন তোমার সন্ধানে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন।"

নীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কাজ কি পিতা, আর সম্পত্তিতে! পিতার অভাব আমার নাই; তবে যদি মাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বা আবার পুরাতন সম্পর্ক ধরিয়া লইতাম। যখন সে সবই গিয়াছে, তখন আমরা যাহা আছি তাহাই ভাল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহাও কি হয় মা! আমি আর কয় দিন! নীরা! তোমায় উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া সুখী দেখিলেই, আমি নিশ্চিন্তে শ্রীহরির চরণে আশ্রয় লইতে পারিব।"

এইবার নীরার চক্ষে জল আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধ কন্যার মস্তকের উপর সন্তর্পণে হাত রাখিয়া বলিলেন, "মা! একটি কথা বলি, লজ্জা করিও না; যথার্থ উত্তর দাও। মা, আমি অনেক দিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে, তুমি ও ধীরেন পরস্পরের প্রতি অনুরাগী। এটী কি যথার্থ?"

নীরা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখ মাটির দিকে নত হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মা, সে অতিশয় অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া, আমি দেখিয়া শুনিয়াও উদাসীন ছিলাম; কিন্তু এখন তোমার যাহা পরিচয় জানিয়াছি, তাহাতে তুমি জমীদার-বধূর অযোগ্যা নও! কিন্তু মা! বিধাতার অন্য ইচ্ছা! ধীরেনের সহিত রজনীর কন্যা অমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে; আর এক পক্ষ পরেই বিবাহ হইবে।

কন্যাকে আরও কাছে টানিয়া তিনি বলিলেন, "মা! তোমার মূর্খ পিতার যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তোমায় শিক্ষা দিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। দেখ মা, তুমি যদি ধীরেনকেই পতি ভাবিয়া থাক,—এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পুত্রের তুমি তাপসী মা—সুতরাং, ইহাতে ভোগের কামনায় তোমার পবিত্র প্রাণ নিশ্চয়ই কাতর হইবে না!"

নীরা তখন মনে মনে বলিল, "তাহাই বল পিতঃ, যেন তোমার উপযুক্ত কন্যা হইতে পারি।'

(৩)

নীরা যখন পিতার সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন জমীদার-বাটীর বিবাহের গোল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। বধূর রূপ, গুণ ও অলঙ্কারের কথা এবং আহারের পারিপাট্যের বর্ণনা লোকের মুখে মুখে চলিতেছিল মাত্র। নীরা ভাবিল, "বাঁচিলাম! ধীরেনের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। অমন পত্নী পাইয়া ধীরেন নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছে। একটু হাসিয়া সে ভাবিল, ধীরেন এই প্রেমের এত গর্ব্ব করিত!

পরদিন তখনও জগতে ভাল করিয়া আলোক ফুটিয়া উঠে নাই! প্রভাত গগনে উষার নবীন আভা ধীরে-ধীরে দেখা দিতেছিল! সুশীতল বায়ু তড়াগ-সলিলে বীচিমালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে তালে-তালে নাচাইতেছিল! দুরন্ত বালকের দলের মত পাখীর ঝাঁক আকাশ-গাত্রে উড়িয়া উড়িয়া গান গাহিতেছিল! নীরা স্নান করিয়া কূলে উঠিয়াই দেখিতে পাইল, কে যেন তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ভাল করিয়া দেখিতেই নীরার বক্ষের রক্ত জল হইয়া গেল। সেখান হইতে সে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না; মাটির দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল।

ধীরেন নিকটে আসিয়া ডাকিল, "নীরা! এতদিনে ফিরিলে! কি পাষাণী তুমি! একবার মুখ তোল, নীরা! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

নীরার প্রথমে বাক্য সরিল না; ধীরেনের সেই আকুল-বাণী তাহার অবোধ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরেই সে সচেতন হইয়া উঠিল। নিম্নদৃষ্টি ধীরেনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "তুমি এখানে কেন? আমাকে দেখিতে আসিয়াছ! তোমার পরিণীতা পত্নীকে গৃহে ফেলিয়া তস্করের মত পর-নারীর অনুসরণ করিতেছ! পথ দাও, আমি গৃহে যাই।"

বিস্মিত ব্যথিত ধীরেন ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "ভুল! ওঃ—কি ভুল বুঝিয়াছি! নীরা আমায় ভালবাসে! নীরা, প্রেম কি যদি জানিতে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহাকেও হৃদয় সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আজ আমায় এরূপ করিয়া দূর করিতে পারিতে

না,—সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের আজ্ঞায়! তাহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন তাহাও তাহারই আজ্ঞায়! কিন্তু এ উত্তাল হৃদয়াবেগ সংযত করিব কাহার আজ্ঞায়? প্রেমের এ মন্দাকিনীর বেগের নিকট সংসারের সকল শক্তি যে ভাসিয়া যায়, নীরা! নীরা, একবার চক্ষের দেখা, তাহাও দিবে না?"

হায়! অভাগীর বুকের ভিতর রুদ্ধ রোদন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল! মৃদুস্বরে অনেক কষ্টে কণ্ঠ খুলিয়া নীরা উত্তর দিল, "না—।"

ধী। আচ্ছা, তাহাই ভাল! কিন্তু নীরা, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখনই এমন হইলে? না, চিরকালই এইরূপ ছিলে? আমি কি নিজের স্বপ্নের প্রমাদে বিভোর হইয়া তোমায় প্রেমের রাণীরূপে দেখিয়াছিলাম? বল, নীরা, একদিনও কি তুমি আমায় ভালবাস নাই?

কত সহে! অবলার দুর্ব্বল হৃদয়ে কত সহে! নীরা আর পারিল না। ধীরেনের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "ক্ষমা কর, ধীরেন! ক্ষমা কর! প্রেম উত্তাল নহে, প্রেম অসংযত নহে, প্রেম ক্ষণভঙ্গুর নহে! তুমি অমলাকে বিবাহ করিয়াছ; তাহাকে লইয়া চির-সুখী হও! কিন্তু আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে তুমি সরিয়া না যাইলে, আমার কি হইবে! আমাকে আর প্রলোভন দেখাইও না। তোমারই চরণ সাধনা করিয়া আমায় জীবন কাটাইতে দাও; প্রেমের অমর্য্যাদা করিতে দিও না!—আমার ভালবাসায় তোমার সংসার যেন বিষ না হয়!" নীরার চক্ষে অশ্রুধারার পর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ধী। তাহাই হইবে নীরা! হতভাগ্য ধীরেন আর তোমায় দেখা দিবে না। কিন্তু হয় ত, দিনান্তে একবারও সে গোপনে তোমার অজ্ঞাতে তোমায় দেখিয়া যাইবে! নীরা, তাহাতে বঞ্চিত করিলে, ধীরেন আর বাঁচিবে না।

(৪)

সেই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন কুটিরের দ্বারে একদিন কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল। নীরার বৃদ্ধপালক সংসারের কাছে সকল হিসাব চুকাইয়া অনন্তপথে যাত্রা করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে পদতলে আসীনা রোদনরতা কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা, মানুষ কখনই আশ্রয়হীন একাকী হয় না! সেই অসহায়ের সহায় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষক আছেন। মা, তাঁহার নাম-গানে কখনই বিরত হইও না। যদি কখনও আত্মীয়ের আশ্রয়ের আবশ্যকতা হয়, তোমার ভাই আছেন, সেখানে যাইও। রামচরণ রহিল, বাল্যে যে তোমায় বক্ষে করিয়া পালন করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্তে ইহার উপর নির্ভর করিতে পার।"

কিন্তু সকল কথা জানিলেও মন মানে কই? সেই চিরস্নেহময় চিরাশ্রয় পিতার অভাবে আজ জগৎ যেন নীরার শূন্য অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল! যে চিরদিন নির্ভরশীলতায় দিন কাটাইয়াছে, আজ ভীতিপ্রদ সংসারের উত্তপ্ত বালুকাতে সে কি করিয়া দেহ-প্রাণ রক্ষা করিবে! হায়! অভাগিনী নীরা আজ কাহার মুখে চাহিবে! শূন্যগৃহে শূন্য হৃদয় লইয়া ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া যখন নীরা কাঁদিতেছিল, তখন একখানি স্নেহকোমল হস্ত ধীরে ধীরে নীরার ললাট স্পর্শ করিল। সে স্পর্শ কি মধুর,—কি স্নেহময়! নীরার এত যে দুঃখ,এত

যে কষ্ট, সব যেন সেই স্পর্শের মধ্যে লুকাইতে চাহিল! ধীরেন ডাকিল,- "নীরা!" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে তাহা বাধিয়া গেল। সে-দিন নীরা ধীরেনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ধীরেনের পদযুগলের ভিতর মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! হায়! এ চরণ-দুইটি যে নিরাশ্রয়ার মহান্ আশ্রয়! ইহা তাহার যে চির-ঈপ্সিত স্বর্গ! আজ কি নীরা এ চরণ ছাড়িতে পারে!!

ধীরেন ধীরে ধীরে বলিল, "নীরা, এইবার আমাদের গৃহে চল। এখানে একাকিনী কি করিয়া থাকিবে?"

নীরা অসম্মত হইয়া বলিল, "তাহা হইতে পারে না! পিতার এই আশ্রমটুকুতে পড়িয়াই দিন কাটাইব।"

ধী। নীরা! এখন তুমি একাকিনী! তাহার উপর তুমি স্ত্রীলোক! তোমার পিতার যাহা আছে, তাহাতে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে সত্য! কিন্তু আমি দাস-দাসী রাখিয়া দিই; নতুবা তোমায় দেখিবে কে?

নীরা মৃদুস্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না। আমার কিছুরই আবশ্যকতা নাই। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি সন্ন্যাসিনী! কিন্তু তথাপি দেখ, মন কি দুর্দ্দমনীয়! আজ তোমায় দেখিয়া আর মনকে বাঁধিতে পারিলাম না। তুমি আমাকে বিস্মৃত হও, নতুবা সংসারে সুখ পাইবে না; সুখদুঃখে যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছ, তাহারও প্রতি অন্যায় করিবে! আমাকেও তোমায় ভুলিতে দাও; আর আমার কাছে আসিও না! দেখ, এ হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! তুমি বড় লোভনীয় বস্তু! এ হতভাগ্যা নারীর সর্ব্বনাশ করিও না।" ধীরেন নীরবে চলিয়া গেল।

হায়, দারুণ দর্প কোথায় রহিল! নীরা যে আর পারে না। এখন দারুণ শোকে ও দুঃখে নীরার সেই দুঃখহারী মুখটী সম্মুখে যে জাগিয়া উঠে! যখন পিতার সঙ্গহীনতায় প্রাণ আকুল হয়, তখনই ধীরেনের সঙ্গ পাইবার জন্য তাহার ক্ষুধিত প্রাণ যে হাহাকার করিয়া উঠে! একবার সেই মুখখানি দেখিলে যেন নীরার সকল যাতনার শান্তি হয়! কিন্তু সে কেমন করিয়া তাহা হইতে দেয়? ধীরেনের সাধের সংসারে কি নীরা আগুন লাগাইবে! কিছুতেই না! তাহার এ নারীজীবন পণ করিয়া সে সংগ্রাম করিবে।

নাঃ! আর চলে না! শেষে কি নীরা পাগল হইয়া যাইবে? সে রামচরণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিল, সে গ্রাম ছাড়িয়া তাহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইবে; রামচরণ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

(৫)

নীরা তাহার ভ্রাতার নিকট আসিল। তখনও গৃহে বধূ-সমাগম হয় নাই; সুতরাং, গৃহস্থলীর কাজ অনেক। সংসারটা যখন গোছান-গাছান একরকম হইল, তখন সে ভ্রাতার বিবাহের তাগাদা আরম্ভ করিল। ছোট্ট ভাই!—কি মিষ্ট জিনিস! নীরার যে বুক কেবলই খাঁ খাঁ করিত, ভ্রাতৃস্নেহে আজ নীরা তাহাতে অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তি আস্বাদন করিল! শৈশবে মাতৃহীন, অধুনা পিতৃহীন ললিতও এই ভগিনীর স্নেহনীড়ে ধরা দিল।

হায়! স্নেহাতুর প্রাণ যে কেবলই আশ্র-

চাহে! যখন গৃহকার্য্যে অবকাশ পাইত, তখনই নীরা বাটীর নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়টিতে গিয়া বসিত। সময় সময় সে বালিকাদিগকে শ্লোক শিখাইত। কখনও বা আবশ্যক হইলে, কোনও শিক্ষয়িত্রী নীরার উপর ভার দিয়া দুই দিন ছুটি লইতেন। কর্ম্মহীন জীবন অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই! এখন নানা-কর্ম্মের মধ্যে নীরা নিঃশ্বাস ফেলিল।

একবৎসর পরে গৃহে নববধূ আসিলে নীরার কাজ আরও বাড়িল। এইবার নীরা নিশ্চিন্ত হইল; ধীরেনকে, বুঝি, সে ভুলিতে পারিবে।

এইভাবে ক্রমে চারি বৎসর কাটিয়া গেলে ধীরে ধীরে নীরার হৃদয়ে আবার মেঘ দেখা দিতে লাগিল। এই স্নেহময় ভ্রাতৃগৃহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অনন্ত ভালবাসা নীরার অন্তরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল। সকল হৃদয় ব্যস্ত করিয়া শুধু একখানি মুখ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে মুখে যেন অনন্ত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—করুণ চক্ষু-দুইটি যেন অশ্রুতে ছল্-ছল্ করিয়া নীরারই পথ চাহিয়া আছে! নীরার শ্রবণে অবিরত বাজিতে লাগিল, যেন কে ডাকিতেছে—"ফিরে এস নীরা, একবার ফিরে এস! পাষাণী—একবার দেখা দিয়া যাও।"

নীরা প্রথম প্রথম মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নদীতে যখন জোয়ারের বেগ আসিতে থাকে, মানুষের শত চেষ্টায় কি তাহা রোধ করা যায়? নীরার সুপ্ত প্রেম দিনে দিনে প্রবল হইয়া ঠিতে লাগিল। শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য নীরার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। একদিন ললিতকে ডাকিয়া নীরা বলিল, "আমায় একটী লোক ঠিক্ করিয়া দাও, আমি একবার হরিনাথপুর যাইব।" ললিল বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেই পোড়ো ঘরে যাইবার জন্য আবার সাধ হইল কেন, দিদি?"

নী। ললিত, পোড়ো হো'ক, আর যাই হোক্, তাহার মায়া কি আমি ছাড়িতে পারি? আমার মন ভারি চঞ্চল হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া কিছুতেই মনকে বুঝাইতে না পারিয়া তবে তোমাকে বলেতিছি।

ল। একান্তই যাইবে?

নী। হাঁ ভাই!

ল। শীঘ্র ফিরিবে তো?

নীরার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "ললিত, অভাগীর আর কে আছে? তোমাদের ছেড়ে কতদিন থাকিব?"

(৬)

নীরা পূর্ব্বগৃহে ফিরিয়া দেখিল, সত্যই তাহা পতনোন্মুখ। তাহার পিতার স্বহস্ত রোপিত পুষ্পোদ্যান কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কেবল কল-নাদিনী স্রোতস্বিনী তেমনই বহিয়া যাইতেছে!

নীরা প্রথমেই রামচরণকে ডাকিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে জমীদার-বাটীর সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

যথাযথ উত্তর দিয়া রামচরণ কহিল, "দিদি জমীদার-বাটীর সংবাদ আর কি বলিব! কর্ত্তা ও গৃহিণী স্বর্গে যাইবার পর মা লক্ষ্মীর কি কুদৃষ্টি যে পড়িয়াছে, জানি না!"—

নী। কেন রে? কি হইল?

রা। ধীরেনবাবুর দুরবস্থার শেষ নাই! আজ ছয়মাস হইল বিসূচিকায় তাঁহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীটী মারা গিয়াছেন।

নীরার প্রাণ যথার্থই কাঁদিয়া উঠিল। সে বিস্ময়-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—"এঁ্যা! বলিস্ কি!"

রামচরণ কহিল, "শুধু তাহা নহে! সেই কষ্টের উপর আজ দুই মাস হইল, ধীরেনবাবুর শয়নগৃহের চারিদিকে এমনভাবে আগুন ধরে যে, তাঁহার বহির্গত হইবার পথ থাকে না। তিনি জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়েন।"

রুদ্ধশ্বাসে নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ষা পাইয়াছেন তো?"

রা। যে-ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

নীরার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না; সে কেবল ব্যাকুল দৃষ্টিতে রামচরণের মুখের দিকে চাহিল!

রামচরণ কহিতে লাগিল, "এত কষ্ট করিয়াও আগুনের হাত এড়াইতে পারিলেন না। যেখানে লাফাইয়া পড়েন, তখন সেখানে খুব আগুন। তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হয় ও তিনি অজ্ঞান হন। তখন পাঁচ-জন গিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসে। এখনও পোড়া ঘায়ে তিনি শয্যাগত আছেন। ডান-পাখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার উপর দেখিবার শুনিবার লোক কেহ নাই। সেই-বংশের দুলাল আজ কত কষ্ট পাইতেছে, ভাবিলে আমাদেরই চক্ষে জল আসে!"

নীরা আর কথা কহিতে পারিল না। বর্ষার নব মেঘমালা সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীরার সুবিশাল সুনীল চক্ষুতারকা-দুইটীতে, আকাশভ্রমে বুঝি, নামিয়া আসিতে-ছিল! সহসা নীরার নয়ন হইতে তুষারপাতের ন্যায় দুই-চারিবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে অশ্রুবৃষ্টি আরম্ভ হইল। নীরা বুঝিল, আজ কয়মাস হইতে কেন তাহার মন এমন করিয়া তাহাকে আক-র্ষণ করিতেছিল!

বাহিরের আকাশে তখন ঘনঘটা। পৃথি-বীতে গাঢ় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছিল। পথঘাট শূন্যময়;—দেখিবার উপায় নাই। মুষলধারায় বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া বারিধারার মধ্য দিয়া ক্ষণপ্রভার মন্দ আলোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া অস্থিরপ্রভার ন্যায়ই নীরা ত্বরিত চরণে জমীদার বাটীতে উপস্থিত হইল।

অতিধীর-পাদবিক্ষেপে সে ধীরেনের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ধীরেন রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। ধীরেনের চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে নীরাকে দেখিতে পাইল না। সন্তর্পনে নীরা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুনিল, শুষ্ককণ্ঠে ধীরেন কহিতেছে, "উঃ মাগো! বড় তৃষ্ণা!"

নীরা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে ধীরেনের শুষ্ক জিহ্বায় তাহা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "এই যে দুধ! খাও দেখি!" চমকিত হইয়া ধীরেন চক্ষু মেলিল। সম্মুখে কেহই নাই। নীরা তখন শয্যানিম্নে বসিয়া গ্রাসে দুধ ঢালিতেছিল। ধীরেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শেষে পাগলও হইব! হা ভগবন্! সত্যই যদি এ সময় এক-বার তাহাকে দেখিতাম! উঃ বড় তৃষ্ণা! কে আছ?" কম্পিতকণ্ঠে নীরা পুনরায় বলিল, "দুধ খাও!" ধীরেনের এবার চোখে জল আসিল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "কেন এ কষ্টের উপর কষ্ট দাও, ঠাকুর! এ কি

তাহাকে ভালবাসারই প্রায়শ্চিত্ত! উঃ! কে তুমি দুধ আমায় দাও?"

নীরা ধীরে ধীরে গ্লাসটী মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "খাও।" কথা কহিতে তখনও নীরার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া দিলে ধীরেন মুদিত চক্ষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? নীরাও কি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে! আজ কি তাহারই আত্মা আমায় দেখিতে আসিয়াছ? দেখিতে আসিয়াছ কি যে, এই দেহের যন্ত্রণার উপর ব্যর্থ প্রেম কি করিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে! দেখিতে আসিয়াছ কি, আজ সব বিসর্জ্জন দিয়াও কি করিয়া তোমার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া দগ্ধ হইতেছি! জীবনে পাষাণী ছিলে, মরণেও কি সে রীতি ছাড় নাই?"

তখন ধারার উপর ধারা আসিয়া নীরার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল। শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে ধীরেনের ক্লিষ্ট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া অতিধীরে তাহাতে নিজের স্ফুরিত অধর স্পর্শ করিল।

তখন ধীরেন চোখ খুলিয়া নীরার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে সে অতি-তৃপ্তির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যতই নিষ্ঠুর হও নীরা, কিন্তু তোমার স্মৃতি বড় মধুর! তোমার প্রকৃতি বড় সুন্দর! আঃ!—দেখ, আমার বুকের জ্বালা আজ কত নিভিয়া আসিয়াছে! কিন্তু তুমি না আসিলেই ভাল করিতে। আবার যখন চলিয়া যাইবে, তখন সে জ্বালা যে আরও বেশী হইবে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে নীরা বলিল, "কোথা যাইব! ওই চরণ ছাড়া নীরার জগতে স্থান আর কোথায়!"

ধীরেন কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে নীরার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; শেষে নিজ-মনে অতি-মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "নীরা আমায় সত্যই ভালবাসে।"

নীরা কোমল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মাথায় একটু বাতাস দিই? ঘুম আসিবে কি?"

ধী। আঃ! আজ একটু তৃপ্তিতে ঘুমাইব।

আহার-নিদ্রা-পরিত্যক্তা নীরার অক্লান্ত সেবা সার্থক হইল। ধীরেন সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দক্ষিণ পদটি খঞ্জ হইয়া গেল। নীরার সাহায্য লইয়া সে একটু একটু বেড়াইতে লাগিল। একদিন প্রদোষকালে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে নীরা বলিল, "একটি কথা আছে।" ধীরেন ভীতভাবে নীরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলিবে?—যাওয়ার কথা নাকি?"

নী। না। থাকিবারই কথা।

ধীরেন বিস্ময়ানন্দে নীরার মুখের দিকে চাহিলে, নীরা বলিল, "যদি চিরদিনের জন্য চরণে স্থান দাও! তাহা না হইলে, এভাবে তো শুধু থাকা যায় না!"

হাসিয়া ধীরেন উত্তর করিল, "ওঃ, বুঝিয়াছি। পুরোহিত আহ্বান?"

নীরা লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিল।

ধীরেন আবার কহিল, "যখন সাধিয়াছিলাম তখন গুমোর হইয়াছিল। এখন এই আগুনে পোড়া খোঁড়াকে, বুঝি, বড় পছন্দ হইল?"

নীরা হাসিয়া উত্তর দিল, "সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে নিয়েছি; এইবার হার করে বক্ষে ধারণ করব।"

শ্রীননীবালা দেবী।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী।

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল, তুমি মহীয়ান্,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ!
লোকে বলে সূর্য্যমুখী সূর্য্য-সোহাগিনী;
তারা ত জানে না মম গোপন-কাহিনী!
কি মোহ-মন্ত্রের বলে আমার জীবন চলে,
আমায় চালায় কোন্ শক্তি সঞ্জীবনী,—
পরে কি বুঝিবে, আমি নিজে যা' বুঝি নি!

আমি ক্ষুদ্র অণুকণা, তুমি প্রভাকর!
তোমাতে আমাতে প্রভু, অনেক অন্তর!
বহু ঊর্দ্ধে বহুদূরে তুমি থাক সুরপুরে,
আমি ফুটি ক্ষুদ্র ফুল মাটির উপর!

অতৃপ্ত তৃষিত আঁখি, সারাবেলা চেয়ে থাকি,
তবুত মেটে না তৃষা;—বিরহে তোমার
জগৎ আমার চোখে শূন্য অন্ধকার!
তুমি রবি, অর্দ্ধ-প্রাণ বিশ্ব-জগতের;
তোমার করুণা মাগি দিবস রয়েছে জাগি,
ব্রহ্মাণ্ড হিসাব রাখে উদয়-অস্তের!

হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়, বুঝিবে কি তুমি—
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি!
সাধকে কি সিদ্ধি-তরে ইষ্টদেবে পূজা করে?
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় না-ক তার?—
চির-সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার!
জান না আমায় তুমি, জানাতে না চাই;
আমি যেন যুগেযুগে এই সুখই পাই!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৭

শীলা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল; শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিবার কক্ষে আসিতে লাগিল। সুব্রত তখনও সেই হোটেল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন ডাক্তার-সাহেব বলিলেন যে আর কোনও ভয় নাই, তখন সুপ্রকাশ গাড়ী 'রিজার্ভ' করিবার জন্য লিখিলেন! শীলা দুই-একটি কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিত, কিন্তু সুপ্রকাশ তাহাকে তাহা করিতে দিতেন না। সুব্রতও আর সুপ্রকাশের বসিবার কক্ষে আসিতেন না; সুপ্রকাশই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতেন। যাত্রার দিবস পূর্ব্বাহ্নে, শীলা একখানি আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়াছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "শীলা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান!"

শীলা বলিল, "কে?"

সুপ্রকাশ। সুব্রত এখানেই আছেন। আমার সঙ্গে প্রত্যহই তাঁর দেখা হয়। তিনি আজ চলে যাবেন। তাই দেখা করতে চান্। তোমার অসুখের সময় তিনি যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন। সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাক্‌তেন।

শীলা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল ; তাহার পর বলিল, "তবে কি সুব্রত বসুর সঙ্গে আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল ? তিনি যে তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন ! আমি ভেবেছিলুম সে-সব স্বপ্ন ; তাই তোমায় কিছু বলি নি।"

সুপ্রকাশ। সেই সব কথার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা কোরে ক্ষমা চাইবেন ; তাই দেখা কর্‌তে চান্‌।

শীলা কাতর দৃষ্টিতে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আবার এসে ত কিছু বল্‌বেন না ! আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বাহিরে গিয়া সুব্রতকে ডাকিলেন। সুব্রত ও শৈলেন উভয়েই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুব্রত শীলার সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন্‌। আমি অনর্থক মিঃ রায়ের নামে কতকগুলি অপবাদের কথা বলে, আপ্‌নার কাছে বিশেষভাবে দোষী হয়িছি। আমি যা বলেছিলাম সবই অন্যায় বলিছি ; না জেনে অপরাধ করিছি। ক্ষমা করুন্‌।"

শীলা ব্যাকুলনেত্রে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য ! মিঃ বসু কি আমায় এসে বলেছিলেন যে, তোমার নামে 'কেস্‌' হয়েছিল ? তুমি মিসেস্‌ দাসকে—?"

শীলার কথার শেষ না হইতেই শৈলেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দার নামে 'কেস' হয় নি ; 'কেস' আমার নামেই হয়। মিসেস্‌ দাস বাইরে আছেন, তাঁর সাম্‌নেই সব বল্‌ছি শুন্‌বেন্‌।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "না না ; তাঁকে আর ডাকবেন না।"

সুপ্রকাশ। শীলা, ডাক্‌তে দাও। এতে ভালই হ'বে !

শৈলেন বাহিরে গিয়া মিসেস্‌ দাসকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। শীলা দেখিল, তাহার মাতার সমবয়স্কা পক্বকেশা আরব্ধ-বার্দ্ধক্যা ঘোরতরকৃষ্ণবর্ণা একটী রমণী অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শৈলেন পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শীলাকে দেখাইয়া মিসেস্‌ দাসকে বলিলেন, "—মিসেস্‌ রায় !"

মিসেস্‌ দাস সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া করজোড়ে শীলাকে প্রণাম করিলেন। শীলা এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে বসিতে বলিতে ভুলিয়া গেল। শৈলেন তাঁহাকে একখানি বেত্রাসনে বসিতে বলিয়া, শীলাকে বলিলেন, "বৌদি ! ইনিই মিসেস্‌ দাস।" তাহার পর পূর্ব্বাপর সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়া শৈলেন আপনার প্রিয়তমা পত্নী সুষমার বিচিত্র সন্দিগ্ধতার বিবরণ, এবং এই সন্দিগ্ধতা-হেতু তাহার নিকট এই সকল ব্যাপার গোপন করিয়া রাখিবার জন্য মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জির উপদেশ, অল্পবয়স্ক শিশুটীর মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখপূর্ণ সাংসারিক অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শীলা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, আপ্‌নার আর বল্‌তে হবে না। এ কথার আর আবশ্যকতা নাই।" তাহার পর মিসেস্‌ দাসকে সে বলিল, "আপ্‌নি বসুন ! দাঁড়িয়ে কেন ?"

শীলার নিকটে যাইয়া, শীলাকে নমস্কার করিয়া মিসেস্‌ দাস বলিলেন, "আপ্‌নার স্বামীর দয়াতেই বেঁচে আছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ থেকে এদেশেই আছেন। আমি এখানেই

হাঁসপাতালে কাজ করতাম। সেই ঘটনার পর আমার কাজ গিয়েছে। আপনার স্বামী দয়া করে মাসে মাসে যে কুড়িটি টাকা দেন, আর আমি একটু আধটু যা কাজ পাই, তাতেই কোন রকমে চল্‌ছে। আমার মা চলচ্ছক্তি-রহিত। আমার দু'টি সন্তান; তাদের একটি কালা-বোবা; আর একটী খঞ্জ, চলিতে পারে না। আমি যে কি-ভাবে জীবন কাটাই, তা জগদীশ্বরই জানেন্! আপনাদের দয়া না হ'লে আমার বাঁচ্‌বার, বোধ হয়, কোনও উপায় ছিল না!"

মিসেস্ দাসের কথা শুনিয়া শীলার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। শীলা তাঁহাকে পুনরায় বসিতে বলিল।

সুপ্রকাশ এইবার শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সকলকার জন্যে চা আন্‌তে বলি?—সুব্রত আজই চলে যাবেন।"

স্বামীর সহিত সুব্রতর এরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল! সুপ্রকাশ বেহারাকে ডাকিলেন ও মিসেস্ দাসকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শৈলেন নতমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি চাহিয়া শীলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটুও ছায়া যেন শীলার ভাল লাগিতেছিল না। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বাঁচিয়া থাকা, কি ভীষণ অবস্থা!—তাহা ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল! সহসা শীলার দৃষ্টির সহিত সুপ্রকাশের দৃষ্টি মিলিত হইল। শীলা সেই দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ দেখিল! সে-মুখে শুধু উদারতা ও প্রসন্নতা বিরাজিত রহিয়াছে! এই স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস! শীলার আপনাকে কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল!

বেহারা চা-পানের দ্রব্যাদি আনিলে, শীলা মিসেস্ দাসকে চা দিতে গেল। তিনি লইলেন না; বলিলেন "আমায় ক্ষমা কোর্ব্বেন; আমি চা খাই না।" তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়া তিনি স্বগৃহাভি-মুখে চলিয়া গেলেন।

শৈলেন ও সুব্রত চা পান করিলেন। সুব্রত তখনি যাইবেন। তিনি শীলাকে বলিলেন, "আবার কটকে দেখা হ'বে। আপ্‌নারা ত লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন্? আমি কটকেই 'প্রাক্‌টিস্' কোর্ব্বো স্থির করিছি। আশা করি, আপ্‌নি আমার অপরাধ সব মাপ্ কোরে আমাকে নিজের ভাই বলেই মনে কোর্ব্বেন।"

যাঁহার প্রতি শীলার মনের ভাব অন্য-প্রকার ছিল, আজ তাঁহারই কথায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া গেল! শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপ্‌নার মাকে, বৌদিদিকে আমার নমস্কার দেবেন। আপ্‌নার বৌদিদিকে বল্‌বেন যে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে সুখী হ'ব। তিনি আমাকে বোনের মত ভাল বাসেন, বলেছিলেন। যেন এইবার তা স্মরণ কোরে, আবার সেই-ভাবেই দেখেন্!"

সুব্রত। বৌদিদি নিজেই ব্যস্ত হবেন! আপ্‌নার কথা তিনি বাটীতে প্রায়ই বলেন। আপ্‌নাদের দেখা-সাক্ষাতে আর কোন বাধা থাক্‌বে না। মাসীমারাও সেইখানে আছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে যান।"

শীলা। রমা কোথায়?

সুব্রত। (নতমুখে) তিনিও সেইখানে আছেন।

দুই-একটী কথার পর সুব্রত শীলার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া দেওয়া হইল। শৈলেন ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইবেন; সুতরাং তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন। সুব্রত যাইবার সময় সুপ্রকাশের কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে কত রকমে কষ্ট দিলাম! ক্ষমা কোর্ব্বেন। ছোট ভাই বোলে—!" তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

সুপ্রকাশ তাঁহাকে বলিলেন, "আবার শীগ্‌গিরই দেখা হবে।" সুব্রত ম্লানমুখে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কানুর দীঘি।

(ভূমিকা)

এ দীঘি পটীয়া-থানার অন্তঃপাতী হাওলা-গ্রামের উপকণ্ঠে বাগচরা-মাঠের উত্তর-প্রান্তে অবস্থিত। প্রকৃতির বিলাস-ভূমি চট্টলার ইহা এক বিখ্যাত, বিশাল ও অতিপ্রাচীন দীঘি। ইহার আয়ু কত বৎসর তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। আমাদের এ বিস্তীর্ণ জনপদে "কানুর দীঘি"-নামেই ইহার সুপ্রকাশ। গ্রামের নবতি বৎসর:প্রাপ্ত স্থবিরতম পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম—এক কৃষ্ণকানু ইহার জন্মদাতা। সন্দেহ-ভঞ্জন-মানসে কানুবংশীয়া বর্ষীয়সী এক ভদ্রমহিলাকে এ-সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলেন, তাঁহাদের বংশের জনৈক আদিপুরুষ পীতাম্বর কানু ইহা খনন করিয়াছেন। পীতাম্বর কানুই হউন, আর কৃষ্ণ কানুই হউন, সে কানু একটী বই দুইটী ছিলেন না; এবং ইহা কানুরই উপযুক্ত বটে। কালিন্দীর মতন ইহারও জল গাঢ় কৃষ্ণ। কালিন্দী হইতে নিমজ্জিত কৃষ্ণকে লইয়া যেমন ব্রজাঙ্গনাগণ পুলকে ব্রজে গিয়াছিলেন, তেমনি কানুর দীঘি হইতেও কৃষ্ণ সলিল লইয়া গৃহলক্ষ্মীগণ পরমানন্দে গৃহে যান। সময়ে সময়ে কালিন্দী-তীর কালার মোহন মুরলীতানে মুখরিত হইত; সময় সময় কানুর দীঘিও কালার প্রাণ-মাতান কুহুতানে ঝঙ্কৃত হয়। কালিন্দীর আশে পাশে ব্রজের মাঠে মাঠে যেমন গোপাল চরিত ও সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালকেরা বিহার করিত, তেমনি কানুর দীঘিরও পার্শ্বস্থিত মাঠে ঘাটে গোপাল চরে এবং তৎসঙ্গে রাখালকুল খেলে। সুতরাং **কানুর দীঘি** ইহার উপযুক্ত সংজ্ঞা, **কানুর দীঘি** ইহার উচিত নামকরণ।

কালের কোন্ তিমির-গর্ভে ইহার জনকদেব লুকাইয়াছেন, জানি না। মনে হয়, যতদিন তিনি ছিলেন, প্রাণপ্রতিমা দীর্ঘিকা-দুহিতা ততদিন তাঁহারই আদরে গরবিণী ছিলেন। কিন্তু আজ কালের কুটিল আবর্ত্তনে ইহার অনেক পতি হইয়াছে;—একাধিপতি কেহই নাই। অনেকের হইয়া সে কাহারও নয়!—সে আদৃতা নয়; সে পরিত্যক্তা। * * *

---

* ফতেয়াবাদ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

শৈল-কিরীটিনী মম জন্মভূমি-অঙ্গে
মনোহর মরকত স্বচ্ছ আভরণ,—
শ্যামলা প্রকৃতি-অঙ্ক উদ্ভাসিত করি
কে তুমি, বিপুল যশ ঘোষিবারে কা'র
লভেছ জনম? লোকালয় কোলাহল
দূরে তেয়াগিয়া, বিজন প্রান্তরে আসি
রচিয়াছ শ্রী-নিবাস; পবিত্র আশ্রম
নির্ম্মায় তপস্বী যথা গহন কাননে।
তুঙ্গতীর-চতুষ্টয় পর্ব্বত-প্রমাণ
কত শত শতাব্দীর ঝটিকা হেলিয়া
এখনও গরবে তারা আছে সমুন্নত;
বিপদে যেমন শূর স্থির অচঞ্চল।
হরিতাভ শস্য-ক্ষেত্র চারিধারে তার
তুলিয়া রজত শির কাঁপিছে হিল্লোলে।
সন্নিকটে অদ্রিমালা আকাশের গায়
ঘনকৃষ্ণ অভ্র-নিভ আছে প্রতিভাত।
অপূর্ব্ব এ সমাবেশ!—সুরম্য বিপিনে
আরামের উপবন, বিশ্রামের স্থান,
কল্পনার লীলাভূমি হয়েছে সজ্জিত।
চারি কোণে বনস্পতি আত্মজ তোমার
প্রসারি সহস্র শাখা ছায়া বিস্তারিয়া
করিতেছে আবাহন শ্রান্ত পথিকেরে;
অথবা প্রহরী-সম আছে দাঁড়াইয়া
দেখাইতে পর্য্যটকে বিচিত্র এ শোভা!
স্মরণ কি হয় সখি! সকাল বিকাল
কত নিশীথ প্রদোষ যাপিয়াছি আমি
তব সুন্দর বেলায় সাথী সনে? কত
ভুলিয়াছি দুঃখ ব্যথা, খুলিয়াছি হেথা
অন্তরের উপন্যাস? কতবার তুমি
উদাস আকুল চিত্ত বিনোদন হেতু
মৃদুল সমীরে ধীরে করেছ ব্যজন?
না, না, ভ্রান্তি মম! হেন পরিচর্য্যা তব
সকলের প্রতি! কত পান্থ আসে যায়
এই উপকূলে, জুড়ায় উত্তপ্ত প্রাণ
শীতল সলিল আকণ্ঠ করিয়া পান।
সুচারু এ ছবি হেরি কে না মুগ্ধ হয়?—
ক্ষুদ্র দীন মোর মত প্রণয়-ভিখারী
কতজন আছে! কে না ভজে তোমা?—দৃষ্টি
অসম্ভব তাঁর, নিরখি ভুলেন যিনি।
হীনজনস্থান নয় তব পুণ্য-স্মৃতি।
শরতের পূর্ণশশী জোছনা-ধারায়
সুষুপ্ত ধরণী-বক্ষ করিলে প্লাবিত
একদা আগ্রহে মোরা তিনবন্ধু মিলে
গিয়েছিনু তব কোলে বিরাম আশায়!—
মনে পড়ে সেই দিন—অন্তরীক্ষ হ'তে
উদার প্রশান্ত তব হৃদয়-দর্পণে
নেমেছিল নিশাপতি নক্ষত্র-আসনে।
হেসেছিলে তুমি কেমন মধুর হাসি
কৌমুদীর শুক্লবাস করি পরিধান।
ওই শুভক্ষণে মোরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
এ-পার ও-পার করি ঘুরি চারিধার,
করিলাম প্রদক্ষিণ শোভন প্রতিমা;
অনন্তর বসিলাম পশ্চিম তটেতে,
অতৃপ্ত লোচনে সবে করিলাম পান
নিশ্চল সৌন্দর্য্য-সুধা; বহুক্ষণ পরে
করিনু বন্দনা তাঁর মোহন সঙ্গীতে;
অন্তরে প্রণমি শেষ লইনু বিদায়।
করেছিলে লক্ষ দেবি! গুপ্ত হৃদয়ের
ভক্তি-প্রীতি-উপাসনা শর্ব্বরী-আলোকে?
সুনিশ্চিত—যদি জড়ে সম্ভবে চেতনা।
মৃন্ময় এ স্থূল দেহ মিশিলে ধূলায়,
যদি এই সুখ-স্মৃতি করিয়া ধারণ
উড়য়ে নির্মুক্ত আত্মা অনন্ত গগনে,
বিহগের সাথে আমি তব তীরতরু
করিব আশ্রয়। দিবস-রজনী সদা
বাল্যতীর্থস্থান এই যমুনার তটে
বিহরিব সুখে, আর অর্চ্চনায় তব
মরত জীবন মম করিব সফল
অধোবাস যতদিন না হয় খণ্ডন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লালা।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 648. | August, 1917

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৮ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৪। আগষ্ট, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

গৌড় মল্লার—ঢিমা-তেতালা।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!

ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে

জনহীন অসীম প্রান্তরে,

রজনী আঁধারা!

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা।

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুলা রে, তিমির-দুকূলা রে!

নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,

চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা!

হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহ-হারা!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

[রজ্ঞা রজ্ঞা] ১ ॥ ২´ ৩

II { রা রা মা গমা। রা রা সা -া। রা -া পা -া। মা -জ্ঞা মজ্ঞা -া } I

ঝ র ঝ র ব রি ষে ॰ বা ॰ রি ॰ ধা ॰ রা ॰

॰ ১ ২´ ৩

I মজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা। রা -া সা -া। ণ্ধ্ণ্া -প্া প্া ন্া। না -ধনসা সা -া I

হা ॰য়॰ প থ বা ॰ সী ॰ ॰হা॰ য় গ তি হী ॰॰॰ ন ॰

I মরা -মরা মা পা। পধণা -পমা -পা -রা। -মগমা -রসা -রা -া। -পা পা মা-জ্ঞা II
হা ০য় গৃ হ ০হা০ ০০ ০ ০ ০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২´ ৩ ০ ১
II { না না নধা -না। র্সা -া -া -া I পমা -পা -না -র্সা। র্রর্সা -র্রা -র্মা -র্জ্ঞা।
ফি রে ০বা ০ য়ু ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ হা০ ০ ০ ০

২´ ৩ র্স ০ ১
-া -া র্রর্জ্ঞা -র্রর্জ্ঞর্মা। র্রা -র্সা র্রর্সা -না } I র্সা -র্রর্সা -র্রা -র্জ্ঞা। -র্রর্সা -র্রা র্সা -া I
০ ০ স্ব ০০০ রে ০ ০ ০ ০ ডা ০০ ০ ০ ০০ ০ কে ০

২´ ৩ ০ ১
নর্সা -র্রা র্সনা -র্সা। সণা -ধা ধণা -ধণধা I পা পা পা পা। পা পা -া পধপা।
কা ০ ০০ ০ ০ ০ রে ০০০ জ ন হী ন অ সী ০ ০ম০

২´ ৩ ০ ১
[রা]
মা -পমা -পা পা। র্সা -া -া -া I { সা সা রা মা। গমা -া -া -া।
প্রা ০০ ০ ন্ত রে ০ ০ ০ র জ নী আঁ ধা ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
-া -া -জ্ঞরা -সরা। -পা -মপা মা -জ্ঞা } I জ্ঞমা -া রা সা। রা -জ্ঞরা সা -া।
০ ০ ০০ ০০ ০ ০ রা ০ হা য় প থ বা ০০ সী ০

২´ ৩ ০ ১
ধণা -প্া প্া ন্া। ধন্া -ধ্ন্সা সা -া I মরা -মরা মা পা। পধণা -পমা -পা -রা।
হা য় গ তি হী ০ ০ ন ০ হা ০য় গৃ হ ০হা০ ০০ ০ ০

২´ ৩ [ ]
-মগমা -রসা -রা -া। -পা -মপা মা -জ্ঞা II
০০০ ০০ ০ ০ ০ ০ রা ০

২´ ৩ ০ ১
II -া -া -া -া। মা পা পা -া I পা পা পা -ধপা। মা পা -া পধপা
০ ০ ০ ০ অ ধী রা ০ য মু না ০০ ত র ০ ০ঙ্গ০

২´ ৩ ০ ১
মা পা মজ্ঞা -া। -া -া -া -া I রা সা ন্সা -রজ্ঞা। -সরা -া -া -া
আ কু ০লা ০ ০ ০ ০ ০ অ কূ লা০ ০০ রে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
মা পা মজ্ঞা -া। রা সরা নস্া -রজ্ঞা I -সরা -া -া -া। মা পা পা মা
তি মি র ০ দু কূ০ ০লা ০০ রে ০ ০ ০ নি বি ড় ০

২´ পা -না নধা না। ৩ র্সা র্সনা সর্র র্সা -া I ০ -া -া -া -া। ১ মা পা পা পা।
নী ০ র ০ দ   গ গ ০ ০ নে ০ ০   ০ ০ ০ ০   গ র গ র

২´ পণা ধা ধণা -পা। ৩ মা পা পমা -া I ০ -া -া -া -া। ১ {সা -া রা জ্ঞা।
গ র জে ০   স ঘ নে ০   ০ ০ ০ ০   চ ০ ঞ্চ ল

২´ রজ্ঞা সা রা -জ্ঞা। ৩ রসা রা পা -া I ০ -া -া -া -া }। ১ পর্সা -া র্সণা -া।
চ ০ প লা ০   চ ০ ম কে ০   ০ ০ ০ ০   না ০ হি ০

২´ ধা পা মপা -ধা। ৩ পমা -জ্ঞা -া -া I ০ রজ্ঞা -রজ্ঞমা রা সা। ১ রা -জ্ঞরা সা -া।
শ শি তা ০ ০   রা ০ ০ ০ ০   হা ০ য় ০ প থ   বা ০ ০ সী ০

২´ ণ্ধ্ণ্া -প্া প্া ন্া। ৩ ধ্ন্া -ধ্ন্সা সা -া I ০ মরা -মরা মা পা।
হা ০ ০ য় গ তি   হী ০ ০ ০ ন ০   হা ০ য় গৃ ০ হ

১ ণ্ধ্ণ্া -প্মা -পা -রা। ২´ -মগমা -রসা -রা -া। ৩ -পা মপা মা -জ্ঞা II
হা ০ ০ ০ ০ ০ ০   ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০   ০ ০ রা ০

নিবেদন।

চরণে বাজুক্ কণ্টকাঘাত, বজ্র-আঘাত শিরে,
তারি মাঝে যেন শ্রীপদ স্মরিয়ে তব পথে চলি ধীরে ;
অটল হৃদয়ে অটুট লক্ষ্য রাখি তব আঁখি পানে,—
সব কুৎসারে কৌতুক বলি' বরি লই যেন প্রাণে।—
কি ভয়, কি ভয়! ও-চরণ-ধ্বনি শুনেছি হৃদয়-মাঝে!
হৃদয়-হীনের পরিহাস-বাণী আর কি গো কাণে বাজে ?
'তোমার পরশ পরাণে লভিয়া জীবনে হইব ধন্য'—
যেন স্মরি' তাই তব পথে ধাই, তোমারি কাজের জন্য!

আন-মনে যদি করি কোথা ভুল, সেথা দিও তুমি ব্যথা,
চপল ভ্রান্তি সংহারি' মোরে শুনায়ো তোমার কথা !
সব দুঃখাঘাত সাদরে বরিতে হৃদয়ে দিও গো বল,
কর্ম্মে আমার দিও অধিকার, তুমি টেনে নিও ফল !
ছিন্ন করিও হৃদয়-গ্রন্থি শাণিত সত্য-ধারে—
দগ্ধ করিও বজ্র-আগুনে মলিন বাসনা-ভারে !
আঘাতে ব্যথায় চেতনা জাগায়ে সকল ভ্রান্তি হরে,
যোগ্য করিও এ জীবন মম তোমারি কাজের তরে !

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

৬ই অক্টোবর প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া বিন্ধ্যাচল-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। রাজ-ঘাট ষ্টেশনে আসিয়া দেখি, গাড়ী আসিতে প্রায় দুইঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে। বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় আউধ্-রোহিলখণ্ড রেলপথে বিন্ধ্যাচল যাইতে হইবে। এ-স্থান-সম্বন্ধে কোনও প্রকার ধারণাই আমার ছিল না;— তাঁহার পর, অপরিচিত স্থানে যে আগন্তুককে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়, এ কল্পনাও আদৌ মনে স্থান পায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী ভদ্রব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, উদার ও মহৎ। বিন্ধ্যাচল হইতে তিনি সদ্যঃপ্রত্যাগত। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ঐ-স্থান সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। যথাসময় তদীয় উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধ হইয়াছিল।

এ-দিকে গাড়ী প্লাট্‌ফরমে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহিগণের সংখ্যা সে-দিন অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ধীরে ধীরে যাইয়া একখানি মধ্যমশ্রেণীর কামরায় আমি প্রবেশ করিলাম; ট্রেনও আস্তে আস্তে চলিল। অনতিবিলম্বেই আমরা 'ডাফরিন' সেতু দিয়া গঙ্গার উপর দিয়া চলিলাম। আবার সেই পবিত্র মনোমুগ্ধকর কাশীধামের দৃশ্যে আত্মহারা হইলাম, প্রাণ-মন বিস্ময়ে বিভোর হইয়া গেল! মনে হইল, আজ বিজয়ার দিনে মা যেন আমাদিগকে নিরানন্দ করিয়া চলি-লেন! যাইতে যাইতে সৌধমালা ও পবিত্র মন্দির-চূড়া আস্তে আস্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল! বেণীমাধবের উচ্চ চূড়াও অবশেষে ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল! হায় প্রতিহিন্দুতীর্থে শত অত্যাচারের নিদর্শন ধরিয়াও হিন্দুধর্ম্ম আজিও 'পূর্ব্বগৌরবে বর্ত্তমান!

পুণ্যতীর্থে অল্প কয়েকদিনমাত্র অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে সবই নিতান্ত আপনার হইয়া গিয়াছিল; সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে থাকিয়াও, প্রীতির বন্ধন নীরবে দৃঢ় হইতেছিল; তাই বিদায়-কালে প্রাণে তীব্র যাতনা অনুভব করিতে-ছিলাম!

মির্জ্জাপুর-ষ্টেশনের অদূরেই চূণার-দুর্গ। দুর্গপ্রাচীর আপনার দুর্ভেদ্য দেহ বিস্তার করিয়া অতীতের কীর্ত্তিগাথা গাহিতেছে। আমরা চলন্ত গাড়ী হইতে দুর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, এই দুর্গের সহিত অতীতের কত মর্ম্মভেদী কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে! কত শৌর্য্য কত বীর্য্য কত পরাক্রম বিস্মৃতির অতল-জলে নিমগ্ন হইয়াছে! পাঠান-বীর সের-সাহের কত বীরত্ব-কাহিনী এই দুর্গের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে! বীর-শোণিতে কতবার এই দুর্গ-প্রাচীর রঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহার ইয়ত্তা কে করিবে! কালের করাল কবলে কত দুর্গ

বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা আজিও উন্নতশীরে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান! বার্দ্ধক্য ইহাকে বিকলাঙ্গ করিতে পারে নাই; ইহার প্রত্যঙ্গে অমিত বল; ইহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

বেলা ১॥ টার সময় বিন্ধ্যাচল-ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করিলাম। মধ্যাহ্ন-সৌরকর-পরিব্যাপ্তা তপ্তবালুকারাশি-পরিকীর্ণা দীনা প্রকৃতি তখন অভিনব সাজে সজ্জিতা! সকলই নীরব নিস্তব্ধ! দূরে দূরে দিগন্ত-প্রসারিণী পর্ব্বতশ্রেণী। তথায় একটুও বায়ুহিল্লোল নাই বা বিহগকূজন-কূজিত একটি পল্লবিত বৃক্ষও নাই; শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র নাই! কোথাও একটু ছায়া নাই যে, বসিয়া বিশ্রাম করি! প্রকৃতি যেন আজিও নির্ম্মম! তাহার নিষ্ঠুর প্রাণে একটুও দয়া নাই। দীর্ঘকালব্যাপী নরহত্যায় যে-স্থান কলঙ্কিত, ভীমদর্শন ঠগী-সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিরীহ পথিকগণ যে স্থানকে যমালয় জ্ঞান করিত, শিশুর আর্ত্তনাদ, জননীর নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস ও পুত্রের হাহাকার যে স্থানে আজিও প্রতিধ্বনিত, স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল যে স্থানে আগন্তুকদিগের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিত, নররক্তে প্রতিদিন যে স্থান প্লাবিত, সেই পাপপূর্ণ অভিশপ্ত স্থানের এতাদৃশ প্রতিকৃতিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এ-স্থানে পদার্পণ করিয়াই প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। ভীমকায় পাণ্ডাগণ সুদীর্ঘযষ্টি-হস্তে আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল; আমি কাহাকে কি বলিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও গতিশীল। একবার ভাবিলাম, কোনও এক ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিব, কিন্তু তমসাচ্ছন্না রজনীতে শুষ্কপ্রকৃতির বিভীষিকাময় দৃশ্য মনে পড়িয়া গেল; ভাবিলাম, এতাদৃশ ভয়াবহ স্থানে একক অবস্থান নিরাপদ নহে। পথিমধ্যে পাণ্ডাগণের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি প্রমাদ গণিলাম। পূর্ব্ব-কথিত বন্ধুবরের উপদেশ আমার মনে হইল। তখন আমি পাণ্ডাবিশেষের নামোল্লেখ করিবামাত্রই সকলে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল।

সঙ্কীর্ণ গলিপথে ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডার বাটীতে উপনীত হইলাম। গলির উভয় পার্শ্বে মৃন্ময় দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ; তাহাতে কোনও সাজ-সজ্জা বা পারিপাট্য নাই। তাহারা সুদৃঢ় দেহ বিস্তার করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। কত ঝড়-বৃষ্টি, কত ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই কর্কশ-দেহে একটুকুও আবিলতা আসে নাই। দেহযষ্টি একবারও অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই।

নীচের তলায় একটী খাটিয়াতে পাণ্ডা-প্রবর বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি অভ্যর্থনা ও সৌজন্যের কোনওরূপ ত্রুটি করিলেন না। তিনি দেখিতে অত্যন্ত কর্কশ ও ভীমকায়; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর বেশ বুঝিলাম, এই কর্কশ বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অতিকোমল স্নেহপূর্ণ অন্তঃকরণ নিহিত রহিয়াছে। আমরা বিশ্রাম করিতে করিতে পাণ্ডাজীর সহিত তাঁহার গৃহস্থলীর নানা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। এই অত্যদ্ভুত গৃহ, যাহার কর্কশ গাত্র সামান্য পরিশ্রমে ও স্বল্প ব্যয়েই

মসৃণ ও সুশ্রী হইতে পারিত, অতিনিম্ন হওয়ায় যাহাতে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা কত ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার কয়টি সন্তান, তাঁহাদের বিবাহক্রিয়া কি-প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাণ্ডাজী বিশেষ আগ্রহ-সহকারে দুর্ব্বোধ্য অর্দ্ধবাঙ্গালায় সমাধান করিলেন। তাহার পর পাণ্ডাজী নিজ হইতেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। মোট এই মাত্র বুঝিলাম, নেপালের রাজা তাঁহার শিষ্য। পূর্ব্ব-কথিত বন্ধুবরের নামোল্লেখমাত্র পাণ্ডাজী শত-মুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বত্য-প্রদেশে নিরক্ষর পাণ্ডার মুখে বাঙ্গালী বন্ধুর এতাদৃশ প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম; ভাবিলাম, গুণের আদর সর্ব্বত্র। বন্ধুবরের আদর্শ চরিত্র এ পাণ্ডাকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। এরূপ বিশ্রামান্তে অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। পাণ্ডাজী আহারের অনুরোধ করিলে, আমরা ভ্রমণান্তে রাত্রিতে তাঁহার আলয়েই অন্নাহার করিব, এইরূপ উপদেশ দিলাম।

মির্জ্জাপুর সহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল-স্থানটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একই ধরণের কতকগুলি গৃহ সন্নিবিষ্ট হইয়া একটি ক্ষুদ্র পল্লী গঠন করিয়াছে। স্থানটির বহুনিম্নে এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে প্রশস্ত রাজপথ-পরিব্যাপ্ত খোলা মাঠ। তাহার পর বিন্ধ্যপর্ব্বত-শ্রেণী। এই পল্লীর উপকণ্ঠেই মা বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির। পূজার পর সমস্ত দিনের জন্য মন্দির-দ্বার বন্ধ থাকে। আমরা সেদিন গবাক্ষ-পথে মায়ের পরম-রমণীয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়াছিলাম। প্রস্তরসোপান-পরিবেষ্টিত মন্দির-প্রাঙ্গণে কত সাধু-সন্ন্যাসী বিশ্রাম লাভ করিতেছেন! মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে পূজো-পকরণ সাজাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা মায়ের নিকট নিবেদিত ছাগমাংস নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। পুষ্প-বিল্বপত্রের দোকানের অভাব নাই। দুই-চারিজন পাণ্ডা শিকারের অন্বেষণে এ-দিক-ওদিক পায়চারি করিতেছে। প্রাঙ্গণ হইতে সঙ্কীর্ণ গলিপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অগণিত প্রস্তর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলাম। তথায় গঙ্গার উন্মুক্ত দৃশ্য—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বীচি-পরিশোভিত শুভ্র সলিল-রাশি প্রাণে অনাবিল শান্তি ঢালিয়া দিল। পবিত্র বায়ু-হিল্লোলে অবসন্ন দেহ শীতল হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-কবি।

হে বিশ্ব-কবি! তুমি কি কৌশলে এই বিশ্ব-কাব্য রচনা করিয়াছ, জগতের প্রতি-বর্ণে তোমার সুনিপুণ হস্তের কি বিচিত্রতাই প্রতিফলিত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব ছন্দেই অনন্ত ও অসীম ভূমণ্ডলখানিকে গ্রথিত করিয়াছ, অজ্ঞানোপহত মূঢ়জীব কি তাহা

বুঝিতে পারে! মনুষ্যের ক্ষীণবুদ্ধি এই রহস্য-জাল ভেদ করিতে পারে না, মনুষ্যের দুর্ব্বল বাক্য তোমাকে সুব্যক্ত করিতে পারে না। এই জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত একত্রিত হইয়াও তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্য দিয়া যে অসীমশক্তির পরিচয় দিয়াছ, তাহাই তোমার স্বাতন্ত্র্য, তাহাই তোমার অনন্যসাধারণ কবিত্ব। অনন্ত অন্ধকাররাশি হইতে এই পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগতের সৃষ্টিই তোমার বিশ্ব-কাব্যের প্রথম সর্গ। তোমার সামরাগিণীর ললিত ঝঙ্কারে পরমাণুসমষ্টি স্পন্দিত হইয়া এই চন্দ্র-সূর্য্যাত্মক জগতে পরিণত হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত জগতের মধ্য দিয়া তুমি আপনাকেই বহুরূপে প্রকাশিত করিয়াছ। তুমিই উপাদান, তুমিই উৎপাদক; তুমিই কাব্য, তুমিই কবি!

লৌকিক কাব্যে কবির অন্তরের কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে, তাঁহার কল্পনা-লহরী বাঙ্ময়াকৃতি লাভ করিয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া থাকে, এইজন্যই কাব্য পড়িয়া কবির রচনানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার অন্তরের কথাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কত যুগ ধরিয়া এই ধরিত্রী-মণ্ডলে প্রাণীসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে, কত পথিক এই সংসার-পান্থশালায় অধিষ্ঠান করিয়া সেই দুর্জ্ঞেয় প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে, কত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের পর্য্যালোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন তোমার রচিত এই বিশ্বকাব্য অনুসন্ধান করিয়া তোমার গভীর উদ্দেশ্য কণামাত্রও বুঝিতে পারিয়াছেন। কয়জন কাব্যের মধ্যে কবিকে ধরিতে পারিয়া অমৃতের অস্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! সেইজন্যই বলি তুমি ও তোমার কাব্য উভয়ই দুর্জ্ঞেয়।

লৌকিক কাব্যের ন্যায় তোমার স্বরচিত কাব্যখানিতেও বস্তু, রস, গুণ প্রভৃতি প্রচুররূপেই বর্ত্তমান আছে। তুমিই তোমার কাব্যের প্রতিপাদ্য, যেহেতু একমাত্র তুমিই সর্ব্বত্র প্রধানরূপে বিবক্ষিত হইয়াছ। তোমাকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি; তোমার নেতৃত্বে জাগতিক কার্য্য-কলাপ সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তুমিই নেতা। তোমার বিশ্বকাব্যে নানা রসের অবতারণা দেখিতে পাই। তুমি নিজে সর্ব্বরসাধার, গুণময়, সেই জন্যই তোমার কাব্যে অনন্ত রসের উৎস। শিশুর নির্ম্মল হাস্যতরঙ্গ, শারদচন্দ্রিকার স্নিগ্ধতা, বিহগের সান্ধ্যকাকলি, তটিনীর কলনাদ, এবং বিকশিত কুসুমনিচয়ের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দ-সম্ভারে পরিপ্লুত হইয়া কে না বলিবে যে, তোমার বিশ্বকাব্য একটী বিমলরসের অগাধ-সমুদ্র! সত্যই বলা হইয়াছে, "স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে, মধুব্রতানাং মকরন্দপানে, দানে দয়ালোরথভক্তগানে পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণা-ময়ীং তে।" * তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ও জলধির উত্তালতরঙ্গভঙ্গী তোমার রুদ্র রস বা ভৈরবী মূর্ত্তির বাস্তব বিকাশ!

* স্তন্যপায়ী শিশুর স্তনদুগ্ধ-পানে, ভ্রমরের মধু আহরণে, দাতার দানে এবং ভক্তের সঙ্গীতে তোমার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়োন্মত্ত বীরগণের আস্ফালনের মধ্যে তুমি বীররসের অবতারণা করিয়াছ। হে প্রেমময়! তুমি অন্যোন্যা দর্শনসহিষ্ণু দম্পতিযুগলের মধ্যে কি গভীর প্রেমরসের অভিব্যক্তি করিয়াছ! হে করুণাসিন্ধু, তুমি দীন-দরিদ্রের মধ্যে করুণ-রসের জীবন্ত মূর্ত্তি আঁকিয়াছ। এই জন্যই তুমি রসের অসীম সমুদ্র।

অলঙ্ঘনীয় নিয়মে জগতের সংস্থিতিই তোমার বিশ্বকাব্যের দ্বিতীয় সর্গ। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তোমার নিয়মের অধীন! আবির্ভাব, তিরোভাব সকলই তোমার নিয়ম। তোমার কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, কাব্যের বর্ণনীয় অর্ণব, ঋতু, উদ্যান প্রভৃতি জীবন্ত মূর্ত্তিতেই তোমার বিশ্বকাব্যে শোভা পাইতেছে। তারকাখচিত নীলনভোমণ্ডল, অরুণ-রাগরঞ্জিতা কুসুমাভরণা উষার দীপ্তিচ্ছটা দেখিয়া বোধ হয়, তুমি কত সুন্দর, কত মনোহর! তুমি নিজে সৌন্দর্য্যের অতল সাগর! তাহা না হইলে তোমার রচিত বিশ্বকাব্য কখনই এত মনোরম হইতে পারিত না।

তোমার ভাব গভীর হইতে গভীরতম, মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। বিশ্বকাব্যের সামান্য একটী পংক্তির মধ্যে তুমি যে অসীম ভাবরাশি নিহিত রাখিয়াছ, কয়জন তাহাই উপলব্ধির বিষয়ীভূত করিতে পারিয়া ধন্য হইতে পারিয়াছেন! আমরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া গভীর গর্জ্জনমাত্র শ্রবণ করিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ি; কিন্তু পারাবার উত্তালতরঙ্গভঙ্গীচ্ছলে যে কি মহাভাবের অভিব্যক্তি করিতেছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না! তোমার ভাষা সরল, ছন্দ ললিত এবং ঝঙ্কার মধুর।

অনিত্য বাস্তবজগতের ধ্বংস বা মহাপ্রলয় তোমার বিশ্বকাব্যের শেষ সর্গ। একদিন তোমার মোহন বীণার সামঝঙ্কারে এই কমনীয় জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর একদিন বিষম-রাগিণীর ভীষণ নিনাদে তাহার অবসান হইবে। তোমার বিশ্বকাব্যের আদি ও অন্ত, উভয়ই আশ্চর্য্যজনক। কাব্যের মধ্য দিয়া আপনাকে এত সুব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছ, তথাপি মানুষ তোমাকে বুঝিতে পারে কই! প্রতিদিন বৃক্ষ, লতা, তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর গগনবিহারী চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি আমাদের নয়নের গোচর হয়; কিন্তু কই, ইহাদের মধ্যে তোমাকে ত অন্বেষণ করি না! বিহগের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হই, কিন্তু সেই মধুরিমার মধ্যে তোমার সত্তা ত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হে বিশ্বকবি! হে বিশ্বকাব্যের রচয়িতা! তোমার বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রতিনিয়ত তোমার অঙ্গুলিরচিত বিশ্বধাম অবলোকন করিয়া, তোমার অপার মহিমার কণামাত্রও বুঝিতে পারি না, ইহাই দুর্ব্বল হৃদয়ের আক্ষেপ।

শ্রী—

বিরহে।

আজি বিরহের দিনে নীরব গগন ঘিরে,
তব প্রেমের আলোক ডানাটি মেলিছে ধীরে।
হেরি প্রভাত-অরুণে তরুণ লাবণি-খানি,
কোন্ অজানার দেশে ডাকে মোরে হাত ছানি।
ওই মধ্য-তপনে রক্ত রবির ফাগে,
তব বাসনা-বাসিত মোহন মূরতি জাগে।
ম্লান সান্ধ্য-গগনে আগুনে ঢাকিয়া ছায়া,
তব রক্তিমময় চুম্বন পায় কায়া।
যবে অন্ধকারের দ্বন্দ্ব অকূলে নাচে,
মম বেদনা হাসিয়া তোমারে নীরবে যাচে।

এই চন্দ্র-ধৌত স্পন্দনহীন হাসি,
হেরি ক্রন্দন যায় নন্দন-নীরে ভাসি।
তুমি তারায় তারায় রয়েছ জড়ায়ে মোরে,
আমি মরিয়া বেঁচেছি তোমার প্রেমের ঘোরে।
তুমি দেবতার বেশে পরেছ অর্ঘ্য-মালা,
পুনঃ ভক্তের সাজে হাতে বরণের থালা।
তুমি সীমার মাঝারে কহ অসীমের বাণী,
আমি মলয়ার চুমে পেয়েছি পরশখানি।
আজি মিলন কাঁদিছে হেরি বিরহের শোভা,
মম অন্তর আছে অন্তরতরে ডোবা।

দরবেশ।

নীরব-কবি।

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
নিবিড় অরণ্য-মাঝে, তরুলতা যথা রাজে,
প্রস্রবণ-বারিধারা গরজে যথায় ;—
যথায় বিহগকুল বুকে ধরি এ মারুত
অম্বর-স্তব্ধতা ভেদি দূরে চলি যায় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে মহীধর যথা কাঁপে,
তটিনী তরঙ্গ তুলি যথা বহি যায় ;—
সুস্নিগ্ধ সমীর যথা পত্রে-পত্রে গাহে গাথা,
নবীন অরুণালোক প্রকাশে ধরায় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি নীরব গাহিয়া বেড়াও—
অসীম আকাশ-মাঝে গ্রহতারা যথা রাজে
গম্ভীর বিচিত্র ঘন বিরাজে যথায় ;—
চমকে চপলা যথা, চাতক শুনায় কথা
গভীর গভীর অতি গভীরতাময় !—
কে তুমি নীরব কবি গাহ গো তথায় !

কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও
তোমার নীরব গীতি, মধুর মধুর নিতি !—
শত কোলাহল-মাঝে দেখা নাহি দাও।
কাছে কাছে আন টানি, কিন্তু তোমা নাহি জানি ;
কাছেতে থাকিয়া তবু ধরা নাহি দাও !—
কে তুমি অমর কবি গাহিয়া বেড়াও !

কে তুমি নীরব কবি গাহিয়া বেড়াও !
তব গান কভু শুনি, কভু তাহা নাহি গণি,
কভু বা নীরব হেরি সে বীণার তার।
ওগো ও নীরব কবি ! এত গাথা গাহ যদি,
এ হিয়া-মাঝারে তব গীতি একবার
গাহিয়া পবিত্র কর হোক্ একাকার !

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক।

বাঙ্গালা-দেশে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার যে পরিমাণ প্রয়োজন, কৃষিকার্য্যের ব্যয়-সম্বন্ধে সহায়তা করার তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন। অর্থাভাবে কৃষকেরা প্রয়োজন মত যথাসময়ে চাষ-আবাদ করিতে পারে না। বর্ষাকালে অর্থসাহায্য পাইলে তাহাদের চাষের প্রভূত উপকার হয়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রজাগণ যথা-সময়ে কৃষিকার্য্যের জন্য অর্থসাহায্য পায়। এখানে ব্যবহারের জন্য কৃষির যন্ত্রাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, এবং প্রজাগণ ইচ্ছা মত এখান হইতে সার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিজ-নিজ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। এই প্রকার সাহায্যই বাংলা-দেশে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিব বিভাগের জন্য প্রতিবৎসর অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকেন। দেশের লোক এ-বিষয়ে মনোযোগী হইলেই, কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন।

প্রত্যেক থানার এলাকায় অন্ততঃ এক একটী কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐ থানার এলাকার গ্রামের লোকেরা, যাঁহাদের অর্থ আছে, তাহাঁরা প্রত্যেকে অল্প অল্প অর্থ সেই ব্যাঙ্কে জমা দিবেন; কেহ-বা ধান্য জমা দিবেন। কো-অপারেটিব বিভাগের রেজিষ্ট্রারের অধীনে এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। তাঁহার নিকট আবেদন করিলে মূলধন-সম্বন্ধে তিনি সাহায্য করিতে পারেন। যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে ঐ টাকার সুদ পাইবেন। ধান্যেরও মূল্য ধরিয়া ঐরূপ সুদ দেওয়া হইবে।

গ্রামবাসী প্রজাগণ নিজ-নিজ গ্রামে এক একটী কো-অপারেটিব সমিতি করিয়া, নিজেদের মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা স্থির করিবে; এবং আপনাদের প্রয়োজন মত টাকা, কৃষিযন্ত্র বা সার প্রভৃতির জন্য ব্যাঙ্কে আবেদন করিয়া সেখান হইতে তাহা গ্রহণ করিবে। প্রজাগণ ব্যাঙ্ককে সুদ দিবে এবং ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার জমী এবং জমীর শস্য উভয়ই আবদ্ধ থাকিবে।

প্রত্যেক ব্যাঙ্কে গোলায় ধান্য এবং গুদামে সার ও কৃষিযন্ত্র থাকিবে। প্রজা সার বা ধান্য লইলে তাহার মূল্য কর্জ্জরূপে পরিণত হইবে। কৃষি-যন্ত্র মাসিক বা দৈনিক হারে ভাড়া দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কের অবস্থানুযায়ী দমকল, ধান-কোটা ছোট কল, তেলের ছোট কল, ধান-ঝাড়া কল, ধান কাটিবার কল, ইক্ষু মাড়িবার কল, ইত্যাদি ভাড়া দিবার জন্য রাখা হইবে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে, অথবা অন্যান্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় বীজ আনয়ন করিয়া ব্যাঙ্কে বিক্রয়ের জন্য রাখা হইবে। আলু প্রভৃতির বীজ প্রজাগণ ব্যাঙ্ক

হইতে লইতে পারিবে। এই সকলের সুবন্দোবস্ত হইলে কৃষকগণের কতই সুবিধা হয়, কৃষিকার্য্যের কতই উন্নতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে সরকারী কৃষি-বিভাগ এবং কো-অপারেটিব-বিভাগ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে। কিন্তু কো-অপারেটিব বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে সাহায্য করা। সুতরাং কৃষিবিভাগ এবং কো অপারেটিব বিভাগ উভয়ে এক মত এবং একত্র হইয়া কার্য্য করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। কো-অপারেটিবের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাহাতে কো-অপারেটিব সমিতির সভ্যদিগকে কৃষি-বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করা হয়।

৩। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া নিবারিত না হইলে, শুধু কৃষি-বিষয়ে কেন, কোন বিষয়েই আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারে না। ম্যালেরিয়ায় ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ কৃষক-শূন্য হইয়া যাইতেছে। বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল পরগণার লোক আসিয়া যদি বঙ্গদেশে বাস ও চাষ-আবাদে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের অধিকাংশ জমী অনাবাদ পড়িয়া থাকিত।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সমগ্র বঙ্গদেশে সমভাবে অবলম্বন করিলে, ইহার হস্ত হইতে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য :—

(১) পানীয় জল পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। গ্রামের স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইলে এই অভাব দূর হইতে পারে। পুষ্করিণী-সকল উদ্ধার করা ব্যয়সাধ্য; কিন্তু এক একটী মৃত্তিকার পাটের ঘেরা-বিশিষ্ট কূপ খনন করা ১০০৲ টাকার মধ্যেই হইতে পারে। কূপের উপরের ঘেরা পাকা এবং উচ্চ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে উপরের জলের ছিটা ভিতরে যাইতে না পারে। কূপের নিকটস্থ নর্দ্দামাও পাকা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে নিক্ষিপ্ত জল দূরে গিয়া পতিত হয়।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পান করা উপকারী। বৃষ্টির জল নির্ম্মল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহা পানে পেটের পীড়া দূর হয়। কোনও প্রকার বীজাণু, যাহা বর্ষাকালে সাধারণ জলে থাকে, পেটে যাইতে পারে না। বাঙ্গালা-দেশে বৃষ্টির জল পান করিবার প্রথা প্রচলিত হইলে, ম্যালেরিয়াও অনেকটা নিবারিত হইতে পারে।

(২) বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা ও পল্লী পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। সকলেই যদি নিজ-নিজ বাটীর ও জমীর জঙ্গল পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে দেশে জঙ্গল হইতে পারে না।

শীতের প্রারম্ভে বন-জঙ্গল কাটিয়া স্থানে স্থানে স্তূপাকার করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিলে, দূষিত বাতাসও চলিয়া যায়।

যে-সকল পুষ্করিণীতে বন-জঙ্গল দ্বারা জল দূষিত হয়, এবং যাহা বাসস্থানের নিকটেই অবস্থিত, সে-সকল পুষ্করিণীতে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কেরসিন তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। এক বোতল তৈল ⅙ একর জলে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে ভাবী বিপদ্ যতটা নিবারিত হয়, তাহার তুলনায় এ ব্যয় কিছুই নহে।

অনেক সময় দেখিয়াছি, কালকাসন্দা এবং রাংচিত্রের গাছ বাটীর নিকটে থাকিলে

সেখানে জ্বরের আবির্ভাব অধিক হয়। আমার মতে গ্রামে এ সকল গাছ না থাকিলেই ভাল।

রাস্তাঘাট ভাল করা ও পল্লির জল যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

পল্লিগ্রামে বাটীর মধ্যস্থ আঁস্তাকুড়গুলি প্রায়ই অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। বাটীর মধ্যে এরূপ কখনও হইতে দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে বাটীর মধ্যে জল বসিতে না পারে এবং যাহাতে দুর্গন্ধ না আসে, এরূপ সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

গোয়াল-ঘরের আবর্জ্জনা বাটীর নিকটে ফেলা উচিত নহে। সারকুড় বাটী হইতে দূরে হওয়া আবশ্যক।

(৩) চা-পান ও কুইনাইন ব্যবহার। যতদিন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ না যায়, ততদিন এই দুইটীর ব্যবহারের প্রয়োজন। চা পান করিলে অনেকটা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে এড়ান যায়। কুইনাইন এবং সিন্‌কোনাও ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। সুস্থ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে কুইনাইন অল্প-পরিমাণে ব্যবহার হইলে, সহজে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না।

(৪) মনকে প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন। এখন পল্লিগ্রামে একস্থানে অনেক লোকের একসঙ্গে বসিবার আড্ডা দেখা যায় না। সন্ধ্যার সময় একত্রে বসিয়া গল্প ও আমোদ করা, অথবা বৈকালে ছেলেদের খেলিতে দেওয়া ও তাহা পরিদর্শন করা, এ সকল মনকে প্রফুল্ল রাখিবার উপায়।

মোটামুটি এই নিয়মগুলি পালন করিলে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে ক্রমে ক্রমে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। পল্লীগ্রামবাসী ভদ্র-লোকেরা এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর না হইলে আর উপায় নাই। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের আশায় বসিয়া থাকিলে, কোন কার্য্যই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃষি, শিল্প, কো-অপারেটিব প্রভৃতিতে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বন-জঙ্গল পরিষ্কার করা, নিজ-নিজ বাসগৃহ এবং পল্লি পরিষ্কার রাখা, এ সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা আমাদের উচিত নহে।

৪। চাষের উপযুক্ত পশু।

আমাদের দেশে গাভী ও বলদের আকার ক্রমশই ছোট হইয়া আসিতেছে এবং তাহারা দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে উত্তম দুগ্ধবতী গাভী এবং বলশালী বলদ বঙ্গদেশে আনীত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন। সরকারী 'ভেটেরিনরী' বা পশু-বিভাগ হইতে এ সকলের আমদানীর বন্দোবস্ত হইলে লোকের ক্রয় করিবার সুবিধা হয়। কারণ, তাহাতে উচিত মূল্যে ভাল গাভী ও বলদ পাইবার সুবিধা হয়।

ত্রিহুতের উত্তরভাগে একদল পশুপালক আছে; তাহারা কেবল বলদ প্রস্তুত করিবার জন্যই গাভী প্রতিপালন করে। গাভীর দুগ্ধ তাহারা দোহন করে না, বৎসকেই পান করায়। ইহাতে বৎসগণ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হয়। ইহাদের পালিত বলদ-সকল অত্যুৎকৃষ্ট এবং কার্য্যক্ষম। বাঙ্গালা-দেশে বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকার পশু পালন করিবার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সেখানকার জলবায়ু

ভাল এবং পার্ব্বত্য-প্রদেশে পশু চরিবার স্থানও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশে পল্লীগ্রামে ভাল বলদ আজ-কাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ধর্ম্মের ষাঁড় রাখা হইত; এখন আর সে-দিকে লোকের দৃষ্টি নাই। গো জাতির উন্নতি করা আবশ্যক। প্রতিগ্রামে অন্ততঃ একটি করিয়া ভাল ষাঁড় পালন করা কর্ত্তব্য। কাহারও শস্য একটুকু নষ্ট করিলেই যে একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, এরূপ ভাবা উচিত নহে। ষাঁড় সর্ব্বদা ছাড়া থাকিলে তাহার আর শস্য নষ্ট করিবার অধিক স্পৃহা থাকে না। অল্প আহারেই তাহার তুষ্টি হয়।

যেমন উত্তম গাভী ও বলদ রাখা প্রয়োজন, সেইরূপ ভেড়া ও উত্তম ছাগল পোষাও আবশ্যক। ভেড়া ও ছাগলের মলমূত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। তাহা ব্যতীত ছাগলের দুগ্ধ এবং ভেড়ার লোমও মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এক একটি ছাগল ১ সের ১॥ সের করিয়া দুগ্ধ দেয়, অথচ অল্প আহার করে। এইরূপ ছাগল পুষিলে গৃহস্থদিগকে ছেলেদের দুধের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না।

৫। সার।

বাঙ্গালা-দেশে সারের জন্য খোল বা খইল ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। লবণও সারের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। এ সকল ব্যবহার করিবার জন্য এখন আর লোককে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হয় না। পয়সার সুবিধা এবং জিনিসের আমদানি হইলেই লোকে আগ্রহ করিয়া এ সকল সার ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কৃষকেরা জানে, ধান্যের জন্য কোন্ সময় খইলের সার ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ সময়েই বা লবণ ব্যবহার করিতে হয়। তাহারা জানে যে ইক্ষু এবং আলুতে খইলের সার অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষকগণ জানে না যে, হাড়ের গুড়া ব্যবহারে কোন্ শস্যে কিরূপ ফল পাওয়া যায়। ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের সার বাঙ্গালা-দেশের কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। গোবর ও চোনা কিরূপে রাখিলে সার ভাল থাকে, তাহাও তাহারা বুঝে না। মানুষের মলমূত্র যে সারের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-দিকেও তাহাদের দৃষ্টি নাই। কেমিকেল বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে তাহারা এখনও জানে না।

এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা-দেশের কৃষক-দিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের দ্বারা এই সকল সার আনাইয়া কৃষকদিগকে ব্যবহার করিতে দিলে, এ সকলের প্রচলন অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কারণ, বাঙ্গালা-দেশের কৃষকগণ এত চতুর যে, তাহারা কোনও বিষয়ে একটু ফল বুঝিতে পারিলেই, তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়।

কোন্ সার ব্যবহারে কি ফললাভ হয়, কোন্ শস্যের পক্ষে কি সার উপযোগী, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার হওয়া প্রয়োজন; এবং গ্রামে গ্রামে চাষ-সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলে প্রভূত উপকার হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ শীলার নিকট ফিরিয়া আসিলে, শীলা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) কেন ? কি হয়েছে যে, ক্ষমা কোর্ব্বো ?

শীলা। মিঃ বসুর কথায়, এখন আমার সব কথা মনে হচ্ছে। আমি তাঁর কাছে সব কথা শুনে, আর মিসেস্ দাসের চিঠি দেখে তোমার উপর কি সন্দেহই করেছিলুম ! আমি যে লক্ষ্মৌ চলে যাচ্ছিলুম্— !

সুপ্রকাশ হাসিয়া, শীলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "যাচ্ছিলে। যাও নি ত ? কি করে যাবে ! আমি কি তোমাকে যে-সে বন্ধনে বেঁধেছি ? এ বন্ধন কি ছিন্ন হ'বার ! পালালে কি আমি ফিরাতে পার্‌তুম না ? সে শক্তি আমার আছে গো ! তাই অত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও তোমাকে পেয়েছি। যাই বল, শীলা, বেচারা সুব্রতর জন্যে কিন্তু আমার ভারী কষ্ট হয় !"

শীলা। (একটু অভিমানের সহিত) সুব্রতর কষ্ট যখন সহ্য হয় না, তখন আমায় বিয়ে না কর্‌লেই হ'ত। আমি চিরদিন, না হয়, অবিবাহিতা থাক্‌তুম্।

সুপ্রকাশ স্নেহভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজ থাক্ ; এ-কথা আর এক দিন হ'বে।"

শীলা। তার চেয়ে সুব্রতর সঙ্গে রমার বিয়ের ঠিক্ কোরে দাও না ? সেই ত সব চেয়ে ভাল হ'বে। রমা ত খুব ভাল মেয়ে। আমি তাকে খুব ভালবাসি।

সুপ্রকাশ। আগে কটকে যাই, তারপর যা হয়, ঠিক্ হবে। এ ত জোরের কাজ নয় !

শীলা। কটক যেতে আমার খুব ভাল লাগ্‌ছে। কেন যে এত দূরে এলে ! অমন সুন্দর বাড়ী ! অমন নদীর ধার—!

সুপ্রকাশ। সেই নদীর ধারটিই সব চেয়ে সুন্দর ! সেই যেখানে তুমি বসেছিলে ! আবার গিয়ে দু'জনে খুব নদীর ধারে বেড়াব, কেমন ? অমিয়কে গিয়ে খুব পুরস্কার দিতে হবে। তাকে একটা 'গ্রামফোন' কিনে দেব, কি বল ?

শীলা। সেই ত আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। না হলে, পরের বাগানে যাওয়া—!

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আবার সেই পরের সঙ্গে কথা কওয়া ! এখন সেই পরকে আপ্‌নার করা খুব সহজ নয় কি ?

শীলা। তুমি যদি মিঃ রায় বলে নিজের পরিচয় দিতে, আমরা তা' হ'লে ভয়ে আর সে-ধারে কখনো যেতাম না !

সুপ্রকাশ। তবে আমার ছদ্মনামই ধরা ভাল হয়েছিল ; কি বল ?

শীলা। আমি কিন্তু শুনেছিলুম, মিঃ রায়ের নাম—শরৎ রায়।

সুপ্রকাশ। আমার নাম চিরকাল সুপ্রকাশ। আমি ত কটকে কখনো আসি নি। জমীদারীও নতুন কেনা হয়েছে। আমার বাবাই সব দেখ্‌তেন। এখন আমায়ই সবই দেখ্‌তে হচ্ছে। কাল ফিরে যেতে হবে। যা বাকি আছে, সব ঠিক্ করে রাখি।

শীলা। আমায় ত তুমি কিছু কর্ত্তে দাও না!

সুপ্রকাশ। তুমি ত আমাতেই রয়েছ! আমি একাই দু'জনের কাজ কোর্ব্বো, সে কি ভাল নয়?

২৮

আজ সুপ্রকাশ ও শীলা কটকে আসিবেন। তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও রমা প্রাতঃকাল হইতেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহস্বামী এতদিন না থাকায়, গৃহাদির তেমন শোভা ছিল না; আজ আবার মনুষ্যসমাগমের সহিত যেন সেই অচেতন জড়পদার্থেও জীবন-সঞ্চার হইয়াছে। সুব্রত আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। গেট হইতে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত সকল স্থান কত নূতন নূতনতর কল্পনার আবেগে আম্র প্রভৃতি কত চিত্রবিচিত্র পল্লব-মালায় সজ্জিত হইতেছে। তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ-বর্ণের পুষ্পমাল্য ও জাপানী লণ্ঠন ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। বৈকালে ট্রেণ আসিবে। সন্ধ্যার সময় সেই রঙ্গিন লণ্ঠনে আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বি-প্রহরের আহারাদির পর সুব্রত আসিয়া দেখিলেন, সব ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। তিনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া বলিলেন, "মাসীমা, আমি তবে এখন যাই? আপ্‌নার সব ত ঠিক্ হয়েছে?"

রমা। (ব্যস্তভাবে) বেশ মজার লোক ত আপ্‌নি! আপ্‌নি এখন কি বলে যাবেন! এত কাজ-কর্ম্ম কল্লেন, বিকেলে 'চা'তে আপ্‌নাকে থাক্‌তে হবে, রাত্তিরেও আজ এখানে খেতে হবে!—

সুব্রত। (হাসিয়া) আপ্‌নার হুকুম্ শুন্‌তে হলে, আমার আর ছুটী নেই! আর তা কি হয়! আজ তাঁরা বাড়ী আস্‌ছেন!

রমা। তা আস্‌ছেন ত কি হবে? একলা ত অনেক দিন ছিলেন; আজ, না হয়, দু'চার জন লোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বেন! ক্ষতি কি হবে?

সুব্রত ইহাতে কোনও উত্তর করিলেন না; নিজের 'পকেটে'র মধ্যে হাত দিয়া একটি 'প্যাকেট' বাহির করিলেন ও রমার সম্মুখে তাহা ধরিয়া বলিলেন, "বৌ-দি মিসেস্ রায়কে এইটি উপহার পাঠিয়েছেন।"

রমা তাহা হস্তে লইয়া কহিল, "আপ্‌নার বৌ-দি ত বল্‌ছিলেন, তাঁর শীলাকে যত ভাল লাগে, এমন আর কাউকেও নয়।"

সুব্রত অন্য দিকে ঈষৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন, কে আস্‌তেছেন। আমি ও-ধারে গিয়ে দেখি, সকলে কি কাজ কোর্‌ছে। আজ রাত্রিতে বাজী পোড়ান হবে, সব ঠিক্ করা হচ্ছে।"

রমা। আপ্‌নি দেখ্‌ছি, মিঃ রায়ের বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছেন!

সুব্রত। শুধু ভক্ত নয়, তাঁকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছি।

দেখিতে দেখিতে বাটীর সম্মুখে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, রমা ছুটিয়া দেখিতে গেল, কে আসিয়াছে। সুব্রত অন্যমনস্কভাবে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রমা দেখিল গাড়ীর উপর হইতে এক উড়িয়া বেহারা নামিয়া পড়িয়া বলিল, "আইলানি;

ঝাট উতরি যাও।" (১) তাহার পর সে গাড়ীর দ্বার সজোরে খুলিয়া দিল। রমা দেখিল, শীলার খুড়ীমাতা অনেকখানি ঘোম্‌টা টানিয়া তাহা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে নামিলেন। অমিয় কাল-বিলম্ব না করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রমা অগ্রসর হইয়া শীলার খুড়ীমাকে বলিল, "আসুন, উপরে আসুন; দিদিমা উপরে আছেন।"

গৃহিণী। (মৃদুকণ্ঠে) তোমরা বুঝি এখানেই আছ? কখন এসেছ?

রমা। মিঃ রায় দিদিমাকে চিটি দিয়েছিলেন, আজ এসে পৌছবেন। তাই আজ আমরা সকালেই এসিছি। দেখুন্ না, তাঁদের জন্যে কত সাজান হয়েছে!

গৃহিণী। আমিও তাই তাড়াতাড়ি দু'মুঠো খেয়েই এনু। অমি ত আস্‌বার জন্যে রসাতল করে ফেলেছে। সে বল্‌ছে ইষ্টিসেনে যাবে।

রমা। বেশ ত। যখন গাড়ী তাঁদের আন্‌তে যাবে, তখন অমিকে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তাঁহারা উপরে আসিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি গৃহে বসিয়াছিলেন। শীলার খুড়ীমাতা আসিলে, তিনি উঠিয়া বসিবার জন্য একখানি বেত্রাসন সম্মুখে সরাইয়া দিলেন। শীলার খুড়ীমা এবার ভূমিতলে না বসিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দেখিলেন, এবার তাঁহার সাজসজ্জারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আজ ত শীলারা আস্‌বে; তাই আমরা সবাই এসিছি। আপ্‌নাদেরও সংবাদ দিয়েছে, লিখেছে। আপ্‌নি এসেছেন, বড়ই ভাল হ'ল।"

গৃহিণী অতিশয় মৃদুকণ্ঠে, যেন কে তাঁহার কথা শুনিয়া ফেলিবে, এইরূপভাবে বলিলেন, "আস্‌বো বই কি! জামাই-মেয়ে বাড়ী আস্‌বে, না এলে কি হয়? তাড়াতাড়ি তাই কাজ সেরে নিয়ে এনু। কর্ত্তা ত ইষ্টিসেনে যাবেন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বেশ ত, ভালই হবে।

রমা ইত্যবসরে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমা, মিঃ বসু বাড়ী যেতে চাচ্ছেন। কি করা হবে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, "যেতে দেওয়া হবে না; আর কি হবে? আমার নাম কোরে গিয়ে মানা কর গে; আর"—এই বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রমা তাহা না শুনিয়াই চলিয়া গেল।

গৃহিণী। কোন্ বসু গা? প্রভাত বোস?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। না, সুব্রত। সেই ত আজ সারা সকাল-বেলাটা এই গোচ-গাছ করেছে।

গৃহিণী। সুব্রত? যার সঙ্গে শীলার বে'র কথা হয়েছিল?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। হাঁ, কথা ত হয়েছিল। এখন যে সুপ্রকাশের সঙ্গে সুব্রতর বড় বন্ধুত্ব হয়েছে। শীলার যখন আগ্রায় খুব অসুখ হয়, সুব্রতও সেইখানে ছিল।

গৃহিণী। সত্যি! খুব আশ্চর্যি ত! বিয়ে হ'ল না বোলে, প্রভাত বোসের মা এসে একদিন আমায় কত কথাই শুনিয়ে গেলেন। তা, দিদি, আমি কি মানা করেছিলুম? তখন মনে হ'ত বটে, প্রভাত বোসের বাড়ী

(১) আসিল; শীঘ্র নামিয়া যাও।

পড়্‌লে শীলা বড়-ঘরে পড়্‌বে। তা শীলা আমার রাজরাণী হয়ে জন্মেছেন! লক্ষ্মীশ্বরী হয়ে বেঁচে থাকুন! তাঁর দয়ায় কত দীন-দুঃখীর প্রাণ-ধারণ হবে।”

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু হাসিলেন। যে-দিন গৃহিণীর সহিত তিনি প্রথম সাক্ষাৎকার করিতে যান, তখনকার ও এখনকার ভাষার কত প্রভেদ!

*　　*　　*　　*

ট্রেণ ক্রমশঃ ‘ষ্টেসনের’ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শীলা উৎসুক-নেত্রে গবাক্ষ দিয়া চাহিতেছে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সুপ্রকাশ ছোট দুই-একটি আবশ্যক দ্রব্য গুছাইয়া সম্মুখে রাখিলেন। ট্রেণের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইল। গুরুগম্ভীর গতিতে ট্রেন ধীরে ধীরে ‘প্ল্যাট্‌ফরমে’ সংলগ্ন হইল। শীলা দেখিল তাহার কাকা ও অমিয় তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুপ্রকাশ দেখিলেন, তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি শীলার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নামাইলেন।

অমিয় লজ্জিতভাবে শীলার প্রতি চাহিতেছিল। শীলা তাহার কাকার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল ও অমিয়কে কাছে ডাকিল! রামলোচনবাবু শীলাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিলেন; এবং সুপ্রকাশকে বলিলেন, “আপ্‌নার জিনিষ আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপ্‌নি শীলাকে নিয়ে বাড়ী যান।”

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে তাঁহার চরণ-রেণু শিরে গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে বলিলেন, “আমায় ‘আপ্‌নি’ বল্‌বেন না! আপনি ত আমারও কাকা হন্!”

এই শ্রদ্ধাপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্য-কয়টি শ্রবণ করিয়া রামলোচনবাবুর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, “তোমার গুণের আর কি পরিচয় দোব, বাবা! তোমার মঙ্গল জগদীশ্বর কোর্ব্বেন।”

অমিয় ধীরে ধীরে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা, আমি দিদি-ভাইয়ের সঙ্গে যাই?”

তিনি বলিলেন, “তোমার দিদি-ভাই যদি বলেন, যাও।”

অমিয় আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিল। সুপ্রকাশ ‘হ্যাণ্ড্‌ব্যাগ’টী লইয়া শীলার সহিত গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গাড়ী দ্রুত ছুটিয়া চলিল। গৃহের নিকট-বর্ত্তী হইবার সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, বাটীর ‘গেট’ অতিসুন্দর-ভাবে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা গেটের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চারিদিকে জনপ্রবাহ আসিয়া জমিতে লাগিল। গাড়ী-বারান্দার নিকট গাড়ী গিয়া থামিলে, সুপ্রকাশ নামিয়া দেখিলেন সম্মুখেই হাস্যমুখে রমা ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জি দাঁড়াইয়া আছেন। শীলা নামিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে নমস্কার করিল। রমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, “আজ আর মিঃ রায়ের সঙ্গে একটি-বারও কথা কইতে দিচ্ছি না। এই যে মিঃ বসু কোথায় গেলেন!” সুব্রত বারান্দার এক-পার্শ্বেই ছিলেন; আর আত্ম-গোপন চলে না, কাজেই অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সুপ্রকাশ ও শীলাকে অভিবাদন করিলেন। সুপ্রকাশ হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি কতক্ষণ এসেছ?”

রমা। মিঃ বসু ত সারা-ক্ষণই রয়েছেন! এই ঘর-বাড়ী সবই মিঃ বসু সাজিয়েছেন।

সুপ্রকাশ। এত কষ্ট করে তোমরা আমাদের জন্যে সব সাজিয়েছ! তার জন্যে কি ধন্যবাদ দেব? আচ্ছা, মনে মনে যা আশীর্ব্বাদ কর্‌লাম, তা এখন বল্‌ব না।

সকলে উপরে গেলেন। শীলা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার খুড়ী-মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শীলা তাঁহার পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন, "বেঁচে থাক মা! তুমি আমার রাজরাজেশ্বরী! এতদিন তোমরা এখানে ছিলে না মা, বাড়ী যেন অন্ধকার-পুরী হয়েছিল! অমি আমায় দিনে একশ'বার জিজ্ঞাসা কর্ত্ত, 'মা, দিদি-ভাই কবে আসবেন্?' এখন তোমরা এলে আমরা যেন বাঁচ্‌লাম। জামাই কেমন আছেন? তুমি ত বড় রোগা হয়ে গেছ!"

শীলা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়েছিল; এখন সবাই ভাল আছি।"

রমা এই সময় তাড়াতাড়ি আসিয়া সুব্রত যে 'প্যাকেট'টি তাহাকে দিয়াছিলেন, সেটি শীলার হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ, মিঃ বসু এটা তোমায় দিতে বলেছেন। বেলা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

শীলা তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া দেখিল, মহামূল্য মুক্তা- ও হীরক-খচিত একটী 'ব্রুচ্'; তাহার মধ্যস্থলে মুক্তাক্ষরে লেখা আছে,— "মনে রেখো!" শীলার এই উপহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইল। সে রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে দেখা হয় ত? আমার সঙ্গে কি তিনি দেখা কোর্ব্বেন্ না?"

রমা হাসিয়া বলিল, "দেখা কোর্ব্বেন্ বই কি! যাঁকে নিয়ে ঝগ্‌ড়া তাঁর সঙ্গে ত বেশ ভাব হয়ে গেছে!" তাহার পর সে শীলার কাণের কাছে অগ্রসর হইয়া, খুড়ী-মাতার কর্ণ-গোচর না হয় এইরূপ ভাবে, চুপি চুপি বলিল, "লোকটি কি এতই অপদার্থ যে ভালবাসা যায় না?"

শীলা একদৃষ্টে রমার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মুখে যে কি ভাব অঙ্কিত, তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল, "মিঃ বসুর বিরুদ্ধে আমার কিছু বল্‌বার নেই। আমি আশা করি, যে তাঁকে ভালবাস্‌বে সেই সুখী হবে।"

রমা "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে 'ষ্টেসন' হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার পরই শীলার খুড়ীমাতা চলিয়া যাইলেন। আহারাদির পর মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, রমা এবং মিঃ বসুও চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া যাইবার পরে নদীর দিকের বারান্দায় গিয়া শীলা ও সুপ্রকাশ দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; 'বোট-হাউসে' ক্ষুদ্র বোটখানি বাঁধা রহিয়াছে ও বাতাসে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। শীতের রাত্রি, তাই চারিদিকে যেন একটু কুয়াসার মত কি ছাইয়া আছে; চাঁদের আলোও তেমন উজ্জ্বল নহে। সমস্ত নগরী যেন নিদ্রাচ্ছন্ন। উভয়ের মনেই এক কথা জাগিতেছিল। উভয়ের হৃদয়ে একটী সুরই বাজিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "যখন কটকে এসেছিলুম, ভেবেছিলুম শুধু দু'এক দিন থেকেই চলে যাব। এখানেই যে আমার সুখ-সৌভাগ্য বাঁধা ছিল, তা ত জানতুম না!"

শীলা। আমি যখন এখানে আসি, আমার মন কি নিরাশায় পূর্ণ ছিল! বাবাকে হারিয়ে,

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এসে, কি পরীক্ষাতেই পড়েছিলুম! তুমিই আমায় রক্ষা করলে। তোমাকে পেয়ে এখন আমার আর কোনও অভাব নেই। লোকের কথায় তোমার মত স্বামীকে যে একবারও অবিশ্বাস করেছিলুম, তা এ-জীবনে ভুল্‌বো না।

সুপ্রকাশ। আগে কখনো সুনামের কাঙাল ছিলুম না। তোমায় দেখে, তোমায় পেয়ে, মনে হ'ত, কলঙ্কের দাগ না থাক্‌লেই ভাল হ'ত। বেচারা শৈলেন ভয়ে স্ত্রীকে কিছু বল্‌তে পারে না। তা'র জন্যেই আমার নীরবে থাক্‌তে হয়েছিল। তবে বড় ভয় হ'ত, যদি কখনো তুমি শুন্‌তে পাও! মনে হ'ত, হয় ত তুমি বুঝ্‌বে না; হয় ত, সত্যই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক্‌বে, ক্ষমা কর্‌বে না! যাই হোক্‌, বিবাহিত জীবনে পরস্পরের নিকট কিছু গোপন না থাকাই ভাল। তখন বল্‌লে তুমি হয় ত কিছু মনে কর্‌তে না, আমাকে সহজেই ক্ষমা কর্‌তে—!

শীলা বাধা দিয়া বলিল, "তুমি দেবতা! তুমিই আমায় ক্ষমা কর!"

সুপ্রকাশ শীলার শুভ্র কোমল হস্তখানি স্বীয় হস্তে ধারণ করিলেন।

* * * * *

পরদিন প্রভাতে সুপ্রকাশ বাহিরে গিয়াছেন। শীলা গৃহ-সজ্জার দ্রব্যাদি একটু গুছাইয়া রাখিতেছে ও আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। এরূপ সময়ে রমা সেই স্থানে আসিয়া দ্বারের আড়ালে থাকিয়া গানটি শুনিতে লাগিল। শীলা তাহার স্বভাব-কোমল মধুর স্বরে গাহিতেছিল—

"এম্‌নি ক'রে জীবন ভরে
যেন তোমায় পাই!
সোনার রবি উঠ্‌লো হেসে,
তোমার পানে চাই!
ফুলের গন্ধে, পাখীর কণ্ঠে
তোমার মধু নাম!
তোমায় পেলে কত শান্তি
কতই আরাম!
মনে প্রাণে জাগ্‌ছ তুমি,
ভালবাসা দিয়া,
তোমারি পানে, লও হে টেনে
অবোধ দুটি হিয়া!"

গান শেষ হইয়া গেলে, রমা আসিয়া শীলার গলা জড়াইয়া ধরিল। শীলা চমকিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এত সকালে যে?" রমা শীলার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখটী লুকাইয়া বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছি।"

শীলা একটু থমকিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি চির-সুখী হও।

রমা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চক্ষু-দুইটি অশ্রুপূর্ণ। সে বলিল, "তুমি যাঁকে ভাল বাস্‌তে পার নি, আমি তাঁকে প্রথম দেখা থেকেই ভালবেসেছি। কখনো তাঁর ভাল-বাসার আশা করি নি, তবু দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁর ভালবাসা পেয়েছি? তিনি কাল সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ী গিয়ে দিদিমার কাছ থেকে আমায় চেয়েছিলেন। দিদিমা খুব আনন্দিত হয়েই মত দিয়েছেন। আমিও মত না দিয়ে থাক্‌তে পারলুম না। তবে তিনি একবার তোমায় ভাল বেসেছিলেন, আমি কি তাঁর উপযুক্ত হতে পার্ব্বো?"

শীলা হর্ষোৎফুল্ল বদনে হাসিয়া বলিল,

"রমা, আজ তোমার কথায় যে কি সুখ হ'ল, তা আর কি বল্‌বো! সুব্রত যে তোমায় ভাল বেসেছেন, এটা যে আমার কি সুখের কথা—! তোমরা দু'জনে দু'জনকার ভাল-বাসায় সুখী হও, ঈশ্বরের কাছে এই আমার অন্তরের প্রার্থনা! আমার মনের ভার আজ সব নেমে গেল। তোমায় ভাই, কে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে?"

রমা। তাই আজ প্রথমেই তোমার কাছে এসেছি।

শীলা। এস, আমরা দু'জনে একবার সেই অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে মনের কৃতজ্ঞতা জানাই।—শীলা গাহিল—

"আজ্‌কে মোরা তোমার চরণ
নমি বার বার,
কোন্ স্বরগ হতে আজি
বহে সুধার ধার!
কোন্ গগনে হাস্‌ছে শশী
এমন সুধা-হাসি!
কোন্ বনেতে ফুট্‌ছে এমন
মধু-ফুলের রাশি!
কোন্ রাজার রাজ্যে মোরা
কর্‌ছি সুখে বাস,
কোন্ মন্ত্রে এমন তিনি
পূরাণ অভিলাষ!
সেই চরণে ভক্তি ভরে
নমি বার বার!
যিনি সেই রাজার রাজা মহারাজা
দেবতা আমার!

সঙ্গীতান্তে শীলা বলিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা চির-সুখী হও।"

এই সময় সুপ্রকাশ গীতাদি শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া আনন্দপূর্ণ বদনে বলিলেন, "তোমাদের কি হচ্ছে? এত গানের ঘটা কেন?"

শীলা। রমার সঙ্গে সুব্রতর বিয়ের ঠিক্ হয়ে গেছে।

আনন্দ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া রক্তিম অধর-প্রান্তে হাসির রেখা ফুটাইয়া রমা দ্রুত-পদে সেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল। সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল ভাল; সব ভাল যার শেষ ভাল।"

(সমাপ্ত)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পুণ্য।

(১)

হীন যে আমি বড়ই হেয়, বঙ্গগৃহের বাল-বিধবা,
আমার মত অভাগী এ জগৎ-মাঝে আছে কেবা?
সংসারেরি আবর্জ্জনা, কারো চোখে আমিই দেবী,
গৃহের মাঝে উল্কা-সম আমি যে কি না পাই ভাবি!

(২)

সবাই বলে জগৎ-মাঝে ত্যক্ত যখন তুই লো আজ,
তীর্থে পুণ্য সঞ্চিত কর্, সংসারে তোর কিসের কাজ?
সতীর মহাতীর্থে যেবা বঞ্চিত হয় এই অকালে,
তীর্থ তাহার মিল্‌বে কোথা, আয়ুর প্রাতে এই সকালে?

(৩)

হ্যাগা দিদি, তোমরাও ত আমার মত ভাগ্যহীনা,
বল, কোথায় কত পুণ্য, কেমন ক'রে যাবে জানা ?
যাব কিগো বৃন্দাবনে যেথায় হরি গো-চারণে
ছড়িয়ে গেছেন্ পদরেণু, লয় শিরে যা ভক্তজনে ?

(৪)

কত পুণ্য বৈদ্যনাথে, বারাণসী-পুণ্যধামে ?
যেখানেতে রুদ্র রাজে, শৈব যথা মত্ত প্রেমে ?
প্রকাশ যেথা মাতৃমূর্ত্তি অন্নপূর্ণা রূপে রামা,
বিলায় অন্ন ক্ষুধার্ত্তেরে আনন্দেতে আপ্‌নি শ্যামা ?

(৫)

গয়া কিম্বা প্রয়াগতীর্থ, কিম্বা পূত হরিদ্বারে,
যাব কিগো ত্রিবেণীতে পুণ্য-ভাগিরথীর তীরে ?
ব্রত, নিয়ম, গুরুর চরণ বল্‌ছো মোরে কর্‌তে সেবা
তাতেই কি গো তরে যাবে অভাগী এ দীন-বিধবা ?

* * * * * * *

(৬)

হে গুরুদেব, কল্পতরু, আছে ত সব তোমার জানা,
ব্রত তীর্থ কিছুই ত গো করে নি এ ভাগ্যহীনা !
তবে গুরো, নিরুপায় কি হতভাগী বাল-বিধবা,
স্বামীর মৃত্যু-আজ্ঞা পালন নয় কি তাহা স্বামি-সেবা ?

(৭)

রোগীর গৃহে রোগের সেবা, পীড়িতকে শান্তি দে'য়া,
নয় কি তাহা ধর্ম্ম আমার, নয় কি তাহা তীর্থে যা'য়া ?
ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেওয়া, মাতৃহীনে অঙ্কে লওয়া,
সেগুলো কি ব্রত নহে, সে সব কি বৃথাই মায়া ?

(৮)

চাই না অন্য কর্ম্ম আমি, যদি ও-সব পুণ্য নয় ;
দুখীর দুখে দুঃখী হওয়া না'ই যদি গো ধর্ম্ম হয় !
পার্‌ব নাকো বধির হতে পীড়িতের সে আর্ত্তনাদে,
পার্‌ব নাকো থাক্‌তে আমি হাহাকারে অশ্রু রুধে।

(৯)

সবিস্ময়ে কহেন ফিরি তখন গুরু শিষ্যাপানে,
'তোরাই ত মা অন্নপূর্ণা তৃপ্ত যারা অন্নদানে ;
রোগীর গৃহ তীর্থ যাহার, কিসের কাজ (মা) তীর্থে তাহার?
সেই ত মহাপুণ্য লভে দুঃখ-মোচন লক্ষ্য যাহার।'

শ্রীপাঁচুগোপাল নন্দী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

কেমন করে বেঁচে থাকি বলিবার পূর্ব্বে আমাদের শরীরের কথাটা একটু বলি। আমাদের শরীর ঠিক্ একটি ধোঁয়াকল (Steam Engine). কলে একটি চুলা আর একটি 'বয়্‌লার' (জল ফুটাইয়া বাষ্প করিবার পাত্র) থাকে ; চুলায় কাঠ বা কয়লা সর্ব্বদা দিতে হয়। বাষ্পের জোরে কল চলে। রেল-গাড়ীর কল, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং কলের (Engine) এনজিনে রেলগাড়ী চলে তাও জানেন। কিন্তু আমাদের শরীর যে একটি কল তা, বোধ হয়, অনেকেই জানেন না বা কখন সে বিষয়ে ভাবেন না।

আমাদের শরীর কলের গাড়ী বটে, কিন্তু এর কল বড় আশ্চর্য্য রকমের। এতে যে আগুন জ্বলে, তা থেকে শিখা উঠে না, ধোঁয়া হয় না ; বাষ্প হয় কিন্তু সে বাষ্প দেখা যায় না। চুণে জল দিলে যে রকম তাপ হয়, দেহের তাপ অনেকটা সেই রকম ; কিন্তু ঠিক্ সেই রকম

নয়। শরীরে আগুন দিনরাত জ্বেলে রাখিতে হয়; নতুবা আমাদের শরীরের সকল কল বন্ধ হয়ে যায়, আর আমরা মারা যাই। কঠিন রোগের সময় ডাক্তার শরীরের তাপ সর্ব্বদা পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাপ রক্ষা করিবার জন্য অনেক যত্ন করেন ও অনেক ওষুধ দেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টায় যদি কোন উপকার না হয়, তা হলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, রোগী আর বাঁচিবে না। শরীরের আগুন রক্ষা করিবার জন্য কি-রূপ কয়লার প্রয়োজন, সেগুলি কেমন করে সংগ্রহ করিতে হয়, আর কিরূপে ব্যবহার করিলে আমাদের শরীর রক্ষা পায় ও আমাদের সুখ-স্বাস্থ্য স্থায়ী হয়, তাহা জানিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! দয়াময় ঈশ্বর আমাদের শরীর কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিলে, কে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

"সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিরাম,
ভাবিলে তাঁহার দয়ার বিধান,
উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।"

২

বায়ু, জল, তাপ ও খাদ্য বাঁচিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে বায়ু সর্ব্বপ্রধান। আমরা আহার না করিয়া, পান না করিয়া দুই-একদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু-সেবন না করিয়া অতি অল্প সময়ও বাঁচিতে পারি না। এক মিনিট যদি আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকি, আমাদের কত কষ্ট হয়! তাতেই জানিতে পারি যে, বাতাস আমাদের দেহের পক্ষে কত আবশ্যক। বাতাসের অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া করুণাময় বিধাতা তাহার প্রচুর আয়োজন রাখিয়াছেন। বাতাস ব্যতীত আমরা ক্ষণকাল বাঁচিতে পারি না; সেইজন্য বাতাস সর্ব্বদা সকল স্থানে পাওয়া যায়। আমরা বায়ু-সমুদ্রে বাস করি; আমাদের চারি দিকে বাতাস! যাকে আমরা আকাশ বলি সেটি বায়ু-মণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল আংটীর মত আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। ঊর্দ্ধে প্রায় ২৫ মাইল (১২॥ ক্রোশ) পর্য্যন্ত বায়ু আছে। বায়ুতে দুইটী পদার্থ স্বতন্ত্রভাবে আছে; এক ভাগ (oxygen) অকৃসিজেন বা অম্লজান আর চারি ভাগ (Nitrogen) নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান। বাতাস কখনো স্থির থাকে না এবং কখন একভাবে থাকে না। ইহার বেগ কখন অধিক, কখন অল্প। বেগের বাতাসের নাম ঝড়! সকল স্থানে এবং আমাদের দেহের মধ্যেও বাতাস আছে। বাতাসের অকৃসিজেন ব্যতীত কোন দহন-কার্য্য হয় না; সুতরাং, বাতাস ব্যতীত আমাদের শরীরের আগুন জ্বলে না, নিঃশ্বাস পড়ে না এবং আমরা মারা যাই। আমাদের শরীরে যখন অধিক তাপ হয়, বাতাস তাপ কমাইয়া দেয়। সূর্য্যতাপে জমি যখন বড় তাতিয়া যায়, বাতাস সেই তাপ আকাশের উপর লইয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোক বাঁচিত না। গরম বাতাস কেমন করে উপরে উঠে এবং উপরের শীতল বাতাস নীচেতে নামে, তাহার কৌশল জানিলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। গ্রীষ্মকালে শীতল বাতাসে বসিলে কেমন আরাম হয়। বাতাস আমাদের শরীরের তাপ উড়াইয়া দেয় বলিয়া এত আরাম বোধ হয়। আহা! দয়াময় ঈশ্বরের কতই করুণা, আমাদের সুখে রাখিবার জন্য তাঁহার কতই

বিধান, কতই যত্ন! এই সকল কথা জানিলে তাঁহাকে না ভালবাসিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে!

আকাশের কথা আর একটু বলি। আকাশ বায়ু-সমুদ্র। যেমন ভূমির সমুদ্রে নদনদী এবং নানাপ্রকার জল-স্রোতের ধোয়াট্ এবং নানাপ্রকার পচা দ্রব্য পড়ে' পরিষ্কার হয়, তেমনি আকাশ-সমুদ্রে পৃথিবীর নানাপ্রকার অনিষ্টকর ধোঁয়া, পচা দ্রব্যের পরমাণু, জীবের নিঃশ্বাসের বিষ প্রভৃতি পড়ে' পরিষ্কার হয়।

পূর্ব্বে বলেছি, আকাশ বায়ুতে পূর্ণ। এই বায়ুর চাপ বা ভার আছে। বর্গ এক ইঞ্চি স্থানে প্রায় সাড়ে সাত সের ভার পড়ে। ভেবে দেখ, আমাদের প্রতিজনের উপর কত ভার আছে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরের বাতাসের এমনই শক্তি যে সেই ভার বহন করে আমরা ভার বুঝিতে পারি না।

আকাশে তাপ আছে; দেশ-কাল-ভেদে তাপের পরিমাণ কম-বেশী হয়। কিন্তু আমাদের দৈহিক তাপ সর্ব্বদা এবং সকল দেশে ৯৮.৬ ডিগ্রী থাকে। 'থারমোমিটার' বা তাপ-যন্ত্র-দ্বারা আমরা তাহা জানিতে পারি। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, আমরা কখন তাপে পুড়ে যেতাম, কখন বা শীতে জমে যেতাম। ধন্য ধন্য দয়াময় ঈশ্বর! তাঁহার কি সৃষ্টি-কৌশল!

আকাশে Humidity বা আর্দ্রতা আছে। যে বাতাস যত তপ্ত সে বাতাসে ততই আর্দ্রতা থাকে। যখন বাতাস আর্দ্রতায় পূর্ণ হয় তখন তাহাকে saturated বা তর হয়ে যাওয়া বায়ু বলে। আর্দ্রতার পরিমাণও দেশ-কাল-ভেদে কম-বেশী হয়। আকাশে বহুদূর পর্য্যন্ত খুব মিহি ধুলা থাকে; আকাশের সুন্দর নীলিমা এই ধূলী-রেণুরই বর্ণ। ভারতবর্ষে কোন কোন দেশে ধূলার বৃষ্টি হয়, তাহাতে আকাশ শীতল হয়। সে-সকল দেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না।

সূর্য্যের তাপ এবং সমুদ্রের জল আকাশে নানা খেলা খেলিতেছে। সূর্য্য সমুদ্র হইতে জল উঠাইয়া পৃথিবীকে দেয়, পৃথিবী আবার প্রয়োজনীয় জল আপনার মধ্যে রাখিয়া, বাকী জল আকাশ ও সমুদ্রে ফিরাইয়া দেয়। এইরূপ আদান-প্রদান সর্ব্বদা চলিতেছে; তাহারই ফলে আমরা এত সুখ-স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছি।

"সুখ সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ! তব;
গ্রহ-তারকা-মণ্ডিত নীল নভঃ,
ধনধান্য-ভরা রমণীয় ধরা;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি;
সকলে পুলকে সম-তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে!"

৪

বাতাসে আমাদের কি উপকার করে? বাতাস প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে। (১) শরীরের অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে; (২য়) রক্ত পরিষ্কার করে; (৩য়) খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করাইয়া শরীর রক্ষা এবং পুষ্ট করে। যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না, নানাপ্রকার কষ্ট ও রোগ ভোগ করিয়া আধ্‌মরা হইয়া থাকি এবং অকালে মরিয়া যাই। নগরে অধিক মৃত্যুর সংখ্যা এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ পরিষ্কার বাতাসের অভাব। গ্রাম সহর অপেক্ষা ফাঁকা, সেখানে লোকের বাড়ীর

চারিদিকে অনেকটা খোলা জায়গা থাকে, সেজন্য বাতাস অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও মুক্ত। গ্রামবাসী নানাকারণে অনেকটা সময় বাহিরে কাটায়। ভদ্রলোকের মেয়েরাও স্নান এবং অন্য কারণে বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়; সেজন্য সহরবাসী অপেক্ষা গ্রামবাসী সুস্থ ও সবল।

অপরিষ্কার বাতাস কত প্রকার আমাদের অনিষ্ট করে, তা ক্রমে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদের বাসগৃহ, বাসস্থান, বিদ্যালয়, কার্য্য-স্থান ইত্যাদিতে বাতাস কিরূপে অপরিষ্কার হইয়া নানা অনিষ্ট সাধন করে, তাহা বলি। সকলেই জানেন যে যদি আমাদের শোবার ঘরে খোলা বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকে এবং ঘুমাইবার সময় সেই ঘরের জানালা দরজা সকল যদি বন্ধ করিয়া রাখি, তবে দুর্গন্ধ হয়। তাহা ঘরের ভিতর থেকে তত বুঝা যায় না; কিন্তু একবার বাহিরে এসে ঘরে যাইলেই তখন বেশ বুঝিতে পারি। বাতাস যে কেবল দুর্গন্ধযুক্ত হয় তাহা নয়, ইহা দূষিত হয়। ইহার কারণ কি?

আমাদের খাদ্য-দ্রব্য যখন জীর্ণ হয়, তখন তাহা হইতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়, এইগুলি দুর্গন্ধের কারণ, আর বিষাক্ত হ'বার কারণ (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের শরীরে দিনরাত আগুন জ্বলিতেছে। এই আগুন দুইটি কাজ করে : বাতাস হইতে (Oxyen) অম্লজান টানিয়া লয় এবং (Carbonic Acid) অঙ্গারাম্ল ছাড়িয়া দেয়। আমাদের নিঃশ্বাসে Carbonic Acid Gas জন্মে। এই Gasএ এক ভাগ কয়লা আর দুই ভাগ Oxygen থাকে। আর আমাদের শরীর হইতে যে ঘাম বাহির হয় তাহাতে দেহের ভিতরকার ময়লা ও এক প্রকার তেল বাহির হয়, এই সকল হইতে মন্দ গন্ধ বাহির হয়। দূষিত বাতাসে আমাদের অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটে; রক্ত পরিষ্কার হয় না, খাদ্যদ্রব্য ভাল হজম হয় না, আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, এবং নানা প্রকার রোগ-যুক্ত হই এবং এই সকল রোগ শীঘ্র অতি-কঠিন হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত আনিতে পারে। এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, পরিষ্কার বাতাস আমাদের কত উপকারী এবং অপরিষ্কার বাতাস কত অপকারী! বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করা সকলেরই উচিত। সহরের পার্ক (Park--বেড়াইবার স্থান), বড় রাস্তা বা ছাদের উপর নিয়মিতরূপে সকলেরই বেড়ান উচিত; বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দের। তাঁহারাই মানব-জীবনের প্রস্রবণ-স্বরূপ। সুস্থ মাতার তো সুস্থ সন্তান হয়। রোগা ছেলে-মেয়ে তাহাদের পিতামাতার এবং সমস্ত জন-সমাজের নানা দুঃখের কারণ। যতদিন আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানিব, এবং জানিয়া সুস্থ থাকিতে চেষ্টা না করিব, ততদিন আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। শারীরিক বলই সকল উন্নতির মূল।

কিরূপে বাতাস পরিষ্কার হয় তা একটু বলি। ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখিবার জন্য যথেষ্ট জানালা দরজা ঘরে থাকিবে এবং বাড়ীর ধারে ধারে একটু একটু ফাঁক থাকিবে। ঘরের দুই দিকেই বারাণ্ডা রাখিলে ভাল হয়। বাড়ীর চারিদিকে খানিকটা খোলা জায়গা রাখিবেন, তাহাতে দুই চারিটা গাছ থাকিবে।

সকলেই জানেন যে, গাছ বাতাস পরিষ্কার করে এবং তাপ কম করে। ঘরে বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চাই। কোঠা-ঘরে শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় সমস্ত জানালা খোলা রাখিলে, আমাদের মত গরম দেশে কিছু অনিষ্ট হয় না। আর শীতকালেও একদিকের রুজ্ রুজ্ জানালা খোলা রাখিতে পারা যায়, কিন্তু গায়ে বাতাসের স্রোত লাগিবে না এবং বেশ করে ঢাকা থাকিবে।

এইরূপ করিলে শরীরের শীত সহিবার শক্তি-বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা সুস্থ ও সবল হই। খড়ের এবং খোলার ঘরের চালার পরল থাকাতে বাতাস যাতায়াতের বেশ পথ আছে! শীতপ্রধান-দেশে (ventilation) বাতাসের যাতায়াত সম্বন্ধে অনেক ব্যবস্থা আছে; সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তবে কড়ির ধারে ফাঁক ও চালের পরল-সকল আমাদের দেশেও রাখিতে পারা যায়। বাসস্থান, গ্রাম এবং সহরের বাতাস পরিষ্কার না থাকিলে ঘরের বাতাস কিরূপে পরিষ্কার থাকিবে? বাসভবন পরিষ্কার রাখা গৃহস্থের কাজ।

গ্রাম এবং সহর পরিষ্কার রাখা মিউনিসি-প্যালিটির সভার হাতে। এই সভার সভ্যগণকে City-fathers বলে, অর্থাৎ নগরের পিতৃগণ। তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে সত্য সত্য তাঁহারা এই নামের উপযুক্ত। তাঁহাদের হাতে নগর ও গ্রাম-বাসীর সুখ ও স্বাস্থ্য ও জীবন, বলিলে পারা যায়। বাসভবনের বাহিরের জঞ্জাল ও পূতিগন্ধময় দ্রব্য-সকল যে কেবল ঘরের বাতাস দূষিত করে তাহা নয়, আমা-দের দেহের, বিছানা, কাপড়, ও জিনিষ পত্রের ময়লাও বাতাস মন্দ করে। যাহা কিছু প্রতিদিন কাচিয়া রৌদ্রে দেওয়া যায় তাহা রৌদ্রে দিবে; রৌদ্রের অভাবে আগুনে সেঁকিবে। আর লেপ বালিস ইত্যাদি রৌদ্রে দিবে। এরূপ করিতে গৃহস্থের কিছু কষ্ট হবে, কিন্তু রোগ ভুগিবার কষ্ট হইতে এ কষ্ট বেশী নয়। বাড়ীর নৰ্দ্দমা ভাল করে ধুইবে এবং তাতে চূণের জল দিবে। টাট্‌কা চূণের জল অতি উৎকৃষ্ট এবং সুলভ বিশোধক। মোটের উপর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীরাজমোহন বসু।

শিশুরোগ

আমাদিগের দেশে দম্পতীর সন্তান না হইলে ত সংসারে সুখই নাই; কিন্তু সন্তান হইলেও তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহাদের সুখের আশা নাই। ইহাকালে বার্দ্ধক্যের সম্বল, পরকালের সদ্‌গতির প্রার্থয়িতা, দেশের ও দশের আশা-ভরসার স্থল আমাদিগের শিশু-সন্তানদিগকে লালন-পালন করিতে হইলে, দুর্নীতির কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া; তাহাদিগের মধ্যে সুনীতির বীজ-বপনে গভীর মনোযোগ প্রদান করা যদ্রূপ প্রয়োজনীয়, তাহাদিগের শারীরিক সুস্থতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবারও তদ্রূপ প্রয়োজন আছে। কখনও কখনও

হিতকর বস্তু হইতেও অহিতকর অনুষ্ঠান সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকালে পড়িয়াছি "আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাম্। মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥"—ইহা অতিশয় যথার্থ কথা। মাতাপিতার অত্যধিক আদরে বা তাঁহাদিগের অমনোযোগিতা-হেতু আপনাদিগের সামান্য সামান্য অবৈধাচরণের সংশোধনের অভাবে যদ্রূপ সন্তানগণ দুর্নীতির গ্রাসে চিরদিনের জন্য পতিত হয়, সামান্য সামান্য শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনের ত্রুটীতে, সামান্য সামান্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টির অভাবেও তদ্রূপ কত যে সাংঘাতিক দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদিগের শিশুদেহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা বলিবার নয়! আমাদিগের দেশে অনেকে সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি কত জন্তু পালন করিয়া থাকেন, অজ্ঞান শিশুসন্তানগণও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে, পৃষ্ঠে, মস্তকে বহন করিয়া থাকে; কিন্তু, এই সকল জন্তুদিগের দেহ হইতে যে কি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি-সকল শিশুদেহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা, বোধ হয়, অনেক জনক-জননীই জ্ঞাত নহেন। এমন কি, গোমাতৃকার দুগ্ধ উত্তমরূপে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া না লইলেও তাহা হইতে বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতীকার করা অপেক্ষা ব্যাধি যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। এক একটী শিশুব্যাধি যে কি ভয়াবহ ও দুরারোগ্য, অদ্য তাহার একটী, বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

১। ডিপ্‌থিরিয়া (বা শ্বেতঝিল্লির উৎপত্তির সহিত কষ্টদায়ক গলক্ষত)

এই ব্যাধি বৃদ্ধ ও যুবা অপেক্ষা শিশুদিগকেই অধিক আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও একবৎসরবয়স্ক শিশুদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত বিরল। দুইবৎসরবয়স্ক বালক হইতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকদিগের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। ক্লেব্‌ লোফ্‌লার-নামক জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বহুপরিশ্রমের ফলে আবিষ্কার করেন যে, ডাম্বেলের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (●——●) চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য একপ্রকার অতিক্ষুদ্র কীট এই ব্যাধির উৎপাদয়িতা। এই ব্যাধি-পীড়িত কোনও শিশুর গলদেশ হইতে এই কীট গ্রহণ করিয়া 'মাইক্রোস্‌কোপ্‌' বা অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, ইহারা বহুসংখ্যক। সাধারণতঃ ইহারা দলবদ্ধ হইয়াই থাকে। এই কীট মানবদেহে কোথা হইতে আসে তাহা দেখা যাউক্।

বিড়াল গরু প্রভৃতি পশুদিগের শরীরে এই ব্যাধিকীট উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদিও গবাদি পশু মনুষ্যের ন্যায় সমভাবে ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। গৃহপালিত ব্যাধিগ্রস্ত মার্জ্জারাদির সহবাসে, অনুত্তপ্ত গোদুগ্ধ-পানে এই ক্ষুদ্র কীট মানবদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। আবর্জ্জনাময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও এই রোগ হইতে দেখা যায়! কখনও কখনও, হাম, টাইফয়েড্‌ নিউমোনিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সহিত এই ব্যাধিও সহগামী হইয়া থাকে।

এই রোগের কীট শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর, দুই হইতে আট দিনের মধ্যে শরীরে রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সে-লক্ষণ-গুলি বিবৃত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ, শিশুটী কয়েকদিন তাহার খেলাধূলা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অন্যমনস্কভাবে সময় যাপন করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুও সামান্য ফুলিয়া উঠে এবং চক্ষুর বর্ণ কিঞ্চিৎ আবিল-ভাব ধারণ করে। ইহার পরই শিশুদেহে জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রায় ১০১° হয়। এই সময় শিশুর গলার অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা অত্যন্ত রক্তিম ভাব ধারণ করিয়াছে ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর টন্‌সিলের বা আল্‌জিবের দুই দিক্‌ হইতে বস্ত্রের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম এক প্রকার শুভ্র চর্ম্ম বা ঝিল্লি বহির্গত হইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ যখন সম্পূর্ণ-ভাবে বহির্গত হয়, তখনই শিশুর প্রাণসংশয় ঘটে। ইতোমধ্যে শিশুর মূত্রের সহিত ক্ষার নির্গত হয় ও তাহার জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এই ভীষণ রোগে সচরাচর তিন প্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, রক্ত দূষিত হইয়া; দ্বিতীয়তঃ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিপর্য্যয়-হেতু উহার ক্ষমতার হ্রাস হওয়ায়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে; এবং তৃতীয়তঃ, গলজ শ্বেতঝিল্লি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া, গলার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে, প্রাণবায়ু নির্গত হইতে পারে। ঐই তিনটী কারণের মধ্যে শেষোক্ত কারণেই, অর্থাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অনেক মৃত্যু সংগঠিত হয়।

কোনও বিশেষ ঔষধ সেবনের দ্বারা এই ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণভাবে Injection বা সূচের ন্যায় অতি-সূক্ষ্ম (পিচ্‌কারী) যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশী ও ত্বকের নিম্নে ঔষধপ্রয়োগ-দ্বারা হইয়া থাকে। এই Injection (ইন্‌জেক্‌শন বা পিচকারী দেওয়াকে) Anti-diptheritic Serum-Injection বলে। কারণ, ইহার ফলে দেহ-মধ্যে একপ্রকার antitoxin বা বিষঘ্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা এই ডিপ্‌-থিরিয়ার ক্ষুদ্রকীট-সকল মরিয়া যায় ও রোগের বিষ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু Injectionএর ফল ফলিবার পূর্ব্বেই অনেক সময় উক্ত শ্বেতঝিল্লির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বার রুদ্ধ হওয়ায়, শিশু নিঃশ্বাস-গ্রহণাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে পারে।

এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে, Injection দিবার পূর্ব্বে শিশুর কণ্ঠের বহির্ভাগে একটী ছিদ্র করা হয় এবং সেই ছিদ্রের মুখ হইতে শ্বাসনলী পর্য্যন্ত একপ্রকার বক্র রৌপ্যনল (silver tube) সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বাহিরের বায়ু একেবারে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হওয়ায়, বায়ুকষ্টে শিশুর প্রাণত্যাগ হয় না। যখন এই প্রকারে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হইতে বালককে মুক্তি প্রদান করা যায়, তখন, যতদিন পর্য্যন্ত না সে সুস্থ হইতে থাকে এবং তাহার গলার শ্বেতঝিল্লি মিলাইয়া যায়, ততদিন, প্রতিদিবস বা একদিবস অন্তর তাহাকে Injection দেওয়া হয়। ইহার পর তাহার গলছিদ্র বুজাইবার জন্য রৌপ্যনল

পরিবর্ত্তন করিয়া তৎস্থানে (Rubber tube) বা রবারের নল দেওয়া হয় এবং পরে তাহাও উঠাইয়া লওয়া হয়। ক্রমে ক্রমে গলার ছিদ্রটী বুজিয়া যাইলে শিশু কথা বলিতে সমর্থ হয়।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরও শিশু সম্পূর্ণরূপে সুস্থশরীর প্রাপ্ত হয় না। কারণ, অনেক সময়, তাহার চলিবার ও বলিবার ক্ষমতার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। ইহাকেই ডিপ্‌থিরিয়া-পক্ষাঘাত কহে। এই সময় বালকের কণ্ঠস্বর বিভিন্ন প্রকার হইয়া যায় এবং এই পক্ষাঘাত বৃদ্ধি পাইলে, ইহা সময় সময় শিশুর চক্ষুতারকায় বিকৃতি আনয়ন করে, অর্থাৎ তাহাকে ট্যারা করিয়া দেয়। এই সকল লক্ষণ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ৬ হইতে ৭ সপ্তাহের মধ্যেই ইহা দূরীভূত হয়।

এই রোগপ্রপীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অতিসাবধানে রাখা আবশ্যক; এবং গৃহের অন্যান্য শিশুরা যাহাতে তাহার নিকট গমন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হিতকর। গৃহপালিত কুকুর বিড়াল বা গাভীদিগকেও দূরস্থ করা মঙ্গলজনক। ডিপ্‌থিরিয়া-পীড়িত শিশু রোগমুক্ত হইলে, তাহাকে অন্ততঃ ৬ মাস বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত নহে। কারণ এই শিশুর রোগ বিদ্যালয়ের অন্যান্য দুর্ব্বল শিশুদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে।

শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বামুনদিদি উঠিয়া যাইলে, সুশীলের মনে হইল, সমস্ত ঘরখানার জমাটবাঁধা বাতাসের বুকের উপর হইতে যেন একটা জগদ্দল পাথর নামিয়া গেল; মৌনগাম্ভীর্য্যে নির্ব্বাক্ থাকিয়া সে এতক্ষণ মনে মনে বিলক্ষণ অসহিষ্ণুতা ভোগ করিতেছিল। লৌকিক শিষ্টাচারের খাতিরে তাহার দিদি সকল রকম মানুষের সংসর্গ-দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু সে এ-সব সহ্য করিতে পারে না। এই উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য বাহিরের আঁদাড়-পাঁদাড় দিয়া কোথাও একচক্র ঘুরিয়া আসিবার জন্য তাহার মনটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্তই ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এইবার হাঁপ ছাড়িয়া ডাক্তার-পত্নীর মুখপানে কৌতূহলী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে বলিল, "উনি আপ্‌নাদের বামুনদিদি হ'ন্?"

বিষাদ-ম্লান অধরে একটু হাসি ফুটাইয়া ডাক্তার-পত্নী একটু জোরের সহিত সহজভাবে বলিলেন, "উনি আমাদের স্বজাতি; গ্রাম-সুবাদে ননদ হন্; অনেক দিন থেকে আমার শাশুড়ীর কাছে আছেন। তাঁর রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম সব উনি করেন। সেই জন্যে আমরা বামুনদিদি বলি;—পুরোণো লোক, সেই জন্যে…।" প্রকাশোদ্যত তথ্যটি ত্রস্তে রসনার মধ্যে আট্‌কাইয়া, সহসা ব্যস্তভাবে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন,

আপ্নার্ ত বেশী সময় নেই ?" এই বলিয়া তিনি নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন।

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে নমিতা বলিল, "খাবারগুলা নষ্ট কর্তে এনেছেন? এ সময় আমি শুধু চা ছাড়া—"

ব্যগ্রভাবে নমিতার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া, মিনতি-করুণ কণ্ঠে ডাক্তার-স্ত্রী বলিলেন, "সে জানি, কিন্তু আমি ত এ সৌভাগ্য আর কখনো পাব না ;—আপনাকে মিষ্ট-মুখ করাবার—!"

বাধা দিয়া সলজ্জহাস্যে নমিতা বলিল, "মিষ্ট ত মুখে যথেষ্টই পেয়েছি। সে তৃপ্তির পর পাকস্থলীর উপর এই গুরুভার চাপান বড়ই অবিচার হবে—!"

মাথা নাড়িয়া হাস্য-মুখে তিনি বলিলেন, "স্নেহের অনুরোধে অনেক অত্যাচার সহ্য কর্তে হয়। দোহাই আপ্নার, অনর্থক সময় নষ্ট কর্বেন না, আসুন !"

নমিতা বলিল, "কিন্তু এই রেকাবীখানা সরিয়ে রাখুন। ঐ রেকাবীতে যা খাবার আছে, তাই আমাদের দু'জনের পক্ষে—"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তস্বরে বলিল, "দু'জনের পক্ষেই মারাত্মক ব্যাপার! কি বল দিদি ?—না দিদিমণি, আপ্নি এ রেকাবীখানা সরিয়ে ফেলুন। অত্যাচার একটুখানিই ভাল ; বেশী হ'লেই ভয়ানক হবে !"

শৈশবের সরলতা-মাখান কচি মুখখানি নাড়িয়া, সুশীল এমনি বিজ্ঞতার ভঙ্গীতে নিজের যুক্তিযুক্ত মন্তব্যটি ব্যক্ত করিল যে, নমিতা ও ডাক্তারবাবুর পত্নী উভয়ের কেহই হাসি সাম্লাইতে পারিলেন না। সুশীলকে পাশে বসাইয়া স্নেহ-স্মিত বদনে ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যা ভাল লাগে তাই খাও ; আমি জেদ্ কোর্ব্বো না, ভাই !"

আহার চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে উভয়ের আহার দেখিতে লাগিলেন। খাজাখানা একহাতে ধরিয়া সুবিধামতরূপে আয়ত্ত করিবার পক্ষে সুশীল একটু গোলে পড়িয়াছে, দেখিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি খাইয়ে দেবো, ভাই ?" সুশীল তৎক্ষণাৎ বলিল, "দিন্, দিন্—।"

প্রীত-কৃতার্থ বদনে তিনি হাত ধুইয়া সুশীলকে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিষণ্ণ-করুণ মুখশ্রীতে বিমল-সুন্দর মাতৃত্ব-করুণার স্নিগ্ধ কোমলতা যেন প্রসন্ন তৃপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। চা-পান করিতে করিতে নমিতা নীরব মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের গোপন দ্বৈধ-সঙ্কোচ সমস্ত যেন লজ্জায় অনুতপ্ত-ম্লান হইয়া উঠিল ; তাহার মন করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল ;—সে অকপট বিশ্বাসে এই নারীর সহিত নিজের তুচ্ছ পরিচয়টা সরল অন্তরঙ্গতায়, অকুণ্ঠিত সৌহৃদ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। যিনি এমনভাবে অযাচিত সহৃদয়তায় এতখানি স্নেহ-সরলতায় নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিতকে সাগ্রহে নিকটে টানিতে চাহেন, তাঁহার কাছে কি আর কুণ্ঠা টিকিতে পারে ?

নমিতা নিঃশব্দে ছিল। ডাক্তার-পত্নী সুশীলকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে এ-ও-সে কথা পাড়িলেন। সে কথাগুলা নিতান্তই ছেলেভুলান কথা,—অথচ সেই অনাবশ্যক কথাগুলার

মধ্যেও তাঁহার নিজের বেশ একটু আগ্রহ-উন্মুখতা প্রকাশিত হইতেছিল। যেন এই তুচ্ছ কথাগুলার মাঝে তিনি সত্য সত্যই তৃপ্তি পাইতেছেন, এইরূপ বোধ হইল। কথা কহিতে কহিতে তিনি এক সময় সহসা গভীর স্নেহে সুশীলের ললাট চুম্বন করিয়া আবেগ-ভরে বলিলেন, "আজ থেকে তুমি আমার আদরের ছোট ভাই হলে, কি বল?"

সুশীল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "আপ্‌নাকেও আমার ভারি ভাল লেগেছে—!"

নমিতা স্নিগ্ধহাস্যে বলিল, "তবেই হয়েছে! এবার এ 'ভাল লাগার' ঝক্কি পোয়াতে আপ্‌নাকে দেশছাড়া হতে হবে!"

সুশীল অপ্রতিভভাবে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, "না না, ছোট্‌দিকে জ্বালাতন করি বলে, ওঁর কাছে দুষ্টুমি কোর্‌ব না।—"

বাধা দিয়া তিনি হাসিমুখে বলিলেন, "কেন কর্‌বে না? নিশ্চয় করবে। না হলে, আমি তোমায় ছোট ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌ব কেন?"

বিস্ময়ভরা বড় বড় চোখ-দুইটা তুলিয়া সুশীল সংশয়ান্বিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা বলুন ত, সত্যি, ছোটভাই হলে জ্বালাতন কর্‌তে হয়?"

প্রাণখোলা-আনন্দে উচ্চ কৌতুক-হাস্য হাসিয়া, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "দেখুন দেখি, কি চমৎকার সরলতা! ছেলেদের স্বভাবের এইটুকু আমার বড় মিষ্টি লাগে! কিন্তু আমাদের ঘরে সাধারণতঃ ছেলেদের স্বভাবের সরলতা, শিক্ষার দোষে এমনি অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতায় পেকে উঠে যে, তাদের ব্যাঙ্গামির জ্বালায় তাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে!"

তাঁহার হাসিমাখা মুখের উপর একটা ক্ষুব্ধ ম্লান ভাব ছড়াইয়া পড়িল। এ আক্ষেপ নমিতার প্রাণকেও স্পর্শ করিল। অন্য সময় হইলে সে এ বিষয়ে নিজের প্রচ্ছন্ন মনোভাব নিশ্চয়ই চাপিয়া যাইত; কিন্তু আজ তাহা পারিল না। দ্বিধা ও ইতস্ততঃ মাত্র না করিয়া সে সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ছোট-ছেলেদের কথা আপ্‌নি কি বল্‌ছেন? তারা অজ্ঞানভাবে অন্যের স্বভাব অনুকরণ করে। তাদের দোষ কি? কিন্তু, যাদের একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে যারা একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের ব্যাঙ্গামির ভয়ঙ্কর বহর দেখ্‌লে যথার্থই ভয় খেতে হয়! বুদ্ধিমান্ ছেলে দেখ্‌লে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়, ছোটভাইএর মত তাদের ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। সেইজন্য স্কুল-কলেজের অল্পবয়স্ক ছেলেদের কাছে পেলে, দরকার না থাকলেও আমি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করে, তাদের নেড়ে চেড়ে দেখি। কিন্তু প্রত্যেকের কাছেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের ঘা খেয়ে ঠকে ফিরেছি। ভবিষ্যৎ জীবনে তারা যে কি-রকম ভাবে শিক্ষার সদ্ব্যবহার কর্‌বে, আমি শুধু তাই ভাবি! কথায় কথায় তর্ক, পদে পদে বাক্-চাতুরী, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাত-পা নেড়ে অভদ্র কর্কশ চীৎকারে খালি আত্মগৌরব প্রচারের ব্যস্ততা! দেখ্‌লে ঘৃণায় মন উত্যক্ত হয়ে উঠে!—বেশী নয়, এই সে-দিন কার্য্য-গতিকে সহরের একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী-পরিবারে

আমায় যেতে হয়েছিল। সেখানে বিদ্যা-সাধ্যির খুব সুখ্যাতি-ওয়ালা একটি 'ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের' ছেলেকে দেখ্লুম; ছেলেটি, আরে বাপ্, ওঃ—!" হঠাৎ নমিতা হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"নাঃ, সে কথা থাক্!"

ডাক্তারপত্নী এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে যেন নমিতার কথাগুলা গ্রাস করিতেছিলেন; সহসা থপ্ করিয়া নমিতা মাঝখানে থামিয়া যাওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও ব্যগ্র ঔৎসুক্যে বলিলেন, "না, না, বলুন্ বলুন্, তারপর?"

সলজ্জভাবে হাসিয়া নমিতা বলিল, "ব্যক্তি-বিশেষের দোষ উল্লেখ করে ব্যক্তিগত-ভাবে আলোচনা করা কুৎসা-চর্চ্চার নামান্তর; সেটা কি অনুচিত নয়? তা ছাড়া, সে ছেলে-টির অসংযত আত্মম্ভরিতার জন্য আমি নিজেই দোষী। তার পড়াশুনার প্রশংসায় খুসী হয়ে আমি তাকে আদর করে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেই বোকামি করেছিলাম। যাক্, তার প্রকৃতি-সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি, তা আমার মনেই থাক্; আপনাকে সেটা শুনিয়ে সরলতার অনুরোধে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে বিশ্বাস-ঘাতক হব না। মোটের মাথায়, এই বল্তে পারি যে, আমাদের ভ্রাতা বা সন্তানরা যেন সে-রকম নির্দ্দয় উচ্ছৃঙ্খলতায়, বুদ্ধির অপব্যবহার আর সময়ের অসদ্ব্যবহার না করে, এইটুকু ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্তে শিখেছি।"

তিনি মনোযোগের সহিত নমিতার কথা-গুলি শুনিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা, আমার দেবর নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে আপ্নার আলাপ-পরিচয় আছে?"

দেবরের নামে সহসা দেবরের দাদার পরিচয়টাই তীব্ররূঢ়-ভাবে নমিতার মনের উপর চমক হানিয়া গেল;—তাহার চিত্তের স্বচ্ছন্দতা ধাক্কা খাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "চাক্ষুস পরিচয়-মাত্র।"

নমিতার কুণ্ঠিত ভাবটুকু বোধ হয়, তিনি লক্ষ্য করিলেন; মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বচ্ছল-উৎসাহ-দীপ্ত আনন্দময় মুখখানার উপর একটা মৃদু সঙ্কোচের ম্লানিমা আবির্ভূত হইল; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে আঁচলের ফুঁপির সুতা টানিয়া বাহির করিতে করিতে নতবদনে,—যেন আপন মনেই—বলিলেন, "ঠাকুর-পো ও-রকম শ্রেণীর ছেলে নন; ওঁর মা, আমার খুড়শাশুড়ী, সেকেলে মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন খুব উঁচু ছিল। ঠাকুর-পো মা'র স্বভাবের মজ্জাগত গুণটুকু পেয়েছেন। এমন উদার সরলতা, এমন অগাধ স্নেহশীলতা, আর এমন উন্নত-সুন্দর চরিত্র প্রায় দেখা যায় না—।" তিনি মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন; তারপর বক্ষের নিভৃত অংশ হইতে সহসা-সুপ্তোত্থিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে যদি কারুর হয় ত, যেন ঐ রকম ছেলে হয়!"

একটা তীব্র বিস্ময়ের সহিত নিগূঢ় বেদনার ধাক্কা ধ্বক্ করিয়া আসিয়া নমিতার বুকে বাজিল! মুহূর্ত্তে এই তরুণীর অন্তরাত্মার মূর্ত্তিটা যেন স্পষ্টোজ্জ্বলভাবে নমিতার চোখে ধরা পড়িল।—আহা, কি গভীর বিষাদবহ বিষণ্ণকরুণ দৃশ্য! সমবেদনায় নমিতার বুকের শিরা-উপশিরাগুলি টন্ টন্ করিয়া উঠিল; কিন্তু পাছে অসতর্কতা-বশে সে ভাবটা

প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া, সে মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রসন্ন-সন্তোষের স্নিগ্ধ রসে এ প্রসঙ্গের উপসংহারটা অভিষিক্ত করিয়া লইবার জন্য হাস্যপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুণ; আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপ্নি ঐ রকম সন্তানের মাতা হন।"

পূর্ব্বের মতই একটু ম্লান হাসি নিঃশব্দে তাঁহার মুখে ফুটিয়া নীরবে মিলাইয়া গেল। সে হাসিতে লজ্জা কুণ্ঠা ছিল না, ছিল শুধু একটু অনুতপ্ত যন্ত্রণার ক্ষীণ আভাস! তিনি কথা কহিলেন না, স্তব্ধভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। নমিতা নিজের হাসিতে নিজেই ব্যথিতা হইল।

ক্ষণপরে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ডাক্তারপত্নী ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নমিতার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার আর বেশী দেরী নাই, নয়?"

"না—" বলিয়া নমিতা দ্বারের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বোক্তা বামুনদিদি দ্বারান্তরাল হইতে গলা বাড়াইয়া রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চণ সহ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া, কি যেন একটা অভাবনীয় রহস্যোদ্ঘাটনে ব্যাপৃতা রহিয়াছেন! তাঁহার দৃষ্টিতে অকারণে এমনই একটা ক্রূর-বিদ্রোহ-ভাব ফুটিয়াছে, যে নমিতাও তাহাতে অন্তরে বিরক্তি অনুভব করিতে বাধ্য হইল! গৃহাভ্যন্তরস্থ মানুষগুলির স্বচ্ছন্দ-বিশ্রান্তালাপ যে ঐ অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির পক্ষে অত্যন্তই অপ্রীতিকর ঠেকিয়াছে, তাহা বুঝিতে নমিতার বাকী রহিল না। সে তন্মুহূর্ত্তেই বিদায় লইবার জন্য মনে মনে অধীর হইয়া উঠিল।

বামুনদিদি সরিয়া আসিয়া দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া নমিতার মুখের উপর নির্লজ্জ খর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা খ্রিষ্টান?"

গম্ভীরভাবে নমিতা বলিল, "না, ব্রাহ্ম—।"

তাচ্ছীল্যের সহিত ঠোঁট বাঁকাইয়া, তীব্র-বিজ্ঞতা-কঠিন মুখে তিনি বলিলেন "ঐ, তা-হলেই হোল; ও সবই ত এক।"

নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, ডাক্তার-পত্নী বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, সবই এক বই-কি। থামুন না,—কেন বাজে তর্ক কর্‌বেন। সবই, এক নয়?"

কথাটা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক হইলেও নমিতা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যটা বুঝিল; ঈষৎ হাসিয়া নিরস্ত হইল। বামুনদিদি কিন্তু সেই মৃদু হাসির মধ্যে একটা উপেক্ষা-কঠোর পরাজয়-দৈন্য অনুভব করিয়া রুষ্ট ও অধীর হইয়া উঠিলেন; মধ্যবর্ত্তিনী ডাক্তার-পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা অত হাসি-কাশি কিসের? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, তোমাদের মত ন্যাকা পড়া ত শিখি নি; আমরা অত শত বুঝি না......।" তিনি 'ন্যাকা পড়া'-নামধেয় মহাপরাধের ব্যাপারটার উদ্দেশে আরও কতকগুলি বিদ্বেষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; এবং এখনকার কালের মেয়েরা ঐ 'ন্যাকা পড়ার' দোষে যে কি রকম ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে, তৎসম্বন্ধেও অনেকগুলি তীব্র মন্তব্য প্রকাশে ত্রুটি করিলেন না।

ডাক্তার-পত্নী ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে রহিলেন। নমিতাও নির্ব্বাক রহিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে, বাহিরে নানাশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাকে মিশিতে

হয়, সেই সূত্রে পারিপার্শ্বিক সমাজের লোক-চরিত্রেও তাহার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ ঘটিয়াছিল। সে জানিত, শিক্ষিতের মার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট যখনই অশিক্ষিতের অমার্জ্জিত বুদ্ধি পরাহত হয়, তখনই সে মর্ম্মান্তিক আক্রোশে চটিয়া, মাথামুণ্ড ব্যাপার বাধাইয়া বসে! সুতরাং বামুন-দিদির কটু-কাটব্য তাহার নিকট বিশেষ কিছু অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু নির্ব্বিরোধ শান্তিতে গৃহতলচারিণী এই নিরীহ স্বল্পশিক্ষিতা নারীকেও যে ইহার জন্য গঞ্জনা-পীড়ন সহিতে হয়, ইহা তাহার ধারণা-বহির্ভূত ব্যাপার! বিশেষতঃ সামান্য পাচিকা যে, কি স্পর্দ্ধার জোরে প্রভু-পত্নীর উপর এমন অন্যায় প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সক্ষম হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে তাহার গোলমাল ঠেকিতেছিল! গৃহের মধ্যে গৃহিণীর—না হৌক, 'গৃহবধূ' বলিয়াও যদি ধরা হয়, তবু পরিবারস্থ সকলের নিকট,—অন্ততঃ দাস-দাসীর নিকট তাহার ন্যায্য সম্মান বলিয়া একটা জিনিস আছে বৈ কি! কিন্তু সে এখানে এ কি দেখিতেছে! অনেক পরিবারে অনেক পুরাতন দাস-দাসীর অনেক রকম কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা সে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অসঙ্গত ঈর্ষা-শাসন আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না! মানুষের সহিষ্ণুতা যতই প্রশংসনীয় হৌক, কিন্তু এমন 'অসহ্য' সহ্য-শক্তির জন্য ডাক্তার-পত্নীর উপর তাহার রাগও ধরিতেছিল, দুঃখও হইতেছিল! ছিঃ, নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া থাকিয়া ইনি অন্যের অন্যায় স্পর্দ্ধাকে যে অসহনীয় রূপে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছেন, তাহা কি ইনি বুঝেন না? নমিতার ইচ্ছা হইল, সে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করে;—কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সে থামিয়া গেল; দেখিল সেই ঘৃণারক্ত মুখমণ্ডলে যে কঠিন-তেজস্বী দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ব্বোধের নিরীহ অক্ষমতা নহে,—তাহা শক্তিশালী সুবোধের সুদৃঢ় আত্ম-সংবরণ-চেষ্টার নিঃশব্দ-সাধনা! নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

অবাধে বাক্যস্রোত বহাইবার সুযোগ থাকার জন্যই হউক্, অথবা যে কারণেই হউক্, বামুন-দিদির ক্রোধের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; শেষের দিকে তাহা সত্য সত্যই ভীষণ হইয়া উঠিল! অসহ্য রোষে অগ্নিবর্ষী চক্ষু পাকাইয়া বিসদৃশ ভঙ্গীতে হাত-মুখ নাড়িয়া, বজ্র ঝঙ্কারে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমার খুসি হয়, তুমি খিষ্টেন ম্যামের মত মুচি নিয়ে মুদ্দফরাস নিয়ে নেচে কুঁদে মাতামাতি কর, তাতে আমার কি? তবে গিন্নি আমায় রেখে গেছে, আমি বিধবা মানুষ যখন একপাশে রইচি,—তখন আমাকে সমীহ করে চল্‌তে হবে বৈ কি! না হলে, আমার বয়ে গেছে!—"তিনি কথার সহিত কার্য্যের ঐক্য"-তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে, বলিষ্ঠ ব্যায়াম-কৌশলীর মত ক্ষিপ্রবেগে দুই হাত সজোরে সম্মুখে ছুড়িয়া একযোড়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন।

নমিতার দৃষ্টি খুলিল! মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল! তাঁহার কথার জন্য যত না হৌক্, কিন্তু কথা কহিবার অশিষ্ট ভঙ্গীর জন্য, তাহার চিত্ত জ্বলিয়া গেল। ইনি তাহার জাতি পরিচয় জানিবার জন্য কেন যে রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া এমন উৎকণ্ঠিতভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহা এইবার স্পষ্ট করিয়া বুঝিল; এবং

নিজের পরিচয়টাও এবার স্পষ্ট করিয়া জানাইবার জন্য সে শক্ত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল ও ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুনুন্, আমি নিজে মুচি মুদ্দফরাস কিম্বা তার চেয়েও অন্ত্যজ জাত স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু নেচে কুঁদে মাতামাতি কর্‌বার শিক্ষাটা বাপ-মা আমাকে শেখান নি; তাছাড়া, সে সময়ও আমার নেই। ......আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে এসে আপনাদের বাড়ীঘর অশুচি কর্‌তে বাধ্য হয়েছি, শুধু...... ।"

তিনি সে কৈফিয়ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। মুখ বাঁকাইয়া, ফাটা পায়ের গোড়ালী শক্ত জোরে মেঝের উপর ঠুকিয়া, গুম্ গুম্ শব্দে চলিয়া গেলেন।

নমিতা হাসিয়া ফেলিল! মানুষের মূর্খতার উপর রাগ করিয়া রাগটা ত্রিশ অনুপলের বেশী সময় মনের মধ্যে স্থায়ী করিয়া রাখা, তাহার পক্ষে অনভ্যস্ত ব্যাপার!—তাহার কাল্পনিক অপরাধকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একজনের উপর অসঙ্গত আক্রমণ চলিতেছে দেখিয়াই, তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল মাত্র; —নচেৎ একজন কলহপ্রিয়া অমার্জ্জিত-বুদ্ধি নারীর উদ্দেশ্যে এমন বে-হিসাবী বাক্য খরচ করায়, তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যাক্, ...সম-বল-প্রধান চিকিৎসার সূত্রপাত দেখিয়াই যে ব্যাধি নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং মানুষটি হাত-মুখ চালান অপেক্ষা, পা চালানই যে এক্ষেত্রে শ্রেয়স্কর বুঝিয়াছেন, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়; অন্য দুঃখ নিষ্প্রয়োজন!

কিন্তু পরক্ষণেই নমিতার হাসি স্থগিত হইল। ডাক্তারপত্নী নমিতার দুইহাত ধরিয়া অশ্রু-ছল্-ছল্ নয়নে, আহত করুণকণ্ঠে বলিলেন—"সাম্প্রদায়িক পার্থক্য-জিনিসটার পরিমাণ কতখানি তা জানি নে;—কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিমাণ যে সঙ্কীর্ণচেতা মানুষের মনে অপরিসীম, সেটা পদে পদে সাংঘাতিক রকমে বুঝ্‌ছি একজন্মী। ঈর্ষায় বুদ্ধিকে ক্রমাগত শানিয়ে আমরা খুব তীক্ষ্ণধার করে তুল্‌তে শিখেছি, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক সম্প্রীতি ভেদ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য;—বাইরের ব্যাপার জাতিভেদ, তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র!"

একি প্রাণস্পর্শিবেদনায়, গভীর আক্ষেপে হৃদয়গ্রাহী উক্তি! এখানে,—এমন উক্তি শুনিবার সম্ভাবনা যে স্বপ্নাতীত আশ্চর্য্য কাহিনী! মুগ্ধ আনন্দে নমিতার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কৃতজ্ঞকণ্ঠে সে বলিল, "ধন্যবাদ, আপনি ঘরেরর মধ্যে নিরুপদ্রবে নির্ব্বিরোধে বাস করেও এটুকু ভেবে থাকেন। বড় খুসি হলুম, আপনার বামুনদিদি বেচারী চলে গেছেন, কাছে থাক্‌লে এখন আহ্লাদের সঙ্গে তাঁকে একটা নমস্কার করে নিতুম। ভাগ্যিস্ তিনি দয়া করে মাঝখানে ঝাপ্টা দিয়ে গেলেন, তাইত আপনার মনের কথা...... ।"

বাধা দিয়া উত্তেজনাদীপ্ত মুখে তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না, ঘৃণায় জীবন জর্জ্জর হয়ে গেছে— !"

মনের বিচলিত ভাবটুকু প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রসন্নহাস্যে নমিতা বলিল, "ও-রকম কথা অনেক জায়গায় অনেক লোকের কাছে আমায় শুন্‌তে হয়; ওসব তুচ্ছ কথায় কি কাণ দিলে চলে? না না, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না— ।"

"কিছুই মনে করি নি; করবার অধিকারই

নেই !—" যুগপৎ ডাক্তারপত্নীর চোখে অশ্রু, মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; ভিতরের উচ্ছ্বসিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া, থর-কম্পিত ওষ্ঠে তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এখনই যাবেন ? আচ্ছা, একবার দাঁড়ান, ও-ঘর থেকে আস্‌ছি— !"

তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নমিতা সূতারগুলি ও ক্রুশটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "সুশীল ওঠ, তোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে হাঁসপাতালে ফির্‌ব।"

সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতিবিস্ফারিত মুখে চুপি চুপি বলিল, "এঁদের বামুনদিদিটা কি ভয়ানক লোক ! ওরে বাবা, এমন হাত পা-নাড়ার কায়দা ..... !"

নমিতার ধমক খাইয়া সে চুপ করিল। ডাক্তার-পত্নীর ফিরিতে বড়ই দেরী হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। সময় বহিয়া যাইতেছে, আর অপেক্ষা করিলে হাঁসপাতালে চাম্মিয়ানের কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে ! উদ্বিগ্ন হইয়া নমিতা পা-পা করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। বিদায় সম্ভাষণের শিষ্টাচারের অপেক্ষায় থাকিতে গেলে, ওদিকে যে কর্ত্তব্য অবহেলার দায়ে পড়িতে হয় !—কি বিভ্রাট !

অধৈর্য্য হইয়া নমিতা অবশেষে তাঁহাকে ডাক দিবার উপক্রম করিল ; কিন্তু তাহা করিতে হইল না। ডাক্তারপত্নী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন, ব্যগ্রভাবে বিদায়-সম্ভাষণ-জ্ঞাপনে উদ্যতা নমিতা তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল!—আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ! এই কয় মুহূর্ত্তের ব্যবধানে সেই সুস্থ সজীব মুখচ্ছবির উপর যে মরণাহতের ক্লান্তি-বিবর্ণতা ছাইয়া পড়িয়াছে ! এ কি অদ্ভুত দৃশ্য !—তাঁহার চরণগতিটুকু শুদ্ধ স্পষ্ট দৌর্ব্বল্যে অবসন্ন স্খলিত !

উৎকণ্ঠিতা নমিতা বলিল, "এ কি, হঠাৎ আপনাকে এ রকম দেখ্‌ছি ! কোন অসুখ বোধ হচ্ছে কি ?"

নমিতার প্রশ্নে তিনি যেন একটু সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ; শ্রান্ত চক্ষু-দুইটি যথা-সাধ্য চেষ্টায় সহজভাবে নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, পাংশু-মলিন অধরপ্রান্তে জোরের সহিত একটু অগ্রাহ্যের হাসি ফুটাইয়া মৃদু-জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, "ওটা কিছু নয় ; পুরোণো ব্যামো ; ছেলেবেলা থেকেই বুক ক্ষীণজোর, তার ওপর স্নায়ুর গোলমাল আছে, সেইজন্যে সময় সময় অমন একটু-আধ্‌টু কষ্ট হয়।—ও ধরি না। শুনুন্—" নমিতার সমীপবর্ত্তী হইয়া, কম্পিত-শীতল হস্তে তাহার হাতে একখানি কাগজ-ভরা মুখ-আঁটা খাম দিয়া বলিলেন, "এতে কিছু রইল— ।" তাঁহার কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল, একটু থামিয়া কুণ্ঠা-ভীরুদৃষ্টিতে, সম্মুখস্থ রান্নাঘরের রোয়াকে চকিত কটাক্ষপাত করিয়া খুব নিম্নস্বরে বলিলেন, "আপনার অবসর সময়ে এটা একবার খুলে দেখ্‌বেন।—আমি যোড়হাত করে বল্‌ছি আমার অনুরোধটি রাখ্‌বেন।...না, এখন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না, আমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।"—তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, অতিকষ্টে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া ঘন-কম্পিতবক্ষে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্না নমিতা

খামখানার দিকে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিল না ; তা ছাড়া রান্নাঘরের রোয়াকে দণ্ডায়মানা বামুনদিদিকে বুকের নীচে আড়-ভাবে স্থাপিত বামহাতের উল্‌টা পিঠে হরিনামের ঝুলি-শুদ্ধ ডানহাতখানার উপর ভর রাখিয়া, দ্রুত ওষ্ঠসঞ্চালনে নামজপ করিতে করিতে, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুঞ্চন সহকারে একাগ্রদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, নমিতা খামখানার প্রসঙ্গে আধ-খানিও প্রশ্ন উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল !—খুব সহজে, যেন কিছুমাত্র কৌতূ-হলের বিষয় বা অপ্রত্যাশিত বস্তু নহে, এমনি ভাবে বিনাবাক্যে খামখানা জামার ভিতর যথাস্থানে রাখিয়া, ডাক্তার-পত্নীর পানে চাহিয়া বলিল, "সে যাই হোক্, আপনি এখন ঘরে গিয়ে বিছা নায় শুয়ে, চুপ্‌চাপ নির্জ্জনে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করুণ ; তা হলেই বোধ হয়— ।"

জোরের সহিত মাথা নাড়িয়া, তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়। ওর জন্যে কিছু ভাব্‌তে হবে না। আর একটি কথা,— ।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত তিনি বলিলেন, "এখানকার অপ্রিয় ঘটনাস্মৃতি যত শীঘ্র পারেন, ভুলে যেতে চেষ্টা কর্‌বেন— ।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বর্ষাতি।

(লজ্জাভাঙ্গা।)

সে-দিন শ্রাবণের ধারা অবিশ্রান্ত-ভাবে ধরাবক্ষে পড়িতেছিল। সন্ধ্যার পর দোর জানালা বন্ধ করিয়া সকলে যখন টেবিলের চারিধার ঘিরিয়া বসিলাম, তখন অতুল বলিল, "আজ কার পালা ?" নীরদ আমার দিকে চোখ চাহিতেই আমার প্রাণ উড়িয়া গেল ; এ দলের ভিতর মুখ খোলা যে সে ব্যাপার নয় ! তাতে আমার মত লোক একেবারে 'থই'-হারা হ'য়ে যায় ! আমি শরতের আড়ালে মুখ লুকুতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নীরদ ছাড়িবার পাত্র নয় ; সে স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিল, "সেটি হচ্চে না বিমল ! রোজ তুমি ফাঁকি দাও, আজ তোমার মিলনের গল্পটি শোনাতে হচ্চে।"

রমেশ বলিল, "সে কি রকম ?"

নী। সে একটু বেশ মজা আছে শোন না।

আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলাম, "নিতান্তই রাক্ষসের মুখে আজ আমায় যেতে হবে ?"

নী। হবে না তো কি ? তুমি একেবারে পয়গম্বর নাকি যে, একেবারে বাদ পড়বে ?

আমি বলিলাম, "তবে ভাই, একটু কম করে হেঁসো। যে ক'রে তোমরা চেঁচিয়ে ওঠ ! জান তো অমন কল্লে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুবে না।"

সকলের অনুরোধে অবশেষে আমি আরম্ভ করিলাম, "জান তো যখন আমার

বিয়ে হয়, সেটা ফাল্গুন মাস! কলেজে নভেলে নূতন নূতন প্রেমের স্বাদ পাচ্ছি, সেই সঙ্গে মনটিকেও একটি বসন্তের প্রমোদ-উদ্যান করে সাজিয়ে তুল্‌ছি, সেই সময়ে যখন সেই নেশা-বিভোর চক্ষে সুরমা সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝ্‌তেই পাচ্চ আমি কি হলুম!"

রমেশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বা! বা! বেশ। তবে নাকি বিমল কথা জানে না?"

আমি বলিলাম, "না ভাই আমি আর পার্‌ব না।"

নীরদ রমেশকে ধমক্ দিয়া আবার বলিল, "না ভাই তুমি চালাও, ফের যদি ও চেঁচায়, ওর মুখে গোবর চাপা দিব।"

পুনরায় আরম্ভ করিলাম, "কি বল্‌ব, সে কি সৌন্দর্য্য! বসন্তের ভাণ্ডারে যত সৌন্দর্য্য ছিল, সব বুঝি নিঃশেষ করে এই তরুণীর দেহ সাজান হয়েছিল! তার দেহের বর্ণের কিসের সঙ্গে উপমা দিলে ঠিক হয়, আমি এখনও তা ঠিক্ কর্‌তে পারি নি। যদি জ্যোৎস্নার আর একটু গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠ্‌তো তবে, বোধ হয়, তার রংয়ের সঙ্গে তুলনা হ'তো।"

হতভাগা রমেশ আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "সাবাস্ রে দেখিস্!"

আমি। সব চেয়ে আমার ভাল লাগ্‌তো তার সেই আজানুলম্বিত কুন্তলরাশি। সেই কৃষ্ণ অলকাবলী কি সুন্দরভাবে তার ললাটে এসে পড়েছিল! তারই নীচে নীল পদ্মের মত চোখ-দুটি ঝল্ ঝল্ কচ্চে! দেখ্‌লেই আমার দীনবন্ধু-বাবুর, 'জানিত না পুরাকালে মহা-কবিচয়" মনে পড়ত।

ফাজিল রমেশ আবার বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুই খুব বেঁচে গেছিস্! কেশনাগিনী তোকে কোন দিন ফোঁস্ করে নি তো?"

আমি তদুত্তরে বলিলাম, "যা, তুই বক্‌বক্ করগে। তোর কথায় আবার মানুষে কাণ দেয়?" এই সময়ে নীরদ মৃদু হাঁসিয়া বলিল, "ঠিক্, রমেশটা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে।"

অপরে বুঝিল না কিন্তু আমার ভারি রাগ ধরিল; বলিলাম, "তবে আমি উঠিতেছি।" চারিদিক্ হইতে নাগপাশ বেড়া করে আমায় ধরে ফেল্লে ও বল্লে, "আরে দাদা—কি কর? বসে যাও, বসে যাও!"

আমি। কিন্তু এত রূপ চোখের সাম্‌নে পেয়েও আমার তা প্রাণভরে দেখ্‌বার সাধ মিট্‌ল না, আমায় দেখ্‌লেই পাতার ভিতর মুখখানি লুকানর মত সে ঘোমটার আশ্রয় নিত। এমন কোরে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে বস্‌তো—!

রমেশ, আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার ভয় হ'তো পাছে উত্তাপে ননীর পুতুল গ'লে যায়—!"

আ। ফুলশয্যার রাত থেকে, ক'দিন ধরে কত সাধ্য-সাধনা কল্লুম, কত কাঁদ্‌লুম, কত রাগ দেখালুম, কিছুতে কিছু না! আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত!—হায় বিধি! "সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব, কো দূর করব পিয়াসা!"—

র। ওরে ও বোকা, কলেও এক বিন্দু জল ছিল না!

নীরদ এবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোকে নিয়ে গল্প শোনা যে দায় হ'য়ে উঠ্‌ল?" তখন সুশীল ও সুবোধ বালকের

মত হাত-জোড় করিয়া রমেশ বলিল, "এবার মাপ্ কর দাদা, আর কোর্ব্বো না।"

আমি। চোরের মত কেবল সারাদিন সুরমাকে লুকিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ খুজে বেড়াতাম। যখন দেখ্‌তাম যে, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাঁস্‌ছে, কথা কচ্চে তখন আমি আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে সেই দিকে চেয়ে থাক্‌তাম! ভাব্‌তাম্, আমার সঙ্গে কবে সুরমা অম্নি করে কথা কবে!

ক'দিন পরে সুরমার পিতা এসে আমাদের দু-জনকেই নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি, সুরমার বিস্তৃত সংসার। এত পশু পাখী পুষেছে, যেন একটা চিড়িয়াখানা! তারের ঘরে ময়ূর নাচ্চে, বাগানে হরিণ-শিশু লাফিয়ে বেড়াচ্চে, পিছনে পিছনে 'ভুলো', 'নলি', 'নীলে' বিলাতি কুকুরের দল সুরমার সঙ্গে ঘুরিতেছে। কোলে একটি মেনিপুষিও বাদ যায় নি। সেই নব-নীরদের মত চুলের রাশ নাচিয়ে নাচিয়ে বিদ্যুৎ-লতার মত সুরমা খেলে বেড়াচ্চে! তার এ-রূপ দেখে আমার চক্ষু যেন জুড়িয়ে যেত! কিন্তু আমার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল।"

রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আহা!"

আ। সে যখন শয্যায় ঘুমাইত, তখন আমি উঠিয়া গিয়া তার সেই অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি একদৃষ্টে দেখ্‌তাম! সেই শুভ্র ললাটে কালো টিপ্ কি সুন্দরই দেখাইত! তার কৃষ্ণ-কবরী বেড়িয়া মল্লিকার মালা মধুর সৌরভে আমার অন্তরে মোহের সৃষ্টি করিত। নীলাম্বরী-বেষ্টিত দেহখানিতে সেই মধুর মুখখানি যেন শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মের মত আমার অন্তর স্নিগ্ধ করিত! তার উপর চাঁদের আলো আসিয়া সেই উজ্জ্বলবর্ণ আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিত। দেখিয়া দেখিয়া আত্মহারার মত আমি তার ঘুমন্ত মুখ অবলোকন করিতাম।

আবার রমেশ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ!"

আ। কিন্তু যে দিন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, সে-দিন এ সুখটুকুতেও আমি বঞ্চিত হইতাম। তৎক্ষণাৎ ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া সুরমা শয্যা হইতে নামিয়া পড়িত; কোনও দিন বা খাটের নীচে ভূমিতেই পড়িয়া থাকিত; আমি শত চেষ্টাতেও আর তাকে তুলিতে পারিতাম না। কোনও দিন বা একেবারে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত।

রমেশ এই সময় বলিয়া উঠিল, "বাছা রে—!"

আ। সুরমার ডোরা বলিয়া একটা কুকুর ছিল, সেটার ভারি কাম্‌ড়ান রোগ ছিল। সুরমার পিতা সেটাকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন। সুরমা কিন্তু সেটাকে লুকাইয়া খাবার দিত। তার ক্ষুধা পাইলেই সে চুপি চুপি সুরমার সন্ধানে বেড়াইত। সুরমার পিতা মাতা দেখিতে পাইলেই, সুরমাকে বলিতেন 'কোন্‌দিন তোকে কাম্‌ড়াবে দেখিস্।' সে ইহাতে মাথা নাড়িয়া বলিত, "কখনই না।"

সে-দিন পূর্ণিমার রাত। আমি যে ঘর-টিতে শুইতাম, তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ খোলা; ফুটন্ত জ্যোৎস্নারাশি ঘরের ভিতর লুটোলুটি করিতেছিল। আমাদের ঘরের নীচেই ফুলের বাগান। তার সৌরভরাশি দক্ষিণ-বাতাসে মিশিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

আমি শুইয়া সুরমার কথাই ভাবিতেছিলাম ; কেবল মনে আসিতেছিল, "এমন চাঁদিনী মধুর যামিনী.. ...ইত্যাদি।" কি জানি কেমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ! কখন্ সুরমা আসিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন অনেক রাত্রি। চাহিয়া দেখি পাশে তো সুরমা নাই ! কোথায় গেল ! তার স্বভাব তো জানি ! হয় ত, বিছানার নীচে শুইয়া পড়িয়া আছে। খাট হইতে নামিয়া চাহিয়া দেখি, সত্যই তাই। সেই নীলাম্বরী-জড়ানো, আগাগোড়া ঢাকা, কুঁকড়ি সুঁকড়ি হইয়া খাটের নীচে সে শুইয়া ঘুমাইতেছে। উত্তর পাইবার আশা নাই, জানিয়াও দুইবার ডাকিলাম,—"সুরমা উঠে এস।" কোন সাড়াই পাইলাম না। তখন ঘুম ভাঙ্গানর বৃথা চেষ্টা ছাড়িয়া, একবার জান্‌লার কাছে দাঁড়াইলাম। তখন চন্দ্রকিরণে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। সেই আধ আঁধার আধ জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে সুরমার চাঁদ-মুখ অনন্ত ভালভাসা লইয়া আমার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আবেশপূর্ণ হৃদয়ে ধীর পদবিক্ষেপে সুরমার নিকটস্থ হইলাম। পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সুরমার দেহ স্পর্শ করিলাম না। যেই মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়াছি, অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মুখ ঘুরিয়া আমার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিল এবং সেই দণ্ডেই ভীষণ ভাবে দাঁত দিয়া কাম্‌ড়াইয়া ধরিল।

সেই শ্রোতার দল এক সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল, "অ্যাঁঃ—সেই সুন্দরী ! হ্যাঁরে, সুরমা তোরে কামড়ে দিলে !"

আ। দূর ছোঁড়ারা ! এমন লোকদেরও গল্প শোনায় ! তিনি হচ্ছেন আমার প্রেয়সীর প্রিয়কুকুর—ডোরা। "তখন একটা উচ্চ হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বাপ রে ! কি ব্যাপার ! হাসি থাম্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল।

অতুল বলিয়া উঠিল, "মজা বটে। তা পর, তা পর ?"

আমি। "তা পর তোমরা যেমন করে হেসে উঠ্‌লে আমিও ঠিক্ ওম্‌নি করে 'বাপ্‌রে গেলুম' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। আমার শ্বশুর সাড়া দিয়ে উঠলেন, "কি হয়েছে ?"

আ। আর কি হয়েছে ! আমার গাল দিয়ে তখন দর্‌দর্ করে রক্ত বেয়ে যাচ্চে ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাঁধের উপর থাবা গাড়্‌তেও ভুলেন নি।

আলো নিয়ে আমার শশুর এসে ব্যাপার দেখে অবাক্ ! কুকুরটা তাঁকে খুব ভয় কর্‌তো ; তার উপর লাঠি হাতে মার্‌তে যাচ্চেন দেখে, সে সরে পড়্‌লো ! তখন বাড়িশুদ্ধ লোক ঘরে এসে হাজির। একদল জামাইয়ের চিকিৎসায় বসিয়া গেল। শ্বশুর বল্লেন, 'সুরমা কোথায় গেল ? আমি হাজার দিন বারণ করেছি, ওটাকে আস্কারা দিস্‌নে ; সেই এ বিপত্তির মূল !' শুনিলাম আমার শাশুড়ীও কন্যাকে খুব বক্‌ছেন !

সকালে মনোরমা এসে বল্লে, "জামাইবাবু, তোমার তো খুব লেগেইছে, কিন্তু দিদিরও যা লেগেছে— !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদির কিসে লাগ্‌ল ?

সে বলিল, "কাল ছোড়্‌দার নেমন্তন্ন ছিল জানেন তো ? সেইজন্যে পিষীমা ঘরের

খিল দেন নি। দিদি দোর খোলা পেয়ে সেই ঘরের বিছানার পায়ের তলায় গিয়ে শুয়েছেন। যখন আপনার ঘরে গোলমাল হয়, তার একটু আগেই ছোড়্‌দা ফিরে আসেন। বাইরের জ্যোৎস্নার আলো যা ঘরে পড়েছিল, তা ছাড়া আর ঘরে আলো ছিল না। দিদিকে ডোরা শুয়ে আছে ভেবে, ছোড়্‌দা খুব জোরে একেবারে এক-লাথি!" এই বলিয়া বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার কিন্তু বুকের ভিতর একটা বেদনা বাজিয়া উঠিল;—আহা সেই কোমল দেহে কত লাগিয়াছে! হাসি থামাইয়া বালিকা বলিল, "দিদি যাই ধড় মড়্ ক'রে উঠে পড়েছিল, নইলে ছোটদা হয়তো ছড়ি-পেটা করতেন। তার পরেই নাকি, আপনার ঘরে শব্দ শোনা গেল! দিদির যেমন আদুরে কুকুর তেম্‌নি হয়েছে!" বালিকা আবার হাসিতে লাগিল। আমার কাছে আর কোনও উত্তর না পাইয়া সে খেলিতে গেল।

দুপুর বেলায় একটু ঘুমই আসিয়াছিল, একটা যেন চাপা-কান্নার সুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; চাহিয়া দেখি সুরমা আমার পাশে বসিয়া দুই-হাতে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সে সময়েও তার সেই চারু ছবি আমার চোখে কি সুন্দরই দেখিলাম! পাছে আমি চাহিয়া আছি জানিলে সে পলাইয়া যায়, তাই অনেকক্ষণ কোনও সাড়া দিলাম না। শেষে আর থাকিতে পারিলাম না; ডাকিলাম "সুরমা!" সে চোখ হ'তে হাত নামাইয়া এই প্রথম আমার দিকে চাহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাঁদিতেছিলে কেন?" সে আবার চক্ষু নত করিল; দেখিলাম ওষ্ঠ-দুটি একবার একটু ফুলিয়া উঠিল; পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার জন্যে তোমার এই কষ্ট!"

সে আমার কি আনন্দ? ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার উত্তরে সুরমাকে বক্ষে ধরিয়া বলি, "তোমার অনাদরই আমার বড় ব্যথা সুরমা! তোমার দোষ কই যে ক্ষমা করিব!" কিন্তু কষ্টে সে মনোবেগ সংবরণ করিলাম; গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তোমার এ ব্যবহারের ক্ষমা নাই সুরমা, রাত্রে কোন্ স্ত্রী এমন করিয়া স্বামির ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে!" ছল ছল চক্ষে সে উত্তর করিল, "আর কখনও এমন করব না।"

আমি তবুও ছাড়িলাম না; বলিলাম, "যদি তোমার কুকুর আমার টুঁটি চাপিয়া ধরিত, তা হইলে তখনি তো মরিতাম! তোমার তো বালাই দূর হ'ত, আমার বাপ্-মার কি হ'ত!" সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল, আর আমি নিষ্ঠুরের মত তার সেই রোদন-ভরা মুখখানি আনন্দ অন্তরে দেখিতে লাগিলাম।

রমেশ হুঙ্কার দিয়া উঠিল "কি বীর-পুরুষ!"

ঘড়িতে তখন ১০টা বাজিয়া গেল; চাকর ডাকিল, "বাবু খিচুড়ি নেমে গেছে; ঠাঁই হবে কি?" "নিশ্চয়ই" বলিয়া সে দিনকার মহা-সভা ভঙ্গ হইল। আমি ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 649. September, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৪৯ সংখ্যা।	ভাদ্র, ১৩২৪। সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

বর্ষ-প্রবেশ।

ইচ্ছাময় পরমপুরুষের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় বামাহিতব্রতচারিণী বামাবোধিনী অদ্য তাহার জীবনের চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া পঞ্চপঞ্চাশদ্ বর্ষের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ইহা জ্ঞানের ক্ষুদ্রবর্ত্তিকা হৃদয়ে জ্বালিয়া—নরনারীর পূতহৃদয়বিকসিত ভাবকুসুমরাশি, মানব-জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাঘটনাবলীর বিক্ষিপ্ত বার্ত্তা প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সজ্জিত অর্ঘ্যপাত্র লইয়া মানবের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আসিতেছে! প্রাতঃসূর্য্যের উদয়াস্তের পর পুনর্ব্বার যখন নবভানু পূর্ব্ব অম্বরে উদিত হইয়া পশ্চিম আকাশে বিলীন হইলেন, মানব বুঝিল, একটীর ন্যায় অপর একটী দিবানামধারী খণ্ডকাল বিলুপ্ত হইল! গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অতিবাহিত হইলে, যখন গ্রীষ্মের সূচনা হইল, যখন ৩৬৫ দিবসের পরে সূর্য্যদেব পুনর্ব্বার তাঁহার পূর্ব্বকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, মানব বলিল, একটী বৎসর পূর্ণ হইল! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল-পরিমাণ-দ্বারা পার্থিব বস্তুসমূহের পার্থিব অবস্থানকাল পরিমিত হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্রকালের দ্বারা যদ্রূপ বৃহত্তর কাল সংগঠিত হইতেছে, তদ্রূপ ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা বৃহত্তর শক্তি, ক্ষুদ্র জীবন-দ্বারা বৃহত্তর জীবন, ক্ষুদ্র-সত্তার দ্বারা বৃহত্তর সত্তার সংগঠন হইতেছে!

এক একটী মানবীয়-শক্তির আদি ও অন্ত আমরা তত্তদ্-মানবের আবির্ভাব ও তিরো-ভাবের সহিত বিজড়িত করিয়া পরিমিত করিতে প্রয়াস পাই, কিন্তু যখন দেখি এক একটী শক্তি শতশত শক্তির জন্মদাতা, এক একটী শক্তির প্রভাবে শত শত শক্তি প্রভাবান্বিতা, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল শক্তিই এক মহাশক্তি হইতেই উৎসারিতা, তখন আমাদিগের পৃথক্ পৃথক্-রূপে শক্তিসকলকে ধারণা করিবার বাসনা দূরীভূত হয়। তখন আমরা ক্ষুদ্রবৃহৎ, সম-বিষম, অনুকূল ও প্রতিকূল, সকল শক্তিই

একই সাধনায় প্রবৃত্ত, সকল শক্তিই সেই এক মহাশক্তির মধ্যে অবস্থিত, পরিপুষ্ট, তচ্ছক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তাহারই সহায়তায় বিনিযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই! এই স্থানেই—এই মহাশক্তির ক্রোড়ে ক্ষুদ্রশক্তিকে শায়িত ও কর্ম্মে লিপ্ত দেখিয়া আমরা তাহার সার্থকতা অনুভব করি।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রাক্কালে ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থাসমূহের মধ্যে নারী-হিতৈষণায় প্রণোদিত যে-শক্তির মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে এই ক্ষীণশক্তি পত্রিকা চিন্ময় পরমপুরুষেরই জ্ঞানদীপিকা ইহার ক্ষীণহস্তে ধারণ করিয়া, তাঁহারই দুরবগাহ সত্তার উপলব্ধিভূমি মানবের হৃদয়-বেদিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মহারতির সূচনা করিতেছিল, তখন কে জানিত আজিও ইহার মঙ্গল আরতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে! যাঁহার শাসনে কোটী কোটী গ্রহতারকা সুদূর গগন-পারে মহাপূজায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নীরবে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার অনুশাসনে অনুশাসিত হইয়া সূর্য্যচন্দ্র তাঁহারই মহা আরতিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাহারই প্রীতিসত্তার বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি তাঁহারই চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে, যাঁহার অনন্তবিধানে বিধৃত থাকিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, অদ্য ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিস্তীর্ণ পরিসর দর্শন করিয়া ইহার সার্থক্যের প্রতি সন্দিহান হইলেও, ইহার এই ক্ষুদ্রশক্তির দ্বারা জগতের মহাশক্তির পরিপূর্ণতা দেখিয়া, ইহাকে জগতের সেই এক মহাশক্তিরই অংশ জানিয়া ও প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এই পত্রিকা বিশ্ববিধাতার,—যিনি তাঁহার অনন্ত-শক্তির কণামাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে প্রদান করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে আপনার শুভ ইচ্ছা জাগরিত করিয়া, তাহাদিগের চিত্তে আপনার জ্ঞান ও প্রীতি অহর্নিশ প্রেরণ করিয়া, শত শত শক্তির ধারা একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিয়া, তৎপরে ইহার গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকা প্রভৃতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, ও তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা করিয়া নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক। ওঁ স্বস্তি॥—

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ইমন্—যৎ।

যদি এসেছো এসেছো এসেছো প্রভু হে—
দয়া করি' কুটীরে আমারি;
আমি কি দিয়ে তুষিব ভূষিব তোমারে
—বুঝিতে না পারি!
আমি যাব কি ও হৃদি'পর ছুটিয়া?
আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া?
হাসিব, সাধিব, ঢালিব চরণে
—নয়নের বারি?

যদি পেয়েছি তোমায় কুটীরে আমার,
আশার অতীত গণি;
আজি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে,
কুড়ায়ে পেয়েছি মণি;
যদি এসেছ দিব হৃদয়াসন পাতি';
দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাঁথি';
রহিব পড়িয়া দিবস-রাতি হে
—চরণে তোমারি।

কথা ও সুর—৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
সা রা II গা গা গা। পা মা গা রা। রা গা মা। গা মা পা -া I
য দি এ সে ছো এ ০ সে ছো এ সে ছো প্র ভু হে ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। না না না না। নধা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
দ. য়া ক রি কু টী রে আ০ মা রি ০ ০ আ মি

২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্রা র্গা। র্সা র্রা র্গা -া। না র্সা র্সা। না র্রা সা -া I
কি দি য়ে তু ষি ব ০ ভূ ষি ব তো মা রে ০

[সা রা]
২ ৩ ০ ১ "য দি"
| পা ধা নধা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া পা পা II
বু ঝি তেনা পা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

[ধা ধা]
২´ ৩ ০ ১ আ মি
II পা ধা না। না ননা না না। ধা না র্সা। -া -া পা পা I
যা ব কি ও হৃদি প র ছু টি য়া ০ ০ আ মি

২´ ৩ ০ ১
| ধা না র্রর্সা। র্গা র্গা র্গা র্গা। র্মা র্গা র্রা। -া -া ধা ধা I
প ড়ি বকি প দ ত লে লু টি য়া ০ ০ (আ মি)

২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্রা র্রা। না র্রা র্সা -া। না র্রা র্সা। ধা না না -া I
হা সি ব সা ধি ব ০ ঢা লি ব চ র ণে ০

২´ ৩ ০ ১
| মা ধা পপা। র্সা না র্রা র্সা। র্গা র্রা র্সা। -া -া সা রা II
ন য় নের বা ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

২´ ৩ ০ ১
সা রা II গা গা গা। গা গা -া গা। রা গা মা। গা রা -া রা I
য দি পে য়ে ছি তো মা ০ য় কু টী রে আ মা ০ র

২´ ৩ ০ ১
| সা রা গা। গা হ্মা ধা হ্মপা। -া -া -া। -া -া পা পা I
আ শা র অ তী ত গণি ০ ০ ০ ০ ০ আ জি

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা না। পা ধা ধা -া। হ্মা পা পা। হ্মা ধা পা -া I
আঁ ধা রে প থে র ০ ধূ লা র মা ঝা রে ০

২´ ৩ ০ ১
| গা গা গা। গা রা গা মা। গা রা -া। -া -া রা গা I
কু ড়া য়ে পে য়ে ছি ০ ম ণি ০ ০ ০ য দি

২´ ৩ ০ ১
| হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা। গা হ্মা পা -া।
এ সে ছ দি ব হৃ দ য়া স ন পা ০ তি ০

২´ ৩ ০ ১
| -া -া -া। গা হ্মা পা ধা। পা ধা -া। না না ধা না।
০ ০ ০ দি ব গ লে নি তি ০ ন ব প্রে ম

২´ ৩ ০ ১
| র্রা র্সা -া। না -া ধা -া। র্সা র্রা র্রা। ধা না না -া।
হা ০ র গাঁ ০ থি ০ র হি ব প ড়ি য়া ০

২´ ৩ ০ ১
| পা ধা ধা। হ্মা ধা পা -া। -া -া -া। -া -া -া -া I
দি ব স রা তি হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
| রা গা হ্মা। গা হ্মা ধা ধা। না ধা পা। হ্মা পা সা রা II II
চ র ণে তো মা ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ "য দি"

———

আমি তোমারই।

রাখ আর মার, যা' কর তা' কর,
　আমি তো তোমার, তোমার হে!
তাপে পোড়াইয়া ছাই কর হিয়া,
　তবু তো তোমার তোমার হে!

যদি সাধ হয়, শতধা করিয়া
এ দেহ কুকুরে দেহ বিতরিয়া,
তব উপবন করিতে সেচন
　লহ এ রুধির আমার হে!
ধূলি কর আশা, স্বপনের নেশা,
　আমি যে তোমার তোমার হে!

চিত্ত আমার করি চূরমার
　অনলে দেহ গো ফেলিয়া;
তাই বলে' মোর এ প্রণয় ঘোর
　ভেবেছ কি যাবে চলিয়া?

মম মরমের ভালবাসা যত,
তিল-মাষা নাহি হবে বিচলিত,
ভয় নাহি পাব, বিমুখ না হব,
　তোমার আদর ঠেলিয়া।

শান্ত উদার বক্ষে তোমার
　রহিব গো আমি জড়ায়ে,
নব বিকশিত কুসুমের মত
　বিমল সুবাস ছড়ায়ে!
অথবা আমারে দাহ কর তুমি,
দাবানলে যথা দহে বনভূমি,
উঠুক হাসিয়া পাবক নাচিয়া
　তব রৌরব-শিখার হে!
রাখ আর মার, যা' খুসি তা' কর,
　আমি তো তোমার তোমার হে! *

দরবেশ

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা, অনুমান, ৪ ঘটিকার সময় মা অষ্ট-ভুজার দর্শন-মানসে যাত্রা করিলাম। বেণীমাধব-নামক একটী ব্রাহ্মণ বালককে পথ-প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। বালক অধিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় স্থানটী যে অধিকতর দুর্গম ও ভয়াবহ, তাহা অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; —আমরা তাহার কথা শুনিয়াও শুনিলাম না। একটী সুদীর্ঘ যষ্টি হস্তে গ্রহণ করিয়া বালক আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিল।

সমতল-ক্ষেত্রে একটী প্রশস্ত রাস্তা; দুই পার্শ্বে উন্নতশীর্ষা ঘন-পল্লবিতা শ্যামলা বিটপি-শ্রেণী! পুরোভাগে দিগন্তপ্রসারিণী পর্ব্বতরাজি! ঐ পর্ব্বতের শীর্ষদেশেই মায়ের মন্দির।

একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলাম। বালক এই-স্থানে আসিয়াই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে লাগিল; আমরা বুঝিলাম, অপরিচিতের পক্ষে এ-স্থান বিপৎ-সঙ্কুল। তাহার পর বালক অবলীলাক্রমে

---

* শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ইংরাজী হইতে।

সিংহ-শিশুর ন্যায় উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রস্তরখণ্ডে আমাদের গতি স্খলিত হইতেছিল। উভয়পার্শ্বে নিবিড় নাতিদীর্ঘ পুষ্পিত-বিটপিশ্রেণী মৃদু বায়ু-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল! কুসুম-সৌরভে বন-স্থলী আমোদিতা! এই লীলাকুঞ্জে, বুঝি বা, বনদেবীগণ অবসর মত বিশ্রাম-লাভ করেন। স্থানটির মনোহারিত্ব ও পবিত্রতা প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের অবতারণা করে! ভীতিমিশ্রিত চিত্তে এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা পর্ব্বত-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; দেখিলাম, সুবৃহৎ উপকণ্ঠ-সমাকীর্ণ একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর চক্ষুর বিষয় অতিক্রম করিয়া কোন্ দূরদিগন্তে বিলীন হইয়াছে! কোথাও জনমানবের স্বরশব্দ নাই; প্রকৃতি স্তব্ধ এবং গম্ভীর! স্থানে স্থানে দুই একটী খর্ব্বকায় আরণ্যতরু অটল অচল ভাবে বিরাজমান; তাহাদের শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, সম্পদ্ নাই; কেবল কর্কশতা এবং কঠোরতায় পরিপূর্ণ! দূর হইতে জটাজুট-সমাবৃত ধ্যানমগ্ন যোগিবরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! দূরে দূরে বহুদূরে দুই একটী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমও পরিলক্ষিত হয়।

যাইতে যাইতে আমরা উন্নতাবনতা ভূমির উপর আসিয়া দেখিলাম, পর্ব্বতের সঙ্গে সঙ্গে পূত-সলিলা গঙ্গা সর্প-গতিতে প্রবাহিতা!—এ-স্থান হইতে বহু নিম্নে বলিয়া গঙ্গা একটী শুভ্র রজত-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়! আবার কিয়দ্দূরে যাইয়া দেখিলাম, অকস্মাৎ যেন কেহ শ্যামল-শষ্পোপরি একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে!—গঙ্গা অতিপ্রশান্ত!

তৎকালে পশ্চিমাকাশ লোহিত-রাগরঞ্জিত হইতেছিল; তপনদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন। প্রদর্শকের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গতিও দ্রুততর হইতেছিল; আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য-সন্দর্শন অপেক্ষা প্রদর্শকের অনুগমন সমীচীন মনে করিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম। দূর হইতেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির ও পতাকা দৃষ্ট হইল। এইটীই মা অষ্টভূজার মন্দির। যে মা দীর্ঘকাল নরশোণিত-পানে পুষ্টা,—নিরীহ সন্তানের আর্ত্তনাদ যাঁহার মর্ম্মে আঘাত করে নাই—সেই মা, না জানি কিরূপ!

মন্দির-দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পাষাণময় পর্ব্বত-গাত্রে একটী গহ্বর ক্ষোদিত হইয়াছে; প্রবেশদ্বারে কোনও শিল্প-নৈপুণ্য নাই, স্থাপত্যের নিদর্শন নাই; গহ্বরাভ্যন্তর চির-তমসাচ্ছন্ন! প্রবেশ করিতে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দ্বারে বহু আয়াসে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে। পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ; তাহাতে একদল সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। কয়েক জন স্ত্রীলোক অন্ধকারময় গহ্বর-মধ্যে আমাদিগকে লইয়া গেল। ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে অতি-ক্ষুদ্রাবয়বা মাতৃমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম; একটু স্থিরভাবে বসিতে পারিলাম না। অমনি স্ত্রীলোকগণ পয়সার জন্য একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। গহ্বরাভ্যন্তরে পর্ব্বত-গাত্রে মা উপবিষ্টা;—উজ্জ্বল নেত্র হইতে জ্যোতির্ম্ময় আভা নির্গত হইতেছে। সম্মুখে একটী প্রস্তর-বেদিকা;—তাহাতে পূজোপকরণ রক্ষিত হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তরে আর কিছুই দৃষ্ট হইল না; কেবল চতুর্দ্দিকেই গাঢ় অন্ধকার। মন্দিরে আলোক- বা বায়ু-প্রবেশের কোনও পথ নাই।

বাহির হইতে মন্দিরটীকে একটী ক্ষুদ্র গিরিকন্দর বলিয়া অনুমিত হয়। এতাদৃশ স্থান ভীষণ নরহত্যার উপযুক্ত বটে। ঠগীগণ নরশোণিতে এই মায়ের পূজা সমাপন করিয়া পাপানুষ্ঠানে বহির্গত হইত। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজও এস্থানে আসিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকথিত স্ত্রীলোকগণই মায়ের সেবকা। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিলাম তাহারা পর্ব্বতের পাদদেশে আবাস-নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়িয়া আসিয়া পয়সার জন্য যাত্রিগণকে ব্যতিব্যস্ত করে, এবং যৎকিঞ্চিৎ আদায় করিয়া লয়।

গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গেল। শ্রমাপনোদনের জন্য একখণ্ড শিলোপরি উপবেশন করিলাম। ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত উদার নভোমণ্ডল! নিম্নে স্বচ্ছ-সলিলা জাহ্নবী যেন সমস্ত দিনের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল! আর সেই বিচিত্র চন্দ্রাতপ স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইয়া নৈশ তিমিরে ঝক্‌মক্ করিতেছিল! অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। তাহার পর ক্ষুৎপিপাসা-নিবারণের জন্য পাণ্ডার আবাসা-ভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে দীপালোক-পরিশোভিত মা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডাজী-প্রদর্শিত প্রকোষ্ঠে শয্যা বিস্তৃত করিয়া একেবারে দেহ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু কোনও মতেই একটু তন্দ্রাও আসিল না; প্রতিমুহূর্ত্তেই আহারাহ্বান প্রতীক্ষা করিয়া নিরাশ হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অনেক দিন পরে আজ ভাগ্যে সোপকরণ অন্ন জুটিবে; কিন্তু বহুক্ষণ পরে আহার করিতে যাইয়া সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইল। পাণ্ডাজীর অপ্রশস্ত অনাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের অপরিষ্কৃত নিভৃত কোণে একটী ক্ষীণালোক দীপের সাহায্যে বসিবার ক্ষুদ্র আসনখানি কোনও প্রকারে সনাক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। সম্মুখস্থিত পাত্রে মোটা চাউলের ভাতের উপর যৎসামান্য ঢেঁড়স ভাজা ও এককোণে অড়হর ডাইল। মুখে দিয়া দেখিলাম সকলই লবণাক্ত। বহুকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিয়া ভোজন সমাপ্ত করিলাম। পাঁণ্ডাজী বা তদীয় গৃহিণী (পাচিকা) ভোজন-কালে কোনও প্রকার অভ্যর্থনা করেন নাই। আমার সঙ্গী বন্ধুটি একটু উদরপরায়ণ;—তিনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটী আহারের সামগ্রীই পুনরাহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তাহার পর এতাদৃশ অতৃপ্ত আহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৬। কৃষির উপযুক্ত যন্ত্র।

কৃষির প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল। বাঙ্গালা-দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা ধানের চাষের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। কিন্তু রবি-শস্য বা আউসের জমী চাষের জন্য এরূপ লাঙ্গল ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে চাষের সময় ক্ষেত্রের মাটী উল্টাইয়া যায়। কারণ, মাটী উল্টাইয়া না যাইলে তাহাতে রৌদ্র লাগিতে ও তাহার ভিতর বাতাস যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে এইরূপ মাটী উল্টাইয়া দিলে, ঘাসের মূল নষ্ট হইয়া যায়। এই কার্য্যের পক্ষে 'মেষ্টন'-লাঙ্গল অত্যন্ত উপযোগী। প্রত্যেক চাষার একখানি করিয়া মেষ্টন লাঙ্গল রাখা প্রয়োজন। হিন্দুস্থান বা পাঞ্জাব-লাঙ্গলে কাজ আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সে সকল লাঙ্গল টানিবার উপযুক্ত বলদ নাই। বাঙ্গালা-দেশে 'মেষ্টন' লাঙ্গলে বেশ কাজ হইতে পারে।

আলু ও ইক্ষুর চাষের জন্য 'হ্যাণ্ড-হো' ব্যবহৃত হইলে অনেক সুবিধা হয়। হ্যাণ্ড-হোর দ্বারা ঘাস তুলিয়া দেওয়া, মাটী খুসিয়া দেওয়া, গাছের গোড়ায় মাটী তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক কার্য্য হইতে পারে। ইহা ব্যবহার করিতে শিখিলে, কুলির খরচ অনেক কম হইয়া যায়।

গরুতে টানিবার উপযুক্ত বড় বিদের বাঙ্গালা-দেশে এখনও তত প্রচলন নাই। ইহার দ্বারা মাটী নরম হইয়া খুলিয়া যায়, এবং জমীর ঘাস উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিলে ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার হয়।

বীজবপন-যন্ত্র—এই যন্ত্রের ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমান ভাবে এবং সমান দূরে দূরে বীজ ফেলা যায়। বীজ-বপন সমান দূরে দূরে হইলে, নিড়ান প্রভৃতির অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং তাহাতে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুষা কলেজ হইতে এই যন্ত্র ক্রয় করা যাইতে পারে।

জল তুলিবার যন্ত্র :—সাধারণ ব্যবহারের জন্য ডোঙ্গা সুবিধাজনক। কিন্তু একস্থানে জল তুলিবার কল ফেলিতে পারিলে 'ওয়াটার-প্রুফ'-নল'-দ্বারা অনেক দূরের ক্ষেত্রেও জল দেওয়া যাইতে পারে। ছোট ছোট দমকল কৃষি-ব্যবহারের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী কৃষি-বিভাগের সাহায্যে ইহা হইতে পারে। 'চেন-পাম্প'ও সুবিধা-জনক।

আখমাড়া কল। এ যন্ত্র আমাদের দেশে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। অনেক স্থানে দেখা যায়, এক ব্যক্তি এই যন্ত্র ক্রয় করিয়া অপর কৃষকদিগকে ভাড়া দিয়া তাহা হইতে দু-পয়সা লাভ করিয়াও থাকে। এই প্রকার অন্যান্য যন্ত্র ভাড়া দিলেও তাহার দ্বারা সুবিধা হইতে পারে।

কুটি কাটিবার কল :—ইহাতে পশু-খাদ্য শীঘ্র শীঘ্র কাটা যায়। ইহার মূল্য বেশী বলিয়া সকলে ক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু ইহা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষি-যন্ত্র।

৭। বীজ ও বীজ-সংগ্রহ।

কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট বীজের

আয়োজন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে-স্থানে যে শস্য ভাল হয়, সেই স্থান হইতে তাহার বীজ আনয়ন করা আবশ্যক। সরকারী কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু দেশের লোকও কৃষি-বীজের ব্যবসায় করিলে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের সে-বিষয়ে উৎসাহ নাই। সব্‌জী-বীজ বিক্রয়ের কয়েকটা দোকান আছে, কিন্তু সেখান হইতে বীজ আনাইলে প্রায়ই তাহাতে অঙ্কুরোৎপাদন হয় না। আমাদের দেশে যদি ভাল বীজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কি কেহ 'হিমালয়ান-সিড্‌ ষ্টোরস্‌' বা পুনা হইতে বীজ আনাইতেন? বাঙ্গালাদেশে সব্‌জী-বীজ এবং সকল প্রকার কৃষিবীজের দোকান হওয়া আবশ্যক।

উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে অনেক স্থানে কৃষিবীজ ও পশুর মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে লোকে সহজে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশে হাটে অনেক প্রকার সব্‌জী-বীজ বিক্রয় হয়। কিন্তু সকল প্রকার সব্‌জী-বীজ এবং কৃষিবীজ হাটে বিক্রয় হইলে, কৃষকদিগের অনেক সুবিধা হয়।

এক দেশের বীজ অন্য দেশে আনীত হইলে শস্য ভাল হয়। এক ক্ষেত্রের বীজ ক্রমান্বয়ে সেই ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে শস্যের ক্রমে অবনতি হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কৃষকদিগকে বীজ-সংগ্রহ-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। ক্ষেত্র-মধ্যে যে গাছের শস্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলি ক্ষেত্রের মধ্যে, হয় ত, একখানি ক্ষেত্রে শস্য ভাল হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার যে গাছের শস্য ভাল হইয়াছে, সেই গাছের শস্যই বীজরূপে রক্ষা করিতে হইবে। সেই বীজ হইতে যে শস্য হইবে, তাহা হইতে আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শস্য নির্ব্বাচন করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে প্রতিবৎসর বীজ-নির্ব্বাচন করিতে থাকিলে শস্যের ক্রমিক উন্নতিই হইতে থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মকাই গাছ, যাহাতে ২টি পরিপুষ্ট ফল জন্মিয়াছে, তাহার বীজ বপন করিলে যে গাছ হইবে, তাহাতে অন্যান্য বিষয় অনুকূল থাকিলে দুই বা ততোধিক উৎকৃষ্টতর ফল ফলিবে। ইহাতেই বীজ-নির্ব্বাচনের উপকারিতা বুঝিতে পারা যায়।

৮। নূতন শস্য।

অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল উৎকৃষ্ট শস্য জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালা-দেশে তাহা ক্রমে ক্রমে আনীত হওয়া আবশ্যক। পঞ্জাবে 'কাবুলী ছোলা'-নামে একপ্রকার ছোলা হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ছোলার দানা অপেক্ষা প্রায় ৩।৪ গুণ বড়। এই ছোলার চাষ আমাদের দেশে হওয়া আবশ্যক। ইহা কাঁচা অবস্থায় মটরসুঁটির ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহার চাষে যথেষ্ট লাভ আছে। খোসাশূন্য একপ্রকার যবও আছে, তাহার আমাদের দেশে চাষ হওয়া আবশ্যক। চিনের বাদামের চাষ অত্যন্ত লাভজনক। যে-সকল জমীতে কোনও প্রকার শস্য জন্মে না, সেখানে চিনের বাদাম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। চিনের বাদাম ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। সেখানে ইহার তৈল 'অলিভ-অয়েলে'র ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এবং খইল পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। পেশোয়ারী-ধান্য অতি উৎকৃষ্ট শস্য; ইহাও

আমাদের দেশে আনাইয়া চাষ করা উচিত। তুলার চাষও আমাদের দেশে হইতে পারে। একপ্রকার তূলা আছে, যাহার গাছ ৩।৪ বৎসর থাকে; তাহাকে গাছতুলা বলে। মধুবনী-অঞ্চলে একপ্রকার তূলা হয়, তাহার রং রেসমের ন্যায়, তাহাকে কোকৃটি কহে। এই সকল নূতন নূতন গাছ আমাদের দেশে আনীত হওয়া প্রয়োজন। এ-সকল কার্য্য কৃষিবিভাগ ও কৃষিসমিতির দ্বারা হইতে পারে।

৯। রোপণ- ও বপন-প্রণালী।

রোপণ ও বপনের নূতন নূতন প্রণালী, যাহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত আছে, ক্রমে আমাদের দেশে তাহা গ্রহণ করা উচিত। নীল-কুটীতে 'সিড্‌ড্রিল'-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়, তাহাতে বীজ সমানভাবে এবং সমান দূরে দূরে পতিত হয়। অনেক স্থলে দড়ি ধরিয়া খুরপী-দ্বারা বীজ-বপন করা হয়। ধান্য-চাষের পক্ষে, আগাম আবাদ হইলে একটি করিয়া গাছ প্রত্যেক স্থানে রোপণ করিলে, তাহাতে গাছে খুব ঝাড় হয় ও ফলন ভাল হয়। ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে ধানগাছ রোপণ করিলে তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এইরূপ নানাপ্রকার বপন ও রোপণের নিয়ম নানা স্থানে আছে; তাহার মধ্যে যাহা সুবিধাজনক, তাহা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত।

১০। পশুখাদ্য।

আমাদের দেশে ধান্যের খড় প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহাতে গবাদি পশুর আহারের অকুলান হয় না। কিন্তু খড়ে গবাদি পশুর সম্পূর্ণ পরিপুষ্টির উপযুক্ত উপাদান থাকে না। তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে সব্জি, ঘাস প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য 'জনারা'র প্রচলন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের মাটীতে জনারা ভালরূপ হওয়া সম্ভব। নিম্নভূমি ধানের ক্ষেতে ফাল্গুন-চৈত্রমাসে প্রথম বৃষ্টি হইলে, তাহা চষিয়া জনারা বপন করিলে, ধান্য-রোপণের সময়ের পূর্ব্বে জনারা পশুকে খাওয়াইবার উপযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং, উক্ত ক্ষেত্রে ধান্য এবং জনারা উভয় ফসলই পাওয়া যাইতে পারে। ধানের ক্ষেতে যখন এক ইঞ্চি মাত্র জল থাকে, অর্থাৎ বর্ষার শেষ ভাগে, খেসারী ছড়াইয়া দিলে, ধান-কাটার পরে সেই খেঁসারী গাছ বড় হইয়া যায়। কাঁচা-সুঁটি শুদ্ধ খেসারী কাঠিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। পশুখাদ্যের জন্য প্রত্যেক কৃষকেরই উচিত, কিছু কিছু জমীতে জনারা প্রভৃতি বপন করা। সাইলো (Silo) প্রস্তুতের একপ্রকার প্রথা আছে, তাহাতে বর্ষাকালের কাঁচা ঘাস কয়েকমাস যাবৎ রক্ষা করা যায়। ইহাও আমাদের দেশের কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

১১। কীট

কীট যাহাতে শস্য নষ্ট করিতে না পারে, কৃষকদিগের তাহার উপায় জানা উচিত। "ফসলে-কীট"-নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়াছে। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কৃষকদিগের জানা উচিত যে, তুতের জল, ফেনিলের জল, কেরোসিন তেল জলে ও ঘোলে মিশান, চূণের জল, সাবানের

জল,ইত্যাদি কীটনাশের পক্ষে বিশেষ-ফলপ্রদ ঔষধ। তামাকের ধোঁয়া, খড়ের ধোঁয়া, গন্ধকের ধোঁয়া, এ-সকলও কীট তাড়াইবার জন ব্যবহৃত হয়।

১২। আম্র ও লিচু এবং আওলাত।

বাঙ্গালা-দেশে প্রতিবৎসর আম ও লিচু ও অন্যান্য ফল, বাঙ্গালার বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে আম্‌দানি হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-দেশে আম ও লিচু যত্ন করিলে খুব ভাল হয়। ভাল জাতীয় আম ও লিচুর চাষ বাঙ্গালা-দেশে যত হয় ততই ভাল। বাঙ্গালা দেশের জঙ্গল কাটিয়া এ সকল গাছের বাগান করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা-দেশের, এমন মাটী যে, এখানে প্রায় সকল প্রকার গাছই ভালরূপ জন্মিতে পারে। সুতরাং যেখানে যাহা ভাল জিনিস দেখা যাইবে, বাঙ্গালা দেশে তাহা আনিবার বলবতী ইচ্ছা কৃষকদিগের হওয়া উচিত।

১৩। কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষি-পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা-দেশের ⅘ অধিবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। সুতরাং, কৃষিকার্য্য শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য নৈশবিদ্যালয়ই উপযোগী। যে-সকল ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় আছে, তাহাতেও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষি-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহাতে নানাপ্রকার পুস্তক প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারী বিভাগ হইতে যে-সকল বুলেটিন বা সরকারী তথ্য বাহির হইতেছে, তাহার বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। এই প্রবন্ধ-পাঠে দেখা যায় যে, কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিদ্যালয়ে বা পুস্তক-প্রচার-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালা-দেশে উচ্চশ্রেণীর কোনও কৃষি-বিদ্যালয় নাই। এখানে 'সাবর কলেজে'র ন্যায় একটী বিদ্যালয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

উপসংহার।

বাঙ্গালা-দেশের কৃষির উন্নতি বাঙ্গালার কৃষকদিগের উপর তত নির্ভর করে না, যতটা শিক্ষিত লোক ও গবর্ণমেণ্টের উপর ইহা নির্ভর করে। পল্লিগ্রামস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষক-দিগের সঙ্গে মিশিবেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন; গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি স্থাপন করি-বেন, সমিতিতে কৃষিবিষয়ের উন্নতির চর্চ্চা করিবেন, আপনারা কৃষিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, বনজঙ্গল কাটা ও পল্লি ও গৃহ পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্র আনাইয়া তাহা তাহা-দিগকে লইয়া পাঠ করিবেন, ইহাই কৃষিবিষয়ক উন্নতির প্রথম সোপান।

'কো-অপারেটিব ব্যাঙ্ক' স্থাপিত করিয়া কৃষিকার্য্যের জন্য টাকা, যন্ত্র ও সার যোগান, কৃষি-উন্নতির দ্বিতীয় সোপান।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া কৃষিবিষয়ক পুস্তকের প্রচার ও কৃষি-বিদ্যালয়-স্থাপন, ইহার তৃতীয় সোপান। কৃষিবিষয়ক শিক্ষা যত অধিক হইবে,ততই কৃষির উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে।

ইহার চতুর্থ সোপান, যেরূপ প্রয়োজন দেখিবেন, গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ আইন করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

হুড্রুফল বা সুবর্ণ-রেখার জল-প্রপাত।

ভারতের নানাস্থানে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, জন-সাধারণ, হয় ত, তাহার বৃত্তান্ত অবগত নহেন। হাজারীবাঘের নানাস্থানে এমন অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যাহা পৃথিবীতে অতুলনীয়। অদ্য কেবল একটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব।

হাজারিবাঘে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই হয় ত, "হুড্রু ফল" দেখিয়া থাকিবেন। সুবর্ণরেখা নদী রাঁচি এবং হাজারিবাঘের সীমার পার্ব্বত্য ভাগে প্রবাহিত হইয়া সাগরের দিকে গিয়াছে। হঠাৎ হুড্রু-নামক স্থানে ইহা পর্ব্বত হইতে ৪০০।৫০০ শত ফিট্ নীচে সমভূমিতে পড়িয়াছে। এইস্থান হাজারীবাঘ হইতে ৬০ মাইলের উপর। আমরা হাজারিবাঘ হইতে রওনা হইয়া প্রথমে মাণ্ডুর (Mandu) বাঙ্গালায় বিশ্রাম এবং আহারাদি করিলাম। মাণ্ডু হাজারিবাঘ হইতে ১৭ মাইল। ইহার নিকটে অনেকগুলি কয়লার খাদ আছে। ৩০ মাইলে রামগড়। এখানে দামোদর নদ পার হইতে হয়। দামোদরের দুইপারে দুইটি বাঙ্গালা আছে। বর্ষাকালে ইহা প্রায় সহজে পার হওয়া যায় না। রামগড় এক সময়ে হাজারিবাঘের রাজধানী ছিল। এখনও হাজারিবাঘের লোকেরা জেলা "হাজারিবাঘ-রামগড়" বলে। এখানে পুরাতন কীর্ত্তির অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান। দামোদরের দক্ষিণ-পারের বাঙ্গালা হইতে দামোদরের দৃশ্য অতি-মনোহর। দুইদিকে ১৫।২০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা যায়। ছোট ছোট প্রস্তররাশির উপর দিয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া আসিতেছে! বন্যার সময় প্রবলবেগে তাহারই উপর দিয়া জলরাশি চলিয়া আসিতেছে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়!

এক সময়ে রাঁচির ডাক্ এই পথে চলিত। তাই বন্যার সময় ডাক্ পারাপারের জন্য দামোদরের দুইকূলে দুইটি বৃহৎ মাস্তুল এবং তৎসঙ্গে কপি-কল এবং রজ্জু সংযুক্ত আছে। এই প্রকার যন্ত্রদ্বারা ডাক্ পার করা আর, বোধ হয়, বাঙ্গালা-দেশের কোথায়ও হয় না।

রামগড় হইতে গোলা প্রায় কুড়ি মাইল। গোলা একটী জনাকীর্ণ ক্ষুদ্র সহর। এখান-কার লোকেরা বাঙ্গালা এবং হিন্দী উভয় ভাষাতেই কথা বলিতে পারে। গোলা মান-ভূমের সীমার নিকটবর্ত্তী। গোলা হইতে হুড্রু প্রায় দশ মাইল। ৬।৭ মাইল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তা আছে। গো-যানে তথায় যাওয়া যায়। তারপরে পাহাড়; হাঁটিয়া যাইতে হয়।

আমরা প্রাতে রওনা হইলাম; কিছু দূর গিয়া গো-গাড়ী ছাড়িয়া হাটিয়া চলিলাম। আমাদের তৈজসপত্র এবং খাদ্যাদি বহন করিবার জন্য একজন জেলেকে মুটে ধরিলাম। শুনিয়াছিলাম, হুড্রুতে বড় বড় মাছ পাওয়া যায়, তাই জেলেকে বেশী পয়সা দিয়া জাল-সহ লইয়া চলিলাম। ২।৩ মাইল ব্যবধান থাকিতে একটা ভীষণ শব্দ শুনিতে লাগিলাম এবং বড় বড় কলের 'চিম্নি'তে যেমন ধূম উঠে তেমনি ধূমও দেখা গেল। যে-স্থানে জলপ্রপাত, তাহার চতুর্দ্দিকে গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়। পথ-

প্রদর্শকের দরকার। কতকগুলি সাঁওতাল কিম্বা কোল-জাতীয় লোক আশুধান্য ঝাড়িতেছিল। তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অনেক করিয়া বলা হইল, কিন্তু তাহারা রাজি হইল না। পুরস্কারের কথাও শুনিল না। শেষে মদীয় একজন ভৃত্য বলিল, "আচ্ছা, আগে থানায় যাই, তারপর কাল দেখ্‌তে পাবে।" এই ব্যক্তি যদিও পুলিস নয়, কিন্তু তাহার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ী ছিল। তাহার কথায় অদ্ভুত ফল ফলিল। তৎক্ষণাৎ একজন ধান্য ফেলিয়া সঙ্গে চলিল।

ক্রমে আমরা হুড্রুতে পৌছিলাম। জলরাশি পশ্চিমদিক্ হইতে দুইটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়িতেছে। বর্ষার জন্য স্রোত অতিপ্রবল। আমরা জীবনে কেহ কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। বিধাতার অপূর্ব্বলীলা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুইঘণ্টা বসিয়াছিলাম। কাহারও মুখে বাক্য নাই! যেখানে বসিয়াছিলাম, তথা হইতে নীচের দিকে তাকান যায় না। ভীষণবেগে জল পতিত হইয়া বাষ্পাকারে উপরে উঠিতেছে; আবার সেইস্থানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত সেই জল যেন বৃষ্টি হইয়া পড়িতেছে। এই বাষ্পের উত্থান এবং পতনই 'চিম্‌নি'র ধূমের মত দূর হইতে দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ পতনের শব্দও শ্রুত হইতেছিল।

যাঁহারা হাজারিবাঘের দিক্ হইতে এই জল-প্রপাত দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখিবার জন্য স্রোতের কিছু উপরে পার হইয়া দক্ষিণদিকে যাইয়া, পাহাড়ের নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু তাহা শীতকালেই সম্ভব। বর্ষাকালে সে ভীষণ স্রোত পার হওয়া অসম্ভব। পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় হইতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

আমাদের পথপ্রদর্শক পাহাড়ীয়াও আমাদিগকে নদী পার হইতে নিষেধ করিল। অগত্যা আমরা পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নীচে যাইতে মানস করিলাম। পাহাড়ীয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে বন্দুক আছে কি না। কেন না, সে-পথে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমাদের সঙ্গে তখন বন্দুক ছিল; সুতরাং সাহস করিয়া সেই পথে চলিলাম। পাহাড় ঘুরিয়া জলপ্রপাতের ঠিক্ পূর্ব্বদিকে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর আস্তে আস্তে সকলে বসিলাম। প্রস্তরখণ্ডের উপরে অনবরত জল-বিন্দুর পতনে, উহা অতিশয় পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তথায় বসিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপার বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

সমস্ত জলরাশি প্রথমে ছয়টী ধারায় পড়িতেছে। সর্ব্বদক্ষিণের ধারাটী খুব প্রবল নয়। তাহার পরেই কয়েকখানি প্রস্তর একত্রিত করা। উহা শিবের স্থান। তারপরের স্রোতটীও বেশী প্রবল নয়। উত্তর-দিকের চারিটি স্রোতের খুব বেগ। পাহাড়ের গায় প্রায় ৫০ ফিট বহিয়া উত্তর দিকের পাঁচটি স্রোত মিলিত হইয়া একটী বিষম বেগবান স্রোতের সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে ৪০০-৫০০ শত ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। বোধ হইল, প্রতিসেকেণ্ডে বিশহাজার মণ লাল তূলা পড়িতেছে। বর্ষাকাল বলিয়া জল ঘোলা এবং

লাল তূলার মত বোধ হইল। শুনিয়াছি, শীতকালে স্রোত সাদা তূলার মত দেখায়, কিন্তু তখন ইহা এত প্রবল থাকে না। এই অবস্থা নিস্পন্দভাবে প্রায় দুইঘণ্টা দেখিয়া, ক্ষুধার জ্বালায় ২।৩ টার সময় উঠিয়া বনের কাট সংগ্রহ করিয়া রান্না চাপাইলাম। এ-দিকে শালপাতা তুলিয়া আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কেহ কেহ স্রোতের জলে পাথর শক্ত করিয়া ধরিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। এদিকে কেহবা সেই জলে জাল ফেলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিতে লাগিল। কিন্তু কেহ বড় মাছ পাইল না।

পৃথিবীতে যত উচ্চ জল-প্রপাত আছে তাহার মধ্যে এই জলপ্রপাত একটী; কিন্তু এদেশে কেহ ইহার নামও করেন না। অথচ অতিদূরদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী সময় সময় আসিয়া ইহা দেখিয়া যান্। শুনিলাম, নায়াগ্রারার জল-প্রপাতও এত উচ্চ নহে। কেবল তাহার স্রোত ইহার অপেক্ষা প্রবল। এই জলের স্রোতের দ্বারা কোনওপ্রকার কল-চালান যায় কি না, তাহা দেখিবার জন্য একজন সাহেব এখানে ঘর বাধিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমরা উপর হইতে দেখিতে-ছিলাম, স্রোতের নীচে পাহাড়ের গায় পায়রাগুলি চড়াই পাখীর মত ছোট দেখাইতেছিল।

আমরা সকলে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমাদের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না। আহারাদি শেষ করিয়া আবার সেই প্রথমোক্ত প্রস্তরে সকলে বসিলাম, কিন্তু পথ-প্রদর্শক পাহাড়ীয়া, সন্ধ্যা হইতেছে, বন্যজন্তুর ভয় আছে, বলাতে আমরা উঠিয়া পড়িলাম। একজন খড়ি দিয়া "হুড্রুলাং" লিখিয়া রাখিল। দ্রুতপদে চলিয়া কোন প্রকারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় এবং জঙ্গল অতিক্রম করিলাম।

হুড্রুফলের অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনাতীত! জ্ঞানময় বিধাতার এমন লীলা সচরাচর দেখা যায় না। প্রাণ-মন যে কি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া বুঝান যায় না!

শ্রীরজনীকান্ত দে।

অদৃষ্টলিপি।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপায়হীনা বিধবা সুধীরের মা যখন বিষ্ণুপুরের জমিদার ইন্দুভূষণ বসু-মহাশয়ের বাড়ীতে পাচিকা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রবেশ করিল, তখন লজ্জা-সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে আছাড় খাইতেছিল। সে শিবিকায় আসিয়াছিল; যখন যান হইতে অবতরণ করিয়া, জমিদার-বাড়ীর বিন্দী-ঝির প্রদর্শিত পথে, ছয় বৎসরের ছেলে সুধীরের হাত ধরিয়া সে চলিতেছিল, তখন সে মনে মনে ডাকিতেছিল, 'ঠাকুর! এখন যদি পৃথিবীটা দুইভাগ হয়, তবে তাহার মধ্যে লুকাইয়া এ দাসীত্ব করিবার লজ্জা হইতে অব্যাহতি পাই!" কিন্তু তাহার প্রার্থনায় মেদিনী বিদীর্ণা হইল না বটে, তবে সে

অন্তঃপুরে পদার্পণ করিতেই, জমিদার-গৃহিণী করুণাময়ী প্রসন্ন-মুখে তাহার সম্মুখীনা হইলেন; অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন সুধীরকে বুকে টানিয়া লইলেন, তার পরে সুধীরের মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস, বোন্ এস!"

সে রাঁধুনী হইতে আসিয়াছে, গৃহিণী বলিলেন "বোন", বুকটা যেন শীতল হইল। তারপরে করুণাময়ী তাহাদের ঘরে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কথা সবই আমি শুনেছি। তা তুমি ভেব না বোন্, কপালে যা ছিল সে ত হয়েই গিয়েছে; এখন তোমার যতদিন ইচ্ছা, আমাদের এখানে থাক।—তোমার ছেলেটি যাতে মানুষ হয়, তা' আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কোর্‌বো। আমরা শুনেছি, আমার মাসাশ্‌-ঠাকুরাণী তোমার মায়ের যা' হতেন; সে-সম্পর্কে তুমি আমার নন্দ, আমি তোমার ভাজ; এ-বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে কোরো।"

সুধীরের মা ভুবনেশ্বরী এমন মধুমাখা কথা শুনিবার মত আশা করে নাই। এই গৃহিণীর মত ভাগ্যবতী যে তাহার মত অভাগিনীকে এমন আদরে গ্রহণ করিবেন, এমন অভয় এমন আশ্বাস দিবেন, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। তবে ত সত্য সত্য বড়লোকেরও হৃদয় আছে! এই দেবীর কাছে পাচিকা কেন,—দাসী হইয়া থাকিলেও ক্ষোভ হয় না। ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতৃগৃহে সে যে অনাদর, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা পাইয়াছে, তাহাই তাহার মনে জাগিতেছিল।

ভুবনেশ্বরী প্রণাম করিয়া করুণাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন করুণাময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৃহে প্রবিষ্টা ঝি রামার মা'র কোল হইতে তাঁহার এক বৎসরের শিশুকন্যা জ্যোৎস্নাকে লইয়া গৃহিণী ভুবনেশ্বরীর কোলে দিলেন। সুতরাং, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্নাকে সাদরে গ্রহণ করিল।

বালক সুধীর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ছিল। এত বড় বাড়ী-ঘর, এ রকম কায়দা-কানুন সে তাহার জীবনে কখনও দেখে নাই। চারিমহলের প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে লালপাগ্‌ড়ী মাথায় বাঁধিয়া, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া দরওয়ান-জী টুলের উপরে বসিয়া আছেন। কাছারী-ঘরে দেওয়ান-গোমস্তা পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাদিগকে পালন ও শাসন করিতেছেন। আবশ্যক মত কাগজপত্র এবং প্রজাদিগকে উপরের বৈঠকখানায় জমিদার-বাবুর কাছে পাঠাইতেছেন। দ্বিতীয় মহলে বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ; সেখানে ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ঠাকুর-ঘর; গৃহদেবতা সেইখানে পূজিত হইয়া থাকেন। নাচঘর, তোষাখানা, দপ্তরখানা, ডাক্তারখানা, সকলই সুসজ্জিত। তারপরে অন্দর-মহল। সেখানও ঝি-চাকর, কুটুম্বিনী, প্রতিবেশিনী সকলে মুখর করিয়াছে। তখন বেলা অপরাহ্ণ। বারান্দায় জলচৌকির উপরে বসিয়া প্রৌঢ় ভট্টাচার্য্য-মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন, জমিদার-বাবুর বিধবা ভগিনী প্রতিবেশিনীদিগের সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সেইখানে খাঁচায় ঝুলানো ময়না-পাখী কত কথা বলিতেছে। শেষ মহল রান্না-বাড়ী হইতে

ফেনভাত খাইয়া গাভীগুলি গোহালে চলিয়া যাইতেছে, বৎস-সকল লাফ দিয়া মায়ের সঙ্গ লইতেছে, রাখাল পাঁচনি হাতে করিয়া তাহাদের গতি সংযত করিতেছে; ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা কৈবর্ত্তজাতীয়া পেঁচোর মা, রোয়াকের উপরে বসিয়া চাউল ঝাড়িতে ঝাড়িতে মা-ঠাকুরাণীর কাছে. একখানি কাপড় যাচ্ঞা করিতেছে; নিতাই-বাগ্দী বড় একটা রোহিত-মৎস্য লইয়া রান্নাবাড়ীর দিকে চলিতেছে; সেইখানে সে তাহা কুটিবে।। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সুধীর যেমন বিস্মিত তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন এই চাঁদের আলোর মত, নবস্ফুট ফুলের মত, জীবন্ত মোমের পুতুলের মত জ্যোৎস্নাকে মায়ের কোলে দেখিয়া সে বড়ই খুসী হইল, তাহার চাঁদমুখখানিতে হাসির জ্যোৎস্না ফুটিল; সে হাত বাড়াইলে জ্যোৎস্না তাহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। সে পুলকিত-চিত্তে জ্যোৎস্নাকে কোলে লইল। কিন্তু ঝি, তাহার কোল হইতে জ্যোৎস্না পাছে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় অগ্রসর হইয়া জ্যোৎস্নাকে ধরিল। সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া যেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল, সেইদিকে ধীরে ধীরে গিয়া দাঁড়াইল।

পুরাণ-পাঠক ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তখন পঠন ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন; অকস্মাৎ সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক পুরাণ-বাখ্যা বন্ধ রাখিলেন এবং অপলকনেত্রে সুধীরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তার-পরে ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "এস খোকা!"

সুধীর বাধ্যস্বভাব বালক; ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের আহ্বানে সে ধীরে ধীরে তাঁহার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তখন তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কাছে বসাইলেন। তার-পরে তিনি তাহার হস্তরেখা, ললাট, মস্তক, চক্ষু, কিছুক্ষণ সোৎসুকভাবে দেখিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল। জমিদারবাবুর ভগিনী ক্ষেমঙ্করীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছেলেটী কে মা?"

বিনীতভাবে ক্ষেমঙ্করী সুধীরের পরিচয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —"আশ্চর্য্য!"

ফলিত-জ্যোতিষে এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র জ্যোতিঃশেখরের লোকবিশ্রুত সুখ্যাতি ছিল। হস্তরেখা প্রভৃতি পরীক্ষা, জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু দুই বৎসর আগে তাঁহার একটী পাঁচবৎসরের পুত্রের বিয়োগে এবং তাহার অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা জ্যোতিষতত্ত্বে জানিতে পারিয়া, এই ধীর, প্রাজ্ঞ ভাগ্যবেত্তা ব্রাহ্মণ শোকাকুল হইয়া এখন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছেন; তথাপি অভ্যাসে এবং অনুনয়-অনুরোধের জন্য অব্যাহত হইতে পারেন নাই।

কৌতূহলাক্রান্তা ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কি দেখিলেন ঠাকুর-মশাই?"

ঠাকুর বলিলেন, "দেখি নাই মা, কিছুই; তবে যেটুকু সহসা চক্ষে পড়িল, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া এর পরে যা হয়, বলিব।"

পূর্ব্ববৎ মহাভারত-পাঠ আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ)

লেখিকা—শ্রীমা—

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা হাসিল ; ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "এই নিন্, আপ্নি আমার ওপর বড়ই অবিচার করুছেন ! —আপ্নি কি আমায় এতই অধম মনে করেন যে, একটা বাজে কথার ঘায়ে আমি একেবারে মূর্চ্ছা যাব? না না; তা মনে করুবেন না। এ ত তুচ্ছ, নিতান্তই তুচ্ছ কথা ; এ শুধু চর্ম্মের ওপর একটু আঘাত দিলে কি না তাও সন্দেহ !—কিন্তু আমাকে—কারুর কাছে সে কথা বল্তেও ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়,—আমাকে, আমার এই অল্পবয়স্কতার অপরাধে ব্যক্তিবিশেষের নিকট এমন সব সাংঘাতিক মন্তব্য শুন্তে হয়, যা মর্ম্মের ভিতর খুব শক্ত ভাবেই বিঁধে যায় ! কিন্তু এর জন্যে কা'র ওপর রাগ বা দুঃখ কোর্ব্বো ?...এর জন্যে আমার দেশাচার দায়ী, আমার দেশের লোকের শিক্ষা-সংস্কার দায়ী ; এরূপস্থলে ব্যক্তিগত দোষ ধর্তে যাওয়াই ভুল ! আমি কারুর ওপর রাগও করি না, কারুর কথার জবাবও দিই না ; চুপ্চাপ্ নিজের কাজ করে যাই।—যাক্গে, যেতে দিন্ ; এখন আর সময় নাই। আসি তবে ;—নমস্কার !"

ক্লান্তিনিপীড়িতা ডাক্তারপত্নীকে সত্বর শয়ন করিতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নমিতা তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

(১৬)

সময়ের অনাটনের জন্য অসহনীয় ব্যস্ততায় নমিতার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। খুব ব্যগ্রতার সহিত চোখ-কান বুজিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ত্রস্ত-চরণে চলিতে লাগিল ;—কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বিষাদবহ সকরুণ হাসি, তাঁহার সেই যন্ত্রণার্ত্ত মূর্ত্তি, নিজের ভাবনার ভিড়ে সে আজ কিছুতেই চাপা দিতে পারিল না ;—কেমন একটা অস্বস্তি-ব্যাকুলতা তাহার বুকের মধ্যে হায় হায় করিয়া নিষ্ফল পরিতাপে ঘূর্ণিপাক খাইতে লাগিল ;—তাহার পর নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার দ্বিগুণ ক্ষোভ হইতে লাগিল ! অসুস্থতা-খিন্ন ক্লিষ্ট প্রাণীটির সময়োচিত কিছু সেবা-সাহায্য করা তাহার অবশ্য উচিত ছিল ; কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, কিছুই সে করিতে পারিল না ! কর্ত্তব্য-ত্রুটির আক্ষেপে তাহার মনটা—শুধু কুণ্ঠিত নয়, বেশ একটু উগ্র জ্বালাময় অসন্তোষে ছাইয়া গেল। পায়ের পর পা ফেলিয়া সেই বাড়ীখানা হইতে যতই সে দূরে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতর গুম্-গুম্ শব্দে বেদনার মুষ্ট্যাঘাত প্রবল জোরে বাজিয়া উঠিতে লাগিল !—হায় ভাগ্য-বিড়ম্বনা ! এমনই দুঃসহ অবস্থা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মসূত্র পরিচালিত হইয়াছে যে, ঠিক উপযুক্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তেই সে শক্তি-বঞ্চিত নিরুপায় সাজিতে বাধ্য হইল ! দাসত্ব—ঐ বাহিরের বন্ধন-দাসত্ব,—যাহার ভার বহন করিতে এত দিন তাহার তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্লান্তিবোধ করে নাই, আজ তাহা নমিতার অনিচ্ছুক হাত-পা-গুলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, যে প্রয়োজন-

টুকুর অন্ধভাবে প্রত্যাখানে বাধ্য করাইল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর শাস্তি মনে হইল। বহু-দিনের পুরাতন এবং স্বেচ্ছাস্বীকৃত হৃদয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-পূত কর্ম্মদায়িত্ব, আজ আভ্যন্তরিক স্বাধীনতা-বিরোধী, উৎকট বিস্বাদপূর্ণ পরা-ধীনতা ও গ্লানি বলিয়া নমিতার সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল!—তেজস্বী হৃদয়বৃত্তি, ক্ষিপ্ত বিদ্রোহি-তায় ঝাঁজিয়া, সজোরে মাথা নাড়া দিয়া তীব্রবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া, হৃদয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যত হইল!...ক্ষুব্ধ পরিতপ্ত নমিতা ভাবিল, আহা, বাজে আলাপের ধূয়া ধরিয়া অনর্থক বক্ বক্ করিয়া যে সময়টা সে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সে সময়টা যদি ঐ কাজটুকু করিবার জন্য এখন ফিরাইয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে,—আঃ, এই অমার্জ্জনীয় মনস্তাপ-পীড়ন হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিত!

জমাখরচের হিসাবে যে মোটা অপব্যয়টা নজরে ঠেকিল তাহাকে নমিতা উপেক্ষা-ভরে এড়াইতে পারিল না। অজ্ঞাতে উষ্ণ বিরক্তিভারে তাহার ভ্রূযুগলে রুক্ষ আকুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাম-হাতের মুঠায় আবদ্ধ সূতা ও ক্রুশের মধ্যে, অন্যমনস্কতা-বশতঃ সজোর মুষ্টির নিষ্পীড়নে সূতার গুলিটার নম্বরি টিকিটখানার সুশ্রী সুগোল আকৃতি যে নিঃশব্দে শোচনীয়া অবস্থায় রূপান্তরিতা হইতেছে, তাহাও নমিতা আদৌ টের পায় নাই। ঘাড় গুজিয়া দ্রুত চঞ্চল চরণে সে অত্যন্ত বেগে রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতে-ছিল। তাহার চরণ-গতির সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী সুশীলকে একরূপ ছুটিয়াই চলিতে হইতেছিল।

বাটীর নিকটস্থ শেষ গলির মোড় ফিরিবার সময় সম্মুখে দ্রুত আগমনশীল সুর-সুন্দর তেওয়ারীকে দেখা গেল। সে, বোধ হয়, বাসা হইতে হাঁসপাতাল যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আসিতেছিল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে প্রিয়জন সন্দর্শনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া, সুশীল, 'দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্'—উপদেশটা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেল!—'উট-মুখো' হইয়া স্বচ্ছন্দ-বিশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে, হর্ষোজ্জ্বল নয়নে চাহিয়া সে অতিব্যগ্রভাবে যেমন প্রিয়-সম্ভাষণ করিতে যাইবে, অমনি পথের মাঝ-খানে পতিত একটা মস্ত ইঁটে অকস্মাৎ সজোরে ঠোক্কর খাইয়া, ঠিক্‌রাইয়া ঘুরিয়া আসিয়া নমিতার উপর সবেগে পড়িল! সেই অতর্কিত সংঘাতটা এমনি বে-কায়দায় বাজিল যে, সুশীলের সুবৃহৎ মাথাটা ত নমিতার বাম পাঁজরে বেশ জোরেই ঠুকিয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে নমিতার হাতের মুঠায় ধরা ক্রুশের সূচ্যগ্র তীক্ষ্ম মুখটি তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া বাম করমূলের চর্ম্মশিরা ভেদ করিয়া আড় ভাবে সটান প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বিদ্ধ করিল! বেদনার বিদ্যুৎপ্রবাহ-সন্তাড়নে মুহূর্ত্তে নমিতার মগজ শুদ্ধ যেন ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল! যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে ত্রস্ত-ভাবে সে বলিল,—"উঃ! সুশীল, দেখিস্, তোর লাগে নি ত?"

সুশীল আত্ম-সংবরণ করিয়া, সুস্থ হইয়া নিজের বেদনার সংবাদটা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই, দিদির করতল-প্রান্তে তীরের ফলার মত কঠিনভাবে বিঁধিয়া স্থির নিশ্চলতায়

বিরাজমান ক্রুশটার পানে চাহিয়া, সহসা আতঙ্ক-ব্যাকুলতায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ গো, উহু—হু, যাঃ! দিদি!—"

ক্ষণমধ্যে আত্মদমন করিয়া, দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করিবার ক্ষমতায় অভ্যস্তা, চির-সহিষ্ণু নমিতা শান্ত ও আশ্বাসের স্বরে বলিল, "চুপ চুপ্! ভয় কি? বিঁধে গেছে তা কি হবে? বোকার মত হাউ চাউ করিস্ নি;—থাম্।"

"দেখি—দেখি—" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র নৈপুণ্যে অন্য দুইখানি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া, কাহারও অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া, বিনা দ্বিধায় তপ্ত কঠিন স্পর্শের চমকে, আহত হাতখানা এক হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, অন্য হাতে কনুইয়ের প্রান্ত ধরিয়া সন্তর্পণে তুলিয়া, টানিল। নমিতা দেখিল সে সুরসুন্দর তেওয়ারী!—সুরসুন্দর মাথা ঝুঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল, আরক্তবদনা নমিতা ধীরে ধীরে হাতখানা টানিয়া লইবার চেষ্টায় মৃদুস্বরে বলিল, "ছেড়ে দিন্, সামান্যই বিঁধেছে।—"

উদ্বিগ্ন সুরসুন্দর নমিতার ব্যবহারে কিছু-মাত্র মনোযোগ না দিয়া, অকুণ্ঠিত অথচ সুকোমল আদেশের স্বরে বলিল, "দাঁড়ান, টান্‌বেন না;—একটু সহ্য করুন্, ওটা টেনে বের করে ফেল্‌তে হবে।"

যতই বিপন্ন হওয়া যাক্ না, একটু ধৈর্য্যশীল হইতে অভ্যাস করিলে,—মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিটা প্রয়োজনের সময় বেশ সদ্ব্যবহারে লাগে। অসহিষ্ণুতাই যন্ত্রণা বেশী বাড়াইয়া তুলে, এবং কাণ্ডজ্ঞান-লোপ করে। সুরসুন্দরের প্রস্তাব মত ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রুশটা উৎপাটিত করিতে দেওয়ায় নমিতার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না,—কিন্তু সে বুঝিয়া দেখিল তাহাতে সদ্যোযন্ত্রণামুক্তির আশা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ আশঙ্কার সম্ভাবনা বেশী।—ইতস্ততঃ করিয়া শান্ত অবিচলিত মুখে নমিতা বলিল, "সেটা পারা যাবে কি? ক্রুশের মুখ যে বঁড়শীর কাঁটার মত বাঁকানো;—টান্‌তে গেলে এখনি শিরায় আট্‌কে ভেঙ্গে যেতে পারে, তাতে আরো মুস্কিল হবে—।"

"তবে?"—এই বলিয়া ক্লিষ্ট উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর পুনরায় বলিল, "তবে? কি করা যায় বলুন্ দেখি?"

স্থিরনয়নে ক্রুশ-বিদ্ধ স্থানটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নমিতা বলিল, "ছুরী ভিন্ন গতি নাই। হাঁস্‌পাতালে এখন এঁদের কাউকে পাওয়া যাবে কি? আমাদের স্মিথ্ কোথায়?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিনি এইমাত্র একটা 'কল' থেকে ফিরে কুঠিতে গেছেন।"

ন। আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে এখন জ্বালাতন করা টা ত……।

সুরসুন্দর। কিন্তু না হলে উপায় কি? হাঁস্‌-পাতালে এখন শুধু সত্যবাবুকে দেখে এসেছি; কিন্তু তাঁর চোখ ভাল নয়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুরী ধর্‌তে তিনি রাজী হবেন কি?—হয় ত, ডাক্তার মিত্র ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি আপ্‌নাকে অপেক্ষা কর্‌তে বলবেন্। আহা-হা, ওখানটা থেকে রক্ত গড়াতে আরম্ভ হোল! দাঁড়ান্; আমার এই রুমালটা দিয়ে—।"

ব্যস্ত উৎকণ্ঠিত সুরসুন্দর, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ধব্‌ধবে পরিষ্কার অল্পমূল্যের একটি ছোট রুমাল বাহির করিয়া নমিতার ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিতে গেল; কিন্তু নমিতা

কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ক্ষমা করুন্।"

সুরসুন্দর থমকিয়া দাঁড়াইল; ক্ষণমধ্যে তাহার বিশাল আয়ত নয়নে ক্ষোভোত্তেজিত ভৎর্সনা-বিদ্যুদ্দীপ্তি ঝলসিয়া উঠিল। স্থির তেজস্বী কণ্ঠে সে সবেগে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিও আমায় ক্ষমা করুন্।—কিন্তু মিস্ মিত্র, আজ এখানে চুপ করে থাক্‌বার সাধ্য আমার নাই। আপ্‌নারা কি মনে করেন, জানি না;—কিন্তু অন্তর্য্যামী সাক্ষী, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, বিশ্বাস করুন্, আমি আপ্‌নাদের নিজের সহোদরা ছাড়া আর কিছুই মনে কর্‌তে পারি না, পার্‌বো না!—"

শেষকথাটা সুরসুন্দর এমন জোরে উচ্চারণ করিল যে, বোধ হইল, তাহার স্ফীতবক্ষের ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া তাহার মর্ম্মনিহত শক্তি-তেজস্বিতা প্রচণ্ড বেগে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া বজ্র-ঝঙ্কারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল!

কাহারও চড়া আওয়াজের ঝাঁঝালো কথা কোনও দিন নমিতার কানে শ্রুতি-সুখকর বলিয়া ঠেকে নাই; কিন্তু আজ এইখানে, এই তীব্র কঠিন তিরস্কার-শব্দ—ইহা শুধু কাণে নহে,—একেবারে প্রাণের উপর গিয়া গম্ভীর ভৈরব রাগের দৃপ্ত-মূর্চ্ছনায় সজোরে বাজিল! —কাণ বুঝিল, ইহা কৌশলাভ্যস্ত কণ্ঠের প্রবঞ্চনা-বাণী নহে! প্রাণ চিনিল—ইহা প্রাণের নিষ্ঠাপূত আবেগে উৎসারিত—অকপট সত্য!

ধ্বক্ করিয়া হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার চরম আঘাতে পূর্ণমুক্ত করিয়া, পরম পুরস্কারের প্রসাদ আসিয়া নমিতার অন্তরে পৌঁছিল! বিশ্বাসে শ্রদ্ধায়, সম্মানে, আনন্দে তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া গেল। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ-জড়তা এক ঝাপ্টায় অন্ধকারে দূর করিয়া দিয়া, গভীর আশ্বাসে শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া নমিতা বলিল, "দিন্ রুমাল;—না না, আপ্‌নিই বেঁধে দিন্।"

নমিতা সাবধানতার চেষ্টা ভুলিয়া, যন্ত্রণার আশঙ্কা ভুলিয়া, ত্রস্তে বামহাতখানা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া, আস্তিনের বোতাম খুলিয়া জামা গুটাইয়া লইল। সুরসুন্দর প্রসন্ন-বদনে, মর্ম্মস্পর্শী স্থিরদৃষ্টিতে একবার নমিতার সেই দৃঢ়, প্রশান্ত, মহত্ত্ব ও গরিমায় উজ্জ্বল, তরুণ, সুন্দর মুখের পানে চাহিল, তারপর কোনও কথা না বলিয়া, দৃষ্টি নামাইয়া, নতশিরে তাহার হাতের রক্ত মুছাইয়া রুমাল বাঁধিতে মনোযোগী হইল।

সুশীল এতক্ষণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিল। এইবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, এক ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া, সাগ্রহে আশান্বিত মুখে বলিল, "ঐ যে,—ডাক্তারবাবু, প্রমথবাবু আস্‌ছেন!"

নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল;—সুরসুন্দরও হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া ঘাড় ফিরাইয়া পিছন দিকে চাহিয়া দেখিল,—হাঁ, ডাক্তার মিত্রই বটে। তিনি শব-ব্যবচ্ছেদাগার হইতে ফিরিতেছেন; হাতে পেন্সিল ও 'নোট-বুক' রহিয়াছে। তিনি অশোভনীয় গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গীতে অতি-মাত্রায় ছাতি ফুলাইয়া, ক্রূর-কঠোর তাচ্ছীল্য-ব্যঞ্জক ভাবে, আকর্ণ-ভ্রূকুঞ্চিত-ললাটে, দৃষ্টিতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র জ্বালাময় ঈর্ষা ভরাইয়া,

প্রখর কটাক্ষে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন ;—বেশ ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া!—বোধ হয়, জুতার শব্দ হইবার ভয়ে! তিনি ও-দিকের মোড় হইতে এইরূপভাবে সন্তর্পণে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে, বোধ হয়, পঁয়তাল্লিশ হাত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; এবং এখন রহিয়াছেন মাত্র দশহস্ত-ব্যবধানে!—কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁহার চলিবার কৌশল! রাস্তার এ মোড়ে দণ্ডায়মান এই তিনটি প্রাণীর কেহই এতক্ষণ তাঁহার আগমন সংবাদটুকু আদৌ জানিতে পারে নাই!—এবং বোধ হয়, তিনি ঐ রূপে চলিতে চলিতে পাশে আসিয়া না উপস্থিত হইলে কেহ তাহা জানিতেও পারিত না, যদি সুশীলের দৃষ্টি-চাঞ্চল্য-ব্যাধিটুকু মাঝখানে না জুটিত!

নমিতার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র ক্ষণমধ্যে ডাক্তার জুতার 'ডগে' ভর দিয়া চলা ছাড়িয়া বেশ সহজ ভাবে গোড়ালিটা-শুদ্ধ মাটিতে পাতিলেন। তারপর ও-পক্ষের শিরোনমন শিষ্টাচারটুকুর উত্তরে পরিপূর্ণ অবজ্ঞার সহিত নোটবুকের কোণ-দ্বারা ডান চোখের উপরস্থ টুপীর প্রান্তটুকু ঈষৎ ঠেলিয়া উঁচু করিয়া শিষ্টাচার জানাইলেন। মুখখানা আসন্ন-বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত অন্ধকার করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ব্যস্ত ও গম্ভীরভাবে টক্ টক্ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। নমিতার হাতের অবস্থাটা যে তিনি দূর হইতে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী না থাকিলেও, তিনি কিন্তু সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, অম্লান-বদনে, ঘাড় ফিরাইয়া—না দেখিতে পাওয়ার ভানে—যখন স্বচ্ছন্দে বিপন্নকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন অতিবড় নির্লজ্জও তাঁহার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায় কুণ্ঠা-কাতর হইতে বাধ্য!......নির্ব্বাক্ নমিতা অধোবদনে ক্ষত-মুখের শোণিত-নিঃসারণ দেখিতে লাগিল। পাছে সুশীল কি সুরসুন্দরের সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়,—পাছে তাহাদের কোনরূপ অপ্রসন্ন মুখভাব চোখে ঠেকিয়া চক্ষুকে পীড়া দেয়, সেই ভয়ে নমিতা চোখ তুলিল না।

সুশীলের বাঙ্‌নির্গম হইল না ; কতকটা বিস্ময়ে—আর কতকটা ভয়ে! পাছে সত্যের খাতিরে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে, দিদির কাছে ভর্ৎসিত হইতে হয়, সেইটুকু শঙ্কা ছিল!

শুধু চুপ্ রহিল না, সুর সুন্দর।—ডাক্তারকে আসিতে দেখিয়া, সে সাহায্য-সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়া বিনা বাক্যে তাড়াতাড়ি রুমালটি খুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল!—এখন ডাক্তারকে ততোধিক নিঃশব্দে নিশ্চিন্তভাবে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, সে প্রথমটা সত্যই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল! বাহিরের লোক নহে, অন্য কেহ নহে।—নমিতা মিত্র উঁহাদেরই অব্য-বহিত-নিম্নস্থানীয়া শুশ্রূষাকারিণী, সহকারিণী। —তাহার সহিত ব্যবহারেও কি ডাক্তার-বাবু, ব্যবসাদারী চালে চলিবেন?—দুর্ব্বোধ্য-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সুরসুন্দর বলিল, "এ কি! উনি চলে গেলেন! কেন?...... কই! না, আপনার সঙ্গে ত ওঁর কিছু মনো-মালিন্য ঘটে নাই! পাচকের কথা?—না না, তাতো জানেন না! তবে?......ওহো-হো, তবে বুঝি—?"

সহসা সংশয়ান্বিত তথ্য মনের মধ্যে তীব্র সত্যে নিষ্কাশিত হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ ভাবে স্থরস্থন্দর বলিল, "তবে বুঝি, আমার জন্যে?—হাঁ, ঠিক, আমিই ত!—উনি যে আমার সঙ্গে কথা-পর্য্যন্ত ক'ন্ না।"

নমিতা নতশিরে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া, স্থরস্থন্দর ম্লান হাসি হাসিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল ও আপন মনেই বলিল, "এমন দরকারী সাহায্যের সময়ও উনি বিমুখ হ'লেন, শুধু ছেলে-মানুষী রাগটুকু বড় করে? বড় পরিতাপের বিষয়! ছিঃ!"

এবার নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল। কণ্ঠস্বরে তীব্র জোর ঢালিয়া দৃঢ় পরিষ্কার স্বরে বলিল, "না 'ছি' বল্‌বেন না। এ যা হোল, 'ছি' বল্‌বার বাইরে! মূর্খের বুদ্ধিদোষ ক্ষমার্হ, কিন্তু শিক্ষিতের নয়। আমার এই তুচ্ছ সাহায্যটুকু না করার জন্য ওঁর ওপর আমি কিছুমাত্র রাগ রাখ্‌তে চাই নে; বরং ওঁর কাছে যে সাহায্য নিতে হোল না, এর জন্যে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু ওঁর জন্যে দুঃখ হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি বলুন্ দেখি! আমার সঙ্গে কিছুমাত্র শত্রুতা না থাকাতেও উনি যখন এ-রকম ব্যবহার কর্‌তে কুণ্ঠিত হলেন না, তখন যার সঙ্গে বাস্তবিকই কিছু মনান্তর ঘটেছে, সে যদি কোনও সময় সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়ায়,—তা হ'লে? তা হ'লে তখনও উনি এমনি ভাবে নিজের শিক্ষার মর্য্যাদা ভুলে, মানুষের কর্ত্তব্য ভুলে তার সম্বন্ধেও এমনি ব্যবহার কর্‌বেন!...... একে কি বল্‌বো? আত্মসম্মান-রক্ষা? না, দম্ভ অভিমানের অন্ধপূজা?"

জ্বলন্ত লৌহের উপর হাতুড়ীর সজোর আঘাত বাজিলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া উঠে, নমিতার ভিতর হইতেও কথাগুলা ঠিক্ তেমনই ভাবে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল! —এবং যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, তাহাকে না পাইয়া সেগুলা যেন লক্ষ্য ডিঙ্গাইয়া, সবেগে ছুটিয়া আসিয়া স্থরস্থন্দরের মাথায় আঘাত করিল। স্থরস্থন্দর ঘাড় হেঁট করিয়া নির্ব্বাক্ রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা সজোরে বলিল, "না, আমি স্মিথের কাছেই চল্‌লুম। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না; আপ্‌নি হাঁস্‌পাতালে যান্। সুশীলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।"

ঈষৎ হাসিয়া মুখ তুলিয়া স্থরস্থন্দর বলিল, "আপনি কি আমার ওপরেও অবিচার কর্‌তে চান্? করেন করুন; কিন্তু আমার 'ডিউটী'র সীমা 'হাঁস্‌পাতাল গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা আমি জানি। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোর্‌বো, বাধা দেবেন না।"

সুশীলের দিকে চাহিয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে স্থরস্থন্দর বলিল, "দাদা বাড়ী যাও, কিছু ভাব্‌না নেই; আমি এখনি দিদিকে সঙ্গে করে এনে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাব—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "না না, ও সঙ্গে আসুক; না হলে বাড়ী গিয়ে গোলমাল করে এখনি সবাইকে ভাবিয়ে অস্থির কর্ব্বে। সঙ্গে থাক্‌লে, সে দায়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বো—।"

স্থরস্থন্দর বলিল, "তবে এস সুশীল—।"

তিনজনে স্মিথের কুঠির দিকে দ্রুতপদে চলিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কে তুই আমার?

১

কে তুই আমার?
কেমনে প্রকাশি ক'ব,
তুই যে আমার সব,
তুই যে আমার যাদু, কত সাধনার!
তুই সে দেবের স্মৃতি,
তুই মোর সুখ-প্রীতি,
স্বর্গ-মোক্ষ-ফল তুই কত তপস্যার!

২

কে তুই আমার?
তুই যে সর্ব্বস্ব ধন,
তুই মোর প্রাণ মন,
সংসার-মরুভূ-মাঝে সুরভি মন্দার!
ক্ষণে না হেরিলে তোরে,
মরমেতে যাই মরে,
আঁধার নিরখি যাদু, এ বিশ্ব-সংসার!

৩

কে তুই আমার?
অন্ধের নয়ন-মণি,
কাঙ্গালের রত্নখনি
নন্দনের পারিজাত, তুই রে আমার!
তুই হৃদয়ের যন্ত্র.
তুই মোর মূল মন্ত্র,
হৃদয়ী বীণায় তুই রাগিণী-মল্লার।

৪

কে তুই আমার?
আঁধারে আলোক-ধারা,
তুই মোর ধ্রুবতারা,
তাপিত হৃদয়ে তুই শান্তি-সুধাধার।
বিধি যেন দয়া করে,
চিরায়ু করেন তোরে
সদা এই ভিক্ষা যাচি পদে বিধাতার।

৫

শুভ জন্ম দিনে তোর কি দিবরে আর?
ধর শুভ আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হোক্ মন-সাধ
হৃদয়ে বহুক্ সদা শান্তি-পারাবার।
হে বিভো! মঙ্গলময়,
অভাগী কাতরে কয়,
শুভাশিস্ শিরে সদা ঢাল বিরজার।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

আলোক—

এ ভগ্ন বীণায়　　কাহার রাগিণী
বাজিল মধুর তানে!
স্বরগের সুধা　　বরষা-ধারায়
জুড়ায়ে তাপিত প্রাণে!
আঁধার হৃদয়　　আনন্দে পূর্ণ
আশার আলোক হেরি!
করুণার দান　　দিয়েছে এ দীনে
ওহে দয়াময় হরি!

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে　　লুটাই চরণে
নয়নে প্রেমাশ্রু-ধার!
আকিঞ্চনে দয়া　　বিতরিছ প্রভু,
করুণা তব অপার!
ভগন কুটিরে　　নবীন আলোক
এনেছ হৃদয়-মণি!
মায়ের বাছনি,　　বাপের দুলাল,
ও মুখ মণির খনি!

মধুমাখা মুখে একটি চুম্বনে
হরিল প্রাণের ক্ষুধা,
অতৃপ্ত নয়নে মেটে না যে আশ
হেরিয়ে আলোক-সুধা!
মুনি-মনোনীত নন্দন-শোভিত
মোর হৃদয় আগার,
স্বরগ হইতে এল আচম্বিতে
নির্ম্মাল্য এ দেবতার!
থেক চিরদিন মায়ের অঙ্কেতে
উজল করিয়ে জ্যোতি,
তোরে জগদীশ মঙ্গল ধারায়
আশিস্ করুন্ নিতি।

শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী।

মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক দৃশ্য।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই নিজেদের দেশের মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহার প্রথম কারণ এই যে, আমেরিকাতে যত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, এদেশে তাহা তত নাই। যখন আমরা সেই স্বাধীন রাজ্যের "ডানা-কাটা" পরীদের সহিত "At-home", "Ball-dancing", "Peanut Banquet", "Epworth league" প্রভৃতিতে মিশিতাম, তখন সেই দেশের নারীরা অত্যন্ত মেশা-মিশি সত্ত্বেও তাঁহাদের সরলতা ও পবিত্রতাকে কিরূপে রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাই আমাদের নিকট প্রথম আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমি সে দেশের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কতকগুলি সামাজিক দৃশ্য পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অগ্রে বর্ণনা করিয়া দেখাইতেছি।

আমেরিকার State University গুলি Co-educational অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নহে। সেখানে যুবক-যুবতী সকলেই সমান শিক্ষালাভ করেন, সকলেই একত্রে Lecture শুনিয়া থাকেন, একত্রে Laboratoryতে কাজ করেন, Oratorical বা debating contestতে পক্ষ গ্রহণ করেন। যখনই কোনও একটী "At-home of social night" হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা কার্য্যে বেশী উদ্যোগিনী হ'ন্।

ক্যানেডায় থাকিতে (Toronto) টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের "At-home"এ কয়েকবার গিয়াছিলাম। ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুইটী dormitory (অর্থাৎ ছাত্র ও ছাত্রীদের বাসগৃহ) আছে;—একটী ছাত্র-দের জন্য, আর একটী ছাত্রীদের জন্য। ছাত্রীদের dormitoryতে একটি প্রকাণ্ড Reception room (অর্থাৎ অভ্যর্থনা-গৃহ) আছে এবং কতকগুলি cosy corners (অর্থাৎ নির্জ্জনে বসিয়া গল্প করিবার স্থান) আছে। প্রত্যেক পাক্ষিক শুক্রবারে ছাত্রীরা ছাত্রদের "at-home"তে নিমন্ত্রণ করেন।

সে দিবস আমরা প্রায় ৩০০ ছাত্র ঠিক রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে মেয়েদের dormitoryতে পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের কতিপয় ছাত্র বন্ধুরা সেখানে 'Introducing Committee' নামে এক একটী চিহ্ন বুকের উপর আঁটিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিতেছেন। আমরা কতিপয় ছাত্রীদিগকেও ঐরূপ চিহ্ন বুকে লাগাইতে দেখিয়াছি। সকলকে পরস্পরের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়াই ইঁহাদের কার্য্য।

আমরা Dormitoryর আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে একখানি করিয়া ছোট খাতা ও পেন্সিল বিতরণ করা হইল। নিম্নে একখানি ছোট খাতার অবিকল নকল দেওয়া হইল :—

"AT-HOME.

Names	Rendezvous
1. Orchestra Waltz—Take me out to the ball game.	
2. "Tell her" Barry.	
3. Orchestra Intermezzo—Red-wings.	
4. "It was a lover and his lass."	
5. Orchestra Two-step-society swing.	
6. "When the heart is young"—Bnck	
7. Orchestra Waltz—My lady daughter.	
8. "Since first time I met thee" Rubenstead.	
9. Orchestra Selection—Apple Blossom.	
10. "Oh, hush thee my baby" Sullivan.	
11. Orchestra selection —Egyptian waltzes.	
12. 'The Battle Eve"—Bonheur.	

Information.

For concert numbers kindly assemble in the Gymnasium as promptly as possible, as the door will be closed five minutes after close of preceding promenade.

Refreshment in Dining Hall from 10 P.M.
Promenades 10 mnutes.
Cars will be in waiting at close."

(অর্থাৎ সম্মিলিত সঙ্গীতের সময় কুস্তির আখ্ড়াতে যত শীঘ্র পারেন সকলে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সমবেত হইবেন, যে-হেতু দরজা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বচ্ছন্দভ্রমণের পাঁচ মিনিট পরে বন্ধ করা হইবে। রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আহারের ঘরে জলযোগের আয়োজন করা থাকিবে। একটী মহিলাকে লইয়া দশ মিনিটের বেশী কেহ স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণাদি করিতে পারিবেন না। "At home"এর পরে ট্রাম-গাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে।)

যে সমস্ত ছাত্রীরা ছাত্রদের সহিত "অল্প-ক্ষণের জন্য বেড়াইতে ও গল্প করিতে চান," তাঁহাদের নাম খাতায় সহি করান হয় ও নির্দ্দিষ্ট মিলন-স্থানের কথাও লিখিতে হয়। ছাত্রেরাও তাঁহাদের নিজেদের খাতায় ছাত্রী-দের নামও সহি করাইয়া লন। এইরূপে ঐ খাতা সকলকে বিতরণ করা হইলে, একটী অধিকবয়স্কা মহিলা একটী শৃঙ্গ বাজান এবং তৎক্ষণাৎ প্রায় ৬০০ যুবক ও যুবতী পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য "হলে"র চারিদিকে ছুটাছুটী করেন। প্রত্যেক খাতায় অন্ততঃ ১২ জনের নাম সহি করা যাইতে পারে।

আমরা এমনও দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত যুবক ও যুবতী অত্যন্ত লাজুক ও লজ্জাশীলা,

তাঁহারা তাঁহাদের খাতায়, হয়ত, দুই-তিন জন partner বা অংশীর নাম মাত্র সহি করাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ সে রাত্রে সে সময়ে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তাগুলি শুনিতে পাইতেন:—"মহিলাগণ একস্থানে দাঁড়াইয়া ভিড় করিবেন না;" "সরে চলুন, লজ্জা করিবেন না;" "আপনি যাহার সহিত স্বচ্ছন্দে বেড়াইবেন ও আলাপ করিবেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন?" "মিস্! আপনার কি বারটা নামই সহি হইয়াছে?" "না; আমার ৩নংটা এখনও খালি আছে।" ইত্যাদি।

দশ মিনিট অন্তর ঘণ্টা বাজান হইত, এবং তদনুসারে আমরা আমাদের partner বা অংশীর পরিবর্ত্তন করিতাম। এইরূপে যে যুবক ও যুবতী লাজুক নহে, তাহারা অনায়াসে বার জনের সহিত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ ও আলাপ-পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা লাজুক তাঁহাদের সময়টা ভাল-রূপে কাটে না।

আমি যে রাত্রে প্রথম "at-home" এতে যাই, সে-রাত্রের গল্পটা একটু বলি। প্রথম রাত্রে আমি আমার স্বভাবানুসারে বড়ই লাজুক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন যাওয়া আসা করাতে আমার সে লজ্জা দূর হইয়াছিল। প্রথম "at-home"এর রাত্রে আমি কোনও ছাত্রীকেই আমার সহিত ভ্রমণ ও আলাপ করিতে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সমকক্ষবাসী (room-mate) দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, আমি লাজুক বালকদিগের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া আছি। তখন তিনি তাঁহার সঙ্গিনীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন:—"সিংহ! ব্যাপারটা কি? তুমি কি একটিও মেয়ের সহিত আলাপ করিতে পারিলে না?" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "না; তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু এরূপ সমাজিক জীবন আমার কাছে নূতন লাগি-তেছে। আমি কখনও আমাদের দেশে এভাবে মেয়েদের সহিত মিশিতে শিক্ষা পাই নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার বন্ধুটি তাঁহার সঙ্গিনীর সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন:—"You take care of my lady, Sinha! I am going. If you don't treat her all right, I shall dump your bed to-night." (অর্থাৎ, "সিংহ! তুমি এই মহিলার যত্ন কর, আমি এখন যাইতেছি। যদি তুমি তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার না কর, আজ রাত্রে তোমাকে বিছানা হইতে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিব।) এই কথাতে আমরা আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সেই নিম্নগণ্ড ও ক্ষীণমধ্যা যুবতী আর কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাদের প্রথানুসারে আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমার সহিত বেড়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "সিংহ! তুমি আমাদের মেয়ে-দের সহিত বেড়াও, ইহা আমরা পছন্দ করি না। আমরা যখন ভারতবর্ষে যাইব, তখন কি তোমাদের দেশের মেয়েরা আমাদের সহিত ঐরূপে বেড়াইবেন?"

তারপর ঠিক্ যখন রাত্রি দশটা বাজে, তখন প্রত্যেক যুবক তাঁহার Partnerকে

সঙ্গে লইয়া খাইবার ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আসেন। সেই সময় ক্যানেডার চাকুরাণীরা পরিবেশনের জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। জলযোগের পর সব ছাত্র ও ছাত্রী, অধ্যাপক এবং তাহাদের পত্নী,—সকলে, একজন পুরুষ ও আর একজন নারী, পরস্পরের হাত ধরিয়া কতিপয় circle বা বৃত্ত রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গান গাহিয়া সে রাত্রের "at home"এর কাজ শেষ করেন :—

"Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days of auld lang Syne?"

* * *

এইবার পাঠকপাঠিকাগণকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দৃশ্য দেখাইতে লইয়া চলি। আমরা ইলিনয় কৃষি-সমিতির সভ্য। আমরা বৎসরে চারিবার মাত্র Social nightএর আয়োজন করিতাম। আমরা ঐ চারি রাত্রে "House hold Science Club"এর সমস্ত মহিলাদের নিমন্ত্রণ করিতাম। উক্ত ক্লাবের সমস্ত মহিলাদের নামের তালিকা ও তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা-লেখা কাগজ "Ag-club" (অর্থাৎ আমাদের ক্লাব) এর Social-night যেদিন হইবে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের ক্লাবের সভ্যদের নিকট পাঠান হইত। ঐ তালিকা হইতে প্রত্যেক সভ্য যে কোন একটি মহিলাকে বাছিয়া লইবেন; তাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বে থাকুক্ বা না থাকুক্। যিনি যাঁহাকে বাছিয়া লইবেন, সেই মহিলা সেই সভ্যের জন্য "reserved" বা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন। তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সভ্যকে নিজের নিজের নির্ব্বাচিতা মহিলাকে ক্লাবে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইবে।

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে একটী ঐরূপ অচেনা যুবতীকে ক্লাবের নিমন্ত্রণে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাহার বাটীতে যাইতে হইয়াছিল। তিনি বেশ নিঃসঙ্কোচে একাকী আমার সহিত বাটী হ'তে বাহির হইলেন। আমি তাঁহাকে ক্লাবে অতিযত্নের সহিত আহার করাইয়াছিলাম। আমরা ভারতবর্ষে কোনও মহিলাকে কি এরূপ করিয়া ক্লাবের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ তাহার বাটী হইতে আনিতে সাহস করিতে পারি!

একবার আমি আমেরিকার একটী ধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলাম :—"আমি আমেরিকাকে ভালবাসি। তাহার স্বাধীনতা অতিচমৎকার। কিন্তু আপনার মেয়েরা প্রত্যেক রাত্রে একাকী "অপেরা হাউসে" "কাফে" এবং অন্যান্য আমোদের স্থানে যান, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি কেন এরূপ প্রশ্রয় দেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যে-হেতু আমরা আমাদিগের কন্যাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকি, সেইজন্য। যদি আমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে তাহারা কখনও রক্ষকের সঙ্গ ছাড়া বাটীর বাহির হইবে না। এই বিষয়টী দুইদিক দিয়া দেখিতে হইবে। মিঃ সিংহ, মার্কিন মেয়ে মানুষ করিবার দুইটী উপায় আছে। আমরা আমেরিকান্ honour-systemকে বিশ্বাস করি; এবং কার্য্যতঃ দেখিয়াছি যে, অধিকাংশ স্থলে ইহাতে ভাল

ফল ফলিয়াছে। আমি আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিলে এই প্রথা সেখানে প্রচলিত করাইতে চেষ্টা করিবেন। উক্ত মহিলাটীর উত্তর যুক্তিসঙ্গত কি ?

Household Science ক্লাবের মহিলাগণও "ag-club"এর সমস্ত সভ্যগণকে চারিটী সান্ধ্য-সম্মিলনে" নিমন্ত্রণ করেন। এই নিমন্ত্রণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Women's Building এ হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা ভালরূপ তালিকা প্রস্তত করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingএ প্রবেশ করিলে মহিলারা ছোট ছোট কাগজ আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন। ঐ সমস্ত কাগজে দেশের ও রাজ্যের নাম লেখা আছে। মহিলাগণও এরূপ ছোট ছোট কাগজ লইয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের কাগজে দেশের ও রাজ্যের রাজধানীর নাম লেখা থাকে। মনে করুন, আমি পুরুষ মানুষ সেইজন্য আমি "New York" লেখা এক টুকরা কাগজ পাইলাম। আমার যিনি Partner বা সঙ্গিনী হইবেন সেই মহিলাটির কাগজে New Yorkএর রাজধানী Albanyর নাম লেখা থাকিবে। ভূগোল পড়া না থাকিলে এইরূপ সান্ধ্য-সম্মিলনে আনন্দ উপভোগ করায় বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

এক্ষণে যে মহিলাটি "Aibany"-লেখা কাগজ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। ঐ মহিলাটীও ইতোমধ্যে "New York" লেখা কাগজ হাতে করিয়া যে পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার অন্বেষণে ফিরিবেন। তারপরে আমি যখন আমার সঙ্গিনীকে খুজিয়া পাইব, তখন তিনি আমাকে 'laboratory of Kitchen', মেয়েদের ব্যায়ামের আকড়া প্রভৃতি স্থানে লইয়া ভ্রমণ করিবেন। ইতোমধ্যে 'হলে' Vocal Solo, Piano Solo বা কিছুর আবৃত্তি হইতে থাকিবে। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগের পর প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তি নিজের নিজের সঙ্গিনীকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে যাইবেন।

আমার আর একটি রাত্রের সামাজিক নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে। ইহা ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Graduate School Club' এর সভ্যরা করিয়াছিলেন এবং ইহার সভ্য আমিও কিছুকাল ছিলাম। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের President (অর্থাৎ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের মত ব্যক্তি), Graduate Schoolএর সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং Graduate Schoolএর সমস্ত অধ্যাপক উহাতে নিমন্ত্রিত হ'ন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে Women's Buildingতে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা দেখি যে, আট-দশটী মহিলা 'পিন্' ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Official blank cardগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রত্যেক অভ্যাগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক একটি কার্ড ও একটি পিন্ লইবেন এবং কার্ডের নিম্নলিখিত স্থানগুলি পূর্ণ করিবেন :—

"Name...

Name of your Alma Mater...

Name of your local College..."

এই সকল পূর্ণ করা হইলে কার্ডখানিকে কোটের বা জ্যাকেটের সাম্‌নের দিকে পিন্ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এরূপ

করার উদ্দেশ্য যে, আপনি বা আমি কে, তাহা কার্ড পড়িয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে কেহ কাহাকেও পরিচিত করাইয়া দিবার জন্য নাই। এখানে নিজে নিজেই আলাপ-পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

আমরা ভিড়ের মধ্যে যাই এবং নিজ নিজ নাম বলি :—"Sinha is my name ; let me read your name.—Miss Mc Taggart. Is that the way you pronounce your name ?" তিনি বলিলেন, "Yes, sir ; glad to meet you." এইরূপে ছাত্র-ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়া থাকেন।

তারপর Graduate School Clubএর কোনও না কোনও সভা কোনও না কোনও বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্বশেষে জনতা নাচের ঘরের দিকে যাইবে। সেখানে একটি পুরুষ অধ্যাপক এবং তাঁহার একটি ছাত্রী, একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী, একটি স্ত্রীলোক ও অন্য স্ত্রীলোকের স্বামী যুগলনর্ত্তন আরম্ভ করিবেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নাচের পর আনন্দ-ধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার পর নিম্নলিখিত গানটি করিয়া সে রাত্রের কার্য্য শেষ করা হয় :—

"You meet her on the campus,
You meet her in the hall,
You meet her in the class-room,
At a lecture or a ball.
"She's numerous as to number,
She's varied as to name,
And yet where'er she may appear,
You know her just the same.

Chorous.
"O College Girl—the Girl of Illinois,
O College Girl, she's loyal and true
to the Orange and Blue.
O College, College Girl—the Girl of Illinois,
The witching spell she wields so well,
There's nothing can destroy.
O College, College, Girl, chockfull-of-knowledge Girl,
The fascinating, captivating Girl of Illinois.'

এক্ষণে আমি আমার পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?—এইরূপ সামাজিক দৃশ্য-সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন ? এইগুলি কি শিক্ষার অংশ নয় ? আপনারা কি মনে করেন যে, আমরা আমাদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছি, যেহেতু ঐ সমস্ত মেয়েদের সহিত ঐরূপভাবে মিশিয়াছিলাম ? শেষ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—"না, তাহা আদৌ নয়।" আমরা যে St. Petersburg, Gottingen, Cambridge, Tokyo, Peking, Harvard, Boston, Wisconson, Leland ও Standford প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এইজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানাবিধ ভাবোদ্দীপক যুবক ও যুবতীদের সহিত মিশিয়া ও নানাবিষয়ে আদান প্রদান করিয়া,আমার মনে হয়, আমরা একটু উদার হইয়া ও হৃদয়টীকে একটু বিস্তৃত করিয়া দেশে ফিরিয়াছি। এইরূপ মিলন শিক্ষাদায়ক এবং আনন্দজনক, ইহা আমার বিশ্বাস। অবশ্য, লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, আমাদের মতগুলি শিষ্টজনোচিত নহে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ।

তপস্যা।

(উপন্যাস)

(১)

কলিকাতার চোর-বাগানে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য হর্ম্ম্যের দ্বিতলস্থ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ একখানি সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিলেন। কক্ষটী সুন্দর, সুপ্রশস্ত এবং আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। কক্ষটী দর্শন করিলে গৃহস্বামীর রুচি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কক্ষতল বহুমূল্য 'কার্পেটে' মণ্ডিত, কক্ষগাত্র নানাবিধ সুন্দর ও সুবৃহৎ চিত্র-ফলকে শোভমান এবং মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকাধার কক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের বৃহৎ টেবিল। টেবিলের উপরে বিস্তর পুস্তক, 'অ্যালবাম্', মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি অসুবিন্যস্তভাবে পড়িয়া ছিল। টেবিলের চতুঃপার্শ্বে স্প্রীংয়ের গদীযুক্ত কতকগুলি মূল্যবান্ কেদারা। অবিনাশবাবু একখানি কেদারায় বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বালক-বালিকা সেই কক্ষ-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় একজন অনিন্দ্য-সুন্দর-কান্তি যুবা কক্ষের দ্বারদেশে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র বালক সহাস্য আস্যে একটী বালিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলে লাবি, দামাই-বাবু এতেতে লে, দামাই-বাবু !"

বালিকা বলিল, "ধেৎ ! দামাইবাবু বুঝি ? জামাই বাবু !"

বালককে এইরূপ শিক্ষা দিয়া, একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, একরাশি কাল কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ দুলাইয়া, গাল-ভরা হাসি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবকের হস্তধারণ করিয়া বলিল, "দেখুন জামাইবাবু ! খোকা জামাইবাবু-বল্‌তে পারে না ;—দামাই বাবু বলে ! ছেলে মানুষ কিনা !" সে এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। অবিনাশবাবুকে সম্বোধন করিয়া বালিকা বলিল, "বাবা ! জামাইবাবু এসেছেন।"

অবিনাশবাবু পাঠে নিযুক্ত চক্ষু না তুলিয়াই বলিলেন, "বোস।" যুবক সে আদেশ পালন করিলেন না ; তিনি নির্ব্বাক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবকের বদনমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ ;—যেন কিছু ক্রোধব্যঞ্জক ; এবং তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব প্রতীয়মান হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অবিনাশবাবু সংবাদ-পত্রখানি সরাইয়া রাখিয়া, চক্ষু হইতে চশ্‌মা-যোড়াটী খুলিয়া তাহা বস্ত্রাগ্রভাগ-দ্বারা মুছিতে মুছিতে যুবককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কবে কল্‌কাতায় এলে ?"

যুবক। আজই এসেছি।

অবিনাশবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হুঁ !" তাহার পর তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি পুস্তক লইয়া ক্রমান্বয়ে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। যুবক তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি বলি বলি করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবিনাশবাবু এইরূপ

পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে "বাবুলাল" বলিয়া ডাকিবামাত্র, "জী" বলিয়া উত্তর দিয়া একজন হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য আসিয়া দর্শন দিল। অবিনাশবাবু বলিলেন, "যা বাড়ীতে বল্‌গে যা, জামাই বাবু এসেছেন।" "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ভৃত্য সেলাম ঠুকিয়া আদব্-কায়্‌দা জানাইয়া প্রস্থান করিল।

যুবকের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দ্বারা একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া অবিনাশবাবু বলিলেন, "বোস না।"

এবারে যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করিলেন। বালক-বালিকাগণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করিয়া যুবককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। যুবক তাহাদের কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া তাহাদের কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন ও তাহার পর অবিনাশবাবুর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন, "আমি ওদের আজ নিয়ে যেতে এসেছি।"

অবিনাশবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "কা'দের?"

যুবক কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বিনীতভাবে বলিলেন, "ওদের।"

অবিনাশবাবু এবার যুবকের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া অবজ্ঞাভরে তিনি বলিলেন, "কা'কে?—লিলীকে?—সে দিন ত তোমার বাপ্ এসেছিলেন—। আমি ত বলে দিয়েছি এখন পাঠান হবে না!"

ক্রোধে যুবকের বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া উঠিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা সংযত করিয়া লইয়া বলিলেন, "যখনই নিয়ে যাবার কথা হয়, তখনই আপনি বলেন, 'এখন পাঠান হবে না।' এটা আপনার উচিত নয়।"

অবিনাশবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার কি উচিত কি অনুচিত, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি! আমার মেয়ে, আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন পাঠাব। কারোও হুকুম তামিল কর্‌তে আমি বাধ্য নই।"

যুবক আর ক্রোধ-সংবরণ করিতে সক্ষম হইলেন না; উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, মেয়ে আপ্‌নার বটে; কিন্তু মেয়ের যখন বিয়ে দিয়েছেন, তখন আর মেয়েতে আপ্‌নার কোনো অধিকার নেই। যখন আমরা নিতে আস্‌বো, তখন অবশ্যই আপ্‌নি পাঠাতে বাধ্য।"

শ্বশুর-জামাতায় কথাটা অবশ্য ধীরে ধীরে হইতেছিল না। বহির্দ্দেশ হইতে গৃহিণী তাহার কতকটা শুনিতে পাইয়াছিলেন। দোক্তা-সংযুক্ত তাম্বূলের রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে ওষ্ঠদ্বয় মুছিতে মুছিতে হেলিতে দুলিতে গৃহিণী তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া তিনি অবিনাশ-বাবুকে বলিলেন, "কি, হয়েছে কি? অত চেঁচামেচি কিসের?"

অবিনাশবাবু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "জামাই-বাবাজী লীলীকে নিয়ে যাবেন বলে আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে এসেছেন!"

যুবক বলিলেন, "ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাব।"

অবিনাশবাবু সদর্পে টেবিলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি কিছুতেই পাঠাব না।"

যুবকও ততোধিক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাঠাতেই হবে; নইলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন?"

অ। ঝকমারি করেছিলুম্। তখন মনে করেছিলুম, তুমি একজন মানুষের মত হবে, তাই বিয়ে দিয়েছিলুম। তুমি যে এমন 'ফেল' মারবে,—ষাঁড়ের গোবর হবে,তা জানলে কখনও তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতুম না! আগে আমার মেয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত হও, তারপর তা'কে নিয়ে যাবার কথা ও মুখে এনো!

গৃহিণীও কর্ত্তার স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার মেয়ে সে পাড়াগাঁয়ে দেশে গিয়ে ঘর নিকুতে, বাসন মাজ্‌তে পারবে না।"

যুবক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন,—"হাঁ, আমি পাড়াগাঁর লোক বটে; কিন্তু একদিন এরই পায়ে ধরে কন্যাদান করেছিলেন; পাঁড়াগাঁর লোকের ঘর করতে হবে জেনেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।"

অবিনাশবাবুও তদ্রূপ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "অন্যায় করেছিলুম। বিয়ে যদি ফিরিয়ে নেবার হ'ত, ত এখন ফিরিয়ে নিতুম। কি আর বলব?—যাও, আর যেন্না বোকো না। এখন আমি লীলীকে কিছুতেই পাঠাবো না! তুমি যা করতে পার, কোরো।

"আচ্ছা বেশ! কিন্তু জানবেন আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত! মেয়েকে সুখী করতে চেষ্টা কর্ব্বেন।" এই বলিয়া যুবক রাগে ফুলিয়া তিনটা হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যুবকের শেষ কথার উত্তরে অবিনাশবাবু বলিলেন, "সে ভাবনা, তোমায় ভাবতে হবে না।" কিন্তু সে কথা যুবকের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যুবক তখন কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

যুবক চলিয়া যাইলে গৃহিণী বলিলেন, "ছোঁড়ার তেজ দেখলে একবার! তোমার ওপর রাগ করে গোঁ ভরে ঠক্ ঠকিয়ে চলে গেল!"

অবিনাশবাবু চশমাটি চক্ষে পরিতে পরিতে বলিলেন, "ও তেজ কতক্ষণের জন্যে!"

যুবক যখন রাগে গনগন করিয়া মসমস করিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন সোপানের পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা একখানি কচি হাত বাড়াইয়া হাত-ছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, "শোন!"

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া দেখিলেন; দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু ও গৃহিণীর রূঢ় বাক্যে তখন যুবকের অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। তিনি তখন হিতাহিত-বিবেচনায় শক্তিশূন্য। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে তাঁহাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-রহিত করিয়াছিল। যুবক চলিয়া যান দেখিয়া বালিকা দ্রুত বাহির হইয়া যুবকের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, যেও না; শোন।" যুবক কিন্তু ফিরিয়াও চাহিলেন না। যুবকের উত্তরীয়খানি বালিকার হস্তেই রহিয়া গেল। তিনি অতি-দ্রুতভাবে সোপান অতিক্রম করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 650. — October, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫০ সংখ্যা।	আশ্বিন, ১৩২৪। অক্টোবর, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লুকিয়ে কেন পাগল কর

ওগো আমার পাগল-করা!

ধর্‌লে কেন পালিয়ে যাও,

ওগো আমার সকল-ধরা!

এই যে ছিলে, কোথায় গেলে,

এই যে আছ, এই যে নাই;

এই যে থামে বাঁশীর ধ্বনি,

এই যে আবার শুন্‌তে পাই।

এবার এলে ছাড়্‌ব না হে,

ধর্‌ব প্রাণে প্রাণের ধরা;

আবার গেলে সঙ্গ নিব,

ওগো আমার সকল-হরা।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আড়াঠেকা-তালের বোল্।

	২´				৩			
II	ধা	কেটে	তাগ্	দিন্।	ধা	ধা	ধিন্	দিন্।
	এ	ছ •	• •	ন্দ •	আ	০	ড়া •	০ ০
	০				১			
	তা	কেটে	তাগ্	দিন্।	ধা	ধা	তিন্	তিন্ II
	নি	তা ০	০ ০	স্ত ০	বে	য়া	ড়া •	০ ০

স্বরলিপি।

১ ২´ ৩ ০

{ সা ‖ রা মা মা -া ‖ পমা পা -া মা। জ্ঞা া জ্ঞা পা। মজ্ঞা -া -া রা।
লু কি য়ে কে ০ ন ০ পা ০ গ ০ ০ ল ক র ০ ০ ও

১ ২´ ৩ ০

‖ মা পধা ণা ধা ‖ পা মা -া জ্ঞা। -া পা মজ্ঞা -া। রাঃ জ্ঞঃ সা } সা।
গো আ ০ ০ মা র পা ০ ০ ০ গ ল ০ ক রা ০ ধ

১ ২´ ৩ ০

‖ রা রা রা রা ‖ সরা -সমা -া জ্ঞা। -া রা সণ্‌ -া। ধ্‌ -া প্‌ সা।
বৃ লে কে ন পা০ ০০ ০ ০ ০ লি ০য়ে ০ যা ০ ও ও

১ ২´ ৩ ০

‖ রা মা মা মা ‖ পা -ধা -ধা -ণা। ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা। ধপা -মজ্ঞা রসা সা ‖
গো আ মা র স ০ ০ ০ ০ ০ ক০০ ০ল ধ০ রা০ ০০ "লু"

১ ২´ ৩ ০

| মা ‖ মা ণা ধা ণা ‖ ণা র্সা -া ণা। -র্সা র্সা র্সা -া। -া -া -া র্সা।
এ ই যে ছি লে কো থা ০ ০ য় গে লে ০ ০ ০ ০ এ
এ বা র এ লে ছা ড়্‌ ০ ০ ব না হে ০ ০ ০ ০ ধ

১ ২´ ৩ ০

ণা র্সা র্রা র্সা ‖ র্সা র্সা -া ণা। া র্রা র্সণা -া। ধা পা -া | মা।
ই যে আ ছ এ ই ০ যে ০ না ০ই ০ ০ ০ ০ এ
বৃ ব প্রা ণে প্রা ণে ০ র ০ ধ ০রা ০ ০ ০ ০ আ

১ ২´ ৩ ০

মা মা -া মা ‖ পা মা -া জ্ঞা। জ্ঞা পা মজ্ঞা -া। রা সা -া সা।
ঐ যে ০ ধা মে বাঁ ০ শী র ধ্ব নি ০ ০ ০ ০ এ
বা র ০ গে লে স ০ ঙ্গ ণ নি ব ০ ০ ০ ০ ও

১ ২´ ৩ ০

রা মা মা মা ‖ পা -ধা -ধা -ণা। ণা -র্সা ণর্সর্রা র্সণা। -ধপা -মজ্ঞা -রসা সা ‖
ই যে আ বা র ০ ০ ০ শু স্তে ০পা ০ ০ই ০ ০ ০০ ০ ০ "লু"
গো আ মা র স ০ ০ ০ ক ল ০ হু ০ ০রা ০ ০ ০০ ০ ০ "লু"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে পূজোপকরণ-হস্তে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। যাত্রিগণের অশ্রান্ত কোলাহল, ঘণ্টাধ্বনি, পাণ্ডাগণের আশ্বাস-বাণী, দোকানীর সোৎসুক আহ্বান, সাধুগণের মন্ত্রোচ্চারণের সমবেত স্বর চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিতেছিল।

মন্দিরে প্রবেশ-কালে দ্বারে প্রচলিত প্রথানুসারে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মা যেন কারাবন্দিনী। লৌহবেষ্টনীর মধ্য হইতে এক একজন মায়ের পবিত্র চরণ-যুগলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ক্ষুদ্রদ্বার-পথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, আবার একজন তাহার স্থল পূর্ণ করিতেছে! অভ্যন্তরে তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততা! নিরিবিলি বসিয়া একটু ভাবিবার সুযোগ ঘটে না। পাণ্ডার তাড়নায় হিন্দুতীর্থে কাহারও অবাধগতি নাই। যে উৎকোচ প্রদানে সমর্থ, তাহার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন! ভীমদর্শন প্রহরিগণ আবার এই বেষ্টনীর দ্বারদেশেও বেশ দুই পয়সা আদায় করিয়া লইতেছে।

দেখিলাম, মায়ের মূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর :— আয়তনেও সুবৃহৎ। একটী কর্পূরের প্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। লাবণ্যময়ী মায়ের পদযুগলে সর্ব্বক্ষণ পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের নয়ন-যুগল হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল! পাণ্ডাজীর উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং চরণযুগল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। আহা, পূজান্তে প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম! পাণ্ডাজীকে পূজার মূল্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিলাম। ইহাও ভাল। পাণ্ডার পরিতুষ্টি একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার! তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহে না; কিন্তু এস্থানে অন্যরূপ প্রত্যক্ষ করিলাম।

পূর্ব্ব রজনীর আহার স্মরণ করিয়া তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 'ষ্টেসনা'ভিমুখে রওনা হইলাম। রাস্তায় সব অপরিচিত দৃশ্য! শরৎকালের সেই শুভ্র-নীরদখণ্ড-পরিশোভিত সুনীল আকাশ, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সেই সরোবর, হংস-কারণ্ডব-শোভিতা সেই দীর্ঘিকা, বিহগ কূজিত ও পুষ্পিত সেই কুঞ্জ, অথবা প্রাবৃড্-জল-প্লাবনে তরঙ্গায়িত শ্যামল প্রান্তর কিছুই নয়ন-গোচর হইল না। বঙ্গ-জননীর সেই স্নিগ্ধমধুর ভাব যেন এ-প্রদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ষ্টেশনের বিস্তীর্ণ বিশ্রামাগারে বহুসংখ্যক লোক বিশ্রাম করিতেছিল;—একটিও ভদ্রলোক বা বাঙ্গালী তথায় দেখিতে পাইলাম না; কেবল জীর্ণবস্ত্র পরিহিত বহুসংখ্যক অশিক্ষিত নরনারী। সকলের সঙ্গেই পথের সম্বল এক একটী বোচ্‌কা।

বেলা ১॥ টার সময় আমরা বিন্ধ্যাচল ছাড়িয়া এলাহাবাদে রওনা হইলাম। আমাদের প্রকোষ্ঠে দুইজন রেল-কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারা বেশ শিষ্ট ও বিনয়ী। ইংরেজী ভাষায় আমাদের সঙ্গে তাঁহারা কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। গাড়ী দ্রুতগতিতে চলিল। প্রখর-সৌরকর-তপ্ত বালুকারাশি গতিশীল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে ঘূর্ণিত হইতেছিল, আর ক্ষণে ক্ষণে উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে সঞ্চিত হইয়া দৃষ্টি প্রতিহত করিতেছিল। অগত্যা স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যের একটী 'বেঞ্চে' গিয়া বসিলাম। চলন্ত গাড়ী হইতে বিন্ধ্যগিরির দৃশ্য অতিশয় মনোরম! যেন কোনও মহাপুরুষের অভ্যর্থনার জন্য বহুব্যয় ও বহু-পরিশ্রমে পত্র ও পুষ্প-স্তবকাচ্ছাদিত বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে! সৌরকর প্রতিফলিত হওয়ায় পর্ব্বতগাত্র অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে! অপর পার্শ্বে স্নিগ্ধ মধুর ছায়া বিরাজমানা; যেন দিবস-রজনী পাশাপাশি যুগপৎ বিদ্যমান। তাহার পর আবার সেই বৃক্ষলতাশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

আমরা প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদ-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ষ্টেশনে বিচিত্র কোলাহল, আরোহিগণের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ গমনাগমন, অনাবশ্যক ব্যস্ততা, বাক্স-প্যাট্রার ছড়াছড়ি, ময়রার দোকানে ক্রেতার ভিড়, ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ী ইত্যাদি দেখিয়া হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল! কি এক গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ শান্তিময় রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! তথায় ব্যস্ততা নাই; গা ঢালিয়া বসিয়া থাক,—কোনও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কারণ নাই!

তিন দিবস পূর্ব্বে এলাহাবাদের এক বন্ধুর নিকট আমার সম্ভাবিত আগমন জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এলাহাবাদে অবস্থান-কালে বন্ধুবরের সংসর্গে যে কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার আন্তরিক সৌজন্য ও উদারতার কথা মনে হইলে প্রাণ-মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়!

এলাহাবাদ।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাহাবাদ-সহরটী অতিমনোহর। এ-স্থানের রাজপথে জনতা নাই, কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই;—যেন এস্থানে চিরশান্তি বিরাজমান। দূরে দূরে বৃহৎ অট্টালিকারাজি স্ব স্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে! পুরোভাগে তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রাঙ্গণ! মধ্যে মধ্যে পল্লবিত-শাখা-সমলঙ্কৃতা বিটপিশ্রেণী পুষ্পভারাবনম্রা হইয়া সৌন্দর্য্যসম্পদ্ বিকাশ করিতেছে। রাজ-পথের দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নিম্ব-বৃক্ষ নিবিড়-পত্ররাশি-বিভূষিতা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল-ছায়াদানে ক্লান্ত পথিকের শ্রমাপনোদন করিতেছে। এ স্থানের সরকারী বিদ্যালয় (কলেজ), বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, বিচারালয়, সকলই সুন্দর ও অতিসুকৌশলে নির্ম্মিত; যেন এক একটী রাজ-প্রাসাদ! চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত ময়দান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! স্থানের অভাব নাই; বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব নাই। সাধারণের ভ্রমণোদ্যান অতিবিস্তীর্ণ; মধ্যভাগে ভারতেশ্বরী স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তরমূর্ত্তি; চারিদিকে পুষ্পিত কুসুমোদ্যান। এ-স্থানে বসিয়া থাকিলে প্রাণের সমস্ত বেদনা, দেহের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়। সুপ্রশস্ত রাস্তা উদ্যানের মধ্য দিয়া সর্প-গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি কুঞ্জ;—

কোথাও বা সারি সারি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট।

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিলাম; এতাদৃশ বিচিত্র সঙ্গম কল্পনায়ও সম্ভবে না। গঙ্গা বেগবতী ও উদ্দাম এবং যমুনা ধীর, গম্ভীর ও প্রশান্ত। খরস্রোতাঃ গঙ্গার জল পঙ্কিল, আর উদার যমুনা স্বচ্ছ-সলিলা ও উর্ম্মিমালা-বিভূষিতা। তাহাতে সুনীল আকাশ প্রতিফলিত হওয়ায় পরমরমণীয় শোভা! এ স্থানেও সেই পাণ্ডার উপদ্রব। দোকান সাজাইয়া তাহারা বসিয়া আছে; পরস্পরে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘাটে যাইবামাত্রই সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া একেবারে আগন্তুককে ব্যতিব্যস্ত করে। একখানি নৌকা-যোগে সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। স্নানার্থীর সংখ্যা সর্ব্বদাই খুব বেশী। দরিদ্রবালকগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গঙ্গায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটি পয়সা নিক্ষেপ করিবামাত্র স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তাহারা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। তাহাদের অধ্যবসায় সমধিক প্রশংসনীয়। সঙ্গমস্থলের উপকণ্ঠে একটী বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমভূমি; তথায় কুম্ভমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে।

গঙ্গার তীরে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম। জটাজুটধারী একজন সন্ন্যাসী কণ্টক-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তিনি বহুকাল ধরিয়া এ-স্থানে কঠোর-তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত।

অদূরে মহাত্মা আকবরের নির্ম্মিত সুদৃঢ় এলাহাবাদ-দুর্গ। স্নানান্তে দুর্গাভ্যন্তরস্থ অক্ষয়বট দেখিতে গিয়াছিলাম। দুর্গদ্বারের অনতিদূরবর্ত্তিনী সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া একটী অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। পুনঃ পুনঃ দীপ-শলাকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। গন্তব্য-পথের উভয় পার্শ্বে অগণিত প্রস্তরময় দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। বহুনিম্নে অক্ষয়বট। গহ্বরাভ্যন্তরে কদাপি সৌরকর বা বায়ু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই অক্ষয়বট দর্শনের জন্য বহুদূর হইতে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী দুর্গদ্বারে সমবেত হইতেছে! কিংবদন্তী আছে, এই অক্ষয়বট-প্রদক্ষিণান্তে তন্নিকটবর্ত্তী কাম্যকূপে যে যে-কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, পরজন্মে তাহার সেই কাম্যবস্তু লাভ হইবে। বনগমন-সময়ে সীতাদেবী এই অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্ঞী কৌশল্যার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন। কাম্যকূপের কোনও-রূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। অক্ষয়বট জীর্ণ শীর্ণ বহুপ্রাচীন শাখা-সমন্বিত বটবৃক্ষ নহে। ইহা নাতিদীর্ঘ নাতিবৃহৎ দুইটী কাণ্ডমাত্র; কাণ্ডের শাখা নাই, উপশাখা নাই, পল্লব নাই। কাণ্ড-দুইটী সম্পূর্ণ সজীব ও তাহাদের গাত্রের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ। পাণ্ডাগণ স্বার্থ লাভের আশায় কাণ্ডগাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখে। গহ্বরাভ্যন্তরে সর্ব্বদা অন্ধকার; দেখিবার সুবিধার জন্য কোনও প্রকার আলোকের বন্দোবস্ত নাই। কাণ্ড-দ্বয়ের অগ্রভাগ যেন কর্ত্তিত। প্রত্যেক কাণ্ডের পরিধি অনুমান তিন ফিটের অধিক হইবে না; এবং উচ্চতা আট ফিটের অধিক হইবে না। এ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। জানি না,

এই সার্থকনামা পবিত্র বৃক্ষ কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে অতীতের পুণ্যস্মৃতি বহন করিয়া যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া এতাদৃশ অভিনব মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে বিরাজ করিতে.ছন।

গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অদূরেই সুরক্ষিত অশোকস্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। অত্যুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে অদ্যাপি পালি-ভাষায় লিখিত অনুশাসনপত্র সুস্পষ্ট রহিয়াছে। মসৃণ স্তম্ভটী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল; যেন বহুমূল্য-মণিমুক্তা-খচিত একটী আধুনিক মন্দির। মগধরাজ অশোক দুই-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাহার পর কালচক্রে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু এই সুদৃঢ় স্তম্ভ অক্ষুন্নভাবে স্থাপয়িতার কীর্ত্তি গরিমা গাহিয়া আসিতেছে! ইহা প্রাচীন-ভারতের স্থপতি-বিদ্যার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিস্তীর্ণ স্থানটী বহির্জগতের সঙ্গে সমুদয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিতান্ত সংযতভাবে আত্ম-গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। মহাত্মা জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে অনুপম সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, বহু অর্থ ব্যয়ে স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে শ্রম ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন রাখিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত!—সমাধি-মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য্য-মহিমা বিস্ময়কর। খসরুর সমাধির অদূরেই তাঁহার মাতৃদেবীর সমাধিস্থান। স্নেহময়ী জননী অপত্য-স্নেহ বিস্মৃত হইতে অক্ষম হইয়াই, বুঝি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া চির-নিদ্রায় অভিভূতা! কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এ নিদ্রার আর অবসান নাই! স্থানটীর গাম্ভীর্য্য এবং মন্দির-দ্বয়ের বিশাল অবয়ব পরোক্ষে মহাত্মা সেলিমের হৃদয়ের গভীরতার

খসরু বাগ্।

রেলষ্টেশনের সমীপে সহরের প্রান্তভাগে খসরুবাগ্। দুর্ভেদ্য-প্রস্তরপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত

পরিচয় দিতেছিল। বিস্তীর্ণ বাগের মধ্যে মধ্যে তাৎকালীন স্থবির জীর্ণ-শীর্ণ বিটপি-

শ্রেণী দর্শকের মনে অতীতের পুণ্যস্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে! আর স্থানে স্থানে আধুনিক-রুচিসম্পৃক্ত সযত্ন-পোষিত অর্কেড, ক্রোটন প্রভৃতি তরুরাজি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অলঙ্ঘ্য সীমান্ত-রেখা স্পষ্টতর করিয়া দিতেছে! অতীত ম্লান হইয়া চলিয়া পড়িতেছে, আর বর্ত্তমান খুব সুস্পষ্ট কিন্তু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। বহুদিন হয়, মোগল-গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালের অবিশ্রান্ত গতিতে কীর্ত্তি-কাহিনী সব লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, মহাত্মা জাহাঙ্গীর পত্নীপ্রেম ও অপত্য-স্নেহের জ্বলন্ত আদর্শকে অতিসযতনে দুর্ভেদ্য প্রস্তরপ্রাচীরে বেষ্টন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের মাহাত্ম্যে ইহাঁদের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী।

এলাহাবাদে যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলাম তাহা বড়ই সুখের প্রবাস। নিত্য নূতন ভোজনের আড়ম্বর; ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত; গল্প তামাসায় সঙ্গীর অভাব নাই; সবই যেন আপন! হঠাৎ মনে হইল, এত আরামে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কঠোরতার মধ্য দিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই স্থায়ী। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উপাসনা।

নিশান্তে দিনান্তে শুধু নহে ভগবান্!
আমি চাহি প্রতিক্ষণে মোর সারা প্রাণ
তোমার চরণপ্রান্তে একান্তে বসিয়া
পীযুষ-সাগর মাঝে রহুক্ ডুবিয়া,
নিরখি তোমার ওই করুণা-কোমল
প্রশান্ত আনন পানে! হৃদি-শতদল
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মধু-গন্ধ-রূপে
তোমারি মাধুরী শুধু প্রীতি-মর্ম্মকূপে
অতর্কিতে লভি নাথ, তোমারি ধরায়
আনন্দে গৌরবে কিবা অর্চ্চিতে তোমায়
উঠিবে গো বিকশিয়া! প্রতিক্ষণ মম
এমনি করিয়া নিত্য সত্য প্রিয়তম!
পূর্ণ হবে ধন্য হবে তোমারি সত্তায়
জন্ম-জন্মান্তের লাগি ভুলি আপনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭)

নমিতা দ্রুতপদে সকলের আগে চলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় উৎকণ্ঠায় তাহার সমস্ত মুখখানা ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তার উপর অত্যন্ত বেগে চলার জন্য চর্ম্মবিদ্ধ কুশটা নাড়াচাড়া পাইয়া ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণু নমিতার ধৈর্য্যের মাত্রাটা চিরদিনই সাধারণ সীমার উর্দ্ধে।—সুদৃঢ়-কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের কঠিন ও বক্র রেখায় নীরব আত্মদমন-চেষ্টার

উৎকট আবেগ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু তাহার আচরণে এতটুকুও ক্লান্তি বা কাতরতার চিহ্ন ছিল না। সে যেন নিতান্তই অবহেলার সহিত আপনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল ! রাস্তার লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার হাতের দিকে ও মুখের পানে চাহিতেছিল, কিন্তু নমিতার কোন দিকেই দৃক্‌পাত ছিল না।

নমিতার চরণগতি অত্যন্তই প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া সুরসুন্দর নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আস্তে ম্যাডাম্, আস্তে ;—অত তাড়াতাড়ি চল্‌বেন না ; বেশী রক্ত পড়্‌বে, আপ্‌নার আরো কষ্ট হবে !—"

"কষ্ট !—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ নমিতা ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাস্তবিকই বড় কষ্ট হচ্ছে ! এক ত নিজের সময় নষ্ট হোল, তার উপর আপ্‌নাকে শুদ্ধ নিতান্ত অন্যায় ভাবে জব্দ কর্‌ছি।...শুনুন্ ; কিছু মনে কর্‌বেন না ; আমার অনুরোধটি রাখুন ; আপনি হাঁসপাতাল যান। সবাই মিলে কামাই কর্‌লে সেখানেও যে কাজের গোলযোগ হবে।... .. না না, আপনি যান।"

সুরসুন্দর হাসিল। সুপ্তোত্থিত মানুষ যেমন করিয়া ঘুম চোখ্ রগ্‌ড়াইয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করে, সুরসুন্দরও তেমনি ভাবে চোখ্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে শান্ত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "নিতান্ত ছেলেমানুষের কথা : লোকের অভাবে সেখানকার কাজ অচল হবে না, তবে কিছু অসুবিধে......। তা আর কি করা যাবে ? ওরা যা হোক্ করে চালিয়ে নেবে। কম্পাউণ্ডাররা তেমন লোক নয়। বিশেষ আমার জন্যে......।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "কিন্তু উপর-ওয়ালারা ?—না না, কেন আর আমার জন্যে অনর্থক মিছে অপমানিত হবেন ? আপ্‌নি জান্‌ছেন না, সে আমার বড় মনস্তাপ হবে ! —আপনাকে অনুনয় করি—।"

ধীর গম্ভীর ভাবে সুরসুন্দর বলিল, "আপনাকে স্মিথের কুঠিতে না পৌঁছে দিয়ে আমি কোথাও যেতে পার্‌বো না। ক্ষমা কর্‌বেন্।"

সে স্বর তর্কের নয়, প্রতিবাদের নয়, শুধু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার ! নমিতা ফাঁফরে পড়িল ! অন্য দিন হইলে, সে এইখানেই থামিয়া যাইত, কিন্তু আজ তাহার সেই স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যটুকু আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। উৎক্ষিপ্ত মনের তিক্তবিস্বাদ জ্বালা সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সহসা অস্বাভাবিক ঝাঁঝের সহিত সে কলহের সুরে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নার সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে সাহায্য গ্রহণের অধিকার আমার আছে কি না...।" কথাটা নমিতা শেষ করিতে পারিল না ; নিজের কণ্ঠের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত বিকট উগ্র ঠেকিল ; থতমত খাইয়া হঠাৎ থামিয়া মূঢ়ের মত নিরর্থক দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল, এবং তারপর নম্রভাবে বলিল, "সাহায্যের যা দরকার ছিল, তা পেয়েছি ; আর কেন কষ্ট কর্‌বেন ?"

সুরসুন্দর কিছু বলিল না ; নিঃশব্দে আহত করুণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে ক্ষুব্ধ মনস্তাপব্যঞ্জক ক্ষীণ

হাসি' হাসিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপ্‌নিও তাই মনে করেন?—শুধু ছিব্‌লেমী করে বাহাদুরী দেখাতেই আমি সুযোগ খুঁজে বেড়াই? ভাল, আমি অকাতরে সব সয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, আপনারা যে যা পারেন, মনে করুন্। এখন, কেন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছেন? চলুন্ স্মিথের কুঠিতে—।"

নমিতার মতামত জানিবার জন্য এতটুকুও অপেক্ষা না করিয়া সুরসুন্দর এবার নিজেই অগ্রসর হইল। হতবুদ্ধি নমিতা তীব্রলজ্জার সহিত একটা নিষ্ঠুর বেদনা অনুভব করিল; নিজের উপর রাগের চেয়ে ঘৃণাটাই বেশী জাগিয়া উঠিল। ছিঃ! যেখানে আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সসম্মানে মাথা নোয়াইয়া চলা উচিত, সেখানে সে কি না নির্দ্দয় ঔদ্ধত্যে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছে? কি বুদ্ধির ভুল!..

অনুতপ্তা নমিতা অস্ফুট স্বরে হেঁট-মুখে বলিল, "দেখুন্, আমি বড় অন্যায় করেছি; কিছু মনে কর্‌বেন না। সংসারে নানা-রকম লোকের নানা অসদ্ব্যবহারে অনেক সময় শান্তসহিষ্ণু মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তির গোলমাল বেধে যায়। আমারও তাই সেই দুরবস্থা হয়েছে......। আপ্‌নার কাছে ক্ষমা চাইছি; কি বল্‌তে কি বলেছি!"

সুরসুন্দর চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; বিস্মিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কই? আপনি ত এমন কিছু বলেন নি। না না, ওতে মনে কর্‌বার কিছু নাই। তবে আমার একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল্। বোধ হোল, আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন। তাই জন্যে?...না, ম্যাডাম না, সে আমারই বোঝ্‌বার ভুল। আপ্‌নি কিছু মনে কর্‌বেন না—দেখুন—।"

দৃঢ়স্বরে পুনরায় সুরসুন্দর বলিল," দেখুন আপ্‌নাকে আর কেউ চিনুক আর না চিনুক্, আমি চিনেছি। আপনার সম্বন্ধে কোন দ্বিধা আমি মনে স্থান দিতে পারব না, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন।" এই বলিয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল।

একমুহূর্ত্তে নমিতার মনের সমস্ত জটিলতা পরিষ্কার হইয়া গেল। পিছন পানে চাহিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "ওরে সুশীল, পাশে আয়।"

সুশীল তখন বিস্ময়ে উৎসুক দৃষ্টিতে বাঁ-দিকের গলির দিকে চাহিতে চাহিতে অত্যন্ত মন্থর গমনে আসিতেছিল। নমিতার আহ্বান শুনিয়া সে ভীতভাবে গলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল, "ঐ যে উনি ওখানে—।"

চকিত নয়নে গলির দিকে চাহিয়া বিস্ময়-মিশ্রিত বিরক্তি-ঘৃণার সহিত নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্র?"

সুরসুন্দর কথা কহিতে কহিতে সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে গলির সীমা এড়াইয়া গিয়াছিল; এইবার নমিতার কথায় চমকিয়া পিছু হটিয়া ঝুঁকিয়া গলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, একটা বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঁচু চৌকাঠের উপর পা তুলিয়া, জানুর উপর হাতের ভর রাখিয়া, সামনে ঝুঁকিয়া ডাক্তার মিত্র গভীর মনোযোগের সহিত 'নোট বুকে'র পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে আড়্‌চোখে

তাঁহাদের দিকে চাহিতেছেন। গলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী কেহ নাই।

তিনি কি উদ্দেশ্যে এমন সময় ওখানে ওরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া 'নোটবুক' লইয়া খেলা করিতে করিতে কোন্ বস্তুর উপর যে গুপ্ত লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবেগে নমিতা ও সুরসুন্দরের মনের উপর ঝলসিয়া গেল। সুরসুন্দর সরিয়া দাঁড়াইল; অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সযত্নে একটা উচ্ছ্বসিত বেদনা-ভরা নিঃশ্বাস চাপিয়া লইয়া, শুষ্ক ম্লান মুখে বলিল, "আসুন! আর কেন?—"

নমিতা কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু স্বর বাহির হইল না। কে যেন সুদৃঢ় নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছিল। আরক্ত মুখে আত্মদমন করিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া সে অগ্রসর হইল। খানিক পরে তীব্র আক্ষেপ-সূচক কণ্ঠে সে বলিল, "মানুষের মাথার গড়ন যতই প্রশস্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক, সুশ্রী ও সুন্দর হোক্, কিন্তু তার হৃদয়ের গঠন যদি সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার পরিচায়ক কুৎসিত হয়, তবে সে হাত-পায়ের খাটুনীর জোরে যত বড়ই 'বীর' হোক্, আসলে কিন্তু মনুষ্য-নামের যোগ্য কখনই নয়;—তা হ'তেই পারে না!"

দুঃশীল পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত পিতার ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে যেরূপ বিষণ্ণ করুণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে, সুরসুন্দরের নয়নেও ঠিক সেই ভাব ফুটিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "একটা পাগলের পাগ্‌লামীর দিকে হর্‌দম চোখ রেখে বসে থাক্‌লে, অতি-বড় সুস্থ মানুষেরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেন ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারে চোখ্ দিয়ে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি কর্‌ছেন?......যার যা খুসী বলুন বা করুন্; আমি আমার লক্ষ্য ভুল্‌ব না; এইটেই মানুষের উচিত দৃঢ়তা, এইটের উপর নির্ভর রেখে আমরা নীরব সংযমে কর্ত্তব্য পালন করে যাব। ফলাফলের মালিক তিনি! হোঁচোট ধাক্কা সে চলবার পথে অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলে ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদ্ হতে পারি নে, কিংবা স্পর্শ-ভীরু 'কেন্নো'র মত আপনাকে গুঠিয়ে, আড়ষ্ট নির্জ্জীবভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে একপাশে শুয়ে থাক্‌তে পারি নে!—আমরা মানুষ, আমাদের সংসারে ঢের কাজ আছে; আপদ্-বিপদের সঙ্গে আক্‌সার যুঝে চলা'র নামই আমাদের জীবন-গতি। এর মধ্যে আলস্যের স্থান নেই, অবসন্নতার স্থান নেই। তা হ'লেই দুনিয়ার মধ্যে টেকে থাকা দায়।......চলুন।" সুরসুন্দর পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে নমিতাকে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিল।

সঙ্কেত-চালিত কলের পুতুলের মত নমিতা নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। সুশীল তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। সমস্ত পথ কেহ কোনও কথা কহিল না। সুশীল ব্যাপার কিছু ভাল না বুঝিতে পারিলেও, কোন একটা অপ্রীতিকর-রহস্য-সংসৃষ্ট গূঢ় অপমানের আঘাত স্পষ্টই বুঝিল; ভ্যাবাচাকা খাইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দিদিকে সহজে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং, আজিকার এই উত্তেজনাটা তাহার কাছে অত্যন্তই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শীঘ্রই তাহারা স্মিথের কুঠিতে আসিয়া পৌছিল। স্মিথ্ সেইমাত্র একটা 'কল' হইতে আসিয়া বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহাদের সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া তিনি তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নমিতার হাতের অবস্থা দেখিয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ক্রুশ-বিভ্রাটের সব বিবরণ জানিয়া লইয়া, অসাবধানতার জন্য একটু স্নেহ-কোমল ভৎর্সনা করিয়া, তখনই মিসেস্ স্মিথ্ বেহারাকে ডাকিয়া, তাহাকে গরম জল আনিতে বলিলেন। তিনি সুরসুন্দরকে বলিলেন, "তেওয়ারী, ভাগ্যিশ, রাস্তায় তোমায় পাওয়া গিয়েছিল! বুদ্ধি করে এখান পর্য্যন্ত এসে তুমি ভালই করেছ; বুঝ্‌তেই পারছ, একটু সাহায্যের দরকার হবে। তোমরা বস, আমি 'পকেট কেস'টা নিয়ে আসি।......হাঁ, ছোট মিত্রও এসে পড়েছ, বটে! এস এস, আমার কুকুরছানাগুলোর খবরটা একবার জেনে আস্‌বে চল।"

সুশীল দুশ্চিন্তা-গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আগে দিদির হাতটা—!"

স্মিথ্ নমিতার মুখপানে অর্থসূচক কটাক্ষ-পাত করিয়া হাসিলেন। নমিতা বুঝিল, তাহার 'হাতটার' জন্যই স্নেহময়ী স্মিথ্ বালক সুশীলকে এখান হইতে সরাইতে ইচ্ছুক। তৎক্ষণাৎ নমিতা আদর করিয়া সুশীলের পিঠে হাত দিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "যা না, ভাই! কুকুরগুলো দেখে আয়। উনি বল্‌ছেন......।"

স্মিথ্ ব্যগ্রতার সহিত সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং খুব আগ্রহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সুশীলের হাতে কয়দিন বিস্কুট খাইতে না পাইয়া, তাঁহার কুকুরগুলা অত্যন্ত মনমরা হইয়া রহিয়াছে। সকলের চেয়ে ছোট বাচ্ছাটি প্রতিদিন বৈকালে সুশীলের জন্য কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিয়া হাট বসায়। অন্যান্য সকলেও তাহার বিরহে অত্যন্ত কাতর।......সুতরাং, আজ সুশীলকে দেখিতে পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি-প্রফুল্ল হইবে। ইত্যাদি।

ছেলে ভুলাইবার জন্য ছেলেমানুষের মত স্মিথ্-মহোদয়াকে এমন সরস-বাক্য-বিন্যাস-কৌশল প্রায়ই ব্যবহার করিতে হয়। এত দুঃখেও নমিতার বেশ একটু স্নিগ্ধ কৌতুক বোধ হইল। সে মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরসুন্দর চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে, গরম জল লইয়া বেহারার সহিত স্মিথ্ ঘরে ঢুকিলেন। এবার তাহার মুখভাব অত্যন্ত বিরক্তি-গম্ভীর। নমিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইল; কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ছুরির ফলা খুলিয়া আলোর কাছে পরীক্ষা করিতে করিতে স্মিথ্ যেন জোর করিয়া মুখে একটু প্রসন্ন হাসি ফুটাইয়া পরিহাস-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আঃ, আমার এই স্নেহাস্পদ চঞ্চল শিশুগুলির হাত-পা কি দুরন্ত দেখ ত! সুন্দর, আমার মাথা খুঁড়্‌তে ইচ্ছা হয়! সে-দিন সমুদ্র প্রসাদ কম্পাউণ্ডার হাঁস্‌পাতালে কোনও সহযোগীর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে একটা বার আউন্স শিশি ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কাঁচ হাতের তালুতে বিঁধে এসে হাজির! রক্তারক্তি

কাণ্ড! আবার আজ এঁর দেখ! সূঁচালো লোহার ক্রুশটার ওপর এমন উৎকট মমতা যে, ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে সেটাকে হাতের মধ্যে ফুঁড়ে, তবে নিশ্চিন্দি। ......নমি, মনটা একটু শক্ত কর। সুন্দর, হাতটা চেপে ধর, যেন নড়ে না, দেখো—।"

স্মিথ্ ছুরি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। নমিতা ডান কাঁধের উপর মুখ ফিরাইয়া চক্ষু বুজিল। সুরসুন্দর পাশে দাঁড়াইয়া স্মিথের নির্দ্দেশ অনুসারে হাতটা শক্ত করিয়া জোরে চাপিয়া ধরিল। স্মিথ কর্ কর্-শব্দে কাঁচা মাংস কাটিয়া ক্রুশটা তুলিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্র ও লঘু হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। নমিতার সর্ব্বাঙ্গে যেন কালঘাম ছুটিতেছিল। যন্ত্রণায় আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; অতিকষ্টে সে সংযত হইয়া রহিল।

স্মিথ্ ক্রুশটা পরিষ্কার করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার অসাবধানতার দণ্ডস্বরূপ এই ক্রুশটি তোমার হাত থেকে চিরদিনের জন্য কেড়ে নেওয়া আমার উচিত। কি বল নমি?"

নমিতা একটু হাসিল সুরসুন্দর হাত ধুইয়া আসিয়া স্মিথ্‌কে বলিল, "আমি তা হ'লে এবার যেতে পারি? হাসপাতালে অনেক কাজ রয়েছে।"

নমিতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকেও যেতে হবে—।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি—? তুমি যাবে কি? তোমার হাতে ক্ষত।"

নমিতা সবিনয়ে বলিল, "আমার ডিউটীর ভার—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "সে অপরে বুঝ্‌বে; আমি বুঝ্‌বো!—তুমি স্মরণ রেখো, তুমি এখন আমার চিকিৎসাধীন রোগী! আমার অনুমতি অনুসারে তোমায় চল্‌তে হবে। তোমার হাতের এমন ক্ষত নিয়ে, আমি এখন সাত দিন তোমায় রোগিনিবাসের কাজে যেতে দিতে পার্ব্বো না!—"

নমিতা বিপন্নভাবে বলিল, "তবু একবার নিজে গিয়ে জানিয়ে আসা উচিত নয় কি?"

স্মিথ্ বলিলেন, "তুমি এই সোফায় চুপ করে শুয়ে থাক। আমি হাঁসপাতাল যাচ্ছি; সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে আস্‌বো। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বল্‌ছ? আমি আছি, সুন্দর কম্পাউণ্ডার আছে;.........আর তা ছাড়া ডাক্তার মিত্রও ত রাস্তা থেকে বিশেষ রকমে দেখে গেছেন; সেটুকু ত অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না!"

নমিতা চমকিয়া উঠিল; বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে একবার সুরসুন্দরের পানে ও একবার স্মিথের পানে তাকাইল। ইহার মধ্যে স্মিথের নিকট এ সংবাদটি যে কে পৌছাইয়া দিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে নমিতার বড় গোলমাল ঠেকিল! সুরসুন্দর ত আসিয়া অবধি চুপ্-চাপ্ কাজ করিতেছে! সে ত বলিবার সময় পায় নাই। তবে? তবে বুঝি বাঁদর সুশীলই চক্ষুর অন্তরালে গিয়া এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে? নিশ্চয়ই তাই!......কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে নমিতা বলিল, "আপনাকে সুশীল বল্‌লে, বুঝি?"

চক্ষু হইতে চশ্‌মা খুলিয়া কাঁচ পরিষ্কার করিতে করিতে স্মিথ্ বলিলেন, "হাঁ, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক কথা এড়িয়ে যেতে চাও, নমি, কিন্তু আমি প্রায়ই সব খবর

পাই। সুশীল ছেলেমানুষ, অত শত বোঝে না; দুঃখের উচ্ছ্বাসে এমনই সকরুণভাবে কথাগুলি আমায় বল্লে, যে বাস্তবিকই আমার মনে বড় আঘাত লাগ্‌ল! ছিঃ, রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষ হয়ে, মানুষের উপর কি এমনই নির্দ্দয় আচরণ করতে হয়? ....আজ এই স্থলে এমন জঘন্য বিদ্বেষপরায়ণ যারা, তারা লোকালয়ে বাস করবার উপযুক্ত নয়! হিংস্র বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডায় বন-জঙ্গলে বিচরণ করাই তাঁদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা!"

স্মিথের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের শ্লেষতীব্র ভৎসনা কক্ষ-গাত্রে সজোরে আহত হইয়া দৃপ্ত-প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। নমিতা নির্ব্বাক্! সুরসুন্দর অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া মৌন ম্লান মুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও নমিতার ভয় হইল! এই তুচ্ছ ঘটনার সহিত তাহার সংস্রবটা কিরূপ অশোভন ভাবে জড়াইয়া, একটা লজ্জাদায়ক ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা মনে করিতেও নমিতার আক্ষেপ বোধ হইল! কুক্ষণে সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার মুহূর্ত্তে সুরসুন্দর আসিয়াই তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই অপরাধে ডাক্তার মিত্রের নিকট হইতে অবশ্যপ্রাপ্য সাহায্য-লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ত হইলই; তাহা উপর, তাহার সেই ভদ্রজনবিগর্হিত অশিষ্ট ব্যবহার, সেই গুপ্ত বিদ্রূপপূর্ণ ক্রূর কটাক্ষ, সেই ছলনাময় অপমান, তাহাও নমিতাকে অকারণে সহিতে হইল! আর নিজের দিক্ হইতে ছাড়িয়া দিয়া, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও, ইহা সে অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, ভদ্রসন্তানের ঐ অভদ্রতাটুকু—ভদ্রপদবাচ্য প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটই মর্ম্মদাহী ও অপমানজনক। অন্ততঃ যাঁহাদের হৃদয়-মনে এতটুকুও চেতনার সাড়া আছে, তাঁহারা নিশ্চিতই ইহা মানিতে বাধ্য!

স্মিথ্ চোখে চশ্‌মা পরিয়া নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিলেন। দুইহাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া গম্ভীরভাবে ক্ষণেক কি ভাবিলেন; তারপর উত্তেজিতভাবে মুখ তুলিয়া সুরসুন্দরের পানে চাহিয়া দৃপ্ততেজস্বীস্বরে বলিলেন, "দ্যাখো সুন্দর, তোমায় একটি কথা বলে রাখ্‌ছি বাবা! জীবনে আর যাই হও, তাই হও,—মনুষ্যত্বটুকু হারিও না! সংসারে ধনবান্ সবাই হয় না, বিদ্বান্ সবাই হয় না, বুদ্ধিও সকলের সমান প্রখর হয় না,—কিন্তু প্রাণ যার আছে, সে যেন প্রাণবত্তা না ভুলে যায়, এইটুকু আমার অনুরোধ! এখানে যার যেমন খুসী, সে সেই রাস্তায় মনোবৃত্তি চালিয়ে নিজের ইচ্ছায় বাঁদর সাজুক্, কুকুর সাজুক, উল্লুক সাজুক, ভাল্লুক সাজুক, কিন্তু তোমরা—অন্ততঃ তুমি একজনও, বাইরে যে অবস্থায়ই থাক, এ পশু-রাজত্বের মধ্যে নিজের অন্তরে সিংহ হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু হারিও না!"

এইবার স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দুই চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল! সে কোনও কথা কহিতে পারিল না; হেঁট হইয়া স্মিথের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। স্মিথ্ হাঁটুর উপর হইতে তাঁহার দুই হস্ত তুলিয়া সুন্দরের মস্তকের উপর রাখিলেন। সুরসুন্দর উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাসে সবেগে উদ্গত অশ্রুস্রোত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টায় দুই হাতে সজোরে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই সুমহান্ আশীর্ব্বাদ আজ জীবনে প্রথম আপ্‌নার কাছে পেলুম্; এর আগে আর কখনো একথা কারো মুখে শুনি নি!"

স্মিথ্ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন; অশ্রুসিক্ত নয়নে মুগ্ধ অভিভূত ভাবে কয় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ নিস্পন্দ থাকিয়া, তারপর ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইলেন। গভীর স্নেহের সহিত সুরসুন্দরের চিবুক স্পর্শ করিয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলে চুমা খাইলেন; কোনও কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরসুন্দর মাথা তুলিল; তাহার চোখে তখনও অশ্রু টল্‌টল্ করিতেছিল। সে আর দাঁড়াইল না; শ্রদ্ধানম্র নমস্কারের সহিত নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্মিথ্ রুমালের খুঁটে, চক্ষুর কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে সস্মিতবদনে স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "সংসারে শোক আর দুঃখ, এই দু'টো জিনিষ মানুষের প্রাণকে যত বড় তেজঃপূর্ণ সত্য শিক্ষা দিতে পারে, এমন আর কেউ দিতে পারে না; ধৈর্য্য ধরে খুঁজে দেখ, প্রত্যেক অমঙ্গলে, প্রত্যেক অন্যায়ে, প্রত্যেক অত্যাচারে তোমার জন্যে কিছু না কিছু শিক্ষা আছেই আছে! তবে যেখানেই ধাক্কা খেয়ে অধীর অভিভূত হয়ে পড়্‌বে, সেইখানেই তোমার সব মাটি।......হাঁ, এখন তবে আমি উঠি, একবার হাঁস্‌পাতাল থেকে ঘুরে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো। তুমি ততক্ষণ এইখানে একটু বিশ্রাম করে নাও, বই টই আছে; খুসী হয়, পড়ে দেখ্‌তে পার। আর হাঁ,—ফের যেন বল্‌তে না হয়; মনে রেখো সাতদিনের মধ্যে যদি হাঁস্‌পাতাল-গ্রাউণ্ডের মধ্যে তোমায় দেখি,—(হাসিমুখে বামহস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া সস্নেহে ও রহস্য-স্নিগ্ধকণ্ঠে) তা হ'লে আমার কাছে 'ঠ্যাঙানি' খাবে!"

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না। চারিদিক্ হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাশি যেন পার্ব্বত্য জল-প্রপাতের মত হুড়াহুড়ি করিয়া একযোগে তাহার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কোন বিষয় সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছিল না। তবুও স্মিথের শেষ কথায় হাঁস্‌পাতালের সীমায় একেবারে প্রবেশ-নিষেধের কড়া আদেশে তাহাকে বিচলিত হইতে হইল। ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাবে সে বলিল, "কিন্তু কিন্তু ম্যাডাম্, কাল সকালেই হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে একবার না গেলেই নয় যে!"

চিন্তিতভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "তাই ত! আবার হাতটা ড্রেস্ করাবার জন্যে তোমায় ওখানে যেতে হবে? আচ্ছা, থাক্, তেওয়ারীকে পাঠিয়ে দেব; তোমার বাড়ীতে গিয়ে সে ড্রেস্ করে দিয়ে আস্‌বে।"

আবার তেওয়ারী! নমিতার কপালে ঘাম ছুটিল! বিব্রতভাবে সে বলিল, "না না, তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না; তাঁর ঢের কাজ—!"

স্মিথ্ ক্ষণেক নীরবে ভাবিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, যদি ওর সুবিধে না হয়, আমি নিজেই সকালে হাঁসপাতালের কাজ সেরে গিয়ে ড্রেস করে দিয়ে আস্‌বো।"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু স্মিথ তাহাকে সে

সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "সুশীলকে বেহারার সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি; তার জন্যে ভেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরোও, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরবো।"

স্মিথ্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রার্থনা।

আমার সকল গর্ব্ব দূর করি দিয়া
　　তোমার গর্ব্ব মুখেতে ল'ব,
আমার সকল বিভব ছাড়িয়া, আমি
　　তোমার চরণ-তলেতে র'ব।
　ঐ চরণ-যুগল পাব বলে তাই
　সকল আশারে ত্যজিবারে চাই;
　যেন কামনা বাসনা ঘুচাইয়ে দিয়ে
　　তোমারে স্মরিতে পাই।
তোমারই নামে আসিয়াছি হেথা,
　　সাথে সেই সুখ-দুখ-তরী।
তোমারই নাম গাহিয়া গাহিয়া
　　পরলোকে যাব ইহরে ছাড়ি!
　জানি আমি ওগো করুণাসিন্ধু,
　পাইব তোমার করুণাবিন্দু;
　জানি তুমি মোরে ভুলিবে না কভু:
　　জীবনে না হয় মরণে,
কোন একদিন তুমি হে আমারে
　　স্থান দিবে তব চরণে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

তোমারি মন্ত্রে উঠিছে হৃদয়ে নব নব
　　ভাবে নূতন সুর।
আশিস্ তোমারি বরষিছে শিরে,
　　হৃদি-দাবানল করিতে দূর।
মনোমলিনতা ঘুচাতে আমার
সুধা-ধারা হৃদে ঢাল অনিবার;
তোমার মহিমা বুঝে সাধ্য কা'র!
　ওগো প্রভু তুমি ত্রিজগত-শূর!
কি-ভাবে হৃদয়ে রাখিব তোমায়,
কানে কানে যেন বলিছ আমায়!
ডাকিতে জানি না, তবু প্রেমরায়!
　　কাছে এসে হাস সুমধুর!
রাজে সদা হৃদে অমিয় মূরতি
সুখময় শান্ত সুশীতল অতি;
তবুও তৃষিত এ হিয়া সম্প্রতি
　　ভেঙ্গে-চুরে যেন হয় চুর!
কেন যেন তা' কিছু জানি না দয়াল,
কর্ম্মফল কিংবা মম মন্দ ভাল!
আসিবে কি সেই শুভ সুক্ষ্ম কাল
　　হেরিব নিকটে, রবে না দূর!
　(নাচিয়া উঠিবে হৃদয়-পুর॥)

শ্রীবিমলাবালা বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়।—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পারাবত—ইহাদিগকে পালন করিতে কোনরূপ কষ্ট নাই। এক এক জোড়া হইতে ৩ বা ৪ জোড়া শাবক প্রতিবৎসর পাওয়া যাইতে পারে। পারাবত রাখিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। যদি পোকার আধিক্য হয় তবে টোংএ ছাই ছড়াইয়া দেওয়াই বিধি। ডিম্ব প্রসব করার আঠার দিন পরে শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। শাবক যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে পুং-পারাবতের সন্তানস্নেহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পারাবতের মধ্যে গোলা ও সিরাজি রাখিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহাদিগের শাবক যেমন অধিক হয়, তেমনই ইহারা সন্তান পালনে সুনিপুণ। ইহারা অতিশীঘ্র পুষ্টও হয়।

আহারের মধ্যে গম যত অল্প দেওয়া যায়, ততই ভাল। অন্যান্য শস্য ইচ্ছানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। পারাবতেরা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত জীব এবং তাহারা অত্যন্ত স্নানপ্রিয়। সুতরাং ইহাদিগের জন্য অগভীর পাত্রে জল রাখিয়া দিবে। কখনও কখনও চূণের জলও ব্যবহার করা উচিত। পারাবতেরা যদি সেই জল পানও করে তবে কোনও ক্ষতি নাই। চূণের জলের দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গের পোকা মরিয়া যায়।

পারাবত একবার পীড়িত হইলে তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এরূপ স্থলে তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই উচিত।

পারাবতের টোংএ ইন্দুরের বড়ই দৌরাত্ম্য হয়; সুতরাং, ইন্দুর-কল পাতিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা অথবা বিষ-প্রয়োগে নষ্ট করা উচিত। বিষ-প্রয়োগ করিতে হইলে অতিসাবধানে তাহা করা উচিত; যেন অন্য কোন প্রাণী তাহা না ভক্ষণ করে। শেঁকো বিষ খাদ্যের সহিত অথবা চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিলে ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীব-হিংসা মহাপাপ।

হংসী—ইহাদিগের জন্য জলাশয়ের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জল ইহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। একটী হংস ছয়টী হংসীর জন্য যথেষ্ট। পুরাতন হংসী শাবকের জন্য রাখিতে পারা যায়; কিন্তু হংস দুই বা তিন বৎসরের অধিক রাখা উচিত নহে। হংসীগণ প্রাতঃকালে ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং বেলা ৮টা বা ৯টা না হইলে তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবে না। উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাদিগের ডিম্ব প্রসব করা শেষ হয়। যদি হংস-শিশু চাহ, তবে ডিম্বের উপর মুর্গীকে তা দিবার জন্য বসাইতে হইবে। চার সপ্তাহে ডিম্ব ফুটিয়া যায়। হংস-শাবক অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। যখন তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে শুষ্ক ও উষ্ণ রাখিতে হইবে। তাহারা দুই মাসের না হইলে তাহাদিগকে জলে চরিতে দেওয়া উচিত

নহে; কারণ, তাহাতে তাহারা পীড়িত হইবে। জল-পান করিতে দিলে পাত্রে আন্দাজ করিয়া এতটা জল দিবে, যেন তাহাদিগের চঞ্চুমাত্র নিমজ্জিত হইতে পারে। হংস-শাবকের পক্ষে আর্দ্রতা বা শৈত্য প্রাণনাশক জানিবে। ডিম্ব হইতে নিঃসৃত হইয়া ২৪ ঘণ্টা অতীত হইলে হংস-শিশুকে দিনে চারিবার খাইতে দিবে। এই সময়ে ডাল রন্ধন করিয়া শাবকদিগকে খাওয়ানই বিধি; কিন্তু প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ উষ্ণ হওয়া উচিত। চোকরের (ভূষি) সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে হংস-শাবকেরা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। ডিম্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিন সপ্তাহ অতীত হইলে হংস-শিশুকে তিন বার এবং ছয় সপ্তাহ গত হইলে, দুইবার খাইতে দিবে। কাঁচা শস্য, ঘাস এবং শাক ইহাদিগের উত্তম খাদ্য। কেবল মাত্র শস্য খাইতে দিলে তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়াই উচিত। জলের পরিমাণ এক ইঞ্চ হওয়া চাই। হংস-শাবকেরা সময়ে সময়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়। এরূপ সময়ে তাহাদিগের ল্যাজ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিলে তাহারা আশু রোগমুক্ত হয়। বড় বড় হংসীদিগেরও উক্ত রোগ হইয়া থাকে। শাকাদি খাইতে না দিয়া অধিক শস্য খাওয়াইলে এইরূপ দশা সংঘটিত হয়। সুতরাং, আহারের জন্য শস্যের সঙ্গে শাকাদি দেওয়াই প্রশস্ত।

রাজহংসী—ইহাদিগের রোগ কম হয় বটে; কিন্তু জলাশয় না থাকিলে ইহাদিগের প্রতিপালনে কোনও লাভ নাই। ইহারা উদ্যানের অত্যন্ত ক্ষতিকারক। চারিটা রাজ-হংসীর জন্য একটা রাজহংস যথেষ্ট। রাজ-হংসীরা কেবলমাত্র একবার ডিম্ব প্রসব করে। ত্রিশ দিনে অণ্ড ফুটিয়া যায়। মুরগী-দ্বারা ডিম্ব ফুটানই প্রশস্ত। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ-মাস পর্যান্ত ডিম্ব ফুটানর সময়। শাবকগুলিকে প্রথম দুই সপ্তাহ জলে যাইতে দিবে না এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথায় হংস-শাবকের ন্যায় খাওয়াইবে। অতঃপর তাহাদিগকে রাজ-হংসীর নিকট দিবে। তখন তাহারা স্বয়ং আগাছা, ঘাস প্রভৃতি খাইয়া জীবন-ধারণ করিবে।

শালগম টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কর্ত্তন করিয়া জলে ভিজাইয়া খাইতে দিলে, রাজ-হংসগণ অত্যন্ত পুষ্ট হয়।

বটের পক্ষী—মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বটের পক্ষীদিগকে থাকিতে দিবে। কিন্তু সাবধান; যেন বর্ষাকালে তাহাদিগের গর্ত্তে জল প্রবেশ না করে। শৈত্যই ইহাদিগের প্রাণহা জানিবে; কিন্তু জমিতে সামান্য জলের ছিটা দিলে কোনও দোষ নাই। বাজরা-নামক শস্যই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য; কিন্তু তাহার সহিত আটাও (যেমন মোটা ময়দা) মিলাইয়া দেওয়া চলে। ইহারা ক্রেস অতি-আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। ইহাদিগের পান করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া চাই। বটের পক্ষী ধৃত হওয়ার পর অনেকই গর্ত্তে মরিয়া যায়। তাহাদিগকে অধীনতায় আনিতে হইলে ক্রমে ক্রমে আনিতে হয়। ইহারা বৈশাখ এবং আশ্বিন মাসে ডিম্ব প্রসব করে।

ঔষধি।

পোকা—পক্ষীদিগের গাত্রে পোকা হইলে

দুই তিন দিন কেরোসিন তৈল তাহাদের গাত্রে মালিস করিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়।

অজীর্ণ—অজীর্ণ হইলে মটর-ভর কর্পূর দিনে তিনবার সেবন করাইতে হইবে। আহার, কাঁচা শস্য দেওয়াই বিধি।

কাশী—কাশী হইলে কর্পূর খাওয়ানই উচিত।

জ্বর—জ্বরে অর্দ্ধগ্রেণ কুইনাইন এবং তিন গ্রেণ কর্পূরই ব্যবস্থা।

ডিম্ব রক্ষা।

ডিম্ব রক্ষা করিতে হইলে, পাত্‌লা গঁদে ডিম্বগুলি নিমজ্জিত করিয়া প্যাক (pack) করিয়া রাখা উচিত। ডিম্বের ক্ষুদ্র দিক্‌টা নিম্ন দিকে কয়লার গুঁড়ায় থাকিবে। খুব তাজা ডিম্বই রক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তিনিই তোমার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।

২। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee :

৩। Examine all things, and hold fast to that which is good.

সকল জিনিষই পরীক্ষা কর এবং যাহা ভাল তাহাকে ধরিয়া থাক।

৪। মুক্তি যদি চাও ভক্তি-ভরে গাও,
নামে প্রাণ মাতাও দিবা-বিভাবরী।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে,
কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষিকেশে।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
আনন্দ-বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধ মনে সদা শ্রীহরি-প্রসঙ্গে,
কর আলাপন সাধুজন সঙ্গে।
এ জীবন-তরী ভাসাও তরঙ্গে,
ভাসাও দেখি মন ধর্ম্মহাল ধরি॥

৫। যে গ্রন্থ মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম ও নিয়তি শিক্ষা দেয় না, তাহা তৃণবৎ ত্যজ্য।

৬। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায় জীবন-গঠনের একমাত্র সম্বল।

৭। মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী॥

যাহার মন অবলম্বন ব্যতিরেকে স্থির থাকে, যাহার বায়ু নিরোধ ব্যতিরেকে স্থির আছে এবং যাহার দৃষ্টি অবলোকন ব্যতীত স্থির, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধ।

৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে।

৯। যাত্রার জন্য চারিটী বাহন রাখিয়াছি। যখন সম্পদ্ আসে তখন কৃতজ্ঞতার বাহনে আরোহণ করি, পূজার্চ্চনা-কালে প্রেমের বাহনে আরোহণ করি, বিপদ্ উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করি, আর পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করি। (তাপস এব্রাহিম)।

১০। নির্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া দূর করিয়া দাও।

১১। কর্ত্তব্য-সম্পাদনই ভগবানের আরাধনা, কর্ত্তব্য-সাধনই মুক্তির উপায় এবং ইহাই পরলোকের একমাত্র বিশ্রামস্থল।

১২। ইস্ দুনিয়ামে আইক্যেয়, ছোরি দেও তোম আয়েট্। লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি যাতু হায় পায়েট্।

এই দুনিয়াতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছ, অহঙ্কার করিও না। যাহা লইবার আছে এই বেলা লইয়া লও ; কারণ, তোমার জীবনায়ু ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে।

১৩। কুরু বন্দে তু বন্দেগি, যো পাওয়ে পাক দিদার। আওসব মাঁনুখ জন্মকা, হোয় না বারম্বার।

কবির বলিতেছেন, যদি তুমি ভগবান্‌কে পাইয়া থাক, তাহা হইলে বন্দনা করিয়া লও ; কারণ, এরূপ মনুষ্য-জন্ম, বারংবার হইবে না।

১৪। যোহি মারগ্ সাঁই মিলে তাঁহি চলো করি হোস্। ফেরি পাছে পছতাওগে।

যে রাস্তায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তাহাতে খুব সাবধান হইয়া চলিবে ; কারণ, তাহা না হইলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হইবে।

রেবা।

(গল্প)

১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অশনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া কাশীধামে মাতৃ-দর্শনে আসিল।

অশনিকান্ত ঘোষালের আদিবাস হালি-সহরে; কলিকাতায় জ্যেঠা-মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া সে রিপণ কলেজে পড়িত। তাহার পিতা জগদীশচন্দ্র ঘোষাল বহুকাল কাশী-রাজার 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র কাজ করিয়া তিন বৎসর হইল কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদীশবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা ভার্য্যা তাঁহারই অনুসৃত পন্থার আকাঙ্ক্ষায় কাশীতেই রহিয়া গেলেন। ছুটির পর অশনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়, কখনও মা তাহার সঙ্গে যান, দুই-একমাস ভাসুরের বাড়ীতে থাকিয়া পুনরায় কাশীতে চলিয়া আসেন। অশনি ছুটির সময় কাশী আসে এবং ছুটীর শেষ দিনটি পর্য্যন্ত পরম নিরুদ্বেগে কাটাইয়া, পুনরায় কলিকাতায় ফেরে।

কাশীতে শুধু যে অশনির মা-ই ছিলেন এমন নয় ;—আরও একটি প্রবল আকর্ষণ অশনিকে তীর্থবাসী করিয়া তুলিয়াছিল। সে আকর্ষণটী 'রেভারেণ্ড' বঙ্কুবিহারী গুহের কন্যা রেবা।

রেবা মাতাপিতৃহীনা। অভিভাবিকা এক খুড়ীর তত্ত্বাবধানে সে বাস করিত এবং 'শিগ্‌রা মিশন স্কুলে' বিদ্যা-শিক্ষা করিত। রেবাদের বাড়ী অশনিদের বাড়ীর কাছেই। সর্ব্বদা দেখা-শোনা এবং যাতায়াতে বন্ধুত্ব ক্রমে আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল। মাতৃহীনা রেবা অশনির মাকে মাতৃ-সম্বোধনে তাঁহার মনের মধ্যেও অনেকখানি স্থান করিয়া

লইয়াছিল। অশনি তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, শিক্ষক, খেলার সাথি। বয়সের সহিত শৈশবের অনাবিল স্নেহ যে ভিন্নভাব ধারণ করিতেছিল, তাহা সমবয়সী এই দুই বিভিন্ন-শ্রেণীর নরনারীর নিজেদের মনের গোচর না হইলেও বাহিরের লোকে কাণাঘুসা করিতেছিল। অশনির মা-ও ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন।

অশনি আশৈশব রেবার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া আসিলেও নিষ্ঠাচারপরায়ণ মাতা-পিতার শিক্ষা, সাহচর্য্য ও দৃষ্টান্তে মনের মধ্যে যথেষ্ট জাত্যাভিমান পোষণ করিত। কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার ভাব-ভঙ্গী চাল-চলনে অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছিল। সে এখন জোর করিয়া রেবার স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি-মোহনভোগে উদর তৃপ্ত করে, রেবার জলের কুঁজা হইতে জল লইয়া খায়, এবং আরো ছোট-বড় অনেকগুলি আপত্তিজনক কার্য্যে মাতার মনে যথেষ্ট বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া থাকে।

এবার বাড়ী আসিয়াই অশনি শুনিল তাহার বিবাহ। বৈশাখের প্রথমেই যে-দিনটা শুভলগ্ন লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিনেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা হইবে। ইহা শুনিয়া অশনি প্রথমে রাগ করিয়া মুখভার করিল, ভাল করিয়া খাইল না; মাতার সহিত কথা কহিল না। কিন্তু যখন এ মুষ্টিযোগে মায়ের উৎসাহের হ্রাস হইতে দেখা গেল না, তখন সে মায়ের কাছে গিয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল, "এ-সব কি শুন্‌চি?—এ রকম ত কোন কথা ছিল না।"

মা তখন স্নানের পর উঠানে রোদে বসিয়া পিঠের উপর ভিজা চুলগুলি মেলিয়া দিয়া, চটের উপর ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কলাইয়ের দালের বড়ি দিতেছিলেন। ছেলের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া তিনি কহিলেন, "কি রকম কথা ছিল তবে, শুনি?"

অশনি মুখ ভার করিয়া কহিল, "আমি ত তোমায় বরাবর বলে আস্‌চি, পড়া শেষ না হলে, বিয়ে টিয়ে কোর্ব্বো না।"

পুঁটির মা এতক্ষণ কাঁশী-ভরা পিষ্ট দালে সঘন কর-তাড়নায় রীতিমত ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিতে করিতে দাদাবাবুর বিবাহে সোনার তাগা ও তসরের সাটী ফরমাইস দিয়া হস্ত-বেদনার উপশম করিতেছিল। দাদাবাবুর গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বরে তাহার আশার প্রদীপ অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। ছেলের কথায় মা ততোধিক গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কিন্তু আমি ত তোমায় বরাবরই বলে আস্‌চি যে, ও-সব বিদকুটে আব্‌দার চল্‌বে না। বি-এ-পরীক্ষা দিয়েই তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।"

অশনি শ্লেষের স্বরে কহিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল না, অতীন্দ্র চৌধুরীর ট্যাকশালকে ঘরে আন্‌বে; বৌ আন্‌বে না!"

মা হাতের কাজ বন্ধ না করিয়া, মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "সে তোর যা খুসী মনে করিস্। বিয়ে কর্‌তেই হবে। সে কি কথা? ভদ্রলোককে কথা দিয়েচি! আর মেয়ে, খাসা মেয়ে! ইচ্ছে হয়, নিজের চোখে দেখে আসিস্। তোর যাতে মন্দ হবে, তেমন কাজ আমি কোর্‌বো না, এ বিশ্বাস তুই আমার ও পরে রাখ্‌তে পারিস্।"

এ কথার পর আর তর্ক করা চলে না। অশনিও তাহা করিল না। সে চলিয়া

যাইবার সময় কেবল নিজের অসম্মতিসূচক অস্ফুট-বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে গেল। মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, এ ঝড় যে উঠ্‌বে তা আমি আগে থেকেই জানি। ভালয় ভালয় এখন দু'হাত এক কর্ত্তে পাল্যে, বাবা শিবনাথ, তোমায় সোনার বেলপাতা দিয়ে ষোড়শোপচারে পূজো দেব, ছেলের আমার সুবুদ্ধি দাও।"

তাহার পর অশনি বাহিরে বৈঠকখানা-ঘরে জাজিম-মোড়া তক্তাপোষের উপর পড়িয়া, খানিক গড়াইয়া, খানিক খবরের কাগজের অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে চোখ্ বুলাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মনে হইল রেবা, হয়ত, এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। চিঠিতে সে রেবাকে আশা দিয়া রাখিয়াছে, এবার তাহার কবিতার খাতা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে সে-গুলি দুই জনে মিলিয়া বাছাই করিয়া লইবে। উৎসর্গ করিবে কাহাকে তাহাও স্থির হইয়া আছে। কেবল বইখানির নাম লইয়াই মতদ্বৈধ চলিতেছিল।

এবার কাশী আসিয়া অশনি রেবার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে যায় নাই, সেই আসিয়াছিল। অশনির মনে হইল, এই কয় মাসের অদর্শনে রেবা যেন অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সে অকারণ হাসি-আব্দার নাই! তাহার চালচলন এত গম্ভীর যে, অশনির মনে হইতেছিল, সে যেন হাত বাড়াইয়া আর তাহার নাগাল পাইতেছে না। হয়ত, মায়ের এই সব পাগ্‌লামীর খেয়ালও সে শুনিয়াছে,—এই কথাটা মনে হইতেই অশনি মনে মনে লজ্জানুভব করিল।

২

রেবা তাহার পড়িবার ছোট ঘরখানিতে একখানা ইংরাজী নভেল হাতে লইয়া পড়িবার ভানে বসিয়াছিল। পাঠের ইচ্ছা তাহার এতটুকুও ছিল না। সে বসিয়াছিল ভাবিবার জন্য। কিছুদিন হইতেই সে অশনির বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিতেছে; উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, তাহাও দেখিতেছে। যতক্ষণ সেখানে থাকে সেও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু এখন বাড়ী আসিয়া তাহার আর এতটুকুও আনন্দোৎসাহ অবশিষ্ট ছিল না। সে কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল! দেশালাইয়ের কাঠিটা যেমন প্রথম-ঘর্ষণেই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃশেষে ভস্ম হইয়া যায়, রেবার সচেষ্টিত আনন্দের আলোটুকুও তেমনি জ্বলিয়া একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, অশনির এইবার বিবাহ হইবে। একটি নোলক্-পরা কিশোরী বধূ তাহার বিচিত্র ছাঁচের কবরী ঢাকিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া, আল্‌তা-পরা দু-খানি কোমল চরণে জলতরঙ্গ মলের রুণুঝুণু বাজাইয়া অশনির অন্তরেও তাহার অনুরণন তুলিবে। সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিশোরী মেয়েটির ঝাপ্‌টা-কাটা মুখের পানে চাহিয়া অশনির কবিতার উৎস এইবার ভিন্ন-পথাশ্রয়ে বহিবে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য সেইখানেই সে দেখিতে পাইবে;—ক্ষুদ্র বাল্য বন্ধুত্বের কথা তাহার আর মনেও পড়িবে না। রেবা কল্পনা-নেত্রে দেখিল, অশনির মুখে আনন্দের দীপ্তি! পত্নী-প্রেমে সে পরিতৃপ্ত!

একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাংশু

আকাশে রেবা তাহার উদাস-নেত্র ফিরাইল। জ্বালাময় তেজ ম্লান করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্য ঢুলিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তেজ কমিলেও ধরণীর তপ্তবক্ষের সমস্ত সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাসগুলা এইবার ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হইয়া বাতাসটাকে অসহনীয়রূপে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

পিছন হইতে মৃদুহাসির শব্দ শুনা গেল। রেবা চমকিয়া মুখ ফিরাইল; সঙ্গে সঙ্গে মধুর হাসিতে তাহারও মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কখন এলে, অশনি?"

অশনি কহিল, "অনেকক্ষণ,—যতক্ষণ থেকে তুমি খুব মন দিয়ে পড়া কচ্ছিলে। এবার পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফাষ্ট হবে।"

রেবা সলজ্জ হাস্যে কহিল, "ঠাট্টা হচ্চে! কেন? কি অমনোযোগটা দেখ্‌লে শুনি?"

অশনি রেবার হাতের পাতা-খোলা বই-খানা কাড়িয়া প্রসারিত ভাবে ধরিল; হাসিয়া কহিল, "কিছু না। কেবল বইখানা কি রকম করে ধল্লে পড়া এগোয়, তাই শিখে নিচ্ছিলুম্।"

রেবা চাহিয়া দেখিল, সে পুস্তকখানা সম্পূর্ণ উল্টাভাবে ধরিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! এমন আত্মবিস্মৃত সে! হারিয়া হার স্বীকার করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নয়। রেবাও তাহার জাতীয় ধর্ম্ম বিস্মৃত হইল না। অকারণ কোলাহলে এক রকম করিয়া প্রতি-পক্ষকে স্বীকার করাইয়া লইল যে, পাঠে তাহার মনোযোগের অন্ত নাই এবং বই-খানা উল্টাভাবে ধরিলেও পাঠকের পাঠে ব্যাঘাত হয় না।

অশনি আসন গ্রহণ করিলে রেবা কহিল, "তারপর মহাশয়ের দেশে গমন হচ্চে কবে?"

অশনির মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল; কহিল, "মার ইচ্ছে এবার শীঘ্রই দেশে যাওয়া হয়—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "আপ্‌নার তাতে অনিচ্ছে না কি?"

অ। আমার তুমি ত জান, রেবা, ছুটির একটা দিনও আমি বাইরে নষ্ট করি কি না? কেন তাও জানো। আর এবারকার এই লম্বা ছুটিটা—।

"তোমার অনেক দয়া অশনি, কিন্তু সংসারে ঢুকে হয়ত এ গরীব বন্ধুটির কথা আর মনেও থাক্‌বে না।" রেবা এই কথাটা হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও হাসি দিয়া শেষ করিতে পারিল না। অকারণে চোখে জল আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কম্পিত করিতে-ছিল। অশনি বিস্মিত চোখে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া লইল। তারপর সরহস্যে কহিল, "বাঃ! বিনয়-প্রকাশও যে ঢের শেখা হয়ে গেছে! মহাশয়া, বুঝি, সম্প্রতি সংসারে ঢোক্‌বার মৎলবে আছেন; তাই ভূমিকায় জানান্ দেওয়া হচ্ছে?"

রেবা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর লুকো-চুরীতে কাজ কি? আমি ত কিছু জানি না?"

অশনি মনোযোগীর ভাবে কহিল, "কি জান শুনি?"

রে। যা জান্‌বার। আগামী ১৭ই বৈশাখ অতীন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী কনকলতার সহিত শ্রীযুক্ত অশনিকান্ত ঘোষালের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে—"

অশনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "থামুন মহাশয়া! আর জেঠামির দরকার নেই।"

রেবা মৃদুমৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল "জেঠাম কিসের? সত্যি কথা বল্‌ব তাতে বন্ধু বেগড়ান্ বিগ্‌ড়বেন; যদিও জানি, বন্ধু ঐ সত্যি কথাটা শোন্‌বার জন্যে সহস্রকর্ণ হ'তেও প্রস্তুত; মুখে যতই তর্জ্জন করুন্!"

অশনি শান্তভাবে কহিল, "বন্ধুর আর যা অপরাধ ইচ্ছে দাও; ঐটে দিও না। বিয়ে আমি কোর্‌বো না।"

রে। কেন? মা ত বল্লেন কর্‌বে?

অ। মা জানেন না। অনর্থক ভদ্রলোককে আশা দিয়ে ভোগাবেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট কথাই বলেচি, এখানে বিয়ে আমি কোন মতেই কোর্‌বো না—।

রেবা মুখ তুলিয়া কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা কাশী আশায় কথাটা আর বলা হইল না। অসহ্য গ্রীষ্মে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এখনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। এক সময় মৌন ভঙ্গ করিয়া অশনিই প্রথমে কহিল, "জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে—কেন করব না।—শুন্‌বে কি?" অশনির কণ্ঠস্বরে ও দৃষ্টিতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হইতেছিল যাহাতে তাহার অব্যক্ত উত্তর শুনিতে রেবার সাহস হইল না। ঘরের বাতাসটাও যেন ভাবাবেগে স্পন্দিত হইতেছিল; না জানি, এখনি সে কি অপ্রকাশ্য গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে! হয়ত, চিরপ্রার্থিত চিরদুর্ল্লভ উত্তর এখনি সুলভ হইয়া প্রকাশ পাইবে। ওগো সে কথা, সে গোপনীয় কথা গোপনীয় থাক্। সে ত প্রকাশের যোগ্য নয়। তবে আর কেন? রেবা মাথা নাড়িয়া অশনির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে জানাইল, না, সে শুনিতে চাহে না।

"কেন না?" অশনি দমিল না। উৎসাহে সোজা হইয়া কহিল, "না" বোল না। তোমায় শুন্‌তেই হবে। তুমি কি আমার মনের কথা জান না? নিজেকে এত বোকা সাজিও না, রেবা! তুমি সবই বোঝ। আমার ভালবাসা আমায় ভুল বোঝায় নি। বল, আমার মনের কথা তুমি জান?"

রেবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বিপন্নভাবে কহিল, "এ সব কথা তুমি কাকে বল্‌চ? অশনি, বুঝ্‌তে পাচ্চ কি?"

"ঠিক্ পাচ্চি। যাকে ছাড়া জীবনে আর কাকেও এমন করে ভালবাস্‌তে পার্‌ব না; যে নইলে সংসার আমার শ্মশান হ'য়ে যাবে, যে আমার শৈশবের খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের প্রিয় সখী—সেই রেবাকেই আমি আমার মনের কথা খুলে বল্‌চি।"

রেবা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া আরক্তমুখে স্খলিতবাক্যে বাধা দিল, "থাম অশনি! এমন করে তুমি আমায় অপমান কোর না।—আমি জান্‌তুম্ না, তুমি নেশা কর্‌তে শিখেচ! জান্‌লে—।" জানিলে সে যে কি করিত, সে-সম্বন্ধে কোনও উপস্থিত যুক্তি খুঁজিয়া না পাওয়ায় সে চুপ করিল। অশনি কিন্তু বাধা মানিল না। সে রেবার গমন-পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কহিল, "মিছে কথা বলে আমায় হাসিও না রেবা! তুমি জান, তোমার অপমান কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। আমার কথার জবাব দাও। বল, আমার স্ত্রী হ'তে তুমি অসম্মত নও।"

রেবা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া

দাঁড়াইল; নতমুখে কহিল "ও-সব পাগ্‌লামীর কথা ছেড়ে দাও। তুমি হিন্দু, আমি খৃষ্টান। কেবল এই প্রভেদটা ভুলে যেও না।"

অশনিও এ-কথা ভুলিয়া যায় নাই। ভুলে নাই বলিয়াই এতদিন ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া চুপ করিয়াছিল। তাহা না হইলে মনের কথা প্রকাশের সুযোগ আরও অনেক আগেই সে লইত। ভাবিতে গেলে ভাবনার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রেবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইলে, তাহাকে লাঞ্ছনা এবং ততোধিক ক্ষতিও যে সহিতে হইবে, এ কথা সে ভালই জানে। বিষয়ে বঞ্চিত হইতে না হউক, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ, এমনকি জগতে একমাত্র স্নেহের স্থান মাতৃকোলের অধিকারেও সে বঞ্চিত হইবে। তা হউক্; রেবাকে ছাড়িয়া সংসারে তাহার সুখ নাই; তাহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া যাইবে। প্রেমের খাতিরে সংসারের সকল সুবিধাই সে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত। রেবাকে ত্যাগ করিলে সে বাঁচিবে না। কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে। মাতার কাছেও সে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। তাহার ফলে মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিতেছেন। বাকী ছিল রেবার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলা। এই বলার জন্য মন তাহার আকুলী বিকুলি করিতেছিল; তবু সঙ্কোচের হাত সে এড়াইতে পারিতেছিল না। ভালই হইল, রেবা নিজেই সুগম পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য যখন স্থির করাই আছে, তখন আর অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? মাতাও আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না; বাহিরেও কন্যাভারাতুর কোনও ভদ্রলোককে আশা-ন্বিতও করিতেছেন। এ খেলার উপসংহার হইয়া গেলেই যে এখন বাঁচা যায়! রেবা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী। তাহাতে কি? ভালবাসার কাছে কি তুচ্ছ, হাস্যকর সে বাধা! পর্ব্বতগৃহ-নিঃসৃতা সিন্ধু উদ্দেশ্যে গমনশীলা নদীর বেগ কি সামান্য প্রস্তরের বাধায় রুদ্ধ হইতে পারে! প্রচণ্ড ঐরাবতও যে এ স্রোতের টানে ভাসিয়া যায়। অশনি মুখ তুলিয়া দীপ্তচক্ষে চাহিল ও কহিল, "রেবা! আমাদের ভালবাসার কাছে ওর কি এত বেশী দাম! এ সব তুচ্ছ বাধায় আমাদের মিলনকে বাধা দিতে পার্‌বে না। আমি খৃষ্টধর্ম্ম নিয়ে তোমায় পেতে চাই।"

রেবার দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, "ধর্ম্মত্যাগ কোর্‌বে? বল কি অশনি!"

অশনি মৃদু হাসিয়া কহিল, "না ত্যাগ কোর্‌বো কেন? শুধু ঠাকুরের নামটা বদ্‌লে নেব। তাতে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না; কিন্তু না নিলে, আমার ক্ষতির শেষ থাক্‌বে না।"

রেবা মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু এ ধর্ম্মমত ত তুমি তাঁর জন্যে বদল কোর্‌চ না। নিজের সুবিধের জন্যে, শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব খুঁটিনাটি, দোষগুণ সহ্য কোর্‌তে পার্‌বে কি না—?" রেবা তাহার কথার শেষ করিতে পারিল না। চোখের জলে তাহারও যে দৃষ্টি ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল! হয়ত, এ দুর্ব্বলতা এখনি অশনির চোখে পড়িবে, এই ভাবিয়া সে সংযত হইল।

অশনি উঠিয়া ঘরখানা বার-দুই পরিভ্রমণ

করিয়া রেবার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এত ভেবে কাজ কর্‌বার আমার সাধ্য নেই। রেবা! আমার মনের কথা তোমায় সব জানিয়েচি। স্পষ্ট উত্তর দাও, তুমি আমার স্ত্রী হ'তে রাজী আছ কি না?"

রেবা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কি যে বল! সবাই ত আর তোমার মত পাগল নয়!"

তবুও অশনি জোর করিয়া তাহাকে ভাবিতে সময় দিল ও সেই সঙ্গে বলিয়া দিল, "এটাও ভেবো,—আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ, সব ছেড়েও আমি অনায়াসে থাক্‌তে পার্ব্বো, কিন্তু তোমায় ছাড়্‌তে হলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

রেবাকে কথা কহিবার সময় না দিয়া, এবং নিজের কথা শেষ না করিয়া, ছাতিটা পর্য্যন্ত না লইয়াই সে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। জানালা দিয়া রেবা চাহিয়া দেখিল, রাস্তাতেও সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

(৩)

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অশনি রেবার সঙ্গে দেখা করিল না। রেবা তাহার খুড়ী-মার মুখে শুনিল, ছেলের সহিত ঝগড়া করিয়া অশনির মা দেশে চলিয়া গিয়াছেন; অশনি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই। এমন ঘটনা রেবার অভিজ্ঞতায় আর কখনও ঘটে নাই। মা যখনই দেশে গিয়াছেন, অশনি তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। রেবা নিজে গিয়া তাঁহাদের ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। এবার অশনির মা দেশে গেলেন, কিন্তু রেবাকে একটা মুখের কথা বলিয়াও গেলেন না! রেবা দুই দিন তাঁর কাছে না গেলে, তিনি ডাকিতে আসিতেন, কত স্নেহের অনুযোগ করিতেন! আজ রেবা তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে যে, মুখের কথা একটা বলিয়াও গেলেন না! সে কেবলই চোখের জল মুছিয়া মুছিয়া ভাবিতেছিল, কেন এমন হইল! তবে কি অশনি সেই সব তার পাগ্‌লামির কথা তাঁহার কাছে প্রকাশিত করিয়াছে?—তাহাই সম্ভব। ছিঃ ছিঃ! তিনি কি মনে করিলেন! তিনি লজ্জাহীনা রেবার স্পর্দ্ধায় কতই না তাহাকে অভিশাপ দিয়াছেন। অশনি পাগল, তাই সে এমন ছেলেমানুষি কথা আবার লোকের কাছে প্রকাশ করে। রেবাই কি তাহাকে ভালবাসে না? বাসে বই কি! সে ছাড়া রেবার ভাল বাসিবার আর কে আছে? রেবার মনে হইল, হয় ত সে অশনিকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে না; যে ভালবাসায় জাতি-ধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় যুক্তি-তর্ক মানিয়া চলা যায় না। অশনির সেই বিশ্বগ্রাসী উদ্দাম ভালবাসার সহিত সে তাহার বিচার-বিবেচনাপূর্ণ সাধ্‌ঘাট বাঁধা ভালবাসার আবার তৌল করিতে চায় না কি? ছিঃ! সে কি তাঁহার যোগ্য! রেবা কল্পনা-নেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের একখানা রঙ্গিন চিত্র আঁকিয়া দেখিতে চাহিল।—চিত্রখানা বড় মলিন দেখাইল। অশনির মনের এ তীব্র অনুরাগ কে জানে কতদিন স্থায়ী হইবে! উদ্দীপনার অবসানে শুধু রেবার প্রেমই কি তাহার পরিত্যক্ত অতীত জীবনের সকল পূরাইতে পারিবে? যে-সমাজ রেবার সহিত তাহার আবাল্যের বন্ধুত্বেও তাহাকে আকৃষ্ট

করিতে পারে নাই, শুধু একটা বন্ধনের স্বীকার-উক্তিতেই সে কি নিজে হইতে মনে-প্রাণে তাহার আপন হইবে? তুচ্ছ রেবার জন্য এতখানি ক্ষতি সহিতে মন তাঁহার দুই দিনেই হয়ত অস্থির হইয়া উঠিবে। পুরাতনের জন্য মন যখন তাঁহার হাহাকার করিবে, রেবা তাঁহাকে তখন কোন্ সান্ত্বনা দিবে!

রেবা ভাবিয়া দেখিল, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করা ছাড়া, তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। যে ভালবাসা প্রিয়ের ক্ষতি করে, সে ভালবাসা ত ভালবাসা নয়! সে উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসা কখনও স্থায়ী হয় না; তাতে সুখ ত নাই-ই, তৃপ্তিও নাই। রেবা মনে মনে বলিল, 'তুমি আমায় হৃদয়হীনা বল্‌বে, কিন্তু আর উপায় নেই। তোমার কাছ থেকে আমি সরে যাব;—আমায় ভুলে যেতে সুযোগ দেব; তা হলেই তুমি সুখী হ'বে। চোখের নেশা ফুরিয়ে গেলে, হয়ত, তুমি আমাকে ভুলেও যাবে।' অশনি তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, মনে করিতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তেমন ভালবাসেন নি ত! যে ভালবাসায় সংসারের স্বার্থ ভুলিয়ে দেয়, এ ত সে ভালবাসা নয়! তাঁর চোখের বাইরে গেলে, হয় ত, মনের বাইরেও চলে যাবে। রেবা ভাবিল, এই না সে বলিতেছিল প্রাণ ঢালিয়া সে অশনির মত ভালবাসিতে পারে নাই! এ দুর্ব্বোধ্য মন লইয়া সে এখন কি করিবে? সে তাঁহাকে বন্ধনে ফেলিয়া দুঃখে ডুবাইবে না। মায়ের কোল, সমাজের বক্ষ হইতে সে তাহাকে ছিড়িয়া আনিবে না। সে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে দৃঢ়সংকল্প। তবু অশনি যে তাহাকে ভুলিয়া যাইবে এ চিন্তাও তাহার অসহ্য মনে হইতেছিল।

রেবার জীবনের সমস্ত সাধ, সব কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে-ছিল, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনও তাহার সেই সঙ্গে ফুরাইয়াছে। অশনির প্রশ্নের সে উত্তর দিয়াছে। চিঠিতে লিখিয়া নয়; নিজের মুখেই সে জবাব দিয়াছে। সেই সঙ্গে অশনির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে। চিরজীবনের পাথেয়রূপে সে যখন অশনির বন্ধুত্ব চাহিয়াছিল, অশনি রাগ করিয়া বলিয়া-ছিল, 'মাপ কোরো। যদি নিতান্তই তোমায় ভুল্‌তে না পারি, শত্রু বলেই মনে কোর্ব্বো;—বন্ধু নয়।' উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসগুলা রুদ্ধ বক্ষের বাহিরে আসিবার জন্য যখন বিদ্রোহে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া শ্বাসরোধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, তখনও সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত হাসি-মুখেই সে বলিয়াছে, "সেই ভাল; তোমার বন্ধুতার চেয়ে শত্রুতাও আমার কাম্য। তুমি এমন হতে পার, তা আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি, অশনি!" একথার পরেও অশনি যখন একান্ত ব্যাকুলতার সহিত সকাতরে কহিয়াছিল, "বল, কখনও কোন দিন—যত দীর্ঘ দিন পরেই তা আসুক্, কোন আশা আমি রাখ্‌ব কি না?" তখনও অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে রেবা বলিয়াছিল, "কালের জরিমানায় ধর্ম্ম কখনও ছোট হয় না; তোমায় আমি শ্রদ্ধা কর্ত্তুম, অশনি! সেটুকু আমার থাকতে দাও। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হয় না। ও-সব পাগ্‌লামী বুদ্ধি ছেড়ে

দাও। জান ত তোমাদের শাস্ত্রই বলেচেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" এ কথার পর "বেশ তাই হবে" বলিয়া সেই যে অশনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে, তারপর আর সে রেবার কোন সংবাদ লয় নাই।

রেবার ইচ্ছা করিতেছিল সে অশনির কাছে মাপ চাহিয়া বলে, সে মিথ্যাবাদিনী, তাই অবলীলায় অতবড় মিথ্যা বলিতে পারিয়াছে। সে তাঁহাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালবাসে; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে। কিন্তু সে কথা সে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই অশনির মন দেখিতে পায়। একবার এতটুকু দুর্ব্বলতা জানাইলে অশনি কি আর তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহিবে! যত কঠিনই হউক, অশনির মঙ্গলের জন্য অশনিকে ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে যাওয়া ছাড়া রেবার আর গতি নাই। সে তাই যাইবে। খুড়ীমাকে সে বুঝাইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া কোথাও কোন কাজ সে খুঁজিয়া লইবে; নচেৎ বসিয়া খাইলে কয়দিন চলিবে? কুবেরের ভাণ্ডার ত তাহার নাই।

খুড়ীমা চোখে কানে কম দেখেন ও শোনেন্। তবু যতটুকু বুঝিলেন, তাহাতে মনে করিলেন, বিদেশে কোথাও সরিয়া যাওয়াই ভাল। মেয়ের যেন দশ দিনে দশ বছর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার সে সদানন্দময় বালিকা-ভাব আর নাই। চিন্তা-শীলা যুবতী রাতারাতির মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে উপনীতা হইয়াছে। কেন যে এমন হইল তাহার খবরও তিনি জানিতেন। সস্নেহে তিনি রেবাকে বুঝাইলেন, "কেন নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছিস্ মা! অশনিকে তুই কোন্ অপরাধে বিয়ে কর্ত্তে চাইচিস্ নে?"

রেবা আজ তাহার একমাত্র আত্মীয়ার কাছে চোখের জল লুকাইতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "ও কথা বোল না খুড়ী-মা! আমার জন্যে তিনি এত ছোট হয়ে যাবেন, —এ আমি সইতে পার্‌বো না!"

খুড়ীমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তবে কল্‌কাতাতেই চল। এখানে আর টেক্‌বে কেমন করে! আহা, বাছা অশনির মনেও এত ছিল!"

(৪)

রেবার উপর রাগ করিয়া অশনি কিছুদিন শূন্য বাড়ীখানাই আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল; রেবার আর সংবাদ লইল না। রাগটা কমিয়া আসিলে সে মনে করিল, রেবা, বোধ হয়, এইবার নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিবে; পারিয়া ক্ষমা চাহিয়া পাঠাইবে। সে ত রেবাকে বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। অবহেলা সহিয়া সে আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে? এমন রাগারাগি তাহাদের কতবার হইয়াছে, কিন্তু রেবাই আগে সাধিয়া ভাব করিয়াছে। কোন দিনই অশনিকে সাধিতে হয় নাই। রেবাই সাধিয়াছে। অসহ্য উৎকণ্ঠা বহন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল। রেবার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা বহন করিয়া কোনও মূকবার্ত্তাবহই আসিল না।

একদিন সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া সকাল বেলা বিছানা হইতে উঠিয়াই অশনির মনে হইল, তাই ত এবারকার কলহের বিষয়টা ত ঠিক্ অন্যবারের মত নয়। যতই হোক্ বিবা-

হের বিষয় লইয়া যখন গোল, তখন সে স্ত্রীলোক আগে ক্ষমা চাহিতে পারে না। নিজেকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া অশনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই রেবার উদ্দেশ্যে যাইতে প্রস্তুত হইল। বাড়ীর বাহির না হইতেই দরোয়ান একখানা পত্র অশনির হাতে দিল। হাতের লেখা দেখিয়াই অশনি বুঝিল, চিঠি রেবার। মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের ক্ষুব্ধ অভিমান ঝড়ের মুখে তৃণগাছির মত কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার অনুমান তবে ভ্রান্ত নয়। রেবা চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আগেই চিঠি লিখিয়াছে। নির্ব্বোধ কেন সে মিথ্যা ঝোঁকে নিজেও কষ্ট পাইতেছে, অশনিকেও পীড়িত করিতেছে? ভগবানের ইচ্ছাই যদি ইহাতে না থাকিবে, তবে কেন সে এমন করিয়া তাহার সমাজ-সংসারের বাহিরে একমাত্র অশনিকেই অবলম্বন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছিল? ভগবানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহার তলে আছে বই কি!

অশনি ঘরে ফিরিয়া প্রথমে খামে মোড়া চিঠিখানা মুঠি. করিয়া করতলে ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একেবারে খামখানা খুলিয়া ভিতরের অপূর্ব্ব রহস্যটুকুকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলিতে তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিল, ভাল খবর নিশ্চয়ই আছে—তবু—!

কাঁচি দিয়া খামের একাংশ সন্তর্পণে কাটিয়া ভিতরের ভাঁজ করা কাগজখানি বাহির করিয়া অশনি টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল। কিন্তু একি—! লেখা অল্পই; পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগিল না। চিঠিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া অশনি বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা—

"অশনি! বিশেষ প্রয়োজনে আমার আজন্মের শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিমণ্ডিত প্রিয়তম কাশী ছাড়িয়া আজ দূরান্তরে চলিলাম। জানি না, ভাগ্য আর কখনও দিন আমায় আমার জন্মভূমির কোলে ফিরাইয়া আনিবে কি না! ভাবিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; উচিতও ছিল তাই, কিন্তু সুবিধা হইল না। খুড়ীমা ভাইয়ের কাছে লাহোরে থাকিবেন, অগত্যা আমারও তাই গতি। জীবনে অনেক অপরাধ তোমার কাছে করিয়া গেলাম। পার ত মাপ করিও। মনে করিও রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ ছিল না। বিদায়—

রেবা।"

রেবা চলিয়া গেল? যাইবার সময় একটা মুখের কথা বলিয়াও গেল না! হৃদয়হীনা নারী! যাহার অশনির সহিত কথা কহিয়া কথা ফুরাইত না, চিঠি লিখিয়া কাগজে কুলাইত না, সেই রেবা এত শীঘ্র এমন পর হইয়া গেল! কি অপরাধ অশনি করিয়াছিল? রেবাকে ভালবাসিয়া সংসারের সকল ক্ষতি অম্লান মুখে সহিতে চাহিয়াছিল, এই না তাহার অপরাধ? কিন্তু এ পলায়নের ত কোন প্রয়োজনই ছিল না! তাহার আদেশই যে অশনির নিকট যথেষ্ট। এতটুকু বিশ্বাসও সে আর রাখিতে পারিল না। অশনির দুই হাতের বদ্ধাঙ্গুলি, মুখের কঠোর ভাব, ললাটের কুঞ্চন-রেখা, তাহার অন্তর-যুদ্ধের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছিল। সে মনে মনে বলিল,

এ ঠিক্ হয়েচে! সে পাষাণে প্রাণ সঁপিতে চাহিয়াছিল, এ তাহার যোগ্য প্রতিফল। রেবা তাহার কেহ নয়। রেবা বলিয়া এ সংসারে কেহ তাহার ছিলও না। তবু যুক্তির দুর্ব্বল বাধা ঠেলিয়া অন্তরের দীন ক্রন্দন কেবলি কাঁদিয়া বলিতে থাকে, সেই যে তাহার সব। তাহার জন্য সে যে সকলি ছাড়িতে চাহিয়াছিল! চিরপ্রার্থিত মাতৃক্রোড় হইতে চ্যুত হইতেও সে যে ভয় করে নাই! তবে কেমন করিয়া সে মনে করিবে, সে তাহার কেহ নয়, কেহ ছিলও না? সে তাহার বন্ধু নয়, প্রিয় নয়, সর্ব্বস্ব নয়? অশনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন অশনি তাহার জ্যেঠা-মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে দেশে যাইতেছে। আনন্দবাবুর কন্যা কনকলতাকে বিবাহ করিতে তাহার আপত্তি নাই।

(৫)

সুদীর্ঘ দশটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশনিকান্ত ঘোষাল এখন আর কলেজের ছাত্র নয়। সে এখন একটা মহকুমার ছোট খাটো হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে ডেপুটি হইয়া দুই তিনটা মহকুমার জলবায়ু-পরীক্ষান্তে সম্প্রতি বদলী হইয়া আরামবাগে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা। অশনি স্ত্রী-পুত্রদের একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; তাই জাহাজের বোটের মত তাহারা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া থাকে। অশনির স্ত্রী কনকলতা রূপসী না হইলেও প্রকারান্তরে নামের সার্থকতা দেখাইয়াছিল। ধনি-কন্যা স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিত হওয়ায় নিজেকে সংসারের কোন উপকারে লাগিবার উপযোগী করিয়া গড়িতে ত পারেই নাই; বরং সে-ই সম্পূর্ণরূপে সংসারের কাছে উপকার লইতেই শিখিয়াছিল। তাহার উপর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে তাহার স্বাস্থ্যও ক্রমে খারাপ হইতেছিল। সম্প্রতি সে সন্তান-সম্ভাবিতা। অশনি স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে বলকারক পথ্য এবং বিজ্ঞাপন দেখিয়া "প্রসূতি-রক্ষক" নানাবিধ 'টনিক' 'পিল' গিলাইয়াও তাহার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ দুর্ব্বল দেহে বল-সঞ্চার করিতে পারিল না। কাশীতে মাতা এবং কলিকাতায় শ্বশুর কনককে লইয়া যাইতে চাহিলে, কেন যে তাহাকে পাঠায় নাই, তাহা ভাবিয়া অশনি এখন মনে মনে নিজের বিবেচনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতেছিল। এখন আর সময়ও নাই।

ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থলেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। দুইদিন প্রসব-বেদনা-ভোগে কনকলতার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছিল। এখানকার একমাত্র শিক্ষিতা ধাত্রীটিও এই সময় পীড়িতা। ডাক্তার কহিলেন, "আর এক উপায় আছে। মিস্ গুহার ধাত্রী বিদ্যা চমৎকার। তিনি ব্যবসাদার ধাত্রী ন'ন বটে, কিন্তু ভারী হাত-যশ। একবার যদি তাঁকে আন্‌তে পারা যেত! তাঁরও শরীর ভাল নয়; কিন্তু দরকারের সময় নিজের অসুখ বিসুখ কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তবে ঐ ভারী দোষ!—বা'র করে আনাই কঠিন।"

বিপদের সময় মানাপমান দেখিতে গেলে চলে না। অশনি চটি জুতায় পা গলাইয়া সার্টের বোতাম না আঁটিয়াই ধাত্রীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিল। সে গিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া

যেমন করিয়াই হউক্ তাঁহাকে লইয়া আসিবে। নহিলে কনককে বাঁচান যাইবে না।

মাননীয় অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় অগত্যাই মিস্ গুহকে বাহিরে আসিতে হইল। দশ-বৎসরের পর দেখা। কালের হস্তক্ষেপে আকৃতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তবু পরস্পরকে চিনিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এ অতর্কিত সাক্ষাতের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না; তাই কিছুক্ষণ দুইজনকেই চুপ করিয়া মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অশনির প্রয়োজন অধিক; শীঘ্রই সে আত্মস্থ হইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইল,—"সদাশয়া মিস্ গুহের অনু-গ্রহের উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। তাহার স্ত্রীর জীবন-রক্ষা না করিলে, শুধু দুইটা নয়, তিনটা প্রাণীরই মৃত্যুর সম্ভাবনা। রেবার মনে পড়িল, আর একদিন অশনি তাহার কাছে এমনি করিয়াই কাতর প্রার্থনায় জীবন-ভিক্ষা চাহিয়াছিল;— বলিয়াছিল, "তুমি ত্যাগ কর্‌লে আমি বাঁচ্‌ব না।" সে অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনার সুরে কহিল, "ঈশ্বরকে জানান্;—আমার দ্বারা চেষ্টার কোনও ত্রুটী হ'বে না।—চলুন্।"

(৬)

সারা রাত্রি অত্যন্ত গোলমালের পর সকালের দিকে বাড়ীখানা ঘুমন্ত পুরীর মত একেবারেই নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রসূতির খবর পাইয়া অশনির মা এবং কনকলতার বাপ্ আগের রাত্রেই আসিয়া পৌছাইয়াছেন। ছেলেমেয়েগুলির ঝঞ্ঝাট পোহানয় মুক্তি পাইয়া অশনি হাঁপ্ ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

দারুণ কষ্ট ভোগের পর মৃত পুত্র প্রসব করিয়া রক্তহীন কনকের জীবনী-শক্তি আরো ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, "কৃত্রিম উপায়ে অন্যের দেহ হইতে রোগীর দেহে রক্ত-প্রদান ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই।" শাশুড়ী, স্বামী এবং বুড়া বাপ্ প্রমাদ গণিলেন। যথেষ্ট পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াও অশনি রক্ত দিবার লোক সংগ্রহ করিতে পারিল না। বাপ্‌রে! পয়সার জন্যে গায়ের রক্ত দেওয়া যায়! অশনি যুবপুরুষ দেহও সুস্থ, কিন্তু কাটা-ফোঁড়ায় তাহার বড় ভয়। ডাক্তারকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন উপায় নাই?" ডাক্তার কহিলেন, "না।" সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া রেবা কহিল, "ডাক্তারবাবু, আপ্‌নি প্রস্তুত হোন্। আর দেরী হলে ওঁকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। রক্ত আমি দেব।"

অশনি ক্ষোদিত-মূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, "মিস্ গুহ, আমায় মাপ্ কর। তোমায় আমি নিজের মেয়ের মত মনে করি। তোমার প্রাণ যে কত দরকারী তা আমি জানি। তোমার যা শরীর, তাতে যে পরিশ্রম তুমি পরের জন্যে কর, তাই ঢের—।"

রেবা বাধা দিয়া কহিল, "ওঁকে বাঁচাতেই হ'বে, আমি কথা দিয়েচি। ডাক্তারবাবু, আপ্‌নার পায়ে পড়ি—আমার চেষ্টার ত্রুটিতে যেন দুর্ঘটনা না হয়। আমার সত্য রক্ষা কর্‌তে দিন।"

অনেক বাত-বিতণ্ডার পর রেবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অগত্যাই ডাক্তারকে সম্মত হইতে হইল। সহিষ্ণুশীলা রেবা শান্তভাবে

ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে আত্মসমর্পণ করিলে, অশনি কক্ষ হইতে পলাইয়া গেল। মা বাহিরে "হরির তলায়" মাথা কুটিয়া সেই অনাচারদুষ্টা অসমসাহসীক-নারীর সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট জরিমানা "মানস" করিয়া দেবতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের অনুমান ভুল হয় নাই। নূতন শোণিত-সংগ্রহে কনকের জীবনের আশা ফিরিয়া আসিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারের আদেশে রেবা এখনও বিছানা ছাড়িয়া উঠা-বসা করিতে পায় না। ডান হাতের যে শিরা ছেদন করিয়া রক্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ক্ষত পূরিয়া আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা এখনও সারে নাই। মা ছেলেপুলে, রোগী এবং সংসারের ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া অবসর পাইলেই রেবার কাছে আসিয়া বসেন। কখনও তাহার গায়ে মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দিয়া বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্, আর কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ করবি না। বাবা! ধন্যি মেয়ে তুই! বাছা, মনে কল্লেও গা শিউরে ওটে। রেবা তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসে। রেবা বাড়ী যাইতে চাহিলে অশনির মা কহিলেন, "তাকি হয়? আগে ভাল করে সেরে ওঠ্। যে তোর শরীরে যত্ন বাছা! বাড়ীতে কেবা দেখ্‌বে, কেবা যত্ন করবে? খুড়ীটিও ত নেই! তাই ত বলি বিয়ে কল্লে এদ্দিনে এক ঘর ছেলে পুলে হোত! কি যে ধিঙ্গি হয়ে রইলি! এখানে ত আর জলে পড়িস্ নি! এও তো তোর নিজের ঘর।"

অশনির মার মুখের পানে চাহিয়া রেবার আবার অতীত জীবন মনে পড়িতেছিল। সেই অনাবিল আনন্দের নির্ঝর সুদূর অতীতে! কি মধুর তাহার স্মৃতি! রেবার জীবনে তেমন দিন আর আসিবে না। মনে পড়ে, অশনির সহিত একত্র খেলা-ধুলা—একত্র বিদ্যাশিক্ষা—মায়ের কোল-মায়ের স্নেহ! একবৃন্তে, ভিন্নজাতি দুইটি ফুল কি শোভনীয় মাধুর্য্যেই তাহারা ফুটিয়াছিল! সে সব সুখের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়।

দুপুরবেলা একা বিছনায় পড়িয়া রেবার কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন কিছুতেই আজ যেন আর কাটিতেছিল না। হয়ত, কনক এখন একা বিছানায় পড়িয়া তাহারই মত এ-পাশ ও-পাশ করিয়া দিন কাটাইতেছে! অশনি এ সময় কাছারীতে বদ্ধ থাকে, তাই কনকের ঘরে যাইবার অদম্য লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। চলিতে এখনও পা টলিতেছিল, তবুও সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। মা অশনির ছেলে-মেয়েদের লইয়া বারাণ্ডায় মাদুর বিছাইয়া ঘুমাইয়াছেন। উঠানে শ্যামার মা বাসন মাজিতেছিল, অন্য ঝি-চাকরেরা দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের আশায় কে কোথায় গিয়াছে!

কনকের ঘরে যাইতে গিয়া সহসা অশনির কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া রেবা বাহিরেই দাঁড়াইয়া পড়িল। কাজ বেশী না থাকায় অশনি সে-দিন হাঁটিয়াই সকাল সকাল বাড়ী আসিয়াছে। তাই রেবা তাহার ফিরিয়া আসার খবর জানিতে পারে নাই। রেবা শুনিল,

অশনি বলিতেছিল, "মা বুঝি, গল্প কর্‌বার আর লোক পান্‌ নি!—ও একটা ছোটবেলার পাগ্‌লামী! এখন মনে হলেই ভয় হয়। কি রক্ষেই পাওয়া গেছে!" স্বামীর আদরে গলিয়া কনক আদরের সুরে কহিল, "রক্ষেটা কিসের? অমন সুন্দরী, বিদ্বান্‌, কত সেবা-যত্ন জানে!" পত্নীর রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া, আদর করিয়া অশনি কহিল, "থামুন পাদ্‌রী-মশাই। আর বক্তৃতা দিতে হবে না। জান ত হিঁদুর বিয়ে এক জন্মের নয়! তুমিই যখন আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী, তখন মুখ্যই হও, আর কুচ্ছিৎই হও, তোমায় যে আমায় পেতেই হোত! ও আমার কে? কেউ না—।"

রেবা নিঃশব্দে আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল। বুঝি, এত দিন এই কথা শুনিবার জন্যই মন তাহার মনের ভিতর তৃষিত হইয়াছিল। অশনির মঙ্গল কামনায় সে তাহার আত্মবিসর্জ্জনের মূল্যে যথার্থই অশনির মঙ্গল ক্রয় করিতে পারিয়াছে কি না—এ সন্দেহের অনুতাপ দশবৎসর ধরিয়া তাহার বুকে তুষানলের মতই ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়াছে। কতদিন মনে হইয়াছে, হয় ত হৃদয়ের সে গভীর ক্ষত কালেও মিলাইতে পারে নাই। না; সে ক্ষত ত নাই-ই; শুধু সামান্য আঁচড়ের দাগমাত্র। সে তাহার প্রিয়তমের দুঃখের হেতু নয়;—তাঁহাকে মাতৃক্রোড়, আজন্মের বিশ্বাস, সমাজ, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম হইতে নিজের স্বার্থের সুখের মধ্যে না টানিয়া আনিয়া ভালই করিয়াছে।

রেবা মাটিতে বসিয়া দুই হাত যোড় করিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধায় ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিল।—"প্রভু! স্বামী! পিতা! শুধু তাঁকে নয়, আমাকেও তুমি রক্ষা করেছ!—তোমার করুণাময় নাম সত্য!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

দুর্দ্দিনে

[১]

আঘাত কর আঘাত কর
অমোঘ রাজ-দণ্ডে;
প্রখর তব শাসনে যেন
সকল দোষ খণ্ডে।
নিরাশা যাক্‌ বাতাসে ঘুচি,
ধুইয়া হিয়া লহ গো মুছি,
পোড়ায়ে মোরে করহ শুচি
পাবক-হোম-কুণ্ডে।

বেদনা-মাখা সাধনা তব
জেনেছি আমি মর্ম্মে;
বেদনা-পথে সাজিব নব
বেদনা-সহা বর্ম্মে।
কখনো যদি বেদনা পাকে
পরাণ মম কাঁদিতে থাকে,
নয়ন-বারি লইব ভরি
মরম-হেম-ভাণ্ডে।

[২]

যেমন ধারা বহিছে ঝড়্
গগনে,
তেমনি তর নৃত্য কর
এ মনে।
জমাট যত আঁধার-আলো,
হাওয়ার তালে উড়িয়ে চলো,
বিজলী-বোনা আলোক ঢালো
নয়নে।
গরজি মেঘ জাগায়ে দি'ক
বেদনা ;
বাদল-ধারে ধৌত কর
সাধনা।
যা'কিছু আমি গড়েছি বসে,
সকল যাক্ নিমেষে ধসে,
তোমার বাজ পড়ুক্ খসে'
চেতনে।

[৩]

আজ্ যে তোরে শুধ্‌তে হবে
আনন্দেরি দেনা ;
তরল হাসির গরল দিয়ে
হয়েছে যা কেনা!
জীবন-বীণা লয়ে করে
কি গাহিলি জীবন ভরে?
চপল গানের উতাল স্বরে
জীবন কি যায় চেনা?
হাস্‌লি যত ক্ষিপ্ত হাসি
অকারণের গানে,
সে-সকল আজ যাবে ভাসি
ব্যথার বিপুল টানে।
আমোদ-প্রমোদ হয়ে তরল
রচে তোরই নয়নের জল,
সেই জলে সব যৌবন-মল
এবার ধুয়ে নে না!

দরবেশ

সংবাদ

১। **ম্যাট্রিকুলেশন** পরীক্ষার ফল।—এই বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে—

প্রথম বিভাগ।

লীলা বসু—ডাওসেসন, মবেল ক্যাথারিন—ঐ, গীতা চট্টো—ঐ, চন্দ্রমুখী সিংহ—গার্ডেন মেমোরিয়াল, মালতীমালা সরকার—ঐ, শেফালিকা রায়—ব্রাহ্মবালিকা স্কুল, ফুলবালা গুপ্ত—ঐ, সুধীরবালা গুহ—ঐ, কনকলতা খাস্তগিরি—ঐ, সুবোধবালা রায়—বেথুন, সুধা চট্টো—ঐ, মণিকা চট্টো ঐ, প্রীতি দাস—ঐ, চপলা দেবী—ডাক্তার খাস্তগিরি বালিকা বিদ্যালয়, প্রমীলা ঘোষ—ছোটনাগপুর গার্লস স্কুল, সুমতি দত্ত—ঐ, সুপ্রভা কর—কটক র‍্যাভেন্সা, প্রীতিকণা দাস—ঐ, অমিয়া পাল—বাঁকিপুর বালিকা, সুমতিবালা দাস—ঢাকা বালিকা, নিখিলবালা গুপ্তা—ঐ, গৌরীপ্রভা তুয়ারা—ছোটনাগপুর বালিকা, স্নেহপ্রভা সরকার—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, প্রেমমালা সিংহ—ঐ, অমিয়া বিশ্বাস—ঐ, সুনীতিবালা রায়—ঐ, কুলবালা সরকার—ঐ, শুদ্ধকণা চক্রবর্ত্তী—ছোটনাগপুর বালিকা, সুধা দত্ত—দার্জিলিং মহারাণী হাই স্কুল, লাবণ্যপ্রভা বসু—ঐ, সুষমা সিংহ—বহরমপুর প্রাইভেট, শান্তিময়ী দাসী—ছোটনাগপুর বালিকা, লাবণ্য বন্দ্যো—ঐ, চিরপ্রভা বসু—ঐ, সীতা সরকার—বেথুন, সুষমা চক্রবর্ত্তী—বাঁকিপুর বালিকা, প্রীতিলতা গুহ মল্লিক—ঐ।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুশীলাবালা মুখো—ডাওসেসন, ভিক্টোরিয়া মবেলসেন—ঐ, রামা জুদা—ঐ, সেরা এইনি—ঐ, সরোজ চক্রবর্ত্তী—গার্ডেন মেমোরিয়াল,

হৈবু যমিন—ইউনাইটেড মিশনরী, প্রেমবালা সাহা—ঐ, সরোজিনী বসু—ঐ, সুষমা দত্ত—ব্রাহ্মবালিকা, মনোরমা রায়—ঐ, সরলা সাধুর্থা—ঐ, নীহারিকা মল্লিক—ঐ, মীরা চট্টো—ঐ, সুশীলা সাধুর্থা—ঐ, শোভনা নন্দী—ঐ; জ্যোৎস্না সেন—প্রাইভেট; লাবণ্য-প্রভা দে—সি, এম, এস ; শান্তিলতা চৌধুরী —মহারাণী হাইস্কুল দার্জিলিং ; প্রিয়বালা সলোমন—ইউ এফ্ সি হাই, শশিকলা সিংহ—ঐ; মৃন্ময়ী রায়—প্রাইভেট; কমলকামিনী রায় —রাভেন্সা কটক; সৌভাগিনী দাস—ঐ, লিলি দাস—ঐ ; শৈলবালা রাউথ—ঐ; মা টোনমে —শিক্ষয়িত্রী ; শিশিরকুমারী সেন—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা, সুমতিবালা রায়—ঐ, লীলাবতী ঘোষ—ঐ ; লীলাময়ী চক্রবর্ত্তী —প্রাইভেট ; মাধুরীলতা চৌধুরী—মহারাণী হাই দার্জিলিং, স্নেহলতিকা হালদার—ঐ ; উৎস ঘোষ—ছোটনাগপুর বালিকা ; বিধান মজুমদার—ভিক্টোরিয়া ইন্, কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ।

প্রতিভাবালা দাস—সি, এম্, এস্।
নলিনীবালা জোন্স—গার্ডেন মেমোরিয়াল্।
স্নেহলতা সামন্ত— ঐ
স্মিতমুখী চক্রবর্ত্তী— ঐ

২। ইংরাজ মহিলাগণ পুরুষদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষদিগকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের গবর্ণর জেনারেলের ও বাণিজ্য-মন্ত্রীর কন্যাদ্বয় শিম্‌লা-পর্ব্বতে কেরাণীর কর্ম্ম শিখিতেছেন।

৩। ল্যাণ্ডন রোণাল্ড্-নামক ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিবাবুর কতকগুলি কবিতায় স্বর-সংযুক্ত করিয়া সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ করিতেছেন।

৪। ১৯১৮ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ঐ সালের ৪ঠা মার্চ্চ, ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ এবং বি-এ ও বি এস্-সি পরীক্ষা ৪ঠা এপ্রিল আরম্ভ হইবে।

৫। ইংলিশম্যানে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চাশ জন আবদ্ধ বাঙ্গালী যুবক স্ব স্ব বাটীতে থাকিবার আদেশ পাইয়াছে।

৬। টিকারির মহারাজকুমার বাঁকিপুরে ভারতীয় বালিকাদের বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত কলেজ-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৩ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকাদের পর্দ্দার মধ্যে থাকিয়া পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে।

তপস্যা।

(২)

মধুমতী-তীরে কমলাপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হরনাথ রায় একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। হরনাথবাবু অতিশয় ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ। তিনি কোনও আফিসের চাকুরে নহেন। তাঁহার কিছু জায়গা-জমী ছিল; তদ্দ্বারাই তাঁহার বেশ সচ্ছলে চলিয়া যাইত। পরের দাসত্ব তাঁহাকে করিতে হইত না। বিলাসিতাই মানবের অভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়। হরনাথবাবুর সে-সকল কিছুই ছিল না। কাজেই, তিনি নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। পত্নী রাজলক্ষ্মী ভিন্ন তাঁহার পরিবার-মধ্যে আর কেহ ছিল না। এই দম্পতী পরোপকার জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পরের কার্য্য ভিন্ন কখনও তাঁহারা অলসভাবে গৃহে অবস্থান করিতেন না। গ্রামের লোকের যাহার যখন যে কার্য্যের আবশ্যকতা হইত হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। কোথায় কাহার ছেলে পীড়িত, ডাক্তার ডাকিবার লোকাভাব, হরনাথবাবু অবিলম্বে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতেন। কাহারও বাড়ীতে মৃত দেহ পড়িয়া আছে, সৎকার করিবার লোক

নাই, হরনাথবাবু তাহাকে বহিয়া লইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই ; হরনাথবাবু রোগীর নিকটে বসিয়া দিবানিশি অক্লান্তভাবে তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আবার কোনও প্রতিবেশীর হাট-বাজার করিয়া দিবার আবশ্যক হইলে, তাহাও করিয়া দিতেন। কোনও প্রতিবেশীর লাউ-মাচা, পুঁইমাচা বাঁধিতে হইবে ; সেখানেও হরনাথবাবু কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাটারি লইয়া উৎসাহের সহিত বাঁশ-বাঁখারি কাটিতে লাগিয়া যান। পাঠিকা-ভগ্নীগণ, হয় ত, একথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না ; বলিবেন, "বাবুতে আবার কে কবে বাঁশ কাটে ? মাচা বাঁধে ? বাবু লোক ত 'পাম্পসু' পায়ে দিয়া, চুড়িদার গায়ে দিয়া, চুরুট-বার্ডশাইয়ের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে গার্ডেনপার্টি জম-জমা করিবেন অথবা মুক্ত আকাশ-তলে বায়ু সেবন করিবেন, কিম্বা ক্লাবে বসিয়া খোষ গল্প অথবা থিয়েটারের 'রিহার্সেল' দিবেন। ইহাই এখনকার বাজারে "বাবু"-দিগের কার্য্য—। তাহা না হইয়া মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া, চটী জুতা পায়ে দিয়া, তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, পায়ে এক পা ধূলা মাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে যায়, কোমরে গামছা জড়াইয়া বাঁশ কাটে, মাচা বাঁধে ! সে বুঝি তোমার বাবু ? আরে ছ্যাঃ—।" কিন্তু যাহা সত্য, তাহার অপলাপ করা নীতিবিরুদ্ধ। সদ্বংশজাত, ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান্ কায়স্থ-সন্তান যদি আপনাদের নিকটে বাবু-নামধারীর অযোগ্য হয়েন, তাহা হইলে আপনাদের যাহা অভিরুচি তাহাই বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিবেন। আমরা কিন্তু তাঁহাকে বাবুই বলিব। এই সকল গুণ ছাড়া হরনাথবাবুর আর একটি মহাগুণ ছিল। তিনি সকল লোকেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব, সরিকে সরিকে বিবাদের তিনি মীমাংসা করিয়া দিলেই মিটিয়া যাইত। এইজন্য কমলাপুর-গ্রামবাসিগণের অর্থ উকিল, ব্যারিষ্টার-দিগের উদর-পূর্ত্তি না করিয়া, দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইত। হরনাথবাবু ব্যতীত গ্রামবাসিগণের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, তিনি সকলেরই বন্ধু। বৃদ্ধেরা পরামর্শ-গ্রহণের জন্য, যুবকেরা উপদেশ-গ্রহণের জন্য এবং বালক-বালিকারা আদর-প্রাপ্তি ও গল্প-শ্রবণের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিত। গৃহিণী রাজলক্ষ্মীও পতির উপযুক্তা পত্নী ; পরোপকারে তিনিও সিদ্ধহস্তা ! কোনও বুভুক্ষু অতিথি কোনও দিন তাঁহার গৃহ হইতে অমনি ফিরিত না। তিনি নিজের আহার্য্য দান করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন। কেহ কোনও দ্রব্যের জন্য তাঁহার নিকটে আসিলে, কদাচ সে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া যাইত না। গরিব-দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া।

পাড়ায় স্বজাতীয়ের বাটী নিমন্ত্রণ হইলে আগে রাজলক্ষ্মীর ডাক্ পড়িত। তিনি রন্ধনশালায় গিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতিপরিপাটিরূপে পঞ্চাশ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। কোমরে অঞ্চলটি জড়াইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া সেই অন্ন-ব্যঞ্জন যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পাতে তিনি পরিবেশন করিতেন, তখন তাঁহাকে যথার্থই অন্নপূর্ণার ন্যায় মনে হইত। তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। গ্রামের মধ্যে তাঁহার এইটী সুখ্যাতি ছিল। সহর অঞ্চলে এখন এ নিয়ম নাই। কিন্তু পল্লী-গ্রামে এখনও প্রচলিত আছে যে, দশজনকে নিমন্ত্রণ করিলে বাড়ীর মেয়েরাই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। আমাদের এখনকার ভগ্নীগণের মধ্যে, হয় ত, রন্ধনশালায় গেলে অনেকেরই মাথা ধরিয়া উঠে, এবং রন্ধন-কার্য্যকে তাহারা অতিহেয় কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহা মনে করিতেন না। বরং তিনি ইহাতে আনন্দিতা হইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগতকে

ভোজন করান, তিনি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। এই প্রকার তাঁহাদের বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত হইত ; অভাব অশান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা আদৌ জানিতেন না। কিন্তু একটি বিষয়ে যথার্থই তাঁহারা বড় দুঃখিত ছিলেন। এই প্রৌঢ় দম্পতী নিঃসন্তান ছিলেন। অপত্য-মুখ-দর্শনে তাঁহারা বঞ্চিত। এজন্য যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-অনুষ্ঠানের এবং ঠাকুর-দেবতার ধরণা দেওয়া, কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নাই। তথাপি কি জানি, কোন দেবতা এই দম্পতীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়া সন্তান প্রদান করেন নাই। কিন্তু বহুদিবস পরে বহু তপস্যার ফলে তাঁহাদের এ আক্ষেপ দূর হইল। "আতুড় ঘর আলো" করিয়া একটি "চাঁদ-পানা" ছেলে রাজলক্ষ্মীর অঙ্ক শোভিত করিল। পতি-পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

(৩)

বিধাতার খেলা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে মানব নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে। মানবের ইচ্ছা-শক্তি সকল সময়ে কার্য্যকরী হইতে পারে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। হায় মানব! 'আমি করিয়াছি', 'আমি করিব', বলিয়া তুমি কিসের দম্ভ করিয়া থাক! জান না, কাল তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তোমাকে নিয়ত চালিত করিতেছে? অপুত্রক দম্পতী পুত্র লাভ করিয়া অন্ধের চক্ষু-লাভের ন্যায় বড়ই আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন! হরনাথবাবু বড় ঘটা করিয়া ছয় মাসে পুত্রের অন্নপ্রাসন দিলেন। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় শিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আধ আধ ভাষায় যখন "মা মা," "বা বা" বলিয়া সে ডাকিত, তখন তাঁহারা মনে করিতেন, "সংসারে এই ত চরম সুখ! আর সুখ কোথায়? হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই সুখের মধ্যে অচিরে একখানা যবনিকা পতিত হইবে! যখন এইরূপ আনন্দে তাঁহাদের দিন কটিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন রাজলক্ষ্মী জরাক্রান্তা হইলেন। সেই জরই তাঁহার কাল হইল। সে জরের হাত হইতে আর তিনি মুক্তি-লাভ করিতে পারিলেন না। অনেক ঔষধ-পত্র খাইয়া জর কয়েকটী দিনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু পথ্য পাইবার পূর্ব্বেই আবার জর দেখা দিল। পুনঃ পুনঃ তিনি এইরূপে জর-ভোগ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। দেশের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তিনিই রাজ-লক্ষ্মীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। রাজলক্ষ্মীর পীড়ার কোনও উপশম হইল না।

হরনাথবাবু পরের চাকুরি কখনও করেন নাই; জমা-জমীর আয়েই তাহার ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া যাইত। আর্থিক সংস্থান তাঁহার অধিক ছিল না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। দুই-একখানি জমীও বন্ধক পড়িল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিলেন না। একদিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে আমার জন্যে এত ওষুধ-পত্তর কিনছ, মুটো মুটো টাকা দিয়ে ডাক্তার আনছ, এত টাকা কোথায় পাচ্ছ? আমার জন্যে শেষে ঋণগ্রস্ত হবে নাকি?" এ কথার উত্তরে হরনাথবাবু বলিয়াছিলেন, "কেন? তুমি কি আমাকে এতই গরিব ঠাওরালে না-কি? আমার কি এমন সংস্থান নেই যে তোমাকে ডাক্তার দেখাই?" রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ হইলেন, সেই হইতে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না।

ক্রমান্বয়ে ভুগিয়া ভুগিয়া রাজলক্ষ্মীর দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ সংসারের তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইবে না! বুঝিলেন, ভগবানের ডাক পড়িয়াছে, যাইতেই হইবে। প্রায় বৎসরাধিক তিনি এইরূপ পীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন;—বহু চিকিৎসায়ও কোন ফলোদয় হইল না।

দিন দিন অবস্থা খারাপ দাঁড়াইতে লাগিল। একদিন ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমি ত এঁর কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, যদি আর কা'কেও দেখাতে ইচ্ছা করেন, দেখান!"

দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান চিকিৎসক। তাঁহার মুখের এ কথা শুনিয়া হরনাথবাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তিনি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর জীবনের আশা নেই? আরাম কর্‌তে পার্ব্বেন না?"

চিকিৎসক দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কি কোর্ব্বো, বলুন? আমার সাধ্য মত আমি ক্রটী করি নি। আমরা রোগ আরাম কর্‌তে পারি, কিন্তু পরমায়ু ত দিতে পারি না!"

হর। তবে আর অন্য ডাক্তার দেখাবার কথা বল্‌ছেন কেন?

ডাক্তার। এর পরে আপনার মনে না আক্ষেপ থাকে, তাই এ কথা বল্‌ছি। আমি ত অবস্থা ভাল ব'লে বুঝ্‌ছি না।

"আপনি না ভাল কর্‌তে পার্লে আর কে পার্ব্বে?" এই বলিয়া হরনাথবাবু হতাশ ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন। কিছু দিনের জন্য 'চেঞ্জে' নিয়ে যান। তাতে উপকার হলেও হতে পারে। দুটো একটা এ-রকম রোগীকে 'চেঞ্জে' গিয়ে সেরে উঠ্‌তে আমি দেখেছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে হরনাথবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইবারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজলক্ষ্মী তাহা শুনিয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "আর কেন? এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি, এখানেই থাক্‌ব। ঘর ছেড়ে কখনও কোথাও যাই নি, এ সময় আর যাব না। আমার মধুমতী ছেড়ে আমি গঙ্গা-যমুনা কিছুই চাই না! আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার ডাক্ পড়েছে; আমায় যেতে হবে। মৃত্যুতে আর আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমি জীবনে যত সুখ ভোগ করিছি, খুব কম স্ত্রীলোকেই এ রকম সুখ ভোগ কর্‌তে পায়! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, লোকে যেন আমার মতন স্বামী-সোহাগিনী হতে পারে। এক দুঃখ ছিল—ছেলে হয় নি। তা' ভগবান্ সে আক্ষেপও দূর করেছেন। এখন তোমার পায়ে মাথা রেখে মর্‌তে পার্লেই হয়। আমাকে পায়ের ধূল দাও—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম তোমার স্ত্রী হতে পাই। সুধীরকে দেখ। এখন হ'তে তুমিই তার মা-বাপ দুই-ই।" পত্নীর কথা শুনিয়া হরনাথবাবু চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উক্ত-ঘটনার এক দিবস পরে একদিন সায়ংকালে প্রেমময় পতি, শিশুপুত্র, গৃহ-পরিজন—সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পতি-পুত্রকে কাঁদাইয়া সতীলক্ষ্মী অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। হরনাথবাবু পত্নীর মৃত্যুশয্যায় পতিত হইয়া বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিবর্গ বহুযত্নেও তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদানে সমর্থ হইল না।

প্রতিবেশীরা শবদেহ-সৎকারের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিল। হরনাথবাবু প্রিয়তমা পত্নী গৃহলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীর দেহ মধুমতী-তীরে ভস্মসাৎ করিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি শূন্যহস্তে শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সব ফুরাইল! হায়! আজি গৃহ তাঁহার পক্ষে শ্মশান-তুল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একমাত্র স্নেহময়ী প্রেমময়ী পত্নীর অভাবে আজি সমস্ত অন্ধকার! সব যেন হাহাকার করিতেছে! তিনি গৃহে আসিয়া যাহা দেখেন, তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি জড়িত দেখিতে পান। আজি যেন তাঁহার জগৎ-সংসার রাজলক্ষ্মীময় হইয়াছে! কই যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন ত এ প্রকার হইত না! বন্ধুগণ তাঁহার নিকটে বসিয়া প্রবোধবাক্য দান করিতে লাগিলেন। চিরদিন তিনি লোকের রোগে শুশ্রূষা,

শোকে সান্ত্বনা-প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাঁহার সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত ; উপকৃত ব্যক্তিগণ কিরূপে আজি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ?

রজনী প্রভাত হইল, আবার দিবাসুন্দরী দেখা দিল। দিন যায় অবার দিন আসে; মানুষ যায় আর ফিরিয়া আসে না। রাজলক্ষ্মীহীন গৃহে হরনাথবাবুর একটী দিবস অতিবাহিত হইল । প্রভাতে রোরুদ্যমান পুত্র সুধীর আসিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হরনাথবাবু সুধীরকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি শোকে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সুধীরের কথা তাঁহার স্মরণই ছিল না। সুধীরকে একজন প্রতিবেশী লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সুধীর গৃহে যাইবার জন্য অত্যন্ত বায়না করায়, প্রভাত হইতেই তিনি সুধীরকে তাহার পিতার নিকট দিয়া গেলেন। সুধীরকে দেখিয়া হরনাথবাবুর রাজলক্ষ্মীর সেই কথাটী মনে পড়িয়া গেল।—"সুধীরকে দেখ, এখন থেকে তুমিই তার মা-বাপ, দুইই।" আর তিনি কেমন করিয়া সেই সুধীরকে ছাড়িয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন? মাতা হইলে কি পারিতেন? হরনাথবাবু নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া রোরুদ্যমান সুধীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। বুঝি, ইহাতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। সুধীরও পিতাকে দেখিয়া, পিতার কোল পাইয়া, কান্না-কাটা ভুলিয়া গেল।

(৪)

যখন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়, তখন সুধীরের বয়ঃক্রম চারিবৎসর মাত্র। চারিবৎসরের শিশুসন্তানটি লইয়া হরনাথবাবু একাকী সংসার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। যখন রাজলক্ষ্মী জীবিতা ছিলেন, তখন হরনাথ-বাবুকে কিছুই দেখিতে হইত না। তিনি পরের কার্য্য লইয়া বাহিরে বাহিরেই অবস্থান করিতেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহাকে প্রত্যেক কাজটী স্বহস্তে করিতে হইত। তাঁহার এমন অবস্থা নহে যে, দাস-দাসী রাখিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন ! তদুপরি রাজলক্ষ্মীর পীড়া-হেতু কিছু ঋণও হইয়াছিল, দুই-একখানি জমীও বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বাকি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি যাহা ছিল তদ্দ্বারা পিতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইতে লাগিল। পরের চাকুরি তিনি কখনও করেন নাই,—আর এ বয়সে পরের দাসত্ব করায় তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। বিশেষতঃ সুধীরকে লইয়া এখন তাঁহার একপদ অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি এখন বাস্তবিকই একাধারে সুধীরের মাতাপিতা দুই-ই। সুধীরকে তেল মাখান, ভাত খাওয়ান হইতে "ঘুমপাড়ানি-মাসী"র গান গাহিয়া ঘুম পাড়ান পর্য্যন্ত তাঁহাকেই করিতে হয়। এখন একমাত্র সুধীরই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। শোকে শান্তি, দুঃখে সহানুভূতি, কার্য্যে সহায় —সবই এখন তাঁহার সুধীর! যখন তিনি সংসারের কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিত, বাতাস করিত, ঘামাচি খুঁটিত, আবার কখনও বা তাহার কচি কচি কোমল হাত-দু'টি দিয়া তাঁহার পা টিপিয়া দিত। যখন তাঁহার রাজলক্ষ্মীর স্মৃতি হৃদয়ের মধ্যে উদিত

হইয়া হৃদয়কে কূলে কূলে ছাপাইয়া, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বহির্গত করিত, সুধীর তখন তাহা দেখিলে ছুটিয়া আসিয়া তাহার নবনীত-তুল্য হাত-দুইখানি দিয়া পিতার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, তোমাল চ'খে কি পলেচে বাবা?" হরনাথ বাবু তখন সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুধীরকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুখ-চুম্বন করিতেন। আবার যখন তিনি রন্ধন-শালায় বসিয়া রন্ধন করিতেন, সুধীর তখন তাঁহার ইন্ধন যোগাইয়া দিত; জলের ঘটিটী, পীড়িখানি আনিয়া পিতাকে প্রদান করিত। এইরূপে পিতা-পুত্রের দিন কাটিতে লাগিল।

একবার সুধীরের বড় কঠিন পীড়া হইল জীবনের আশা ছিল না। প্রতিবেশীরা ভাবিল, বুঝি, মায়ের কোলের ছেলে মা কোলে তুলিয়া লইবেন। হরনাথবাবু আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সুধীরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তত যত্ন, তেমন শুশ্রূষা বুঝি মাতাও করিতে পারেন না! সন্তানবৎসল পিতার স্নেহ-যত্নের বিরাম ছিল না। তিনি সুধীরের আরোগ্য-কামনায় স্ত্রীলোকের ন্যায় কত দেবতার পদে মাথা কুটিতেন, কত হরির লুট মানিতেন। দেবতারা তাঁর সে কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন। সুধীর আরোগ্য-লাভ করিল। হরনাথবাবু কৃতজ্ঞতার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গ্রাম্য দেব-মন্দিরে পূজা দিয়া আসিলেন।

হরনাথবাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে জানিতেন না। পুত্রকেও সেই নীতির অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেন। বৃথা প্রবোধ দিয়া তিনি কখনও পুত্রকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেন না। ভ্রমেও কখন পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতেন না। মাতৃহারা শিশু যখন মাতার জন্য কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা! মা কোথায়?" হরনাথবাবু তখন ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন "ঐ খানে!" বালক মাতাকে দেখিবার আশায় আকাশ-পানে চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইত না, তখন পিতাকে বলিত, "বাবা, আমি মায়ের কাছে যাব।" হরনাথবাবু তখন পুত্রকে বুঝাইয়া বলিতেন, "এখন সেখানে যাওয়া যায় না, বাবা! সময় হলে একদিন সকলকেই সেখানে যেতে হবে।" এইরূপে দরিদ্র হরনাথ রায়ের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সন্তান-সন্ততির শিক্ষার পক্ষে তাহাদের মাতাপিতার পূত চরিত্র ও তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ কার্য্যকরী এরূপ আর কিছুই নহে। পিতার সুশিক্ষার গুণে তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে বালক সুধীর শৈশব হইতে উচ্চপ্রকৃতির লোক হইতে আরম্ভ করিল।

বঙ্গদেশে কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্যক্তির অভাব নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হরনাথবাবুকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিতে অনেকেই অনুরোধ করিল। কত কন্যাদায়গ্রস্ত উমেদার আসিয়া দুই বেলা তাঁহার খোষামোদ করিতে লাগিল।

কোনও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; "ভাগাড়ে মরা গরু পড়িলে শকুনির পাল তাহাকে যেরূপ ঘেরিয়া ধরে, এক ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইলে সেই ব্যক্তিকে কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ ঘিরিয়া ধরে!" কথাটা যথার্থ বটে! বাঙ্গালায়

বর-পণের সৃষ্টি হইয়া যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে, বঙ্গবাসিগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। প্রত্যেক গৃহেই কন্যাদায়; প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই হাহাকার; তথাপি এ পণ-গ্রহণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কত স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা পঞ্চাশবৎসরের বৃদ্ধ-পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া মাতাপিতা কন্যা-দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। হায়! এরূপ বিবাহের নাম কি কন্যা-দান? ইহা যে প্রকৃত পক্ষেই "বলিদান!" এরূপ বিবাহ না দিয়া কন্যাকে চিরকুমারী রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কন্যা একটু বয়স্থা হইলেই, জানি না, সমাজের কি এমন সর্ব্বনাশ ঘটে! বাঙ্গালীর ঘরে বিবাহ যেন যা তা একটা ছেলে-খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে সমাজের যে কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে,—বড় দুঃখের বিষয়, সমাজপতিগণ ভ্রমেও সে চিন্তা করেন না। এইরূপ বিবাহের ফলেই দেশে বালবিধবার সংখ্যা এত অধিক। এই প্রকার বিবাহের ফলেই পতিতা রমণীর সৃষ্টি এবং রাশি রাশি পাপের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়গণ যদি ছোট ছোট বালিকার পাণিগ্রহণ না করিয়া বিপত্নীক অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে অনেক অবলা বালিকা দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু পুরুষ এতটা সংযম, এতটা স্বার্থ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরুষে অনায়াসে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত, তিন-চারি-বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু একটী দশ বৎসরের বালিকা যদি বিধবা হয়, তাহারও পুনর্বিবাহ দেওয়া আধুনিক হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে! নিজেরা বিলাস-সাগরে ভাসমান থাকিয়া তাঁহারা সেই কিশোরীর কর্ণে ব্রহ্ম-চর্য্যের মন্ত্র বর্ষিত করিতে থাকেন। সে মন্ত্র যে কতদূর কার্য্যকর হইতেছে, তাহা ত সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। হায়! বঙ্গদেশে রমণীগণ চির-পরাধীন! জানি না, কত মহাপাতক-ফলে বঙ্গদেশে রমণী জন্ম-গ্রহন করিয়া থাকে। যে দেশে সমাজ এত স্বার্থপর, সে দেশের সমাজের উন্নতির আশাও সুদূর-পরাহত।

হরনাথবাবু বঙ্গদেশবাসী; সুতরাং এ প্রৌঢ়া-বস্থায় তাঁহারও অনেক পাত্রী জুটিয়াছিল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ! কাহারও কথায়, কাহারও অনুরোধে তিনি পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন না। যে অত্যন্ত পীড়া-পীড়ি করিয়া ধরিত, তাহাকে বলিতেন, "আমার পুত্র আছে, আমার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রয়োজন নাই আমি আর বিবাহ করিব না! আমার সুধীর বড় হইলে সুধীরের বিবাহ দিয়া বধূমাতা গৃহে আনিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 651. November, 1917.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৪। নবেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী!
এ পারে ফুরাল খেলা, আর তবে কেন বেলা?
বেলা হ'লে হবে যে রে তুফান ভারি;
যাবি যদি চলে আয় এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে, আয় এসেছে তরী;
এ পারে কেবলি শোকে পাগল করিবে তোকে;
কেঁদে কেঁদে চোখে আর রবে না বারি;
এই বেলা চলে আয়, কেন রে দেরি!

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী;
আশার কুহকে মাতি ছুটাছুটি দিবারাতি,
তবু আশা পূরিবে না জীবন ধরি!
কাজ নাই, চলে আয় তাহারে ছাড়ি।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
মায়ার বাঁধন কাটি তরীতে চলরে ছুটি,
ও-পারে পাবি রে সুখ পরাণ ভরি;—
পারে নিয়ে যাবে বলে এসেছে তরী।

পারে যাবি কে রে আয় এসেছে তরী!
পাপী তাপী যে যথায় সকলে ছুটিয়া আয়,
এ তরীতে নাহি ভয় তুফানে পড়ি,—
এ যে সেই পরমেশ-চরণ-তরী!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ শেঠ।

গানের স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট মিশ্র—একতালা।

তুমি এস হে।

মম বিজন চির-গোপন
দুঃখ-বিতান হৃদি-আসনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
জাগে চেতনা শত বেদনা,
মৃত জীবনে তব পরশে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
লভি শকতি, প্রেম-ভকতি,
তব আরতি করি জীবনে ;
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমি তৃষিত, আছি ক্ষুধিত,
যাচি অমৃত তব সকাশে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে।
যত সাধনা, ব্রত-কামনা,
সব সফল তব সাধনে,
তুমি এস হে, তুমি এস হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ • ১
II র্স র্রা ণা। ধা ধা -া। পা ধা ণা। ণধা পা -া I
(১) তু • মি এ স ০ হে ০ ০ ০০ • •

২´ ৩ • ১
I ধা পা -া। মা গা -া। রগা মা -া। -া গা রা I
(২) তু মি • এ স • হে ০ ০ ০ • • ০

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। ধ্‌া ন্‌া স্‌া। -া -া -া II
(৩) তু মি • এ স ০ হে ০ ০ • • ০

২´ ৩ ০ ১

II সা রা -া। সরগা পমগা -া। গধা পা -া। গপা মা গা I

ম ম ০ বি০০ জ০ন ০ চি০ র ০ গো০ প ন

জা গে ০ চে০০ ত০না ০ শ০ ত ০ বে০ দ না

ল ভি ০ শ০০ ক০তি ০ প্রে০ ম- ০ ভ০ ক তি

আ মি ০ তৃ০০ ষি০ত ০ আ০ ছি ০ ক্ষু০ ধি ত

য ত ০ সাধ০ না০০ ০ ব্র০ ত ০ কা০ ম না

২´ ৩ ০ ১

I গা মা -া। রগা সা -া। সা -া -া। সা রা -া I

দুঃ খ- ০ বি০ তা ০ ন ০ ০ হৃ দি ০

মৃ ত ০ জী০ ব ০ নে ০ ০ ত ব ০

ভ ব ০ আ০ র ০ তি ০ ০ ক রি ০

যা চি ০ অ০ মৃ ০ ত ০ ০ ত ব ০

স ব ০ স০ ফ ০ ল ০ ০ ত ব ০

২´ ৩ ০ ১

I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I

আ স ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I

(৪) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I

প র ০ শে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I

(৫) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I

জী ব ০ নে০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I

(৬) তু মি ০ এ স ০ হে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
স কা ০ শে• •• • •• • • • • •

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৭) তু মি ০ এ স ০ হে • • • • •

২´ ৩ • ১
I সা রা -া। সরা গমা পা। মগা রা -া। -া -া -া I
সা ধ ০ নে• •• ০ •• ০ ০ ০ ০ •

২´ ৩ ০ ১
I গা রা -া। সা ন্‌া -া। সা -া -া। -া -া -া I
(৮) তু মি ০ এ স • হে ০ ০ ০ • ০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—৪ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়াই ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" যথাক্রমে গেয়। তাহার পর, পরবর্ত্তী কলি গেয়। ঠিক এই নিয়মেই ৫, ৬, ৭ এবং ৮ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিবার পরে পরেই, প্রত্যেক বারে ১, ২ এবং ৩ নম্বরের "তুমি এস হে" গাহিয়া, তখন অন্যান্য কলি ধরিতে হইবে। এই নিয়মে, গাহিতে পারিলে এই গানটি ভারি শ্রুতিমধুর হইবে।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

নির্জ্জন কক্ষে 'সোফা'র উপর আড় হইয়া পড়িয়া নমিতা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। যদিও যন্ত্রণাধিক্যে তাহার শরীর-মন অস্বচ্ছন্দতায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বিভিন্ন-ঘটনা-সংঘাতে উত্তেজিত চিন্তাশক্তি, তাহার মনোবৃত্তিগুলাকে ফাঁকে পাইয়া, প্রথমেই তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ছুটাইল, তাহার সেই প্রত্যহের অভ্যস্ত কর্ম্ম সংস্কারের দিকে! এই সুন্দর উদ্যম-আনন্দে সচেতন, স্নিগ্ধ-মধুর সন্ধ্যাকাল,—ইহা যে প্রতিদিন রোগি-নিবাসের সেবাব্রতের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, অক্লান্ত উদ্যমে তাহার শ্রম-চর্চ্চা করিবার সময়!—ইহা কি এই সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে সুকোমল 'সোফা'য় পড়িয়া অলস- ও নিশ্চেষ্ট-ভাবে যাপিত করা সহ্য হয়! এ যে বড় কষ্টকর আরাম-উপভোগ!

কিন্তু গত্যন্তর নাই! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া 'সোফা'র উপর পড়িয়া রহিল। মনে সে ভাবিতে লাগিল, হাঁসপাতালের কথা! তাহার অনুপস্থিতির জন্য হাঁস্‌পাতালে, হয়ত, এতক্ষণ গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে! বেচারী চার্ম্মিয়ান্‌, হয়ত, খুব ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার জন্য পথ চাহিয়া রহিয়াছে!...... আবার আহা, নমিতার কর্ত্তব্যের অংশভার যাহাদের আজ হইতে বহিতে হইবে, তাহারা ঐ অধিকন্তু খাটুনীর জন্য কত কষ্ট পাইবে! হয়ত, কেহ মনে মনে বিরক্ত হইবে, কেহ প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাইবে! আবার কেহ বা কটু-কাটব্য-বর্ষণেও হয়ত বা, ত্রুটি করিবে না।

নমিতার আর শুইয়া থাকা পোষাইল না। সে উঠিয়া সোফার উপর সোজা হইয়া বসিল; একবার মনে করিল ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া হাঁস্‌পাতালে হাজির হয়!......কি তুচ্ছ এই সামান্য দৈহিক যন্ত্রণা! স্মিথের মাতৃস্নেহ-করুণা-মণ্ডিত নয়নে ইহা যতই কষ্টকর-যন্ত্রণা হউক, কিন্তু নমিতার পক্ষে ইহা এখন সত্যই আর বিশেষ-কষ্টবহ বেদনা নহে! কিন্তু সামান্য এইটুকুর জন্য, সৌখীন-ক্লান্তি-অবলম্বনে সে এখানে অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া রহিল, আর সেখানে যে এই অজুহাতে 'দশ-বিশ-লক্ষ' মন্তব্য সংগঠিত হইবে, তাহার কঠিন গুরুত্ব তাহার বড়ই অসহ্য! ছুরির ফলার তীক্ষ্ণ কঠিনতার মধ্যে একটা মহদ্‌ গুণ আছে,—সারল্য। কিন্তু, মানুষের শাণিত রসনার শ্লেষ-ব্যঙ্গ,—না না, সে বক্র প্যাঁচের নির্দ্দয় তীক্ষ্ণতার ত্রিসীমানায়, কোন-জাতীয় সমবেদনা তিষ্ঠাইতে পারে না!...তবে? তবে উপায়?...

ব্যগ্র ব্যাকুল মনের উপর বজ্র-চমকে স্মৃতি ঝলসিয়া গেল,—ইহা স্মিথের আদেশ! —নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে নমিতা 'সোফা'র উপর আবার শুইয়া পড়িল। থাক্‌, স্মিথ্‌ যখন দয়া করিয়া স্নেহের দাবীতে, স্বেচ্ছায় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কোনও কথা কহিবার অধিকার নমিতার আর নাই! নিষ্ফল অসন্তোষ দূর হউক্! যা হইবার হইবে। স্মিথ্‌ বুঝিবেন্! তিনি নমিতাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার আদেশ দিয়া গিয়াছেন,—নমিতা দুশ্চিন্তা বিড়ম্বনার বোঝা ঘাড়ে লইয়া এখানে নিরুপায় নিশ্চিন্ততার আরাম ভোগ করুক্। বিপ্লবের ঝড় বাহিরে বহিয়া যাক্!

কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার আরামটুকু তাহার গায়ে যে তীব্র ঘৃণা-অস্বস্তির অঙ্কুশ হানিতেছে! নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবার সাধ্য কি? নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই যে আরাম-উপভোগ,—ইহা এখন নিতান্তই দস্যুতালব্ধ সম্পত্তির মত অন্যায় অধর্ম্মার্জ্জিত। অন্যের কষ্টভোগ বাড়াইয়া —এই যে নিজের শ্রান্তি-অপনোদন,—ইহা তাহার কাছে বড়ই ঘৃণাকর! কিন্তু স্মিথের স্নেহ-অনুকম্পাটা মাঝখানে জুটিয়া বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছে!

চোখের সম্মুখে মানুষের মুখের ভিড় বেশী জমিলে দৃষ্টিশক্তিটা বাহিরের দিকেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়, ভিতর দিকে ফিরিবার অবকাশ তাহার ঘটিয়া উঠা দায় হইয়া থাকে।—তা ছাড়া, বাক্‌শক্তির ঝঙ্কার-সংঘাতে চিন্তাশক্তিটা, অনেক সময়, থতমত খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। এতক্ষণ নমিতার অবস্থাও কতকটা তাহাই হইয়াছিল। এইবার

স্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষের মাঝে কর্ম্মহীন উদাস চিত্তটা আচ্ছন্ন করিয়া খুচ্‌রা দ্বন্দ্বের আলোড়ন চলিতে চলিতে, সহসা মস্তিষ্ক-যন্ত্রটিকে তীব্র উত্তেজনায় সন্ত্রস্ত-চকিত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে গভীরতর দ্বন্দ্ব-বিপ্লব জাগিয়া উঠিল। নমিতার মনে পড়িয়া গেল, ডাক্তার মিত্রের আজিকার ব্যবহার, এবং নমিতার আত্মকৃত আচরণ!

মাথা ঠিক্ করিয়া খুব ভালরূপে সমস্ত ঘটনাটা তলাইয়া ভাবিয়া যথাসাধ্য নিরপেক্ষ হইয়া নমিতা বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কোন্‌খানে কাহার কতখানি দোষ আছে, তাহার মাপ জোঁক পরে হইবে, আগে নিজের ব্যবস্থাটা পরীক্ষা করা হউক্!...... নমিতা হাতের উপর মাথা রাখিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।—না, তাহার আজিকার ব্যবহারটা ভাল হয় নাই; মোটেই ভাল হয় নাই! ন্যায় এবং সত্য যত বড়ই ও মহৎ পবিত্র বস্তু হউক্, কিন্তু পঞ্চভূত-গঠিত এই মাথাটার উপর যাঁহারা উর্দ্ধতন হইয়া আছেন, তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অসন্তোষ-বিরক্তি প্রকাশ করা, যেমনি দুঃসাহসিকতা, তেমনি নির্লজ্জ-ধৃষ্টতা!

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়ই গরম বোধ হইতেছিল। জামাটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে ভাবিল,—না, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; হাঁসপাতালের চাকুরী আর নয়। মানুষের নীচতা-সংঘাতে এক ত তাহার মনও অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আর একটা নিদারুণ কষ্ট!—যাঁহারা উর্দ্ধতন সম্মান-পাত্র,—তাঁহাদিগের ব্যবহারকে ঘৃণা করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনায় ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্ট হইয়া, চিত্তবিক্ষেপ ঘটাইয়া, তাহার বড় লোক্‌সান হইতেছে। সময়ে সাবধান হওয়া ভাল। ডাক্তার মিত্রের সহিত এই যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল, ইহার চরম পরিণতি কোথায় গিয়া সমাপ্ত হইবে, কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ, সে ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণশক্তি মানুষ। প্রতিপক্ষ যখন প্রবল, তখন সন্তর্পণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্রব এড়াইয়া চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

জামা খুলিতে খুলিতে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই পত্রখানা নমিতার হাতে ঠেকিল। তাহার মনে পড়িল, তিনি উহা অবসর-সময়ে পাঠ করিতে বলিয়াছেন! এই ত অবসর! নমিতা একবার দ্বারের দিকে চাহিল;—কাহারই আসিবার সম্ভাবনা নাই, বুঝিল। আলো উস্কাইয়া দিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া খাম ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। মুহূর্ত্তে সে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িল! দেখিল, পত্রের সহিত দুইখানি নোট! একখানি পঞ্চাশ টাকার ও অন্যখানি পাঁচ টাকার!

নোট-দুইখানার এ-পিঠ ও-পিঠ একবার উল্টাইয়া দেখিয়া নমিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্র পড়িতে লাগিল:—

"শ্রী
বিনীত নিবেদন,

পীড়িত পাচকের আশ্রয়দাত্রী করুণাময়ীর সন্ধান পাইয়াছি। দেবর নির্ম্মলবাবু ছাড়া আর কেহ এ সংবাদ জানে না, জানিবেন। যদি ঘৃণা না করেন, তবে অনুতপ্ত-বেদনার অশ্রুজলের সহিত আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

"মুখোমুখী এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমার মাতার দেওয়া তত্ত্ব প্রভৃতির দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতে পঞ্চান্নটি টাকা দিলাম। অতঃপর বালকটির চিকিৎসা-খরচে যাহা লাগিবে, তাহা দিয়া, বাকী টাকা তাহার হাতে দিবেন, এবং যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য সুবিধা না থাকায়, আপনাকেই এ-সব দুঃখভোগের দায়ী করিলাম। নিরুপায়জ্ঞানে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

'আর একটি অনুরোধ। ঠাকুরকে এ বাড়ীতে আর আসিতে দিবেন না; এবং তাহাকে বা অপর কাহাকেও আমার নাম-সংক্রান্ত কোনও কথা জানাইয়া, মর্ম্মপীড়া বাড়াইবেন না। আপনার উন্নত-স্নেহ-ক্ষমা-শীল হৃদয়ের উপর অকপট বিশ্বাস-নির্ভর স্থাপন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, ভুলিবেন না। ইতি

ক্ষমাপ্রার্থিনী

শ্রীসরমা মিত্র।"

বিশ্বস্ত-সুপ্ত মানুষের 'রগে' অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত বাজিলে, সে যেমন বিকল ও মুহ্যমান হইয়া অর্থশূন্য-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, নমিতাও ঠিক তেমনি ভাবে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল!......মুক্ত স্বাধীনতার হাত ফস্কাইয়া, হঠাৎ তাহার সতেজ ক্রিয়াশীল হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন একটা কঠোর পরাধীনতার দৃঢ় নিষ্পীড়নে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ইচ্ছাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণের ক্ষমতাও যেন তাহার লুপ্ত হইয়া গেল! নমিতা পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

নিস্পন্দ-নির্জ্জীবভাবে নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মাথার ভিতর একটা জটিল গোলমালের প্রলয়-আলোড়ন চলিতেছিল। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহ-সংঘর্ষে হৃদয়াভ্যন্তরে অনুভূতি-প্রবাহে বিরাট বিশৃঙ্খলা বাধিয়া গিয়াছিল; নমিতার মনে হইল, এক মুহূর্ত্তে সে যেন কি একটা অদ্ভুত কিছু বানিয়া গিয়াছে!

অনেকক্ষণ পরে, অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। স্মিথের টেবিলের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিল, "বাড়ীতে একটা জরুরী কাজ ভুল করিয়া আসিয়াছি, শীঘ্র ফিরিতে বাধ্য হইলাম, ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমার হাতে এখন কোন যন্ত্রণাই অনুভূত হইতেছে না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন। নমিতা।"

ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর পত্রখানা সন্তর্পণে জামার ভিতর লুকাইয়া, ক্রুশ ও সূতার গুলি হাতে লইয়া, নমিতা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। বারেণ্ডায় স্মিথের বেহারার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, "সুশীলকে সে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। বিমল-বাবু কার্য্যগতিকে ব্যস্ত আছেন, শীঘ্রই এখানে আসিতেছেন।"

নমিতা রুদ্ধস্বরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! জরুরী কাম্‌কো বাস্তে হাম্ আবি মোকাম্ পর যাতা।—মেম-সাব আনেসে বোলো, টেবিল পর লিখ্‌কে আয়া......ঔর মেরা হাঁথ্ আবি আচ্ছা হ্যায়।"

মিস্ স্মিথ্ নমিতাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলিয়া ভৃত্যেরা নমিতার সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিত। নমিতা ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা

সাবধানে ডানহাতে ধরিয়া, বারেণ্ডার সিঁড়ি হইতে খুব ধীরে ধীরে নামিতেছে দেখিয়া, বেহারা পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "জী, বঢ়ি আঁন্ধার হুয়া, একঠো বাত্তি লেকে, আপ্ কো সাথ্—।"

পরের কষ্ট-অসুবিধা ঘটাইয়া, নিজের সুবিধা গুছাইয়া লইতে নমিতার দ্বিগুণ অসুবিধা বোধ হয়! ভৃত্যের প্রস্তাবে সে ব্যস্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিল, "কুচ্ কাম নেহি, সাম্‌কো বখৎ বহুৎ আদ্‌মী যাঁতে আঁতে হেঁ।—কেয়া ডর!"

বেহারা মাথা নাড়িয়া সমর্থনসূচক স্বরে বলিল,—"বহুৎ—খুব্— !"

নমিতা রাস্তায় নামিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার হইলেও আকাশে তারা থাকায়, তাহা তেমন গাঢ় হয় নাই। মোড়ের মাথায় 'লাইট-পোষ্টে'র আলোয় পথগুলি আলোকিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও পথে লোক-চলাচল হইতেছিল। নমিতা কাহারো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বিরাট বিষণ্ণতার ভারে অভিভূতচিত্তে, ক্লান্ত নির্জ্জীবের মত পথাতিবাহন করিয়া চলিল।

দুই তিনটা মোড় ঘুরিয়া, বাড়ীর কাছে শেষ তে-মাথার মোড়ে 'লাইট-পোষ্টে'র নিকট আসিয়া পৌঁছিতেই, সহসা সাম্‌নে হইতে একদল সঙ্গীতমত্ত লোক আসিয়া পড়ায়, নমিতার গতিরোধ হইল। লোকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; উৎকট সুরা-দুর্গন্ধের তীব্রঘ্রাণে চমকিত হইয়া নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিল।—সর্ব্বনাশ! ইহারা সকলেই যে অপ্রকৃতিস্থ!

অসহায় নমিতার আপাদমস্তকে, ভয়-ব্যাকুলতার তীব্র কম্পনপ্রবাহ বহিয়া গেল! সন্ধ্যারাত্রে প্রকাশ্য রাজপথের উপর কোনও ভয় নাই সত্য; কিন্তু এমন সঙ্গিহীন অবস্থায় হঠাৎ সম্মুখে ভয়ঙ্কর কিছু দেখিলে, তাহার মত ক্ষীণশক্তি মানুষের প্রাণ কোন্ সাহসে স্থির থাকিবে! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ্য থাকিলেও কথা ছিল; কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা!

দু-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত বাড়ী, পিছনে অন্ধকার গলি! নড়িবার সরিবার পথ নাই, উপায় নাই, সময় নাই! উহারা আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা প্রাণপণে আপনাকে শক্তি-সংযত করিয়া, আলোকস্তম্ভের গা ঘেঁসিয়া, আহত হাতখানা আড়াল করিয়া, আড় হইয়া দাঁড়াইল! ঘাড় বাকাইয়া নতদৃষ্টিতে রুদ্ধশ্বাসে মাতালদের স্খলিত চরণগতি লক্ষ্য করিতে লাগিল! যদি মত্ততার ঝোঁকে কেহ এই দিকে টলিয়া পড়ে,—তবে হে ভগবন্,—আত্মরক্ষার শক্তি দিও!

ভগবান্, বুঝি, তাহা শুনিলেন। নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বলিয়াই হউক্, অথবা যে কারণেই হউক্, এই অপ্রকৃতিস্থ মাতালদের দৃষ্টিতে মানুষের মত শিষ্টপ্রকৃতিস্থতা কিছু ছিল। অগ্রবর্ত্তী দুইজন সাম্‌নে নমিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত থামাইল এবং সন্ত্রস্ত হইয়া পিছনের 'চূড় মাতাল' সঙ্গীগুলির উচ্ছ্‌ৃঙ্খলতা সংযত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পাশের লোকটা মাদিরালস নয়নে চলিতে চলিতে খুবই টলিতেছিল। একটা ছোট হোঁচ্‌ট খাইয়া, নেশার ঝোঁকে অভিভূত

শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোম্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্ বড়্ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো......... ।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভৎসনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি। ... আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিশ, আপনি..., কি উপকার যে করলেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জনতদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁস্‌পাতালের মেথর 'রম্‌ণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা দরখাস্তে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সায়েব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুন্দসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উঁচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপ্‌নি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি করছিল। স্মিথ্ শুনে চটে গেছেন,... তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্লিকেশনের' কথা বলতে পাঠালেন।... যাক্, ও-সব বাজে কথা শোন্‌বার জন্যে কান পেতে বসে থাক্‌লে ত কোনই কাজ কর্‌বার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ক্রটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষুঃ-পীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোক্কর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোছট্ খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্‌লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুব্‌ড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল ভৈ?"

'নেই বাপ্, কুছু নেই!—"এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্, আজ তোম্‌কো নেহি মিল্‌নেসে হাম্ তো রাস্তে পর মর্ যাতা—।"

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাক্‌ড়ো হাম্‌রা কান্ধা।—হাঁ চলো।... মিস্ মিত্র,একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দত্তজায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কহিবে ভাবিয়া পাইল না; তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির 'বাদ্‌লা' বসান, দেশের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্‌খসে শব্দের সহিত জুতার খট্‌খট্

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতে-ছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বখা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতে-ছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহুরে ফাজিল;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনু-রোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁসপাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁসপাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা ?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এত-টুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রমণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উর্দ্দিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জি-ক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশালাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল; দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি; হাঁস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাঁস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস করে দেব আপনার; চলুন চলুন... ।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ্ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য···!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে গুজব রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে তা বলে কে আর···। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আস্‌বেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে 'পার্টি' জম্‌মে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্ দত্ত ! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল; কোনওমতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি মোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ।"

সে কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব ! না, কিছুতেই না ! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উঁহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না ! তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেল্‌তে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন্, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দত্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গাত্রে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার মতে আব্‌হাওয়ায় সর্দ্দি ততটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ুস্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচ্ড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিম্বের কুসুমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হরিদ্রা বা গরম-মশ্লা দিবে না। পরন্তু সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামচ গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ:—দুর্গন্ধ হইলে কৃষ্ণ লবণ ½ ছটাক ও হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ:—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দালচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর:—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

কৃমি:—কৃমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের গুরুত্বে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি-চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটী অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে ধরুন্; প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় করতে হয়, তাদের জন্যে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ল্যাভেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোরবেন ম'শায়! আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করতেছি—তারপর?"

রা। শুনুন্, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেঞ্জো, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্যে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপ্‌নি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটীর বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপ্‌নি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌চেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে!

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপ্‌নি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন্, সে আমার মতের সমর্থন করবে।

বন্ধু। হাঁ, সে খুব কম; অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক! আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন করছি না! আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্ম আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বন্ধু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন! ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বন্ধু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বন্ধু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন্, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বন্ধু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমশ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্য সঞ্চিত দু'এক পয়সা খরচ করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ করবে, আর নিজ-পক্ষ-রক্ষার জন্যে বলবে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্য এ সকল চাইই! কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়নিকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্য কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করলে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিত্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বন্ধু। সব সময় স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়! তাকে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি করতে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া করতে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাক্‌বে।

রা। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বল্‌ছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বসু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্‌ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হয়েও হচ্ছেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম্‌।

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিলা বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বরষের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক্‌ ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।
সুগন্ধ চন্দনে শিশির-কুঙ্কুমে
পবিত্র প্রসূন কোমল হারে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক্‌ সম্পদ্‌ আসুক্‌ শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক্‌ সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বলেতে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত লোক-মুখে বিবৃত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়! সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্য লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে —মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাঞ্ছা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি যুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের-তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্য যাত্রি-গণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন! পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থযাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনার চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত ভাবি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথার আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-চ্ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দ-যুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই, গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কেন বৃথা কর অনুরোধ,
শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
কা'র মিটে প্রবল তিয়াসা
'আঙ্গুর' 'আনার' 'বেদনায়' ?

সারা প্রাণে জ্বলিলে অনল
ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা !

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অরঘ সঁপিয়া
দূরে যাবে তিয়াসা ভীষণ।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় —নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল্, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতি-দানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহা-দের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশ-ভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ক্রটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়, লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাক্‌তে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী আমার! আমরা বজ্‌রায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুন্‌চি ওদিকে শীঘ্র রেল খুল্‌বে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাক্‌তে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাক্‌বে, আমি ভাল থাক্‌ব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্ছ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পূতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন-চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালী-নামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্কগ্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ত্বগুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্ত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর কর্ণদ্বয়ে দুই শিশু সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রচ্ছলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। বাহেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়াজাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন! এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কুল্লা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্ট-সিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিসার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৩৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইঁহারাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানা-স্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার বকযন্ত্র চোয়ানের কল অহর্নিশ চলিতেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্য-কর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটোল মাটি আছে সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটোল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল স্বাস্থ্যকর হয়, সেইজন্য কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের স্থানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তা'র অল্প অংশ আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক্ (চামড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ ফল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জল-প্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত জানিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন! দেহ গৃহ; কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয়? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায়!

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ!
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্য-তাম্॥ সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ লায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্‌কে গুণ গাওতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving: sing praise upon the harp unto our God:

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে-ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোণা রূপা কাল হায়, কঙ্কর্ পাথর হীর্। এক্ নাম মুক্তামণি, তাকো জপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও অভাবের অতি-রিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে নহি চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সখ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনরার আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ যাৎ হায়,
বিখয়ন্ সুঝে কাল।
কহেঁ কবির রে প্রাণিয়ঁ!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য সাম্লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবি সারাটি দিন ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে ঝাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্বস্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী-তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্‌ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর জনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজলক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানায় চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট" "বিষ্ণু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল!

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্‌্এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়ন-মণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে! ফসল যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায়! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভূমে একা সে কিরূপে থাকিবে! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেখানে ত বাবা নাই! সে যে মাতৃহারা বালক! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটী ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে!

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর জনৈক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাকবে; আমি তাকে দেখ্‌ব। আপ্‌নার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড়া বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে, গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনার ভাবনা কিসের? এমন ছেলে যদি এই পল্লী-গ্রামে বসে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্যা হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ-চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটী স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন! সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া! সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক্, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন;—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিটী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কস্মিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিটীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিটী আস্‌বার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আস্‌তে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার আদেশে

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাঁহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তকগুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থ-শালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, খোষা সংযুক্ত কুমড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" মৎস্যের ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্য-দেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্ট্রিকে'র আলো, ইলেক্ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুঞ্জে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম ভগ্নীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই;—আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত সুধীর দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না; আমি ঘোড়া হব! বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধীরের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী; জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষন্ন চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন স্বার্থক মনে কর্‌তুম! কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ ক্ষুদ্র পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
মালাটিকে ফেলে গেছ পাশে!

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
করি নাইআমি তোমা তরে!

ডাকৃছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব দরশনে!
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে!
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বস্‌বে যবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজ্‌বো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসেছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে?
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা,
একা আমি ভাব্‌ছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শণ করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—সার জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। সার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের বোনানজী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি থাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য ৬টী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— ,, ,, ।
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।
২। লীলা বসু—ডাওসেসন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— ,, ,, ।
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাট্যার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী, ময়মনসিং।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 652. December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫২ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!

কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,

ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"

বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,

হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,

হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;

হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।

কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,

ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?

দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।

ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।

কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,

ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?

ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।

কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। **স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।**

২´ ৩ ০ ১
-া II { ধা ধা -া। পা -া পমা। মা মা -া। মা মা -া I
ও ই ম হা ০ সি ০ ন্ধুর্ ও পা র থে কে ০

১
[পা -া -া]
সে ০ ০

২ ৩ ০
I মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -ণা } I
কি ০ ০ স ০ঙ্গী ০ ত০ ভে সে আ সে "ও ০ ই"

২´ ৩ ০ ১
I { -া -া পা। পা পা -ধণা। ণা ণা -া। র্সা ণা -া I
০ ০ কে ডা কে ০ ০ ম ধু র তা নে ০

১
[পা মা মমা]
লে আয় ওরে

২´ ৩ ০
I ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া } I
কা ত র০ প্রা ণে ০ আ য় চ লে আ য়

১
[-া না না]
০ ব লে

২´ ৩ ০
I মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র্ পা ০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না -া না। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সর্সা I
আ য় রে ছু টে ০ আ য় রে ত্ব রা হেথা

১
[র্রা র্রা র্সনা]
জ রা হে থা

২´ ৩ ০
I র্সা -র্রা র্সা। ণা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা } I
না ই কো মৃ ০ ত্যু না ই কো জ রা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সা -র্রা র্সা। ণা ধা -পা I
বা তা স্ গী ০ তি গ -ন্ ধ ভ রা ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা -ধপা। মা -গা রা। রা মা গা। রা রা রা } I
চি র ০ ০ স্নি ০ গ্ধ ম ধু মা সে হে থা

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
চি র ০ শ্যা ম ল ব সু ০ ন্ধ রা ০

১
[-া ম্ম সা]
০ কে ন

২´ ৩ ০
I র্সর্া -র্সা -ণা। ধা -পা পা। পা ধা -া। পা -ধণা ণা II
চি র • জ্যো ৎ স্না নী লা ০ কা ০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I রা রা -া। রা রা -গমগা। রা রা -া। ঋা রা রসসা I
ভূ তে র বো ঝা ০ ০ ০ ব হি স্‌ পি ছে ভূতের

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া। মা মা -া। মা মা -পধা। পা মা মমমা I
বে গা র খে টে ০ ম রি স্‌ ০ মি ছে দেখ্ ঐ

২´ ৩ ০ ১
I { ধা ধা -া। ধা -া ধা। ধা ণা ধা। পা -া -া I
সু ধা ০ সি ০ ন্ধু উ ছ লি ছে ০ ০

১
[ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের

২´ ৩ ০
I পা -ধা পা। মা -া গা। মা ধা পা। ধা ধধা র্সা } I
পূ ০ র্ণ ই ০ ন্দু প র কা শে দেখ্ ঐ

২´ ৩ ০ ১
I র্সা সা -া। নর্সা র্সা -া। ণা ণণা -া। ধা ধা -া I
বো ঝা ০ ফে লে • ঘ রের্‌ ০ ছে লে ০

১
[-া না না]
০ কে ন

২´ ৩ ০
I পা ধা পা। মা গা -া। মা ধা -া। পধা -ণা ণা II
আ য় চ লে আ য় আ মা র পা০ ০ শে

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। না না -র্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০ গৃ হে • আ ছি স্‌ ব ন্ধ ওরে

১
[র্রা র্রা র্সনা]
অ ন্ধ ওরে

২´ ৩ ০
I র্সর্রা র্সা -ণা। ধা পা -ধপা। মা পা -র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা } I
ও রে -০ মূ ঢ় • • ও রে • অ ন্ধ • •

২´ ৩ ০ ১
I { না না -া। র্সা -া র্সা। র্সর্রা র্সা -ণা। ধা -পা পা I
সে ই • সে ০ প র মা ০ ন • ন্দ

১
[রা রা রা]
সে কে ন

২´	৩	০	১
I পা পা -ধণা।	ধা পা -মগা।	রা গমা গা।	রা -া -া} I
যে আ ০ ০	মা রে ০ ০	ভা ল ০ বা	সে ০ ০
২´	৩	০	১
I মা মা -পা।	পা পা -া।	মা পা -র্সা।	র্সা র্সা -া I
ঘ রে র্	ছে লে ০	প রে র্	কা ছে ০
২´	৩	০	১
I র্সর্রা র্সা -ণা।	ধা পা -া।	পা ধা -া।	পা -ধা ণা II II
প ড়ে ০	আ ছি স্	প র ০	বা ০ সে

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে দাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,— !" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে সাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পুঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্‌মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন্, আজ আমার জন্যে আপ্‌নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন; —বিশেষ আপনি......! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাকলে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন্, আপ্‌নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্‌নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্‌—ভুলে যান্‌! সংসারের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্‌ ঐ জন্যেই ......?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ করলুম কি? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্‌; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্‌? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্‌, যে রাস্তার, যে ধূলোর উপর ভগবান্‌ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধুলোর. উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্‌; তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্‌! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুরসুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্‌ সাহসে মুখ উঁচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচান্তঃকরণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁট হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।...... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তার-পর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্-মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার স্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চির-দিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতনবাহী স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলো-ড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহো-জ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ!

কাপড় ছাড়্‌তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাব্‌ছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্‌ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?......না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্ন-দাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সাম্‌নে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়্‌বে?"

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হঁা, হঁা; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!......কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!...... থাক্‌, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্‌ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জ্বল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাঁহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি —?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "স্মিথের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? প্রকাণ্ড বোকা তুই!......আচ্ছা; বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,...... ।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্‌দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোঁড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে দেখা আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ রে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি—।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল দুয়ার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটায় কি বড়ই লেগেছে ?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

সমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝখান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.........।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্য্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্মিথের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—"ওঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দর্‌কারী কাজের হাতটা আজ্‌কা জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে খানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম্; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!···বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে ?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি ? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার···! শোন নি, দিদি ?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্ ?—"

বিমল বলিল, "সমি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে স্যুট্ করে নিঃশব্দে পিট্‌টান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখস্বস্তি ত ষোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো! রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভোঁচ্‌কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে কর্‌লুম্‌, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্‌ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেরাদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্‌ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্‌ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস্‌, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্‌ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁস্‌পাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্‌। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তাঁ'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম ঢেউ সশব্দে তাহার উপরে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্যুপরি ঝাপ্টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গতাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিক্‌টা তলাইয়া বুঝিবেন না; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুন্ন হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাঁধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলায়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চুণে-হলুদ্ গরম কর্‌তে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চুণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—."

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি কর্‌ছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "'টাই'য়ের নমুনার জন্যে! কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাঁস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাঁট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্মিথের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাঁস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌঁছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্ঝনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাঁসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌঁছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মূলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উছাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগ্‌লি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়; তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্য বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্য জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, সারাজীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে:—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিব-রাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সঙ্ক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া ল'ন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহো-বাগ্লোরকালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচরসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহা-দিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না। তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্য দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক জনৈক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম-পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি পয়স্বিনী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হুগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখানকার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হুগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অরুন্তুদ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী; তাহার উপর অকৃতদার। সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না ধরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহা-দিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও রাসের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভ-পুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজ-ধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তটীকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈব-শক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধা-বল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে

দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৪টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ক্রস্ ও ইঁট বহুল পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছলিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া দ্বার হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ খনে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধার শশীটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে তোষিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ খনে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল বান?
তুমি কি হে বঁধু, লুঠেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে।
সুপ্ত এ জীবন, লুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে লহরে লহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্দরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

দরবেশ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মনসুরের জীবনে সাদৃশ্য।

* ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন!

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মনসুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাঠিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একই আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মনসুরও যিশুর ন্যায় অনল হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ;—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল হক্ (অহং ব্রহ্ম')।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম! আমরা ইহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহাঁর মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অমরত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর!
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জ্বল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ক্রটি ভাবে অনুক্ষণ।

হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাহ্য সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজোদয় আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশুপুত্র সুধীর খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন। কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভানু?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই যত্ন করিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আস্‌তে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা লক্ষ্মী দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাকে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত,"হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন্, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তুকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তুক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপ্নি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আস্‌ব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি! ছি! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না! অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উদ্বিগ্ন

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গ-মাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাক্‌বে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুন্‌তে আমার ভয় করে। আমি যেন জন্ম-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর জন্য এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার সে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে যে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির;
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটী স্বয়ং না দেখিবেন, সেটা অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি ব না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যূষে ঘোড়ার দানার সিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা জৈ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, লুসার্ণ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকুরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আব্‌হাওয়ার অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যজ্য।

এক্ষণে অশ্বরথীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি কচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুঁটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সম্ভাষি' কহে গরুর গাড়ীরে
"ধিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"
বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

বাংলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন! আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাংলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অশুভ আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও তুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। তুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটী বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে কর্‌তে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়।—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই!"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ, সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। তাই সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবাবুকে এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুট্‌বে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"

অতুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, হ'বার যো নেই কেন? আমি সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী দিয়েছিলুম। এই দেখ, তিনি আমাকে লিখেছেন, মেয়ে পছন্দ হ'লেই তিনি বিয়ে দেবেন। টাকা তিনি চান্ না। বিভাকে দেখে কা'র পছন্দ না হবে? তবে আর হবে না কেন, মা?"

মাতা বলিলেন, "তার জন্যে নয়! ওরা যে বঙ্গজ কায়েৎ। ওদের সঙ্গে কি আমাদের চলিত আছে? তা' থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি?"

অতুল শুনিয়া মনে করিল ও-কথাটা কাজের কথাই নয়! তাই সে বলিল, "হ'লেই বা বঙ্গজ; তাতে দোষ কি? আমি জানি ওদের বংশ ভাল। আর অমন ছেলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবে না। ও-সব বঙ্গজ কঙ্গজ রেখে দাও। সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দাও যে, মেয়েটা সুখে থাক্‌বে! তা না হয় ত, তোমার আর দু'মেয়ের মতন বুড়ো মাতালের হাতে প'ড়ে মর্‌বে দুঃখে।"

মাতা-পুত্রে যখন এই সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন অতুলের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা-পুত্রের কথার কিয়দংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অতুল?"

অতুল পিতার কাছে সমস্ত বিষয় বলিল এবং সুধীরের সহিত বিভার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দিন্; বিভা সুখে থাক্‌বে!"

অতুলের পিতা সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন; শুনিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে?—আমরা হলুম্ দক্ষিণ-রাঢ়ী, ওরা হ'ল বঙ্গজ; ওরা ত আমাদের চল্‌তি ঘর নয়।"

অতু। চল্‌তি আর অ চল্‌তি কি! বাবা! চলালেই চলে যায়। ওরাও কায়স্থ ত বটে! আর বংশও সৎ। তবে আর এতে দোষ কি?

দোষটা যে কি তাহা অতুলের পিতা জানেন না। শুধু অতুলের পিতা কেন? কেহই তাহা জানেন না। তথাপি একটা ব্যর্থ দলাদলি লইয়া সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না।

অতুলের পিতা বলিলেন, "তা কি হয়? যা কখন হয় নি, তা কেমন করে কর্ব্বো?"

অতুল বলিল, "বাবা, এইটেই আমাদের মহা ভুল। আর এই দলাদলিতেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে এত বেগ পেতে হয়। ভারতে আমাদের স্বজাতির সকলশ্রেণীর মধ্যে যদি বিয়ের চল্‌তি থাক্‌ত, তা'হলে আর বরপণের এত পীড়াপীড়ি হ'ত না। এতে ত কোন দোষ নেই বাবা! সুধীরের সদ্বংশে জন্ম। সুধীরের বাপ্ অতিসজ্জন। এমন ছেলে আপনি পাঁচহাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবেন না।—আর অমত কর্‌বেন না; দিয়ে দিন্। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে। লোকের নিন্দার ভয়ে, মেয়েটার এমন ভাল বিয়ের সুযোগ ছাড়্‌বেন না।"

অতুলের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অতুল এতক্ষণ মনে মনে ভগ্নীর কত

সুখের কল্পনা করিতেছিল! এমন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল! এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্ব্বেন না; দিয়ে দিন্! লোকে নিন্দা কলেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছেলেদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গ্রাহ্য নেই! আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বঙ্গজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাক্‌বো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদাহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার এ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র! এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির লোলুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কার্‌বার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলীর বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌চি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথবাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডোল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যেন একটা মাধুর্য্য মাখান দেখিলেন। বুঝি, এমনটী আর নাই।

সুধীর নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া একটু আপত্তি করিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা গরিব; বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজ্‌বে না। এ বিয়েতে কাজ নেই।" কিন্তু হরনাথবাবু "না" বলিতে পারিলেন না। একে ত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর লীলার সেই স্নেহমাখা কোমল মুখখানি বৃদ্ধের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লীলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিতেছিল।

বিধাতার ভবিতব্যতাই বলুন, আর লীলার কর্ম্মফলই বলুন, শ্রীমান্ সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতাতেই উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরে হরনাথবাবু পুত্র ও পুত্রবধূ স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "লীলা এখন নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার ঘরে কেউ নেই; সে কা'র কাছে থাক্‌বে? একটু বড় হোক্, নিয়ে যাবেন। সে ত এখন আপনারই হ'ল; যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন; তার জন্যে আর কি? এখন যদি সেখানে গিয়ে ওর মন না টেকে—কাঁদাকাটা করে—তা হ'লে একটা অসুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর আপনিও তা'হলে বিপদে পড়্‌বেন।"

হরনাথবাবু অধিক পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; ক্ষুণ্ণমনে একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামের লোকে বধূ দেখিবার জন্য তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি তাহাদের অনেক বলিয়া কহিয়া শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহার এত আদরের সুধীরের বৌ, তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ, সে বধূ তাঁহার গৃহে আসিল না; এ কি প্রকার বিবাহ হইল! মুখেত অবিনাশবাবু খুব সৌজন্য দেখাইলেন; ভিতরে কি তাঁহার কিছুই নাই? সকলই কি মুখ-সর্ব্বস্ব? কেবল খোসা-ভূষি সার! সুধীর ত বলিয়াছিল, "বড়লোকের মেয়ে গরিবের ঘরে সাজ্‌বে না।" সত্যই কি শেষে সুধীরের কথা কার্য্যে পরিণত হইবে? কেনই বা তবে তিনি সুধীরের কথা না শুনিয়া বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন? কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করা বৃথা! কার্য্যশেষে অনুশোচনায় কোনও লাভ নাই।

(৯)

দেখিতে দেখিতে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে হরনাথবাবু আরও দুইবার লীলাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ দুইবারও নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া অবিনাশবাবু লীলাকে পাঠান নাই।

এদিকে সুধীর যখন এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে কত নিরীহ যুবককেও শ্রীঘরবাস করিতে হইয়াছিল! দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল!

সুধীর একে মেসে থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তাহাতে সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সুতরাং, সে যে একজন 'এনার্কিষ্ট'-দলভুক্ত—ইহা পুলিশ-পুঙ্গবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুধীর কারারুদ্ধ হইল। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য অবিনাশবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ সুধীরকে অপরাধী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইল না। কিছুদিন কারাবাসের পর সহৃদয় বিচারপতি সুধীরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুধীর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সেবার পরীক্ষায় সে এম-এতে নিম্ন স্থান অধিকার করিল, ও আইনে 'ফেল' হইল। তাহার পর মনের কষ্টে সে পিতার নিকট দেশে চলিয়া গেল।

মানুষের সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিক্ হইতেই অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সুধীর গৃহে আসিয়া দেখিল, পিতা পীড়িত। সেই জীর্ণশীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহে তাঁহাকে গৃহের অনেক কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। তাহা দেখিয়া সুধীরের বড় কষ্ট হইল। তাহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে বিবাহ করিয়াছে কি জন্য? স্ত্রীটী দেবতার মত অদৃশ্যে থাকিবে, আর সে সেই স্ত্রীর ধ্যানে জীবনাতিপাত করিবে বলিয়া? না, বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়া? সে ত পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রী যদি তাহা না করিল, তবে সেরূপ স্ত্রীতে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। হউক্ না, সে ধনাঢ্যের কন্যা। দরিদ্রের পুত্রবধূ—দরিদ্রের স্ত্রী ত সে বটে? কেন সে তবে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না? সুধীর মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি তাই শিখেছি। ঘরের কাজ করতে কখনো শেখান নি, আমিও তা শিখি নি যে, আপনার একবিন্দু সাহায্য করি। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন, তা আর আমি সহ্য করতে পার্ব্বো না। আর এখন আমার চাকরিও কিছু হয় নি যে, একজন রাঁধুনি রাখতে পারি। আপনি এক কাজ করুন,—একবার কলিকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন।"

হরনাথবাবুরও কি সেই ইচ্ছা নহে যে, পুত্রবধূটী আসিয়া তাঁহার এ নির্জ্জন গৃহখানি জনপূর্ণ করিয়া তোলে? তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না যে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূ একমুষ্টি ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়? কিন্তু কি করিবেন! সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি না বুঝিয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিধিলিপি অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, বাবা, বেহাই বউমাকে পাঠাবেন না। মিছে আনতে যাব। সে আসবে না। সে বড়লোকের মেয়ে।" সুধীর মনে মনে বলিল, সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম—তখন শুনলেন না! কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া পিতার মনে কষ্ট দেওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। তাই সে বলিল, "কেন আসবে না? হোক্ সে বড় লোকের মেয়ে। গরিবের বউ ত হয়েছে?

আর এখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নেই যে কাঁদাকাটার ওজর দেখাবে। আপনি একবার যান্, দেখেই আসুন না কেন, কি বলেন। এবার যদি না পাঠান, তা হলে যা'হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না। চিরকাল বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কর্ব্বে, এমন কোনো লেখাপড়া করে ত আপ্নি আমার বিয়ে দেন নি!"

হরনাথবাবু বুঝিলেন, সুধীরের একান্ত ইচ্ছা বধূটীকে লইয়া আসা। তাই তিনি আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বধূ আনিতে কলিকাতায় গেলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু কন্যা পাঠাইতে এবারেও অসম্মতি জানাইলেন। অধিকন্তু বৈবাহিককে বেশ "মিঠে-কড়া" রকম দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। হরনাথবাবু আর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুধীর একে পূর্ব্ব হইতেই পত্নী ও শ্বশুরের উপর চটিয়াছিল; এবার তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্ত্রীকে আনিতে স্বয়ং যাত্রা করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকাঙ্ক্ষা।

সকলি দিয়াছ প্রভু,
আর কিছু নাহি বাকি;
তবুও ভিখারী হয়ে
ও-চরণে আশা রাখি!
সঙ্কল্প বিকল্প শত
পলে পলে রহে জাগি;
পথহারা হয় ভ্রমে;—
চিত্ত দীন কা'র লাগি!
আশার আলোক ফুটে;
নিরাশা নিভায় বাতি।
চেয়ে থাকি কা'র পানে!—
কবে পোহাইবে রাতি!
আসক্তি কঠিন পাশ,
ছিঁড়িবে কাহার বলে?
মান অভিমান সব,
ভেসে যাবে কোন্ জলে?
সুখে দুখে নির্ব্বিকার
কর এই চিত্তভূমী,
বাঞ্ছিতের এ আকাঙ্ক্ষা
পূরাও জগৎ-স্বামী!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।—শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পঞ্জাবশাখার সেক্রেটারী। তিনি পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা হইতে প্রতিনিধিও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে চাহেন:—(১) পঞ্জাবের নারীদের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) পঞ্জাবে যে-সকল নারী বর্ত্তমান সময়ে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

(৩) বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া অভাবগ্রস্ত বিধবাদের জন্য আশ্রম-স্থাপন এবং প্রত্যেক বিধবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) হিন্দুবিধবাদের স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধির প্রণয়ন।

(৫) ভারতের বিবাহিতা নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, বিবাহিত ভারতীয় পুরুষ কোন ইংরাজনারীকে বিবাহ করিলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

(৬) ভারত-নারী আইন বা অন্য যে কোনও ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মিউনিসিপাল বা অনুরূপ সকল নির্ব্বাচনে ভারতনারী অধিকার পাইবেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যত অনুষ্ঠান আন্দোলন আছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারত-নারীদিগকে গ্রহণ করা হউক্।

(৯) ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে বালিকাবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হউক্।

(১০) বিদেশের মহিলাদের স্থলে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিদর্শন-এজেন্সী গঠিত হউক।

(১১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে উপদেশ দিবার জন্য মহিলা 'এড্‌ভাইসরী বোর্ড' গঠিত হউক।

(১২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মত ঐ মহিলাবোর্ডকে পদগৌরব অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক্।

২। মহিলা প্রতিনিধি—ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণের ১৮ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ নগরে ভারত-সচিবের সহিত দেখা করিবার কথা। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী শ্যামলা নেহরু, শ্রীমতী মোহানি ও মিঃ মহম্মদ আলির জননী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাধ্যতামূলক বালিকা-শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মহীশূরে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার-কল্পে বহু সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

৪। ইংরেজ মহিলাদের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পরীক্ষা।—গেজেটেড্ অফিসারদের স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ও উর্দ্দুর পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীদের ১০ টাকা ফি দিতে হইবে। উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোনও পুরস্কার পাইবেন না।

৫। ব্রিটিশ নারীদের কর্ম্ম-শক্তি।—ব্রিটনে এখন ৪৭½ লক্ষ নারী যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২॥ লক্ষের অধিক সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার নারী গোলাগুলি নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরে কার্য্যক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬। নৌ-সৈন্য-বিভাগে নারী।—ইংলণ্ডের

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উপকূলবিভাগে নৌ-বিভাগীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নারীর দ্বারা একটি দল গঠন করিয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কার্য্য, পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধান। গত মেট্রি-কুলেশন, আই-এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়াতে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রেজেষ্টারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনা-রলের পার্সোনেল এসিষ্টাণ্ট, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সৎকার্য্যে দান।—বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন হোমের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীমতী হরিমতি দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০৲ টাকা এবং ঐ গৃহে একটি রোগী রাখিবার আংশিক ব্যয় বাবদে ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, (পূর্ব্বদ্বার) হইতে শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ১১শ-স্থানীয়। ইহার মূল্য ॥০ মাত্র।

গ্রন্থখানি বৈদিকযুগের "ওঁ পিতা নোঽসি" —(তুমি আমাদিগের পিতা)—এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চের স্বাভাবিক অনভিব্যক্ত পিতৃভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ যে-ভাবকে সর্ব্বাগ্রে "পিতা নোঽসি"—তুমি আমাদিগের পিতা— এইবাক্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সেই পিতৃভাবে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে প্রাণময়ী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জগৎপাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জ্ঞানদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ তাঁহার মঙ্গলময় প্রলয়ে তাঁহাকে রুদ্র-রূপে দর্শন করিলেও, ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াও আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ বলিয়া আমাদিগের পিতা এবং ঈশ্বর শুভদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভগবানের সৃষ্টি-, স্থিতি- ও প্রলয় বিধানে, সর্ব্বত্র বিচিত্র সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পিতৃরূপে অবলোকন করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সান্নিধ্যো-পলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ হয়, তাঁহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ঈশ্বরোপাসনার যথেষ্ট সহায়তা হয়। ঈশ্বরোপাসক, ধর্ম্মার্থী, সকল নরনারীর ইহা প্রভূত উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মপরিবারে ইহা পঠিত হউক, ও সকলের নিকট আদৃত হউক্।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 653. January, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৩ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৪। জানুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে

ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!

পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা

দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,

বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা

উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ;

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস্ মাগে,

গাহে তব জয় গাথা।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে

ভারত-ভাগ্য বিধাতা!

জয় হে, জয় হে, জয় হে,

জয়, জয়, জয়, জয় হে!

অহরহঃ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী;

হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী;

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।

হে চির-সারথি! তব রথ-চক্রে,

মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে,
পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল,
নত নয়নে অনিমেষে।
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি,
পূর্ব্ব উদয়-গিরি-ভালে ;
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য-সমীরণ
নব-জীবন-রস ঢালে।
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা ;
দারুণ বিপ্লব-মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
তব করুণারুণ রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা !
জন-গণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-দুঃখ-ত্রায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে জয় হে জয় হে
জয় জয় জয় জয় হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১

II সা রা গা গা । গা গা গা গা । গা -া গা গা । রা গপা মা -া I

জ ন গ ণ ম ন অ ধি না ০ য় ক জ য় হে ০

২´ ৩ ০ ১

I গা -া গা গা । রা -গা রা রা । ন্‌া -রা সা -া । -া -া সা -া I

ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ পা ০

২´ ৩ ০ ১

I পা -া পা পা । -া পা পা -া । পা -া পা পা । পা হ্মা ধা পা I

ঞ্জা ০ ব সি ০ ন্ধু গু জ্‌ রা ০ ট মা রা ০ ঠা ০

২´ ৩ ০ ১

I মা -া মা মা । গা -া গা মা । রা -মা গা -া । -া -া -া -া I

দ্রা ০ বি ড় উ ৎ ক ল ব ০ ঙ্গ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা -া গা গা । গা -মা রা রা । গা পা পা -া । মা -া মা -া I

বি ০ ন্ধ্য হি মা ০ চ ল য মু না ০ গ ০ ঙ্গা ০

২´ ৩ ০ ১

I গা -া গা গা । রা রা রা রা । ন্‌া -রা সা -া । -া -া -া -া I

উ ০ চ্ছ ল জ ল ধি ত র ০ ঙ্গ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I সা সা সা সা । সা -া সা -া । ন্‌া -সা রা -া । -া -া -া -া I

ত ব শু ভ না ০ মে ০ জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I রা রা রা রা । রা -া রা রা । সা -রা গা -া । -া -া -া -া I

ত ব শু ভ আ ০ শি স্‌ মা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা -া গা গা । রা -গা রা রা । ন্‌া -রা সা -া । -া -া -া -া I

গা ০ হে ত ব ০ জ য় গা ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা পা। পা -া পা পা। পা -া পা পা। র্মা ধা পা -া I
জ ন গ ণ ম ০ ঙ্গ ল দা ০ য় ক জ য় হে ০

২´ ৩ ০ ১
I মা -া মা মা। গা -া রা রা। ন্‌া -রা সা -া। -া -া -া -া I
ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I না না র্সা -া। না ধা না -া। -া -া পা পা। ধা -া -া -া I
জ য় হে ০ জ য় হে ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা রা রা। গা গা রা গা। মা -া -া -া। -া -া -া -া II
জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II সা সা সা সা। সা সা সা -া। ন্‌া রা রা রা। রা -া রা রা I
(১) অ হ র হঃ তব আ ০ হ্বা ০ ন প্র চা ০ রি ত
(২) প ত ন অ ০ ভ্যু দ য় ব ০ ন্ধু র প ০ ন্থা ০
(৩) ঘো ০ র তি মি র ঘ ন নি বি ড় নি শী ০ থে ০
(৪) রা ০ ত্রি প্র ভা ০ তি ল উ দি ল র বি ০ চ্ছ বি

২´ ৩ ০ ১
I সা রা গা গা। গা গা -া গা। -রা -গা মা -া। -া -া -া -া I
(১) শু নি ত ব উ দা ০ র বা ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০
(২) যু গ যু গ ধা ০ বি ত যা ০ ত্রী ০ ০ ০ ০ ০
(৩) পী ০ ড়ি ত মূ ০ র্চ্ছি ত দে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০
(৪) পূ ০ র্ব উ দ য় গি রি ভা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা -পা পা পা। -া পা পা পা। পা -না ধা পা। -া র্মা ধা পা I
(১) হি ০ ন্দু বৌ ০ দ্ধ শি খ জৈ ০ ন পা ০ র সি ক
(২) হে ০ চি র সা ০ র থি ত ব র থ চ ০ ক্রে ০
(৩) জা ০ গ্র ত ছি ল ত ব অ বি চ ল ম ০ ঙ্গ ল
(৪) গা ০ হে বি হ ০ ঙ্গ ম পু ০ ণ্য স মী ০ র ণ

২´ ৩ ০ ১
I মা মা -া গা । -া রা রা -া । ন্‌া -রা সা -া । -া -া -া -া I
(১) মু স ল্ মা ০ ন খৃ ০ ষ্টা ০ নী ০ ০ ০ ০ ০
(২) মু খ রি ত প থ দি ন রা ০ ত্রী ০ ০ ০ ০ ০
(৩) ন ত ন য় নে ০ অ নি মে ০ ষে ০ ০ ০ ০ ০
(৪) ন ব জী ০ ব ন র স ঢা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া সা সা । সা -া সা সা । ন্‌া -সা রা -া । -া -া -া -া I
(১) পূ ০ র ব প ০ শ্চি ম আ ০ সে ০ ০ ০ ০ ০
(২) দা ০ রু ণ বি ০ প্ল ব মা ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০
(৩) দুঃ ০ স্ব প্নে আ ০ ত ০ ঙ্কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
(৪) ত ব ক রু ণা ০ রু ণ রা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I রা রা রা রা । রা -া রা রা । সা -রা গা -া । -া -া -া -া I
(১) ত ব সি ং হা ০ স ন পা ০ শে ০ ০ ০ ০ ০
(২) ত ব শ ং খ ০ ধ্ব নি বা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০
(৩) র ০ ক্ষা ০ ক রি লে ০ অ ০ ঙ্কে ০ ০ ০ ০ ০
(৪) নি ০ দ্রি ত ভা ০ র ত জা ০ গে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -া গা গা । রা গা রা রা । ন্‌া -রা সা -া । -া -া -া -া I
(১) প্রে ০ ম হা ০ র হ য় গাঁ ০ থা ০ ০ ০ ০ ০
(২) সং ০ ক ট দুঃ ০ খ ০ ত্রা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০
(৩) স্নে ০ হ ম য়ী ০ তু মি মা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০
(৪) ত ব চ র ণে ০ ন ত মা ০ থা ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা পা। পা -া পা পা। পা -া পা পা। ক্ষা ধা পা -া I
(১) জ ন গ ণ ঐ ০ ক্য বি ধা ০ য় ক জ য় হে ০
(২) জ ন গ ণ প থ প রি চা ০ য় ক জ য় হে ০
(৩) জ ন গ ণ দুঃ ০ খ ০ ত্রা ০ য় ক জ য় হে ০

২´ ৩ ০ ১
I মা -া মা মা । গা -া রা রা । ন্‌া -রা সা -া । -া -া -া -া I
(১) ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০
(২) ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০
(৩) ভা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ • ১
I পা পা পা পা। পা পা পা -া। পা না ধা -া। পা -ৰ্ক্সা ধা পা I
(৪) জ য় জ য় জ য় হে ০ জ য় রা ০ জে ০ শ্ব র

I মা -া মা মা । গা -া রা রা । ন্া -রা সা -া । -া -া -া -া I
(৪) ভা • র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা • • • ০ ০

২´ ৩ • ১
I না না র্সা -া। না ধা না -া। -া -া পা পা। ধা -া -া -া I
(১,২,৩,৪) জ য় হে ০ জ য় হে ০ ০ ০ জ য় হে • ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা রা রা। গা গা রা গা। মা -া -া -া। -া -া -া -া II
(১,২,৩,৪) জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ • ০ ০ ০ •

গান।

চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে ;
যাঁহার দয়ার নাহি-ক সীমা,
আকাশ বাতাস গায় মহিমা ;
নদী বয় সাগর পানে
যাঁর প্রেমের টানে।

লুকায়ে গোপন বুকের মাঝে
জীবনে-মরণে বিরাম-কাজে,
সবায় টানে আপন পানে,
কভু বাধা না মানে ;
চেয়ে রও সেই একের পানে,
মনঃপ্রাণে যে তোমায় জানে ॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১০)

সুধীর চলিয়া যাইবার পর লীলা বড় কান্নাটাই কাঁদিল। নিজের শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া লুটোপুটি খাইয়া কাঁদিল।—"হা নির্দ্দয়, তুমি এত কঠিন! এত নিষ্ঠুরতা! প্রাণের বেদনা একটু বুঝিলে না! দাসী বলিয়া একটু অনুগ্রহ করিলে না! বিন্দুমাত্র—একটীকণা মমতা কি তথায় ছিল না! এত কি অপরাধ করিয়াছি যে, একবার ফিরিয়াও চাহিলে না?"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন লীলার হৃদয়ের আবেগ একটু প্রশমিত হইল, তখন সে মনে

মনে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। সে আগেই ভাবিয়াছিল, এবার তাহাকে লইতে আসিলে সে শ্বশুরবাড়ী যাইবেই; আর পিতার আপত্তি শুনিবে না। এতদিন লজ্জাবশতঃ কাহাকেও সে কিছু বলে নাই, কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিবেন না। শ্বশুর বারংবার লইতে আসিতেছেন, আর তাহার পিতা বারংবার তাঁহার অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন! কি অন্যায়! কেন তাঁহারা এরূপ অপমান সহ্য করিবেন? সুধীরের সহিত সে যাইবে, ইহা মনস্থ করিয়াই সে সুধীরকে ডাকিয়াছিল, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত সুধীর তাহার কোনও কথা না শুনিয়াই চলিয়া গেল। লীলা বুঝিয়াছিল, তাহার শ্বশুরকে দরিদ্র বলিয়া পিতা ঘৃণা করেন। কিন্তু সে দোষ কাহার? পিতা সমস্ত জানিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। যদি তাঁহার মনে এই সকল ছিল, তবে কেন বিবাহ দিয়াছিলেন? রমণীর পতিই সর্ব্বস্ব! পতিসেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম! পতি বিনা নারীজীবনে সুখ কোথায়? সেই পতিসেবা হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করা কি পিতার উচিত কার্য্য হইতেছে? লীলা ভাবিল, "এই ত তিনি এইখানেই আছেন। অনুনয়-বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়া একবার তাঁহাকে আসিতে লিখিব। তিনি আসিলেই তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইব। তিনি কি একবার আসিবেন না?" এই ভাবিয়া লীলা চক্ষু মুছিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

লিখিতে লিখিতে পত্রখানি অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া গেল। সেখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে আবার নূতন কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সেখানিও ঐদশা প্রাপ্ত হইল। সে যতই মনে করে সে আর কাঁদিবে না, ততই তাহার সযত্ন-বারিত রুদ্ধ অশ্রুধারা শত-ধারায় প্রবাহিত হয়। উপর্য্যুপরি কয়েকখানি কাগজ নষ্ট হইবার পর বহুকষ্টে একখানি পত্র সে প্রস্তুত করিল। যাহা মনে আসিল, তাহাই সে লিখিল। সে-পত্রে বর্ণবিন্যাস ছিল না, ভাষার প্রাচুর্য্য ছিল না; ছিল কেবল আসিবার জন্য অনুরোধ, এবং শতেকটা মাথার দিব্য।

ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত-করে লীলা পত্রখানি মুড়িয়া, একজন দাসীর হাতে দিয়া, তাহাকে তাহা গোপনে সুধীরের হাতে দিয়া আসিতে বলিয়া দিল।

দাসীটী লীলাকে মানুষ করিয়াছিল; সে লীলাকে বড়ই ভালবাসিত। লীলার কথা মত সে গোপনে পত্রখানি লইয়া চুপি চুপি সুধীরের বাসায় গেল। কিন্তু সেখানে গিয়া সুধীরের দেখা পাইল না। মেসের একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সুধীর বাড়ী গিয়াছে।

সুধীর বাটী হইতে আসিয়া বরাবর অবিনাশবাবুর বাটী আসিয়াছিল; 'মেসে' যায় নাই। তাই তাহার আগমন-বার্ত্তা 'মেসে'র কেহই জ্ঞাত ছিল না। তাহারা জানিত সুধীর বাটীতেই আছে।

লীলা পত্র প্রেরণ করিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া পত্র ফেরত দিয়া বলিল, "জামাইবাবু বাড়ী গেছেন; এখানে নেই।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবেন, কিছু শুনলি?"

"না বাবু, তা কিছু শুনলাম না!" বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

লীলা সুধীরের উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া

ধরিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অবলা রমণীর কান্না ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? কান্নাই নারীর সম্বল, কান্নাই নারীর বন্ধু! কাজেই জীবন-সর্ব্বস্ব তাহার সে কান্না কেহ দেখিল না, কেহ বুঝিল না। দুঃখীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ধনমত্ত বিলাসীর গৃহে কাহাকেও পাওয়া যায় না। ধনমদে মত্ত যে, দয়া মায়া, সমবেদনা, তাহার গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই লীলার কান্না কেহ দেখিল না; কেহ বুঝিল না। ধনমত্ত ধনকেই কেবল মাত্র সুখের উপকরণ মনে করে।

লীলা স্বামীর উপর অভিমান করিতে পারিল না। পিতার উপরেই তাহার রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু পিতাকে আর কি বলিবে? তাই তাহার অন্তরে যাহা উদয় হইতেছিল, সে তাহাই করিতেছিল। কিরূপে স্বামীর সহিত মিলিত হইবে, সে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। সে আবার উঠিয়া সুধীরকে পত্র লিখিতে বসিল। এবার পত্র লিখিয়া শিরোনাম লিখিয়া টিকিট আঁটিয়া ডাকঘরে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল।

পত্র লিখিয়া উত্তরের আশায় লীলা প্রত্যহ ডাকের মুখ চাহিয়া থাকে। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তবুও লীলার পত্রের উত্তর আসিল না। লীলা গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া, পথের পানে চাহিয়া থাকে। 'পিয়নে'র স্কন্ধবিলম্বিত 'ব্যাগ্'টী দৃষ্টি-পথে পতিত হইবামাত্র তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। যদি কাহারও পত্র লইয়া 'পিয়ন' বাটীর দ্বারে আসিয়া "চিঠ্‌ঠি" বলিয়া হাঁকিত, লীলা অমনি অস্থির হইয়া উঠিত। ঐ বুঝি তাহার পত্রের উত্তর আসিল! কিন্তু লীলার পত্রের কোনও উত্তর আসিল না।

একখানি একখানি করিয়া লীলা তিন চারিখানি পত্র লিখিল, কিন্তু তাহার কোনও পত্রেরই উত্তর আসিল না। তখন তাহার বড় ভয় হইল। সে ভাবিল, "তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? পিতার অপরাধে আমাকে এ কঠোর শাস্তি দান করিবেন? অহো! অবলার সর্ব্বস্ব-ধন, পতি-পরিত্যক্তা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?"

লীলা যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, ও দিকে তখন হরনাথবাবু পুত্রের সংবাদ না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রায় মাসাধিক হইল সুধীর লীলাকে লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে লইয়া যাইতে সমর্থ না হওয়ায় সে আর বাটী ফিরে নাই। পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ পুত্রের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় তিনি সুধীরের 'মেসে' সংবাদ জানিলেন। সেখানে তাহারা সুধীরের কোনও খবরই দিতে পারিল না। অবশেষে অবিনাশবাবুর কাছে গিয়া তিনি শুনিলেন, সুধীর তথায় আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই দিনই চলিয়া গিয়াছে। হরনাথবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুধীর বাটী যায় নাই, কলিকাতায় নাই, তবে সুধীর গেল কোথায়?

লীলা সব শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শ্বশুরের পায়ে ধরিয়া সে সকল কথা

খুলিয়া বলে; বলে, "ওগো, সে যে বড় অভিমানী! সে যে রাগ করে চলে গেছে! তোমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস গো, ফিরিয়ে নিয়ে এস! লীলার আরাধ্য দেবতাকে তোমরা খুঁজে এনে লীলাকে দাও।" কিন্তু মুখে কোনও কথা সে বলিতে পারিল না। লজ্জা আসিয়া বাধা প্রদান করিল।

(১১)

সুধীরের কোনও সংবাদ না পাওয়াতে অবিনাশবাবুও চিন্তিত হইলেন। সুধীর গেল কোথায়? অবিনাশবাবু "গোড়া কাটিয়া আগায় জল" বিস্তর ঢালিলেন। সুধীরের অনুসন্ধানের জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু সুধীরের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। প্রথমে তিনি পুলিশে সংবাদ লইলেন। সেখানে সুধীরকুমার রায় অমুক তারিখে নির্দ্দোষ প্রমাণ হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর তাঁহার নামে কোনও অভিযোগ নাই। সুধীরের বন্ধুবান্ধবের কাছে তিনি জানিলেন। তাহারা কোনও সংবাদই বলিতে পারিল না। পুলিশে ঘোষণা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, 'ওয়া-রেণ্ট' প্রভৃতি নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশের জন্য যে যে উপায় আছে, তাহার কিছুই করিতে ব্যতিক্রম হইল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি সুধীরের কোনও সংবাদ নাই! তখন অবিনাশবাবু স্থির করিলেন যে, সুধীরের মৃত্যু হইয়াছে। সেই যে সুধীর বলিয়াছিল, "মেয়েকে সুখী কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন।"—অবিনাশবাবু ভাবিলেন, সে কথার অর্থ আর কি হইতে পারে? হতভাগ্য যুবক ক্রোধভরে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে। নচেৎ এত অনুসন্ধানে কি তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যাইত না?

এই ভাবিয়া একদিন তিনি চুপি চুপি গৃহিণীকে বলিলেন, "দেখ, সুধীর ছোঁড়া, বোধ হয়, আত্মহত্যা করেছে। নইলে এতদিনে কোন রকমে না কোন রকমে তার কোনও খবর পাওয়া যেত।"

গৃহিণী এ-কথা শুনিয়াই 'দড়াম্' করিয়া আছাড় খাইয়া গৃহতলে পড়িয়া উচ্চ চিৎকারে পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন।—"ওগো, আমার লীলার কি হবে গো! লীলী আমার মাছের মুড়ো নইলে ভাত খেতে পারে না যে গো!—সে দুধের মেয়ে নিরিমিষ্যি ভাত কেমন করে খাবে গো!"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবিনাশবাবু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা এ-কথা জানিতে পারে। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ!—চুপ কর না, ছাই;—অত চেঁচাচ্ছ কেন? এখুনি লীলী শুনতে পাবে!"

অবিনাশবাবু চুপ করিবার জন্য গৃহিণীকে যতই অনুরোধ করিতে লাগিলেন গৃহিণীর সুর ততই পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল! "ওগো আমি কি করে চুপ কোর্ব্বো গো?—আমার লীলী থান পরে বেড়াবে, আমি কেমন করে তা দেখ্ব গো! আমি তাকে গয়না খুলতে দোবো না গো!"—ইত্যাদি ইত্যাদি—।

অবিনাশবাবু গৃহিণীকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অবিনাশবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুধীরের

কল্পিত মৃত্যুর কথাটা যেন লীলা জানিতে না পরে। কিন্তু কথাটা লীলার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। গৃহিণীর কান্না শুনিয়াই মোহিনী দাসী অঞ্চল-দ্বারা চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া লাল করিয়া লীলার কাছে গিয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "আহা দিদিমণি গো কি সর্ব্বনাশটা হ'ল গো! আহা এও পরমেশ্বরের মনে ছিল গো!"

লীলা চমকিত হইয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি!—কি!—কি হয়েছে? অমন কচ্ছিস কেন?"

দাসী। আহা! এও তোমার কপালে ছেল?

কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় লীলার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

দাসী পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "আহা আমি সে-কথা কেমন করে মুখে আন্‌ব গো—!"

লীলা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তোর পায়ে পড়ি, মোহিনি, বল্‌ কি হয়েছে?"

কথাটা বলিবার জন্য মোহিনীর পেট ফুলিয়া দম্‌ আট্‌কাইতেছিল; কিন্তু কথাটা একেবারে বলিয়া ফেলা উচিত হয় না বলিয়া, বলিতে পারে নাই। লীলার আগ্রহ দেখিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আহা দিদিমণি! জামাইবাবু নেই গো! মা ঠাকরুন্‌ তোমার নাম ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে লেগেচে। আহা, তুমি যে বড় আদুরে মেয়ে গো! তোমার এমন দশা তানারা কি করে দেখ্‌বে?"

লীলার মস্তকে বজ্রপাত হইল। এরূপ দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। এমন সংবাদ যে শুনিতে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কথাটা শুনিয়া তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি, তাহার পায়ের নীচে হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। লীলা দাঁড়াইয়াছিল; মাথায় হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হইল না; হৃদয় ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বহিল না। কেবলমাত্র মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল! সে নির্ব্বাক্‌, নিশ্চল জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া মোহিনী ভীত হইয়া চলিয়া গেল।

কিছু পরে আর একজন দাসী আসিয়া বলিল, "আহা! এমন লক্ষ্মী মেয়ের কপালে এই ছিল গা! এই কচি বয়সে পোড়া কপাল পুড়্‌ল! হ্যাঁ দিদিমণি! জামাইবাবুর কি হয়ে ছেলো গা?"

লীলা কোনও উত্তর করিল না। উত্তর দিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। তাহার অন্তর-মধ্যে যে কি হইতেছিল, তাহা সেই জানে। অন্যে তাহা কি বুঝিবে?

গৃহিণী যখন জানিলেন যে, কথাটা লীলার অগোচর নাই, তখন তিনি মনে করিলেন, তবে আর লুকাইয়া কি হইবে? তিনি লীলার নিকটে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মানসে বলিলেন, "শুনেছ ত মা, জামাই মারা গেছেন। তা'র জন্যে তুমি মনে কোনো কষ্ট কোরো না! বিয়ে হয়েছিল ঐ পর্য্যন্ত;—কেবল আইবুড় নাম ঘুচেছিল বৈ ত নয়! শ্বশুর-বাড়ীর সুখ ত আর পাও নি! তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক; আমি তোমার কোনো কষ্ট রাখ্‌ব না। তোমাকে এক সুট জড়োয়ার গয়না গড়িয়ে দোব, হাতীবাগানের

বাড়ীখানা তোমার নামে লিখে দোব। তোমার কিসের ভাবনা ?”

লীলা মাতাপিতার এরূপ মমতাশূন্য রূঢ় কথা অনেক শুনিয়াছিল, অনেক সহ্যও করিয়াছিল। এবার সে সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করিল। নারীর সর্ব্বস্বধন স্বামী নাই, আর মাতা সেই কথা নিরুদ্বেগে বলিতেছেন! অর্থের লোভ দেখাইতেছেন! থাকুন্ তিনি তাঁহার অর্থ লইয়া। লীলা তাঁহার অর্থের প্রয়াসিনী নয়। লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, “যাও মা, আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না। তোমরাই আমাকে শ্বশুর বাড়ীর সুখে বঞ্চিত করেছ। আজ কি ছার অর্থের লোভ দেখাতে এসেছ! আমি তোমার অর্থের কাঙ্গালিনী নই।”

লীলার মুখে এ রকম কথা শুনিয়া মাতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। যে লীলা মুখ ফুটিয়া কখন একটী কথা বলে না বা বলিতে সাহস করে না, তার মুখে আজ এমন কথা! তিনিও রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন।

লীলা আপনার কক্ষে গিয়া সুধীরের সেই পরিত্যক্ত উত্তরীয়খানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল! “—কোথায় তুমি দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এস, একবার এস! ‘তুমি নেই’—এ কথা যে প্রাণে সহ্য হয় না! কে বলে তুমি নাই? না, না, তুমি আছ। আমি ত এমন কোনও পাপ করি নি যাতে বিধাতা আমার সিঁথির সিঁদূর মুছে দেবেন্। আমি তোমার পায়ে এমন কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক’রে যাবে! তুমি কি জান না আমার হৃদয় তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে পূর্ণ! তোমার ধ্যানে আমি মগ্ন! তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। আমার এ সাধনা কি সিদ্ধিলাভ কর্ব্বে না? এ তপস্যা কি নিস্ফল হবে? না, না, তা কখন হবে না। নারায়ণ সতীর সহায়। জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি যেখানেই থাক, আমি তোমাকে খুঁজে বা’র কোর্ব্বোই। তুমি যে দেশে যেখানেই থাক, আমি তোমার কাছে যাবই। তোমার চরণ ভিন্ন আমি ত কিছুই জানি না। তবে কেন আমি তোমার চরণদর্শনে বঞ্চিত হব?”

(১২)

কত বৎসর চলিয়া গেল! সুধীর আসিল না। অবিনাশবাবুর বাটীর সকলে সুধীরের নাম বিস্মৃত হইল; কেবল একজন হইল না। সুধীরের কথা, সুধীরের নাম লীলার জপমালা হইল। সুধীর কবে তাহাকে কোন্ মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, কবে তাহাকে আদর করিয়াছিল, কবে তাহাকে দেখিবার জন্য লুকাইয়া আসিয়াছিল, সেই সকল ভাবিয়াই সে দিন যাপন করে। লীলা আহার-বিহার, বেশভূষা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিল; কেবল সধবার চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর ত্যাগ করে নাই। তাহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, সুধীর বাঁচিয়া আছেই; এ সকল ত্যাগ করিলে স্বামীর অমঙ্গল হইবে। তাই সে এ-সকল ত্যাগ করে নাই। সে অধিকাংশ সময় নিজের কক্ষেই অবস্থান করিত। বাহিরের বাতাস, লোকের কলরব তাহার বিষাক্ত বলিয়া মনে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে বা বেড়াইতে যাওয়া সে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। পিতার এ সুখভবন তাহার কারাগৃহ বলিয়া অনুভূত হইত। লীলা

ভাবিত, 'বাবা বুদ্ধিমান্ হয়ে কেন এমন কাজ করলেন? কেন তাঁকে এমন কথা বল্লেন? যখন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছেন, তখন ত আমি তাঁরই। তিনি যেখানে থাক্‌বেন সেই আমার অমরাবতী। তিনি মেটে ঘরে বাস করেন;—আর আমি তাঁর দাসী! আমি কি সে ঘরে বাস কর্‌তে পারতুম্ না? তাঁর দাসী নাই? নাই বা থাক্‌ল? আমি কি তাঁর কাজ নিজের হাতে কর্‌তে পারতুম না? ঐ ত হরিদাসী, মোহিনী বাসন মাজে!—ওরাও মানুষ আমিও মানুষ, আমি কি আর বাসন মাজতে পারতুম্ না? আর রান্না?—সেটাত গৃহস্থমাত্রেই করে। হায়, আমি নিজের হাতে রেঁধে স্বামীকে শ্বশুরকে খাইয়ে কত সুখ পেতুম! হায়! কেন বাবা আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করলেন? রান্না, সকলকে খাওয়ান, এত মেয়ে মানুষের প্রধান ও প্রথম তৃপ্তিপ্রদ কাজ! লোকে মিছেমিছি কতগুলো রাধুনী রেখে কত অর্থনষ্ট ও অতৃপ্তির উৎপাদন করে! সে অর্থে কাঙ্গাল গরিবদের খাওয়ালে তাদের জীবনরক্ষা হয়। কেন তারা করে না? সুখী লোকে, বুঝি, দুঃখীর দুঃখ বুঝে না!' (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুখ-তৃষ্ণা।

তোমারে স্মরণ হ'লে
জাগে প্রাণে অনুতাপ!—
জনমি দুনিয়া 'পরে
করিয়াছি কত পাপ!
এ চিত্তের অবসাদ
ঘুচে যায় তব গানে!
কোথা হ'তে কুড়াইয়ে
তপ্ত প্রাণে শান্তি আনে!
সংসার-বাঁধনে আমি
সদা জড়াইয়ে আছি!
অটুট বাঁধন তাই,
হ'তে নারি কাছাকাছি!
যবে গো বিষাদ-মাঝে
নিরিবিলি থাকি বসে,
তখনি তোমার স্মৃতি
আঁখি-পথে আসে ভেসে!
তখনি গো উঠি কেঁদে,
তখনি গো তোমা চাই!
তখনি তোমার পদে
প্রাণ-ভয়ে মাগি ঠাই!
তখনি ভকতি আসে
করিবারে আবাহন।
কিন্তু কতটুকু সখা,
তোমা সনে আলাপন?
আকুল আবেগ ভরে
চাহি ঐহিকের সুখ।
কিছু না বুঝায়ে তুমি
দিলে মোরে সেই টুক্‌!
সেই যে তোমার সনে
হ'লো মোর পরিচয়;
আর না হইল; তুমি
পলাইলে দয়াময়!

চাহি ঐহিকের সুখ,
তুমি হলে নিরদয়;
ডুবিনু বিষয়-কূপে,
ভকতির হলো লয়!

সম্পদে পলাও তুমি,
ঘোর দুখে হলো ভুল!
বোঝালে না প্রভু তুমি,
আমি গো কাটিনু মূল!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী নদীয়া-জেলার পুরাতন রাজধানী। ইহা ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এ-স্থানের লোক-সংখ্যা ১০৮৮০; তন্মধ্যে ১০৪১৬ জন হিন্দু, ৪৫৭ জন মুসলমান এবং ৭জন খৃষ্টান। বঙ্গ-দেশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ-রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২০৩ খৃঃ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক সহরটী অধিকৃত হয়। এস্থানে সংস্কৃত-সাহিত্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া স্থানটী ভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের মীমাংসাই গৃহীত হইয়া থাকে। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দু-রাজগণ এস্থানে সংস্কৃত-শিক্ষার জন্য অনন্ত উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই এস্থানে সংস্কৃত চর্চ্চা এত অধিক। হাজার হাজার ছাত্র এখানে হিন্দুদর্শন শিক্ষা করিয়া থাকে। এস্থানের বহু ছাত্রই ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কয়েকটীর নাম—হলায়ুধ, পশুপতি, শূলপাণি এবং উদয়নাচার্য্য। ইঁহারা সকলেই লক্ষ্মণ সিংহের সমসাময়িক। অক্ষিরোধ যোগী নামে জনৈক পণ্ডিত হিন্দুস্থান হইতে সমাগত হইয়া নবদ্বীপে প্রথম তর্কশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। তর্কশাস্ত্র ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং গৌরাঙ্গ দেব ইঁহার বিখ্যাত ছাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি দীধিতি ও গৌতম-সূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্মৃতিতে ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রে খ্যাতিলাভ করেন। গৌরাঙ্গ বা চৈতন্য-দেব বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কারক হ'ন। চৈতন্য জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। তিনি ১৪৮৫ খৃঃ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য বৈষ্ণব-গণের নিকট নবদ্বীপ পরম পবিত্র স্থান।

বর্ত্তমান নবদ্বীপও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিখ্যাত। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নাম টোল। তথায় স্মৃতি ও ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন লইয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি টোলে নাই; বরং পণ্ডিতেরা ছাত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন। মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র টোল রাখিবার জন্য একশত টাকা মাসিক বৃত্তি দিতেন। তদবধি ঐ টাকা এখনও দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ১০০৲ টাকা ন্যায়ের প্রথম এবং ৬০৲ টাকা দ্বিতীয় এবং

৫০ টাকা স্মৃতির অধ্যাপককে দিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে একজন উত্তর-পশ্চিম-দেশস্থ পণ্ডিত দর্শন ও বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপের পঞ্জিকার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। তাহাতে ঝড়বৃষ্টির যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী থাকিত, লোকে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিত। দুঃখের বিষয় এই যে, জ্যোতিষের আচার্য্য এখন বিলোপোন্মুখ হইয়াছে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে বৈষ্ণবগণ প্রতি-বৎসর সমাগত হ'ন এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘী পূর্ণিমাতে তথায় মেলা হইয়া থাকে।

নদীর পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান নবদ্বীপের বিপরীতে বামনপুকুর নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় অনেকগুলি ঢিবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বল্লাল-ঢিবি নামে খ্যাত। এই স্থানে বল্লাল সেনের রাজভবন ছিল। স্থানটীতে বল্লাল-দীঘি নামে একটী সরোবরও আছে। এগুলির অস্তিত্বে ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে যে, বল্লাল সেন যেমন গৌড়ে বাস করিতেন, তেমনই তিনি এখানেও বাস করিতেন।

কলিকাতা অপেক্ষা নবদ্বীপের জল-হাওয়া অনেক পরিমাণে ভাল। পূর্ব্বে শরীর অসুস্থ হইলে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা এখানে শরীর সুস্থ করিতে আসিতেন।

নবদ্বীপে পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বক্রেশ্বর।

বক্রেশ্বর বঙ্গদেশস্থ বীরভূম-জেলার একটী গ্রামমাত্র। ইহা বক্রেশ্বর-নদীর উপর অবস্থিত। এখানে দেব-মন্দিরের মধ্যে শিবের মন্দিরই অধিক। বক্রেশ্বর একটী পীঠস্থান। সতীর কপালদেশ এখানে পতিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর অনেক যাত্রী এস্থানে তীর্থ করিতে আসেন।

এইস্থানের আখ্যায়িকা এইরূপ:-- একদা সুব্রত ও লোমশ ঋষি লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে উপস্থিত হইলে, লোকেরা পূর্ব্বে লোমশ ঋষির অভ্যর্থনা করে। তাহা দেখিয়া সুব্রত ঋষি ক্রোধ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান্। এই সময়ে তাঁহার ক্রোধ এরূপ সীমায় পঁহুছিয়াছিল যে, তৎ-প্রভাবে তাঁহার শরীরের অষ্টস্থান বক্র হইয়া গেল। তদবধি তিনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হইলেন। অঙ্গবিকৃতি সঙ্ঘটিত হইলে তিনি অতিদুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে শিবের আরাধনার জন্য সমাগত হন। এখানে তাঁহার প্রতি দেবাদেশ হয় যে, যতক্ষণ তিনি বঙ্গদেশের গৌড়-নামক স্থানের গুপ্ত কাশীতে আরাধনা না করিবেন, ততক্ষণ তিনি সফল কাম হইবেন না। অষ্টাবক্র ঋষি বক্রেশ্বরে আসিয়া দশ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া শিবের আরাধনা করেন। তখন মহাদেব সদয় হইয়া এই বর দেন যে, এখানে পূর্ব্বে যে অষ্টাবক্রের ও পরে মহাদেবের পূজা বরিবে তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হইবে। অষ্টাবক্র যেখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা আদিষ্ট হন্। তাঁহার উপর ইহাও আদেশ ছিল যে, মন্দির প্রস্তুত হইলে, তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি থাকিবে;—একটি অষ্টাবক্রের ও অন্যটী মহাদেবের। এখন মন্দিরের মধ্যে যে দুইটি

মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বৃহৎটী অষ্টাবক্রের।

বিশ্বকর্ম্মা যেখানে মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান মন্দিরের মধ্যে কোনও উৎকীর্ণ-লিপি নাই। উত্তর-পূর্ব্বদিকে বহির্দ্বারের উপর ত্রিকোণাকৃতি স্থানে যে লেখা দেখা যায়, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে শালিবাহন শকে (১৬৮৩) দর্পনারায়ণ নামে জনৈক ব্যক্তিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভিতর ভাগে প্রোথিত দুইটী প্রস্তরের হেতম্বর ও তরলাসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম এবং তৃতীয় প্রস্তরটীতে শালিবাহন শক (১৬৭৭) খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি রাস্তা ও গলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র মহাদেবের মূর্ত্তিই দেখা যায়। মূর্ত্তিগুলি অবশ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তীর্থ করিতে আসিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে তিনটী পুষ্করিণী আছে। সেগুলি সালকাটালি, চন্দ্রসাইর এবং দামুসাইর নামে খ্যাত। এখানে যে ব্রাহ্মণ তীর্থকৃত্যাদি করান, তিনি বলেন যে, উক্ত নামের ভদ্রব্যক্তি দ্বারা পুষ্করিণী খোদিত হইয়াছে।

দক্ষিণে একটি প্রস্রবণ অবস্থিত। সেখানকার জল উষ্ণ। অনেকগুলি বাটীও সেখানে দৃষ্ট হয়। প্রস্রবণ হইতে গন্ধকের ধূমরাশি সদাই উদ্গীর্ণ হইতেছে। এরূপ প্রস্রবণের সংখ্যা আটটী। তন্মধ্যে যেটী অত্যন্ত উষ্ণ তাহা অগ্নিকুণ্ড-নামে খ্যাত। এখানকার জলের উষ্ণতা প্রায় ২০০° ডিগ্রি। সিঁড়িদ্বারা স্নাতকগণ কুণ্ডে অবতরণ করে। এই জলে সর্প ও ভেক বহুল পরিমাণে মরিয়া থাকে। সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া জলে নামিতে হয়। জলটী উষ্ণ ও গন্ধকের ঘ্রাণবিশিষ্ট। সুতরাং ইহা কোনও বিশেষ রোগের উপশম করিতে সমর্থ। এখানকার প্রবাদ এই যে, শিব হতকাক্ষ পাতালে বাস করেন। তাঁহার মস্তকে সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিত। শিবের তেজে জলটী উষ্ণ হইয়া পৃথ্বীগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইতেছে।

প্রত্যেক প্রস্রবণের এক একটী আখ্যায়িকা আছে। অগ্নিকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, রাজা হিরণ্যকশ্যপ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদ কিন্তু কৃষ্ণভক্ত। এজন্য তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভুগিতে হয়। অবশেষে হিরণ্যকশ্যপের নির্য্যাতন হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ হিরণ্যকশ্যপকে বধ করেন। প্রহ্লাদ আপনাকে পিতৃবধের হেতু ভাবিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় পাপক্ষালনার্থ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নাত হইয়া শিবের আরাধনায় বিগতকল্মা হয়েন। এই জন্য অগ্নিকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাকে কামদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে মহাদেব-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন্। তখন তিনি স্বীয় পাপ-ক্ষালণার্থ ও শিবকে পরিতুষ্ট করিবার মানসে বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ মহাদেবের আরাধনায় পাপমুক্ত হন।

শ্বেতগঙ্গার প্রবাদ এই যে, বর্দ্ধমান জেলাস্থ মঙ্গলকোটের শ্বেতনামক জনৈক রাজা মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি এইবার প্রার্থনা

করেন যে কুণ্ডটী তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

সানভাগ্যকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ যে, হিমালয়ের কন্যা গৌরী মহাদেবের জন্য লালায়িত হইয়া বক্রেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক উক্ত কুণ্ডে স্নানকরণান্তর মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন্ ও পরে উভয়ের বিবাহ হিমালয়ে হয়।

সূর্য্যকুণ্ড-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, একদা নারদ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে সমাগত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের গুণগান করিতে লাগিলেন। সুমেরুর-গুণগাণ বিন্ধ্যের অসহ্য হইল। তখন তিনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন। সূর্য্য দুঃখিতান্তঃকরণে এখানে আসিয়া উক্তকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক মাহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যকে অবনত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন।

জীবনকুণ্ডের প্রবাদ এই :—পূর্ব্বকালে সরভ ও চারুমতি নামে দম্পতী বাস করিত। তাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন। সংসারে তাঁহাদিগের আপনার বলিতে আর কেহ না থাকাতে, তাঁহারা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটণে বাহির হইলে কালবশে ব্যাঘ্র আসিয়া সরভকে হত্যা করে ও তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক মাংস খাইয়া ফেলে। চারুমতি অতিদুঃখে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন্। শিব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলে,তিনি স্বামীকে পুনর্জীবিত দেখিতে প্রার্থনা করেন। তখন তাহার প্রতি আদেশ হয় যে, তুমি তোমার স্বামীর অস্থিগুলিকে একত্র করিয়া বক্রেশ্বরে গমন করতঃ জীবনকুণ্ডে অস্থিগুলিকে নিমজ্জিত কর, তবেই তোমার স্বামী জীবিত হইবে। চারুমতি তাহাই করিল। তখন তাঁহার স্বামীও পুনর্জীবিত হইলেন। এখনও অনেক রমণী স্বামীহীন হইলে স্বামীকে সঞ্জীবিত করিবার আশায় জীবনকুণ্ডে স্নান করে।

ভৈরবকুণ্ডের প্রবাদ এইরূপ :—ব্রহ্মা ও মহাদেবের পাচটী মুখ। তখন ব্রহ্মা ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শিবের সমকক্ষ। ব্রহ্মার প্রতিযোগিতায় শিব ক্রোধান্বিত হইয়া জটা হইতে একটী কেশ উৎপাটিত করিলেন। অমনি বটুক-ভৈরবের আবির্ভাব হইল। তখন শিব বটুক ভৈরবকে ব্রহ্মার উর্দ্ধমুখটী নখদ্বারা ছিন্ন করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল; কিন্তু ব্রহ্মার ছিন্ন মস্তকটী বটুক-ভৈরবের নখে লাগিয়া গেল। তিনি সর্ব্বতীর্থে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মুণ্ডটী তাহার নখ হইতে অপসৃত হইল না। তখন তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে কাশীতে সমাগত হইয়া শিবের আরাধনা করিলে, মুণ্ডটী নখ হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার ক্ষত-যন্ত্রণা গেল না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভৈরব পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইল। এইবার সে বক্রেশ্বরে আসিয়া ভৈরবকুণ্ডে স্নান ও পাপহরা নদীতে হস্ত ধৌত করাতে তাহার ক্ষত আরোগ্য হইল। ভৈরবকুণ্ডের পুর্ব্বদিকে পাপহরা নদী অবস্থিত।

খরকুণ্ডের প্রবাদ :—সত্যযুগে মহর্ষি অগস্ত্য সাগরকে উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার উদরের জল কিছুতেই বহির্গত হইল না। তখন তিনি বক্রেশ্বরে সমাগত হইয়া খরকুণ্ডে

স্নান-করণান্তর শিবের পূজা করিলে, তাঁহার উদরের জল বহির্গত হইল।

বক্রেশ্বরের পূজার জন্য ২৫ জন পাণ্ডা আছে। এখানে বৎসরে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির পূর্ব্বদিন হইতে মেলা আরম্ভ হয় ও তাহা প্রায় সাতদিন থাকে। এই মেলায় বিক্রয়ার্থ কাটোয়া হইতে কলা, পিত্তলের বাসন ও কলিকাতা হইতে মনোহারী দ্রব্য এবং বর্দ্ধমান-জেলার পাটাকোনা-নামক স্থান হইতে প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আসে।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলে পুরাতন কাশি আরোগ্য হয়। ইহা চর্ম্মরোগাপহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গঙ্গা-বন্দনা।

কোথা গো মা, হে জাহ্নবি ! এ অধমা
　　চায় স্থান !
এসেছি, মা, বড় আশে তোমাকে
　　সঁপিতে প্রাণ !
কুলুকুলু-কুলু-রবে কোথায় তুমি মা যাও !
পায়ে ধরি, মহাদেবি, আমাকে গো
　　কোলে লও !
পতিতে দাও মা, স্থান ; নাম তাই সুরধুনী !
পরমারাধ্যা তুমি ;—পুরাণে মহিমা শুনি !
স্মরিলে তোমার নাম, মহাপাপ কেটে যায় ;
দাও মোরে কোলে স্থান, রাখ মোরে
　　রাঙ্গাপায়।
স্রোত মাঝে বেয়ে যায় পাল-তোলা কত তরী,
দিই স্রোতে ভাসাইয়া আমার এ দেহ-তরী !
বহিছে তোমার বুকে প্রবল তরঙ্গ কত !
সতত দেখিতে সাধ তব পদ-কোকনদ !
শুভ্র কুসুমের মত তোমার ও মূর্ত্তি-খানি !
সতত বন্দি, মা, তোরে আমার আরাধ্যা জানি !

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

জাতীয় উন্নতিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

অনেকে মনে করেন, ছলে বলে কৌশলে বা শারীরিক বীরত্বে অন্যের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারিলেই জাতীয় উন্নতি হয়। কিন্তু তা হয় না। যদিও হয়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মহাবীর নেপোলিয়ন যে-সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সে সব রাজ্যের জাতিরা সকলেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইত। চরিত্রের বল, ধর্ম্ম-নীতির শক্তি, সত্যের প্রভাব যে জাতির উন্নতির ভিত্তিভূমি, অতীতকালের মহত্ত্বের অনুকরণ যে জাতির উন্নতির পরম সহায়, সে-জাতির উন্নতি বিশ্বজগতের ক্রমবিকাশের

নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিকশিত হইলেও চির অপ্রতিহত, অপরাজিত ও চির সম্মানিত থাকিবেই; সন্দেহ নাই। গ্রীস ও রোম যখনই বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল, তখনই অধঃ-পতনের মুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল! যখনই পুণ্যময় ভারতের চির-ধর্ম্মশীল জাতির কয়েক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতার মহাপাপ-পঙ্কে নিপতিত হইল, যখনই অতীতকালের মহত্ত্ব ভুলিয়া সুচরিত্র, ধর্ম্মনীতি ও সত্য হইতে স্খলিত হইতে লাগিল, তখনই জাতীয় অব-নতির চিহ্ন-সকল দেখা যাইতে লাগিল। যদি কোনও জাতিকে উন্নত হইতে হয়, তাহা হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে শারী-রিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হইতে হইবে। যেমন প্রত্যেক অঙ্গের সুস্থতাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তেমনি প্রত্যেক জাতির প্রতি-ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সজীবতাই জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সুস্থতা ও জাতীয় জীবনের লক্ষণ।

নরনারীগণের মধ্যে অনেকে মনে করেন, 'আমি দীন হীন অতিক্ষুদ্র; আমার জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, সৎকর্ম্মের ক্ষমতা নাই; আমার সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কি সম্পর্ক! আমি নীচ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন হইলেও বোধ হয়, জাতীয় উন্নতির কিছু আসে যায় না! কোথায় দেশদেশান্তর-ব্যাপী একটি জাতি!—তাহার মধ্যে আবার অসংখ্য প্রকৃতি, বর্ণনাতীত চরিত্র, গণনাতীত ধর্ম্ম এবং নীতি বিদ্যমান! এই বিপুল বিস্তৃতি, এই অপরিমেয় ধর্ম্মনীতি-চরিত্র এবং প্রকৃতির মধ্যে আমি কোথায়! আমি আমাকে ত খুঁজিয়াই পাই না! সেই আমি মন্দ হইলেও, চরিত্রগঠন করিতে না পারিলেও জাতীয় উন্নতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি?' এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের বিষম ভ্রম! একটী জাতিকে সুগঠিত, সুসংযত ও উন্নত্যোন্মুখ করিতে হইলে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি সে-জন্য দায়ী! কারণ, একটি বৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণকালে যদি একটী ইষ্টক বা প্রস্তর মন্দ থাকে, তাহাতে অলক্ষিত ভাবে সমস্ত অট্টালিকার ক্ষতি হয়। যদি একটী সুরম্য সুসজ্জিত প্রাসাদের কোনও এক অলক্ষিত স্থানে পূতিগন্ধময় কোন পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাসাদের বায়ু দূষিত হয়। যদি কোনও প্রকাণ্ড সতেজ মহীরুহে দুইচারিটী কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবেশ করে, তবে তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাকে শুষ্ক-কাষ্ঠাবশেষ করিয়া তোলে। যদি কোনে সবল সুকান্তি শরীরে দুইএকটী মারাত্মক কীটাণু কোনও ক্রমে প্রবিষ্ট হয়, ক্রমে সে শরীর দুর্ব্বল ও কান্তিবিহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য ভারতবর্ষীয় জাতিকে যদি উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীর কর্ত্তব্য :—নিজ নিজ চরিত্র গঠন করা। ধর্ম্মেতে নীতিতে, সুকর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে নিজ-নিজ চরিত্রকে, জীবনব্যাপী প্রকৃতিকে সুসজ্জিত, সমলঙ্কৃত ও জ্যোতিষ্মান্ করিতে চেষ্টা করা। মেধা, জ্ঞান ও অবস্থানুসারে সকলেরই ইহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি, তুমি, তিনি বা সে লইয়াই জাতি; জাতির অর্থ অন্য কিছু নয়। যেমন একটী একটী অণু লইয়া সমগ্র জড় জগৎ, একটী একটী জলকণা লইয়া মহাসমুদ্র, একটী একটী বৃক্ষ লইয়া মহারণ্য, একটী

একটী বালুকণা লইয়া মহা মরুভূমি. তদ্রূপ একটী একটী মানবকে লইয়া সমগ্র মানব-জাতি। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আবার হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার জাতি। জাতির মধ্যে কোনও পুরুষ যদি অসৎপথে পদার্পণ করিয়া অধঃপতনের মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই জাতির সকল পুরুষেরই মস্তক অবনত হওয়া কর্ত্তব্য; এবং নারীগণের মধ্যেও সেই প্রকার হওয়া উচিত। সকলেই জানেন, আমাদের প্রাচীন পিতা-মহীগণ বলিতেন, 'এক মেয়ের লজ্জা নয়, সহস্র মেয়ের লজ্জা।' সকলে মিলিয়া নিন্দার বাজার না খুলিয়া, যাহাতে সেই অধঃপতিত ভাই কিম্বা ভগিনী অধঃপতনের মুখ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব। যদি কেহ উদাসীনভাবে জীবন কাটান, কোনও উন্নতির চেষ্টা না করেন, তাঁহাকেও উত্তেজিত করিয়া, যাহাতে তিনি সকল প্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কি পরিবার, কি সমাজ, কি জাতি, সকলের পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দায়িত্ব আছে।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ও সুচ-রিত্রের জন্য দায়ী, তেমনি সে নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে জীবনকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত ও আদর্শস্থানীয় করিবার জন্যও দায়ী! এই ভারতবর্ষীয় জাতি-সকলকে যদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীকে যেমন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ও সভ্যতায় উন্নত হইতে হইবে, তেমনি প্রাচীন কালের ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের যে-সব বিষয়ে সারত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ও মহত্ত্ব ছিল, সেই সব বিষয়ের অনুকরণ করিতে হইবে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ়তা, রামচন্দ্রের বীরত্ব ও সত্য-পালন, হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ও সত্য-রক্ষা, যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং জনকের ন্যায় সংসারী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারতীয় নারীকেও ভারতের পুরাকালীন উচ্চশ্রেণীর নারীগণের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে হইবে। সীতার, সাবিত্রীর, দময়ন্তীর সতীত্ব, পাতিব্রত্য, ও সুনীতি; পদ্মাবতী প্রভৃতির ন্যায় ধৈর্য্য ও বিনয়; মৈত্রেয়ী ও গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরা যেন মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতে পারি, "যাহা লইয়া আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" আমরা যেন গান্ধারীর ন্যায় বলিতে পারি, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!" আমরা যেন ধ্রুবের মাতার ন্যায় বলিতে পারি, "জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা হয় নিবারণ, হেরিলে হৃদয়ে হরি পদ্মপলাশলোচন।" আমরা যেন সীতা-দময়ন্তীর ন্যায় বলিতে পারি, "জানিস্ না ওরে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন, সতীত্বের তেজ অগ্নি বিষম কেমন।" আমরা যেন রমাবাইয়ের ন্যায় বলিতে পারি, "রাজা স্বামী রাজ্য-সুখে কি হবে আমার, যদি না ভাবিতে পাই হরি সারাৎসার?" এইরূপ পুরা-কালীন ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর নরনারীগণের বহু প্রবচন, প্রবাদ-বাক্য, ও মহাবাক্য-সকল গ্রন্থাকারে, ও ভারতীয় নরনারীর হৃদয়-মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও সকল সময়ে,

সকল স্থানে, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সারত্ব ও মহত্ত্বের সম্মান-রক্ষা, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। পুরাতন-পত্রবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ বৃক্ষেও যদি তাহার জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বসন্ত-সমাগমে তাহাতে আবার নব নব কিশলয় ও নব নব ফলপুষ্প উদ্গত হইয়া চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতে থাকে। তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠবৎ পুরাতন মহত্ত্ব-বৃক্ষেও যদি জীবনী শক্তি বিদ্যমান থাকে, যদি জাতীয় প্রত্যেক নরনারীর ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানরূপ সারাংস ও রস তাহার অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে একদিন সুসময়ে তাহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতারূপ নব কিশলয় ও ফলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে বিমোহিত করিবেই!

হে সকল উন্নতির মূলশক্তি! মঙ্গলময় বিধাতঃ! জাতীয় উন্নতির জন্য যে প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নত, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, বিদ্বান্, সভ্য ও পরোপকারী এবং তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে, ইহা যেন আমাদের প্রত্যেকের মনে নিয়ত জাগরূক থাকে। আর আমরা যেন পুরাতনকে ভুলিয়া না যাই এবং নূতনকেও অগ্রাহ্য না করি; যেন আমরা নূতন ও পুরাতনের সম্মিলিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবতার ন্যায় হইতে পারি। যেন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি, পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান, বিনয়, সেবা ও সচ্চরিত্রতায় এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় নিজ নিজ জীবনকে সংগঠিত করিয়া জাতীয় উন্নতির সহায়তা করিতে পারি। পুরাতন লোকচক্ষুর অতীত স্থানই যে নূতন মহাসৌধের ভিত্তিভূমি, ও নূতনের চাকচিক্যই যে আশা, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের জীবন এবং সর্ব্ববিষয়ে নূতন ও পুরাতন উভয়ের সারাংশের গৌরব রক্ষা করিয়া চলাই যে জাতীয় উন্নতির পরম সহায়তা, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই! এই তোমার কাছে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।

ব্যথার দিনে

আমি নিবিড় ব্যথার বিপুল বোঝাটি
যখন বহিতে থাকি,
তুমি পথটির পাশে কাশের বনেতে
লুকাইয়া মার উঁকি!
ওগো কেন, ওগো কেন?
সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াতে
কেন লাজ-বাস হেন?
না-হয় আমারে দিয়েছ ব্যথা,
না-হয় বোঝাটা হয়েছে ভারী,
তাই বলে কি গো ক'বনা কথা?
তব সনে মম কিসের আড়ি?

তুমি কত কত সুখ দিয়েছ মোরে,
দিয়েছ ভরিয়া আঁচলখানি;
ঘন বন্ধনে বেঁধে বাহুর ডোরে,
বক্ষ উপরে নিয়েছ টানি।
সে সুখের কথা ভুলি নি আমি,
ভুলি নাই এই ব্যথার খনে;

আজ লাজ-বাস আসিতে তুমি,
লুকায়ে রয়েছ কাশের বনে

এস দেখে লই দুখের পথে,
দেখে লই দু'টি নয়ন ভরি ;
তারপরে লয়ে বোঝাটি মাথে,
দীর্ঘ পথে যাব আগুসরি।

সুখের দিনের বুকের স্বামী,
দুঃখের দিনে এস হে দেখি ;
কেন লুকাইয়া রয়েছ তুমি,
লাজ-নত মুখে দিতেছ উঁকি !

দরবেশ

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(২০)

সকল দিক্ হইতে বিশৃঙ্খল মনটা টানিয়া আনিয়া শান্ত সংযত হইয়া নমিতা গৃহ-স্থালীর কাজে ভিড়িয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের ক্রূর-কটাক্ষ-স্মৃতিটা তাহাকে ক্রমাগতই একটা প্রতিহিংসার উত্তেজনায় ঝাঁঝাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার উপর দত্তজায়ার ব্যবহারগুলা মনে পড়িতে লাগিল। মনটা অস্বাভাবিক ঘৃণা-বেদনায় পরিতপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।—ছি, ছি, কি অদ্ভুত বর্ব্বরতাই ইহাঁদের অভ্যস্ত হইয়াছে ? কাণ্ডজ্ঞান স্মরণ রাখিয়া কাজ করিতে ইহাঁদের এতটুকুও ইচ্ছা করে না ? ......ঐ সব যথেচ্ছাচারিতা-সূচক ব্যবহারই, বুঝি, ডাক্তার মিত্রের মত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক সমূলে বিচলিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহারা অসঙ্কোচে সমস্ত স্ত্রী-জাতি-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব ধারণা পোষণ করিয়া বসেন ! ভুলিয়া যান, একেবারে ভুলিয়া যান,—কুৎসিত-প্রবৃত্তি দাসত্বের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে আত্ম-সম্মান হারায় নাই, তাহার বুকের মধ্যে জাগ্রত গৌরবে যে নারীত্ব—যে তীব্র-চেতনাময় নারীত্ব বিরাজ করিতেছে,—সে নারীত্ব কেবল মাত্র বিলাস বৈভবে সমালঙ্কৃত হইয়া, হাবভাবে ঘৃণিত-চাতুর্য্য-কৌশলে নির্ব্বোধের দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহে না ! সে নারীত্ব চাহে বিশ্ব-মানবের কন্যাত্ব, ভগিনীত্ব, মাতৃত্ব !

কথা-টা যখনই মনে পড়িতেছিল, তখনই রুক্ষ ঔদ্ধত্যের ঝাঁজ ভরা মনটা ক্ষমা-করুণায় নম্র হইয়া আসিতেছিল। থাক্, ছেলে মানুষের মত ঝগড়া করিয়া কি হইবে ? ডাক্তার মিত্র তাঁহার নিজের মনে বা চরিত্রের গঠন অনুসারে, জগতের সকলের মন ও চরিত্রের রীতি-আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা করুন,—নমিতা নমিতা-ই থাকিবে !—

গ্লানি-জর্জ্জর চিন্তা-অবসাদ এক পাশে ঠেলিয়া নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিমলের দ্বারা টাট্‌কা খবরের কাগজ আনাইয়া শুশ্রূষা-কারিণী ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বাছিয়া বাছিয়া, যথারীতি আবেদন পত্র লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। সকলের

অগোচরে, গভীর রাত্রে লেখা শেষ করিয়া খুব ভোরে উঠিয়া সে ডাকে তাহা ফেলিয়া দিয়া আসিত। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, যদি চাকরী কোথাও জুটে, লছমীর মাকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে; এখানে আপাততঃ সকলে যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। কারণ, বিমলের পরীক্ষা কাছাকাছি;—পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

যে প্রভুর শীলতাজ্ঞান নাই, তাঁহার ঔদ্ধত্য-গর্ব্বের নীচে নতশিরে সভয়ে দাসত্ব-লাঞ্ছনা-বহন অসহ্য ব্যাপার! স্মিথ কি প্রভু নহেন? তিনি কি প্রভুত্ব করেন না? প্রত্যেকের নিকট হইতে ন্যায্য কর্ত্তব্য আদায় করিতে, তিনি ত ডাক্তার মিত্রের চেয়েও বেশী কঠোর।—কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে, ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য-পালনের জন্য প্রত্যেক কুলী-মেথরটি পর্য্যন্ত সমান স্নেহে, আদরণীয় নহে কি? কিন্তু ডাক্তার মিত্র? তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ! সিনিয়ার 'এ্যাসিষ্টেণ্ট' সার্জ্জন সত্যবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্র যখন তাঁহার সহিতও ঔদ্ধত্য-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়েন না, তখন ক্ষুদ্র প্রাণী 'ড্রেসার কম্পাউণ্ডার'রা তাঁহার কাছে সদয় ব্যবহার লাভ করিবে, ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব! যাউক্, তাহাদের চিন্তা তাহারা বুঝিবে! এখন নমিতার মত সহায়-সঙ্গতিহীন ক্ষুদ্র মানুষকে সময় থাকিতে পথ দেখিতে হইবে;—অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও প্রতিকার-চেষ্টার কষ্ট সহিবার ভয়ে নিরীহ ভাল মানুষ সাজিয়া উদাসীনভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিয়া নিরুপায় সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইবার লোভ নমিতার অন্তরে নাই। অসন্তোষ আসিয়া যখন তাহার অন্তঃকরণটা ক্ষিপ্ততায় মাতাইয়াছে, তখন উপায় একটা খুঁজিতে হইবেই! পিতার মর্য্যাদা-গৌরব ভুলিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে সে পারিবে না;—তাহার জন্য সকল রকম অসুবিধা সে সহিতে প্রস্তুত! দাসত্ব-লাঞ্ছনায় পদাঘাত করিয়া উপবাসে দেহ-নিপাত করিবার মত প্রাণের জোর তাহার খুব আছে, কিন্তু সুশীল-সমিতার ক্ষুধা-ক্লিষ্ট মুখের শুষ্ক দৃশ্য কল্পনায় আনিতেও যে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! চাকুরী মজুদ না করিয়া চাকরী ছাড়া হইবে না। সেই পর্য্যন্ত নীরব ধৈর্য্য অবলম্বনীয়!

পাঁচদিন কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষত ধৌত করিতে সমুদ্রপ্রসাদ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। সুরসুন্দর যে কারণেই হৌক, কার্য্যব্যস্ততার ওজুহাতে এ কয়দিন এদিক্ মাড়ায় নাই। অবশ্য, কাজের চাপটা তাহার এখন বেশী পড়িয়াছে সত্য; যে-হেতু পুরাতন ডাক্তার-সাহেব তাঁহার মেমের পীড়ার জন্য টেলিগ্রামে ছুটি মঞ্জুর করাইয়া, হঠাৎ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্থানে নবীন সিবিল সার্জ্জেন কাপ্তেন জ্যাক্‌সন গত পরশু আসিয়াছেন। কাজেই ঔষধ প্রভৃতির ব্যাপার লইয়া সুরসুন্দরকে অত্যন্ত খাটিতে হইতেছে। তবে ইহার মাঝে দুঃস্থ দুঃখীর জন্য অন্য কাজেরও বিরাম নাই। কিন্তু কে জানে কি ভাবিয়া, সে নমিতার হাতের সংবাদ লইতে আসে নাই। মিস্ স্মিথও 'ফিমেল ওয়ার্ড' লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন; তবু তিনি দুই দিন আসিয়াছিলেন। নমিতা তাঁহার কাছে এক

আশ্চর্য্য শুভ সংবাদ শুনিয়াছে যে, ডাক্তার মিত্র না কি আজকাল খুব 'ভালছেলে' হইয়া, শান্তভাবে মনোযোগ দিয়া কাজ করিতেছেন। বুড়া সত্যবাবু অপেক্ষা তিনি বেশী ক্ষমতাশীল, কাজ-কর্ম্মে চটপটে, কাটাকুটিতে সুন্দর ক্ষিপ্রহস্ত; দৃষ্টিও তাঁর বেশ সূক্ষ্ম; সুতরাং 'কাজ দেখাইয়া' ছোক্‌রা ডাক্তার-সাহেবকে খুসি করিয়া, তিনি এখন হাঁসপাতাল শুদ্ধ সকলের উপর অত্যন্তই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন! এমন কি ফিমেল ওয়ার্ডে' ডাক্তার সাহেবের সহিত চক্র দিতে গিয়া মিস্ স্মিথের কার্য্য-অবহেলার কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেও ছাড়েন নাই।

আজ সকালে সমুদ্রপ্রসাদ আসে নাই। নমিতা বুঝিল কাজ পড়িয়াছে। সে নিজেই ঘায়ের উপর-উপরটা কোন রকমে ধুইয়া লইল। অন্যান্য কাজ সারিয়া, পুরাতন ডাক্তারি বহি-গুলি বাহির করিয়া, রৌদ্রে দিয়া, উদাস করুণ দৃষ্টিতে সেগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে নানা কথা ভাবিতেছিল!—আহা, জীবনে একবার যদি বছর কয়েক অবসর পায়, তবে প্রাণের আশা মিটাইয়া এই অসমাপ্ত শিক্ষা—এই চিকিৎসা-বিদ্যাটা শিখিয়া লইয়া সে তৃপ্ত হয়! এগুলোর দিকে দৃষ্টি পড়িলে আজও মনের মধ্যে অধীর আগ্রহ দুর্দ্দাম ব্যাকুলতায় মাতিয়া উঠে!......হায়, সংসারের স্থূল অভাবগুলি মিটাইয়া দিবার জন্য, মাথার উপর যদি একজন উপার্জ্জনশীল আত্মীয় অভিভাবক কেহ থাকিতেন, তবে যত বড়ই দুঃখ-কষ্ট হউক্, সব সাদরে মাথায় বহিয়া নমিতা আবার সেই পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ছাত্রী-জীবনের অঙ্কে গিয়া দাঁড়াইতে পারে! জীবনের সমস্ত শক্তি ঐ শিক্ষা, ঐ সেবা সাধনার চরণে উৎসর্গ করিয়া দেয়!

উন্মনা হইয়া নমিতা নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের স্মৃতি মনে পড়িল।—হাঁ! শিক্ষার ক্ষেত্র বটে! কি বিপুল আয়োজন! হাঁসপাতালের কাজে খাটিতে খাটিতে, নূতন নূতন শিক্ষার আনন্দে, মন কত আশায়, কত আগ্রহে, কত কৌতূহলে ভরিয়া উঠে! তাহার ঔৎসুক্য দেখিয়া স্মিথ্ কত যত্নের সহিত তাহাকে সাদরে শিক্ষা দিয়া থাকেন? নমিতা সে সব শিখিতে শিখিতে অবস্থার দুঃখ ভুলিয়া যায়, শরীরের ক্লান্তি ভুলিয়া যায়! দুঃসহ দাসত্ব,—তাহাও আনন্দময় অমরত্ব-সাধনার তপস্যা বলিয়া মনে হয়! দত্তজায়া প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাশ্লেষে তীব্র পরিহাস করিয়া থাকেন!—করুন্, কিন্তু সত্যই নমিতা মিস্ স্মিথের অনুগ্রহে, অনেক অনেক জটিল তথ্য শিখিয়া থাকে।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার আর সমুদ্র সিং দু'জনে বাইরে এসে বসে আছে; তুমি শীঘ্রি এস—।"

বিস্মিত হইয়া নমিতা বলিল, "এত বেলায়? কোন দরকার আছে?"

তাড়াতাড়ি জ্যাকেটটা টানিয়া গায়ে দিয়া, গলার বোতাম আঁটিয়া, কাপড় চোপড় ঠিক্ ঠাক্ করিয়া নমিতা বাহিরে আসিল। বাহিরের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর নিশ্চিন্ত মনোযোগে খবরের কাগজ পড়িতে-ছিল।—এক ধারে বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্র-প্রসাদ হড়্‌বড়্ করিয়া

পাশে বসিয়া বিমল সকৌতুক হাসিতে হাসিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। নমিতা ঘরে

ঢুকিতেই কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপনার হাতটা ধোয়া হয়ে গেছে? কিন্তু আমাদের যে একবার দেখ্‌বার দরকার আছে—!"

নমিতা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রপ্রসাদ ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে হবে পরে। মিস্ মিত্র, আপাততঃ শুনুন্ একটা সুসংবাদ।—আমাদের হাঁসপাতালের সবাইকার—অর্থাৎ বড় ডাক্তার সত্যবাবু থেকে, যতগুলো অবাধ্য দুষ্ট ড্রেসার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, আছে,—সবাইকার শ্রাদ্ধাধিকারী স্থির হয়ে গেছে। আর মরণোত্তরকালের ভয়-ভাবনা নাই!"

কনুইয়ের ঈষৎ ধাক্কায় সমুদ্রকে পিছনে ঠেলিয়া হটাইয়া সুরসুন্দর বলিল. "আপনার হাতটায় মোটেই পুঁজ হয় নি; ভালই হয়েছে। আজ 'ব্যাণ্ডেজ' প্যাল্টে দিয়ে যাই। একটু মলম রেখে দিন। সব তৈরী করে এনেছি,—।" পকেট হইতে জিনিসগুলি বাহির করিতে করিতে সুরসুন্দর বলিল, "সমুদ্র, ব্যাণ্ডেজটা খোল!"

খুব রাগের ভাব দেখাইয়া সমুদ্র বলিল, "আসুন মিস মিত্র, ওরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। মানুষকে কষ্ট দিয়ে জব্দ না কর্‌লে ত ওর আহ্লাদ হয় না!"

সমুদ্রপ্রসাদ আদেশ পালন করিল ও আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু 'কার মাথা খাই', 'কার মাথা খাই' করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুর্‌ছেন। এই সব নিরীহ প্রাণীর বেওয়ারিশ মুণ্ডুগুলা হাত-ছাড়া হয়ে গেলে, তাঁর ক্ষুধা-শান্তির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হবে। এ ত বড় মুস্কিল!......"

সে আরও বকিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "সর, অত লম্ফ ঝম্ফ করে ঘা-ধোয়ান হয় না। দয়া করে সরে বস। আমিই কাজটা সেরে নি—।"

পরম আন্তরিকতার সহিত সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "কৃতজ্ঞ হলুম। আসুন বিমলবাবু, আমরা কথাটা শেষ করে ফেলি—।"

বিমলকে টানিয়া লইয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ গল্প করিতে লাগিল। আজ প্রাতঃকাল হইতে হাঁসপাতালে যে যাহা বলিয়াছিল ও যে যাহা করিয়াছিল, তাহার অদ্যোপান্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে করিতে হঠাৎ নমিতার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, আমাদের 'মাদারের' অনুপস্থিতিতে ছোট ডাক্তারবাবু কোন দিন 'ফিমেল ওয়ার্ডে' 'আউট ডোরে' রোগী বিদেয় কর্‌তে গেছ্‌লেন?—তাঁর কাজ দেখে, আপনি কি কোন কথা মিস্ চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছিলেন?"

শঙ্কর চাকর প্লেটে গরম জল ঢালিয়া দিতেছিল, সুরসুন্দর তাহার সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত-সহা হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতেছিল। নমিতাও সেই দিকে চাহিয়াছিল। সমুদ্রপ্রসাদের কথায় চমকিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বলিল, "কই,—চার্ম্মিয়ান্ কি বলেছেন?'

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "তিনি কিছু বলেন নি, বরং উল্টে অস্বীকার কর্‌লেন; কিন্তু 'নেই-আকড়া' মিসেস্ দত্তকে জানেন ত? তিনি না-ছোড়বান্দা; বল্লেন, 'হ্যাঁ—নমিতা মিত্রি বলেছে। আমি নিজের কানে শুনেছি।

চার্ম্মিয়ান্ 'না' বল্লে মান্ব কেন?'—দু'জনে খুব ঝটাপটি; দস্তুর মত ঝগড়া। আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাগ্যে ডাক্তার-সাহেব চলে গেছ্লেন তখন, আর 'মাদার' তো আজ হাঁসপাতালে মোটেই যান্ নি; কোথায় 'কলে' বেরিয়েছেন! 'শূন্য ঘরে ছুনো রাজা'—বা ডাক্তারবাবুকে ত ভাল মানুষ পেয়ে কেউ গ্রাহ্যও করে না।—তবু মাঝে পড়ে তিনি প্রাণপণে 'থাম থাম' করে চেঁচালেন। মিস্ চার্ম্মিয়ান রাগে লাল হয়ে হাঁস্পাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তার-পরই আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু ঐ শ্রাদ্ধের বায়না সই করলেন।"

রুদ্ধশ্বাসে সমুদ্রপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার মিত্রের সম্বন্ধে আমি কি কথা বলেছি?—কিসের জন্যে এত ঝগড়া?—"

সমুদ্র বলিল, "ছোট ডাক্তারবাবু রোগীদের মন জুগিয়ে আপনার মত তোষামোদ করে চলেন না বলে—।"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্য যাঁরা নিতে আসেন, তাঁরা অর্থের কাঙালী, সামর্থ্যের কাঙালী, অনুগ্রহের কাঙালী।—এতটুকুমাত্র সদয় ব্যবহার পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যান্। তাঁদের তোষামোদ করা, মন যোগান,—এ সব কথা বলাই ভুল। আমি তা কেন বল্তে যাব?.........তারপর বলুন, আপনার কথাটা শুনি—।"

সাগ্রহে সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "আপনি বলেন নি? ঠিক্। মিসেস্ দত্তের কথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করি নি। বড়বাবুও করেন নি।—বিশ্বাস করেছেন শুধু ছোটবাবু! —তারপর শুনুন্, আমার কথা। মেয়ে রোগীদের অবাধ্যতার জন্য ডাক্তারবাবু ধমক্ ধামক্ করেছিলেন বলে, আপনি চার্ম্মিয়ানের কাছে বলেছেন, 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যের ব্যবস্থা দেখ্লে তীব্র ঘৃণায় ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।—"

আশ্বস্ত হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "এই কথা? এর জন্যে এত মারামারী? ......আমি গরীব; গরীবের দুঃখ আমাদের প্রাণে আঘাত করে। দাতব্য চিকিৎসালয় সাধারণের সম্পত্তি; সেখানকার ব্যবস্থা-ত্রুটির সম্বন্ধে সাধারণের দিক্ থেকে কোন কথা বল্বার অধিকার কি কারুর নেই? কিন্তু ভুল করেছেন। আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কেন কথা কইব? ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীদের সঙ্গে শিষ্টালাপ করুন্, আর অশ্রাব্য কটূক্তি করুন্, তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা কইবার ক্ষমতাও আমার নাই, সাহসও নাই। আমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা কোর্ব্বো? তবে সমগ্র হাঁস্পাতালটার সম্বন্ধে বল্তে পারি; তার মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি; —আপনার আমার ত্রুটি অন্যায় সম্বন্ধে—।"

সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ঐ ত মুস্কিল! ছল-চাওয়া মনসা-ঠাক্রুণ, ঐখানেই ফোঁশ্ করে কামড় দিলেন। গায়ের জোরে হাত, পা, ছুঁড়ে গলাবাজি করতে পার্লেই দুনিয়ার বাজারে জিৎ পড়্তো। মিসেস্ দত্তের সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্বে বলুন?.........তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস একমাত্র ছোটবাবু ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয় নি!—যেন সমগ্র হাঁসপাতালটার মধ্যে ঐ এক

মহাপুরুষ ছোটবাবুটি ছাড়া আর লক্ষণীয় বস্তু কিছুই নাই! কি চমৎকার 'থিওরি'!—"

এইবার হঠাৎ নিজের মনের মধ্যে একটা চমক্ খাইয়া নমিতা দমিয়া গেল! সমুদ্র-প্রসাদ-কথিত "লক্ষণীয়-বস্তু"কে লক্ষ্য করিয়া যদিও সে চার্ম্মিয়ানের কাছে ও-কথা বলে নাই, তাহা নিশ্চিত সত্য;—তবুও ইহাই সুনিশ্চিত সত্য যে, ঐ "লক্ষণীয়-বস্তু"টি, সন্তোষের দিক্ হইতে হউক্ বা অসন্তোষের দিক্ হইতে হউক—সম্প্রতি নমিতার পক্ষে তীব্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।......আপনাকে নিরাপদ্ করিবার জন্য সে মনের সত্যকে অস্বীকার করিবে না। 'খট্‌কা' তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে—একটু! কিন্তু উহাঁরা আক্রমণ করিতেছেন যে উল্টা দিক্ হইতে!—এটা ত স্বীকার করা চলে না!

নমিতাকে নীরব অন্যমনস্ক দেখিয়া সমুদ্র-প্রসাদ খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধ করে বলেছি, ভাই তেওয়ারী,—এই কথা মিস্ মিত্র বলেছেন, তাই এত তর্জ্জন গর্জ্জন! 'ইওর-আনার'রা এত ভয়ানক অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে ঐ কথাটি যদি আমাদের 'মাদার' স্মিথ্, কি চার্ম্মিয়ান্,—নিদেন পুলিশ-সাহেবের পিস্তুত বোনের শাশুড়ীর ভাই-ঝি বল্‌তেন, তা'হলে দেখ্‌তে ও কথার দাম অন্য-রকম হ'ত;—'ইওর-অনার্'দের মানের কান্নার ফুরসুৎ থাকৃত না; নিদারুণ দুশ্চিন্তায় পড়্‌তে হ'ত!—আর অন্যপক্ষের ঐ বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে—।"

সুরসুন্দর এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া এক মনে নমিতার হাতের ঘা ধুইতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় তাহার যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে, বা এ সকল তর্ক-দ্বন্দ্বের কোন শব্দ যে তাহার কাণে পৌঁছাইতেছে, তাহা তাহার শান্ত মুখের উদাসীন ভাব দেখিয়া এতক্ষণ কেহই অনুভব করিতে পারে নাই। এইবার সমুদ্রপ্রসাদের শেষ কথা তাহার সুপ্ত অনু-ভূতিকে বিদ্যুদাহতের মত চমকে উদ্দৃপ্ত করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। ঘাড় ফিরাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে সমুদ্রের পানে চাহিয়া, রুক্ষস্বরে সুরসুন্দর বলিল, "কাণ্ডজ্ঞান সংযত রেখে কথা বল। বর্ব্বরতার সীমা একটা আছে —।"

অপ্রতিভভাবে সমুদ্রপ্রসাদ থামিয়া গেল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ! সুরসুন্দর ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধ দিয়া, 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া হাত ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল। সমুদ্র সসঙ্কোচে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনি এর পর সবই শুন্‌তে পাবেন। আগে আমার মুখে কিছু শুন্‌তে হোল, এর জন্য দোষ ধর্‌বেন্ না।"

"না—না, ওতে দোষের কি আছে?"—এই বলিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে চাপিয়া ঠোঁটের শুক্‌না ছাল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, অপ্রসন্ন-ভ্রূকুঞ্চন-সহ কি কতকগুলা কথা ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া আসিয়া সে সুর-সুন্দরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা বেঞ্চির উপর হইতে তুলিয়া লইয়া অর্থশূন্য দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে একটা প্রবল দুশ্চিন্তার ঘূর্ণীবাত্যা বহিতে লাগিল। সত্যই কি সে অসংযত-জিহ্বার দোষে অনধিকারচর্চ্চার অপরাধে অপরাধী হইয়াছে? নিজের অজ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়া সত্যই কি সে ন্যায়ের দোহাই দিয়া অন্যায়

চাতুরী করিতেছে? ছোট ডাক্তারবাবুর প্রতি তাহার মনের ভাবটা ঠিক্ অনুগত ভক্তের মত নহে, তাহা ঠিক; কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত উদাসীনও যে নহে, তাহাও ত ততোধিক সত্য। তবে কি সে সত্য-সত্যই একটা অপ্রকাশ্য বিদ্বেষের ঝোঁকে মাতিয়া যথেচ্ছাচারের পথে পা বাড়াইয়াছে? মানুষের অন্যায় আচরণে ক্ষুণ্ণ হইতে গিয়া কি সে মানুষকে শুদ্ধ ঈর্ষা-অবজ্ঞার পাত্র স্থির করিয়া বসিয়াছে?...না, না, না। তাহা ত সে করে নাই; করিবার সাধ্যও যে তাহার নাই! পিতার শিক্ষা সে ভুলিতে পারিবে না; পারিবে না!···অসহ্য হইলে, মানুষের অন্যায়কে ঘৃণা করিতে পারে;—কিন্তু মানুষকে ঘৃণা? না, অসম্ভব!

হাত ধুইয়া, ঘরে আসিয়া হাত মুছিতে মুছিতে, বিমলের কাছে দাঁড়াইয়া সুরসুন্দর কি দুই-চারিটি কথা বলিল। বিমল বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বাড়ী চল্লেন? কত দিনের ছুটি নিলেন?"

সুরসুন্দর বলিল, "তিন হপ্তা।"

চিন্তামগ্না নমিতা চমকিয়া বলিল, "কে?"

বিমল বলিল, "তেওয়ারী ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। ওঁর ছোট ভাইটির বড় অসুখ—!"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়াছিল। এইবার ব্যগ্র-চঞ্চল হইয়া সে ত্রস্তে বলিল, "ছোট ভাই? সেই যে টি আমার মত?—প্রেমসুন্দর?"

সুশীলের মাথাটি ধরিয়া স্নেহভরে একটু নাড়া দিয়া বিষণ্ণ হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সুরসুন্দর নীরবে জানাইল "হাঁ—।"

নমিতা একবার সুশীলের মুখপানে ও একবার সুরসুন্দরের মুখপানে চাহিল। মুহূর্ত্তে নিজের ভিতরের দুশ্চিন্তা-দ্বন্দ্ব-বিপ্লব বিস্মৃত হইয়া একটা নম্র-কোমল সহানুভূতির ব্যথায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "কি হয়েছে আপ্নার ভাইটির?—কি অসুখ?"

নতমুখে ললাটের শিরা টিপিয়া ধরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "Hemptysis. রোগটি এখন বড়ই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু চিকিৎসা শুশ্রূষায় হোল না; বায়ু-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে। পাহাড়ের বা সমুদ্রের হাওয়া চাই।" ক্ষণেক থামিয়া ক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় সে বলিল, "দু' মাস থেকে ছুটির দরখাস্ত করছি, এতদিনে মঞ্জুর হোল,—আজ! তাও স্মিথ্ না থাক্‌লে হোত না। কাল থেকে ছুটি। আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই যাব। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, হয় ত! এইখান থেকেই তবে—আসি!—নমস্কার।"

প্রতিনমস্কার করিয়া নমিতা বলিল, "লাহোরে চল্লেন?"

শান্ত করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সুরসুন্দর বলিল, "লাহোরে ত কেউ থাকে না এখন—!" পরক্ষণে ব্যথিতভাবে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "এখন সব কল্‌কাতায় থাকেন, মেজ ভাইয়ের পড়া-শুনার জন্যে—।" কথাটা বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া সামলাইয়া লইয়া,—"আসি তবে" বলিয়া ব্যস্ত-চঞ্চলভাবে সমুদ্রকে টানিয়া লইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া, সহসা মনে পড়ায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার কাগজটা?"

"এই যে নিন্—" বলিয়া ত্রস্তে বেঞ্চির উপর পূর্ব্বস্থানে নমিতা হাতের কাগজটা

ফেলিয়া দিল, এবং পরক্ষণে নিজেই সেটা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া সস্মিত মুখে বলিল, "না, এই নিন্— ।"

কাগজটি হাতে লইয়া পুনশ্চ নমস্কার-চ্ছন্দে তাহা কপালে ঠেকাইয়া, বিদায়-ম্লান-হাস্য-রঞ্জিতমুখে সুরসুন্দর বলিল, "তবে চল্লুম্ এখন। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন্। স্মিথ্ থাক্‌তে কোন ভাবনা নাই। তিনি আমাদের মায়ের মতই। তবু বুঝে চল্‌তে হবে। সাবধানে থাক্‌বেন্। বিমলবাবু, সমুদ্র রইল। যখন যা দর্‌কার হবে, কোনো দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না— ।"

সসৌজন্যে ধন্যবাদ দিয়া সময়োচিত কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে বিমল তাহাদের সঙ্গে গৃহের বাহিরে চলিয়া গেল। সুশীলও পিছু পিছু গেল।

নমিতার পা সরিল না। ভারাক্রান্ত চিত্তে সে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। কিছুই না, সুরসুন্দর নিতান্তই পর! কিন্তু ঐ হাঁস-পাতালের সম্পর্ক-সংস্রবে, পরের কাজে খাটিতে খাটিতে, পরস্পরের সহায়-নির্ভরতা পরস্পরের মধ্যে কি সুশান্ত নীরব স্নেহবন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে! অবশ্য লঘুহাস্যে ব্যঙ্গ করিয়া ইহা উড়াইয়া দিলে, বিদ্রোহিতা করিবার জন্য কেহ কামান পাতিবে না, তাহা সুনিশ্চয়। তবু, এই যে বিদায়ের মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট অনুভূত সকরুণ স্নেহের টান,—ইহা কি নিতান্তই উপেক্ষণীয়?—এই সুদূর প্রবা-সের অঙ্কে, ঐ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড গর্ভাঙ্কগুলা, ওগুলা সবই কি নিরর্থক বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলা চলে?......কে জানে? মানুষের বিচিত্র অনুভূতি! বিভিন্ন মত!—বিবিধ বিধান! হয়ত উহা কিছুই নয়; তবু আজ এইখানে!—হাঁ, মনে হইতেছে বৈ কি! একই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত আত্মীয়তা-প্রীতিবদ্ধ নমিতা, বিমল, সুশীল, সুরসুন্দর, স্মিথ্;—সবাই এক! এ আত্মীয়তার মাঝে ডাক্তার মিত্রকে কিংবা দত্তজায়াকে স্থান দিতে—কিছুনা না, কিছুমাত্র কার্পণ্য করা, দ্বিধা করা চলিবে না।

নমিতা উর্দ্ধমুখে চাহিয়া, চিবুকের ছোট ব্রণ খুঁটিতে খুঁটিতে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল। সুশীল আসিয়া তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যথিত করুণ কণ্ঠে বলিল, "জান দিদি, সেই ভাইকে উনি বড় ভালবাসেন! সেইজন্যেই ত আমায় উনি ভাল বাস্‌তেন। আমি না-কি দেখ্‌তে তারই মত এত বড়। —আর আমার গলার আওয়াজটা—উনি বলেন, সেও তারই মত। সে কি কি খেতে ভালবাসে জানো?—তালশাঁস। একদিন উনি আমায় ঐ কেটে খাওয়াচ্ছিলেন, আর বল্‌ছিলেন, কল-আঁটি সে খেতে খুব ভালবাসে। আর নাশ্‌পতি...... ।"

বিস্ময়-ঔৎসুক্য দমন করিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি, তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তোমার এত প্রিয়পাত্র?—থাক্, এতদিনে আমার সন্দেহ মিট্‌ল। ভাল, ও-রকম বন্ধুত্ব লাভের বটে!—আহা! বেচারীর ভাইটি ভাল হোক্।"

বিমল ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের জিনিষপত্র নাড়াছাড়া করিতে করিতে অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভাল হয় নি দিদি, ভাল হয় নি। কেন বাপু, পরের কথায় থাকৃতে যাও! ডাক্তার মিত্রি! চেন না ওঁকে?—বড়

ভয়ঙ্কর লোক! ওঁর সম্বন্ধে বাইরে যে-সব কথা শুন্‌তে পাই—। বিমল ঢোক্ গিলিয়া থামিল।

নমিতার মুখ গম্ভীর হইল। বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরস্বরে সে বলিল, "ভুল করেছি বিমল! ঐ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকুরির কাজ চালাবার জন্যে যে রকম নির্জ্জীব যন্ত্র হওয়া উচিত, আমি তা হই নি ভাই! মান্‌ছি, ভুল করেছি। কিন্তু অন্যায় দেখে, আমার চেয়ে একদিনের বড় হতিস্, এখনি তোকে কাণ ম'লে দিতে অনুরোধ ক'রতুম! আর এমন—ভুল—!" সবেগে মাথা নাড়িয়া নমিতা বলিল, "কখনো নয়, কখনো নয়—!"

নিজের শয়নকক্ষে গিয়া নমিতা নিঃশব্দে দ্বার ভেজাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ব্যর্থ-চেষ্টা।

সাম্‌নে দেখিয়ে ছুটিলাম আমি,
যতদূর মোর সাধ্য,
ধরিব বলিয়ে তোমারে আজিকে;
তুমি ত হ'লে না বাধ্য।
কাছে না যাইতে, পলক ফেলিতে,
লুকালে তুমি কোথায়!—
খুঁজিলাম কত, এ-দিকে সে-দিকে,
তবু না পাইনু হায়!
ফিরিতেছি যবে হতাশ হইয়ে,
আবার দেখিনু পাশে।
বিনতি করিয়া সাধিলাম কত,
চরণ-পরশ-আশে!
কহিলে না কিছু; হাসিতে হাসিতে
চলিয়া গেলে আবার!—
ফিরিলাম শেষে, ভাঙা বুকে মোর
ল'য়ে শুধু হাহাকার!
আপনা হইতে নাহি দিলে ধরা
কেহ না ধরিতে পারে!
অধীর আমরা শুধু ছুটাছুটি
করি বৃথা বারে বারে।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-লিপি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৌরীপুর গ্রাম। দ্বিপ্রহর বেলায় দ্বিতলস্থ গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া, গোপীনাথের স্ত্রী মোহিনী বালিসের ওয়াড় সেলাই করিতেছিল। দরিদ্রা প্রতিবেশিনী ক্ষান্তর মা তাহার নিকটে (মশলা- ও চুয়া-যুক্ত) পানে খাইবার দোক্তা লইতে আসিয়াছিল। উঠানে পা দিতেই লাউ-মাচার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সাত আটটী নধর-কান্তি অলাবু দোদুল্যমান দেখিয়া ক্ষান্তর মাতার চিত্তে তাহার একটীর লাভের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ যুগপৎ প্রবেশ করিল। সে সিঁড়ি বাহিয়া মোহিনীর কাছে উপস্থিত হইল।

একা বসিয়া, বুঝি, মোহিনীর বিরক্তি বোধ হইতেছিল। ক্ষান্তর মা'কে দেখিয়া প্রসন্ন মুখে সে বলিল, "বোসো।" ক্ষান্তর মা' আশ্বস্তা হইয়া বসিল।

মোহিনীর চুল এলো ছিল। ক্ষান্তর মা' এ-কথা সে-কথার পরে বলিতে লাগিল, "আমি তা সব্বাইকে ব'লে থাকি—বৌদির চুলের যেমন ছিরি, এমন আর কারও নয়।" মোহিনী নিজ-কেশকলাপের সুখ্যাতি শুনিয়া একটু যে প্রীতিলাভ করিল না, এমন নয়। সে বিশেষ করিয়া ক্ষান্তর মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

আবার খানিকক্ষণ কথা-বার্ত্তা হইলে ক্ষান্তর মা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় গিয়েছেন, বৌদি ?" মোহিনী কিছু অপ্রসন্ন-ভাবে বলিল, "তিনি তো আজ এক মাসের উপরে তাঁর বোনের বাড়ীতে ব'সে আছেন। ভগ্নীপতি বেড়াতে বেরিয়েছেন; তিনি তাই বোনের অভিভাবক হয়ে রয়েছেন।"

মোহিনীর কথার ধরণে চতুরা প্রতি-বেশিনী তাহার মনের কথা বুঝিল। বিস্মিতার মত বলিল, "তাই তো! নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে বোনের বাড়ীতে রয়েছেন! তোমাদের কে দেখে তার ঠিকানা নাই!"

এই সহানুভূতি পাইয়া মোহিনী দ্রবীভূত চিত্তে বলিতে লাগিল,—"উনি তা' কোনদিনই বোঝেন না। বোনের জন্য বোনাইএর জন্য প্রাণ দিতে পারেন। আমার পট্‌লির সেবারে অসুখ হয়েছিল; তা'কে ভাত না দিতেই ঠাকুর-জামাইএর অসুখের চিঠি পেয়ে অমনি কল্‌কেতায় গেলেন! দিন-রাত বোন্ বোন্ করে পাগল হ'ন্। আমি কোন কথা বল্‌তে গেলে বলেন, 'ভুবনকে আমি গায়ের রক্ত দিয়ে নিজে মানুষ করিছি। ও ভূমিষ্ঠা হ'বার পরেই মায়ের অসুখ হ'ল। ঘরে আর লোক ছিল না। আমিই সেই একরত্তি মেয়েকে পালন করেছি। ভুবনের একটু অসুবিধে আমি সইতে পারি না।" তা বল্‌তে কি, আমার পট্‌লি, গুঁটুলির চাইতে, আমার গুলুর চাইতে বোনেদের উপরে ওঁর মমতা!" ক্ষান্তর মা' এত বড় অসম্ভব কথা এই যেন জীবনে প্রথম শুনিল, এমনি মুখখানি করিয়া কহিল, "এমন কথা তো কখনই শুনি' নি বৌদি! তা বোন্ তো আমাদের মত গরীব কাঙাল নয়? তার আর অভাব কিসের?" মোহিনী উত্তেজিতা হইয়া বলিল, "বোন্ তো রাজরাণী! স্বামী কত টাকা রোজ্‌গার কোচ্চে! বাড়ীতে বামুন, ঝি, চাকর রয়েছে! স্বামী-স্ত্রীতে গাড়ী ক'রে কত জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াচ্চে! কত লোককে কত দিচ্চে থুচ্চে! সে তো রাজরাণী! উনি কি! ভাগ্যে জমিদার-বাড়ীর কাজটুকু ছিল, তাই দিন চলে যাচ্চে। আর এই পৈতৃক দালানটা আছে, তাই বাছাদের নিয়ে কোন মতে মাথা রেখে আছি!"

ক্ষান্তর মা দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তা বৌ-দি যা'ই বল, দাদাবাবু বড্ড ভালমানুষ। আচ্ছা, ভুবন কত লোককে কত দেয় থোয় বোল্‌চো, তা তোমাদের কিছু দেয় টেয় কি?" মোহিনী গর্জ্জিয়া বলিল, "আমাদের আবার দেয় কি! —এই যে তা'র ভাইপো, ভাইঝি,—সে ইচ্ছে কোল্লে ওদের কি না দিতে পারে? সে-সব কিছু নয়। তবে ভাইকে খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায় আর খুব 'দাদা দাদা' করে। আর কিছুই নয়।"

ভুবনেশ্বরী গোপীনাথের পুত্রটীকে এবং কন্যা-দুইটীকে তিনটী গিনি দিয়া মুখ দেখিয়াছিল; প্রতিবৎসর পূজার সময়ে তাহাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ দিয়াও থাকে। মোহিনী সে-কথার উল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করিল।

ক্ষান্তর মা খাণিকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল; তারপরে বলিল, "এমন কথা তো কখন শুনি নি, বৌদি!—ভাইপো, ভাইঝি,—ওরা তো গায়ের রক্ত!—বাপের বংশ! পেটের সন্তানকে খাইয়ে পরিয়ে যে তৃপ্তি হয়, ওদের খাইয়ে পরিয়ে সেই তৃপ্তি হয়! আমার দাদা-শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই হয়ে রয়েছে। সেবারে আমার বড় ভাইপো এল, তাকে একখানা কাপড় দিলুম; তার ছাতা দিলুম। ছোট ভাই-বোনেদের জন্য খাবার নিয়ে যাবে ব'লে ছ' আনার পয়সা দিলুম; আরও কত দিতে ইচ্ছে হয়।" ইত্যাদি।

মোহিনী এই সহৃদয়ার সহানুভূতিতে অধিকতর প্রীতা হইল। তাহার প্রার্থনা অনুসারে সে তাহাকে একখানি পুরাতন সঞ্জীবনীর খানিকটা ছিড়িয়া, তাহাতে সেই মশলাযুক্ত চুয়ামাখা দোক্তা কতকগুলি ঢালিয়া দিল। ক্ষান্তর মা তাহা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে লাউএর কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যাহ্নকালে মেঘোদয়ের মত, অপ্রত্যাশিত গোপীনাথ সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া ক্ষান্তর মা সন্ত্রস্ত ভাবে নীচে নামিতে লাগিল। মোহিনী দেখিল, গোপীনাথের মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণ; তিনি বাক্যমাত্র না বলিয়া শয়ন-গৃহে গিয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন।

পীড়া-সম্ভাবনা ভাবিয়া মোহিনী সেই ঘরে খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল; ধীরে ধীরে বলিল, "অসুখ হয়েছে না কি? ঠাকুর-জামাই কবে এসেছেন?"

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে গোপীনাথ উত্তর করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌ! বজ্‌রা ডুবে গিয়েছে! রমাকান্ত ডুবে গিয়েছে। ভুবন আজ কাঙালিনী হয়েছে!" এই বলিয়া গোপীনাথ কাঁদিয়া উঠিলেন।

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। হাজার হউক্ স্ত্রীলোক তো বটে! বলিল, "কি বল্লে! য়্যাঁ? —কি সর্ব্বনাশ হ'ল!"

গোপীনাথ অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আর বোল্‌বো কি!—আজ পাঁচদিন ভুবন বিছানায় প'ড়ে আছে! তার যে আর কেউ নাই! তুমি একবার তার কাছে চল। আমার আদরিণী ভুবন আজ অনাথা হয়েছে! তুমি তার কাছে একবার চল।"

মোহিনী কি উত্তর দিত জানি না। এ-দিকে বিদ্যালয়-প্রত্যাগত গুলু, পটলি ও গুটলি "বাবা এসেছেন" বলিয়া, উঠানে আসিয়াই কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহা-দিগকে থামাইবার জন্য মোহিনী নীচে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

অক্ষয়-স্মৃতি।

আজিও পবিত্র তব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
ভরি আছে এ বিশ্বের আকাশ বাতাস।
আজো তব ভাবমুগ্ধ চিন্তাবিন্দুগুলি
পুণ্য করি বিশ্ববায়ু ছুটিছে আকুলি!
আজো তব আঁখি-যুগে দেখা দৃশ্যরাজি
বিশ্বের গগনতলে রয়েছে বিরাজি!
ও-কর পরশ করা তরুলতারাজি
এখনো মৃত্তিকা-বক্ষে রহিয়াছে সাজি!
চৌদিকের চিত্রপট-পুঁথি-পত্রচয়
দেয় আজো বিশ্ব-মাঝে তব পরিচয়!

কত কত কণ্ঠে আজো এ বিশ্বের ঘরে
ধ্বনিত হতেছে নাম কি উদাত্ত স্বরে!
ধীরে ধীরে কালস্রোতে সব যাবে ভেসে;
রহিবে না চিহ্নমাত্র পুঁথি-বাস-বেশে!
ভুলে যাবে নিম্নদেশে শ্যামলা ধরণী,
উর্দ্ধে নীলাম্বর গ্রহ তারার বিপণি;
ভুলে যাবে ছয় ঋতু দিন বর্ষ মাস,
ফুল ফল আলো জল আকাশ বাতাস!
তখনো উজ্জ্বল হ'য়ে রবে মোর মনে
তোমার মধুর স্মৃতি অতিসঙ্গোপনে!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বপতি, পুরুষ-প্রকৃতি,
কহি জোড় করি হাত,
যা দিয়াছ মোরে, সোহাগে আদরে,
পারি যেন তারে, নাথ,
যতন করিতে, হৃদয়ে রাখিতে,
আঁকিতে মানস-পটে,
ভূধরে সলিলে, এ নভোমণ্ডলে,
হেরিতে সকল ঘটে!
অবহেলা করে, ফেলে আমি দূরে,
দিই নাকো যেন তায়,
সাদরে তুষিয়ে, হৃদয়ে লইয়ে,
এ জীবন যেন যায়!
ক্ষুদ্র এ মনের দৈন্যভাব যেন
দূরে চলে যায়,—দূরে;
তাঁরি করুণায়, হিয়া ভরে যায়,
ভক্তিপ্রেমে রয় পূরে!

দয়াময় তুমি, জান অন্তর্য্যামী,
মোদের মনের আশ;
যাতে শুভ হয়, হে করুণাময়,
ক'রো তাই অভিলাশ!
আপনার করে, দিয়াছ গো যাঁরে,
কৃপাভরে, পরমেশ!
যাচি পদে তব, হে প্রিয় বান্ধব!
সুখী যেন হয় শেষ!
দয়া-ধর্ম্ম-ভক্তি, সত্য-প্রেম-প্রীতি
লভি যেন ধ্যানে তাঁর;
আরাধ্য দেবতা, না ভুলে এ-কথা,
সে চরণ করি সার!
নিজ গরিমায়, ভেসে নাহি যায়,
যেন স্ব স্ব প্রিয় ধন,
তেমতি করিয়ে, দোঁহে আবরিয়ে,
রাখ সখা!—আকিঞ্চন!

শ্রীবিমলাবালা বসু।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 654. February, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

নূতন খাতা।

আজ্ বেঁধেছি নতুন খাতা
লিখ্‌ব বলে' তোমার গাথা,
কইবো আমার মনের কথা
প্রাণের সরল ছন্দে;
প্রতি-আখর তোমার সুরে
বাজ্‌বে আমার হৃদয় জুড়ে'
নাচ্‌বে কেবল তোমায় ঘুরে'
উজ্জ্বল রসের গন্ধে!

কোন্ গাঁয়ের সে কোন্ বাগানে,
কোন্ বনের কোন্ পাখীর গানে,
কোন্ রঙের কোন্ ফুলের ঘ্রাণে,
কোন্ বিটপীর পত্রে,
তোমার সনে কখন সখা,
আমার হ'লো প্রথম দেখা,
সেই কথাটা আছে লেখা
পুরাণ খাতার ছত্রে।

তোমায় আমায় যে-দিন চিনা,
শুনিয়ে দিলে বিপুল বীণা,
গোপন সুরের ঠাঁই-ঠিকানা
সে-দিন দিলে জান্‌তে;
সেই আনন্দে ছিলাম বেঁচে,
এখন দেখি সে সব মিছে;
জানা-গাওনা তফাৎ আছে,
এখন পেলাম শুন্‌তে!

কাজ্ নাই মোর বিফল জানা,
নিষেধ-বিধির জয়-নিশানা,
নানান্ ঘাটের নানান্ খানা
বাহাদুরীর দৃশ্যে;
তোমার জানা থাক্‌বে তোমার,
শিখ্‌বো আমি গাইতে এবার,
রক্ত ধারার ভিজানো তার
বাজ্‌বে সকল বিশ্বে!

দরবেশ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ভৈরবী—দাদ্‌রা।

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ';
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরু-মর্ম্মর পবন-দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'!
আনিস্‌ নে তোর ঘরের কথা,
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা;
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ' রে বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে,
বিশ্বভুবন ভরা গানে!
সেই গানের তালে তালে
হৃদয় মেলে সহজ হ'॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ০ ১´ ০
II { সা মা -মমা । পা দদা -পা I মা পা -া । জ্ঞজ্ঞা -জ্ঞা মা I
আ কা শের আ লো০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০
I পা মা -া । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া । -া -া -া I
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I সা দা -পপা । পা দদা -পা I পা দা মা । পপা -দা পা I
কা ন নের ফু লে০ র সা থে ০ মি০ ল্‌ বি

১´ ০ ১´ ০
I মা পা -া । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা I সা -া -া । -া -া -া } II
য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
II দা দা -া। দা র্সা -ণর্সা I র্সা র্সর্সা র্সা। র্সা র্সর্সা -র্সা I
(১) ত রু ০ ম র্ম ০র প ব০ ন দো লা০ য়
(৯) দে খ্ রে চে য়ে ০০ আ কা০ শ পা নে০ ০

১´ ০ ১´ ০
I ঋা ঋা -া। র্সা র্সা -র্সর্সা I ণা ঋর্ঋা র্সা। ণা দদা -পা I
(২) নৃ ত্য ০ দো দু ০ল তা রা০ র মা লা০ য়
(১০) বি শ্ব ০ ভু ব ০ন ভ রা০ ০ গা নে০ ০

১´ ০ ১´ ০
I দা দা -দা। পা মা -া I পা ণা দা। মা -পা -া I
(৩) যে গা ন দো লে ০ সে ই দো লা তে ০
(১১) সে ই গা নে র ০ তা লে ০ তা লে ০

১´ ০ ১´ ০
I পণা -দা পা। মা পা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -ঋা। সা -া -া I
(৪) হৃ০ দ্ বি য দি ০ স হ০ জ হ' ০ ০
(১২) হৃ০ দ য় মে লে ০ স হ০ জ হ' ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I { সা সা -সা। সা সা -ঋা I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -মা। মা মা -া I
(৫) আ নি স্ নে তো র ঘ রে০ র ক থা ০

১´ ০ ১´ ০
I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা -া। পা মা -া I জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা ঋা। মজ্ঞা জ্ঞঋা -সা } I
(৬) বি জ০ ন ম নে র ব্যা কু০ ল ব্য০ থা০ ০

১´ ০ ১´ ০
I সা দদা পা। পা পা পা I মা পপা ণা। পা পা -া I
(৭) স হ০ জ স র ল শি শু০ র প্রা ণে ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা -জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা মা I জ্ঞা জ্ঞা -ঋা। সা -া -া II
(৮) বা হি র হ' রে ০ বা হি র হ' ০ ০

এই গানটি গত ভাদ্রমাসের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ১১২ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত। গানটিকে তালে আনিবার জন্য নামমাত্র একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। দাদ্‌রা ছয়টি হ্রস্ব মাত্রার তাল। ঠেকা যথা :—

১ ০
I ধা ধি নাক্। না ধি নাক্ I
I সে যায় থাক্। না যায় থাক্ I

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

প্রার্থনা।

মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে শত বন্ধনে।
সার্থক করি লও হে মম বক্ষভরা ক্রন্দনে॥
অন্তরযামী, জান হে তুমি,
তৃষ্ণা-সাগর হৃদয়-ভূমি;
রচ তটে তার সুধার আধার তোমার গৃহ-নন্দনে।
রুদ্ধ চিত্ত-কপাট খুলি'
নিত্য হে দেব! নয়ন তুলি'
নিরখি' ওমুখ, শিহরিবে বুক, পূজিবে ফুলচন্দনে।
মুক্ত কর সত্য হে নাথ! আজিকে সকল বন্ধনে॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

তপস্যা।

(১৩)

অবিনাশবাবুর বাটীতে বড় ধূম। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা লাবণ্যপ্রভার বিবাহ। ভবানী-পুরের কোনও ধনাঢ্যব্যক্তির পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। লীলার মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—"কল্‌কাতার সহর, আর বড়লোকের ঘর নইলে মেয়ের বিয়ে দিতে দেবো না! তা' সে ছেলে যেমনই হোক্!" তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদ্বান্ ছেলে লইয়া কি তিনি ধুইয়া জল খাইবেন? 'পাড়া-গেঁয়ে' ছেলের সহিত লীলার বিবাহ দিয়াই লীলার এত দুঃখ, ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় ধারণা। সেজন্য এবার অবিনাশবাবু গৃহিণীর ইচ্ছানুরূপ গৃহে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। পাত্রটীর "ক"-অক্ষর "গোমাংস" বলিলেই হয়; চরিত্রটীও তথৈবচ! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গৃহিণীর বাঞ্ছিত ধনাঢ্যের পুত্র ত সে বটে! বাটীতে অনেক দাস-দাসী আছে, গাড়ী-ঘোড়া, মটর আছে! মেয়েকে নিতে লালপাগড়ী-মাথায় দ্বারবান্ আসিবে; ল্যাণ্ডো, মটরকার, কত কি আসিবে!—ইহাই ত গৃহিণী চান্! এই কল্পনায় তিনি অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন। কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে বাটী পরিপূর্ণা! উৎসবের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই।

সকলেই আনন্দে মগ্ন; কেবল লীলাই এ আনন্দে যোগদান করিতে পারে নাই। আক্ষেপে, অনুতাপে লীলা মরমে মরিয়া আছে। পতিবিরহ-বিধুরা লীলার সে রূপ-লাবণ্যরাশি আর নাই! তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশি আজ রুক্ষ; আয়ত চক্ষুর্দ্বয় কোটর-গত; তপ্তহেম-বর্ণ আজ পরিম্লান; পীবরতনু আজি ক্ষীণা! লীলাকে দেখিলে আজ সহজে চেনা যায় না! লীলার মাতার কন্যার এতটা মনঃপীড়া ভাল লাগে না। কুটীরবাসী দরিদ্র একটা যুবকের জন্য এত কেন? সময় সময় এজন্য লীলাকে যথেষ্ট শ্লেষবাক্যও শ্রবণ করিতে হইতেছে। তিনি পরিচিত, অপরিচিত, যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, "দেখেছ, কি সব বেইমান্! আমি এত ক'রে মানুষ মুনুষ কল্লু'ম, পেটে ধর্‌লুম!—আমি মরি 'মেয়ে, মেয়ে' করে, আর মেয়ে কি না, আমাকে গেরাজ্জিও করে না! আমার কথা যেন মেয়ের বিষ মনে হয়! কলিকাল কি না!"

কুটুম্বিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, "ছোটবোনের বড় ঘরে বিয়ে হচ্ছে ব'লে, লীলা হিংসেয় ঘরের বা'র হয়েও একবার দেখ্‌ছে না।"

গৃহিণীও এ কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "হাঁ বোন্‌, হাঁ! তোমরাই দেখ, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

হায়! দুঃখিনীর মর্ম্মবেদনা কেহ বুঝিল না! বুঝি, এ জগতে তাহার বেদনা বুঝিবার কেহও ছিল না!

লীলার কাকা যামিনীবাবু অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডেরাডুনে কাজ করিতেন ও সপরিবারে সেইখানেই বাস করিতেন। লীলাকে তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অবিনাশবাবুর সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। অবিনাশবাবুর স্ত্রী তাঁহার নামে অগ্নিশর্ম্মা হইতেন, ক্রশ্চান, বিধর্ম্মী, 'সায়েব' বলিয়া তাঁহাকে অজস্র গালাগালি দিতেন। তাঁহার স্পৃষ্ট কোনও বস্ত্রাদি জলে ধৌত করিয়া ও গঙ্গাজল ছিটাইয়া তবে স্পর্শ করিতেন। এ সকল সত্ত্বেও যামিনীবাবু লীলাকে স্বীয় কন্যা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন এবং কোনও কার্য্যোপলক্ষে কখনও কলিকাতায় আসিলেই, ভ্রাতৃজায়ার ঘৃণা-অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া অগ্রজ অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে সাক্ষাৎকারাদির জন্য আসিতেন। তিনি অতি-সদাশয় এবং মহৎ ও উদার চরিত্রের লোক ছিলেন।

যামিনীবাবু পূর্ব্বে যেমন আসিতেন, তেমনি এই বিবাহোপলক্ষে আসিয়া লীলাকে দেখিতে আসিলেন। আনন্দোৎসবের মধ্যে লীলাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বরাবর লীলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লীলা মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়াছিল। লীলার আকৃতি দেখিয়া যামিনীবাবু স্তম্ভিত হইলেন; সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "কেন মা, তুই এমন হয়ে গেছিস্‌?" সে-স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বলিল, "কাকা, তোমার আদরের লীলার কপাল ভেঙেছে। এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন শীগ্রি তার মৃত্যু হয়! তা হ'লেই সকল যন্ত্রণার শেষ হবে।"—এই বলিয়া লীলা তাহার কাকার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

যামিনীবাবু সমস্ত শুনিলেন; শুনিয়া বলিলেন, "দাদার ঐ ত কেমন দোষ!—ভারী একগুঁয়ে। মেয়েই যদি পাঠাবেন্‌ না, তবে বিয়ে দেবার কি দরকার ছিল? জামাইয়ের সঙ্গে কি এম্নি ব্যবহার করে? ছ্যাঃ

লীলা বহুদিবস পরে একজন প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহাকে মনের বেদনা জানাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে সমবেদনা প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। এই বৃহৎ-পুরীমধ্যে বহু আত্মীয়-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে একা। তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ ছিল না! হৃদয়ভার লঘু করিয়া সে কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য একান্তে ভগবানের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাবণ্যপ্রভার বিবাহ হইয়া গেল! খুব বাজনা বাজাইয়া, বাজী পোড়াইয়া-

আলো জ্বালাইয়া বর আসিল। আত্মীয়বর্গও তাহা দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলেন।

বিবাহের আটদিন পরে এক গা গহনা গায়ে দিয়া লাবণ্য শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিল। আত্মীয়গণ কেহ গহনার প্রশংসা, কেহ বৈবাহিকের প্রশংসা, কেহ বা তাঁহার ধনের প্রশংসা করিয়া গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইল।

(১৪)

চৈত্রের শেষভাগ। কলিকাতা-সহরে বেশ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। লীলা তাহার কক্ষ-তলে অর্দ্ধশায়িত হইয়া অন্যমনস্কভাবে রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। সম্মুখের বাতায়ন উন্মুক্ত! বাতায়ন-মধ্য দিয়া লীলা কত লোক, কত দ্রব্য দেখিতেছিল, আর আকাশ-পাতাল, কত কি চিন্তা করিতেছিল! তাহার চিন্তার ইয়ত্তা ছিল না! পার্শ্বের কক্ষে লাবণ্য পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে ছিল—

কিছু নাহি চাহি সখা, আর!
চিরদিন রব গো তোমার!
তোমার চরণতলে
বিকায়েছি বিনিমূলে,
তুমি যে আমার প্রভু, কত সাধনার।
সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ,
নাহি চাহি প্রতিদান;
জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!

সুমধুর-তানলয়-মিশ্রিত বালিকার মধুর কণ্ঠস্বর লীলার কর্ণে প্রবেশ করিয়া সহসা লীলার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করিল! লীলা একাগ্র-চিত্তে গানটী শুনিতে লাগিল। গাহিয়া গাহিয়া লাবণ্য নীরব হইল; কিন্তু লীলার হৃদয়-মধ্যে তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—'সাধিয়ে দিয়েছি প্রাণ, নাহি চাহি প্রতিদান; জীবনে মরণে শুধু রহিব তোমার!'

এরূপ সময়ে যামিনীবাবু কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা, লীলা!" লীলা ত্রস্তে পরিধেয় বসন সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "কি কাকা?" যামিনীবাবু বলিলেন, "আজ আমি যাচ্ছি মা!" লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "যাবেন্ কাকা! আর দিন-কতক থাক্‌লে হ'ত না?"

যামিনী। না, মা! এই ক'দিন, রইলুম্; আর থাকৃতে পার্ব্বো না। সেখানে ছেলেমেয়ে-গুলো কি কচ্ছে কে জানে! তাদের দেখ্‌বার ত আর কেউ নেই! আমি আবার তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বো। যা হবার হয়ে গেছে, আর ত কোন উপায় নেই মা! মিছে আর কেঁদে কেটে দেহটা কেন মাটি কচ্ছ? মনটা একটু প্রকৃতিস্থ রেখ মা!

লীলা। হাঁ্যা কাকা, মনকে প্রকৃতিস্থ রাখ্‌ব, মনে করেছি। আমি একটা উপায় ঠাউরেছি! কিন্তু আপ্‌নাকে একটু সাহায্য কর্ত্তে হবে, কাকা! আপনি ভিন্ন আমার মুখ চাইতে আর কেউ নেই। আপ্‌নি ভিন্ন আমাকে আর কেউ ভালবাসে না কাকা!

যা। আমাকে কি কর্‌তে হবে বল মা! আমার সাধ্য হ'লে, আমি প্রাণ দিয়ে তা কোর্ব্বো।

লী। কাকা, আমাকে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে রেখে আসুন্!

লীলার কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পরে বলিলেন, "সে কি মা! সেখানে তুমি কা'র কাছে যাবে?"

লীলা। আমার শ্বশুরের কাছে।

যামিনীবাবু নীরব রহিলেন; কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দাদা তোমাকে তখন পাঠান্ নি, আর এখন পাঠাবেন কেন মা?"

লীলা। আমি তাঁকে লুকিয়ে যাব।

যা। সে কি হয় মা!

লীলা। কেন হবে না কাকা? বাপ-মা যদি সন্তানকে কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দেন, সন্তান কি তা হ'লে কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হবে? বাপ-মা সন্তানকে অধর্ম্ম কর্‌তে বল্‌লে, সন্তান কি সেই অধর্ম্মই কর্‌বে? আমার বুড়ো শ্বশুরের আর কেউ নেই। তাঁর সেবা না কর্‌লে আমার কি পাপ হবে না? তাঁর সেবা করা আমার কি প্রধান কর্ত্তব্য নয়? আপনিই বলুন্?

যা। তা ত বুঝ্‌লুম্! কর্ত্তব্য তো তোমার বটেই! কিন্তু ভগবান্ তোমাকে সে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে দিলেন কৈ?

লীলা। কাকা, আমাদের সকল কাজ ভগবান্ হাত ধরিয়ে করিয়ে দেন না! তিনি আমাদের জন্যে আমাদের সম্মুখে একটা অসীম অনন্ত বিরাট কার্য্যক্ষেত্র রেখে দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে যাবার জন্যে বিস্তীর্ণ কর্ত্তব্য পথ রয়েছে। আমাদের সৎ-সাহস নিয়ে সে পথে চল্‌তে হয়। আমি যদি চিরদিন আমার বাপ-মাকে ভয় ক'রে চলি, আর আমার বুড়ো শ্বশুরকে একবিন্দু জল দিয়েও তাঁর উপকার না করি, তা হ'লে আমার মহান্ অধর্ম্ম হবে!

যামিনীবাবু নীরবে লীলার কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। লীলা আবার বলিতে লাগিল, "আপনার পায়ে পড়ি কাকা! আপনি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন্! আর আমার এ সোণার পিঞ্জরে ভাল লাগ্‌ছে না! শ্বশুর গরীব হউন্, আর যাই হউন, মেয়েমানুষের শ্বশুরঘর করাই বিধি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্‌লে মেয়েমানুষ কখনও সুখী হ'তে পারে না। আমার শ্বশুরের সেই ভিটে আমার কাছে বৈকুণ্ঠ!" এই বলিতে বলিতে লীলা একবার থামিল ও তারপর ঢোক্ গিলিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমি তাঁর সঙ্গেই চলে যেতুম! কিন্তু কি বল্‌বো, আমার পোড়া অদৃষ্ট-দোষে, আমার কথা না শুনেই চলে গেলেন। আর কাকা, আমার মনে এখনও একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে জেগে ওঠে! সবাই বলে তিনি নেই, কিন্তু আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোথাও আছেন। মনে হয়, বুঝি, একদিন তাঁকে দেখ্‌তে পাবই! তাই আমি এখনও হাতের নোয়া খুলি নি, এখনও সিঁদুর মুছি নি। মনে হয়, যদি শ্বশুরের ভিটেয় থাক্‌তে পারি, তা হ'লে কখন না কখন তাঁর দেখা পাব! কিন্তু এখানে থাক্‌লে ত তা পাব না! বাবা তাঁর বড় অপমান ক'রেছেন। তিনি আর এখানে আস্‌বেন না; এখানে কোন খবরও দেবেন্ না! তা' যদি দিতেন, তা হ'লে এতদিন নিশ্চয় তাঁর খবর পেতুম।"

লীলার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া যামিনীবাবু বড় আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি যা বলেছ মা, তা' তা বুদ্ধিমতীর মতই বলেছ! কিন্তু তোমার বাপ-মাকে কি বল্‌বে? তাঁদের যদি এ-কথা বলি, তা হ'লে তাঁরা কখনই সম্মত হ'বেন্ না! অধিকন্তু আমার উপর অত্যন্ত রাগ কর্‌বেন। একে

ত তাঁরা আমার নামে হাড়ে চটা! জানই ত মা!"

লীলা বলিল, "আমি বল্‌ব যে দিন-কতক আমি আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমার শরীর খারাপ্। এ-কথা বল্‌লে, মা যাই বলুন্, বাবা নিশ্চয় মত কর্‌বেন। আমাকে কমলা-পুরে রেখে আপ্‌নি ডেরাডুনে চলে যাবেন। আমি যাঁর কুলের বউ, তাঁর কাছে থাক্‌ব। আর আপ্‌নার ভয় কি? পরে যদি বাবা, মা জান্‌তে পেরে রাগ করেন, তাতে কারো কোন অনিষ্ট হবে না।"

যামিনীবাবু সম্মত হইলেন। সে-দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। লীলা সন্ধ্যাকালে পিতার বিশ্রামকক্ষে গিয়া বলিল, "বাবা, কাকা কাল চলে যাচ্ছেন, আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দিন-কতক বেড়িয়ে আস্‌ব। ক'ল্‌কাতা ছাড়া কখন অন্য দেশ দেখি নি! দেখতে্ বড় ইচ্ছা করে!" লীলা কর্ত্তব্য পালনের জন্য এই পথ অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতে পাইল না।

অবিনাশবাবু লীলাকে যথার্থই ভাল বাসিতেন। লীলা বহুদিন কোথাও বাহির হয় নাই। বহুদিন সে পিতার কাছে আব্দার করিয়া কোন কথা বলে নাই। তাই আজি লীলার মুখে এ-কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন এবং লীলার ডেরাডুনে যাইবার কথায় সহজেই সম্মত হইলেন। মাতা কিন্তু সম্মত হইলেন না। বিধর্ম্মী কৃশ্চানের বাড়ী মেয়ে গেলে পাছে তাঁহার জাতি-ভ্রংশ হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহার অধিক! লীলার কথা শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "সে মগের মুল্লুকে সোমত্ত মেয়ে এক্‌লা কোথায় যাবে? তুমি যে একেবারে ঢালা হুকুম দিয়ে দিলে?"

অবিনাশবাবু গৃহিণীর কথা গ্রাহ্য করিলেন না। গৃহিণী অপেক্ষা তিনি ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপেছ না কি? সে তা'র নিজের কাকার সঙ্গে যাচ্ছে! একলা আবার কিসের?—যেতে চাচ্ছে যাক্; দিন-কতক বেড়িয়ে আসুক্! তাতে তা'র শরীর-টাও সার্‌বে, মনটাও ভাল হবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে লীলা তাহার খুল্লতাতের সহিত রওনা হইল। লোকে জানিল লীলা যামিনীবাবুর সহিত ডেরাডুন যাইতেছে; কিন্তু সে তাহার চির-আরাধ্য-ভূমি শ্বশুর-বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

(১৫)

লীলা তাহার বহু দিনের সাধনার স্থান—চির আরাধ্য ভূমি শ্বশুর-বাড়ীতে আসিল। তাহার কত দিনের বাসনা আজি সে পূর্ণ করিল। কিন্তু হায়! এ কি হইল! লীলা তাহার আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইবে না, তাহা জানিয়াই আসিয়াছিল; কিন্তু যাঁহার সেবা করিবার জন্য সে এত করিয়া মাতা-পিতাকে লুকাইয়া কত আশা মনে ধরিয়া আসিল, তিনি কৈ? যে বৃদ্ধ শ্বশুরের চরণ-পূজার জন্য তাহার এত আগ্রহ, সেই পূজনীয় শ্বশুর তাহার এ পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন কৈ? তিনি ত সে বাটীতে নাই! কেবলমাত্র ভগ্ন পরিত্যক্ত গৃহগুলি পড়িয়া রহিয়াছে! মৃন্ময় প্রাচীরের স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উঠানের মধ্যে মধ্যে বড় বড় বন্য বৃক্ষনিচয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-শব্দে লীলার মনে হইতে লাগিল,

তাহারা যেন লীলাকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল! যেন তাহারা বলিতে লাগিল, "নাই, নাই ;—তা'রা নাই!"

যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া আসিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, ছেলেমানুষের কথা শুনিয়া এ কি কাজ করিলেন! এ বাটীতে যে অনেক দিন লোক-সমাগম নাই, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইতেছে। নিকটেও কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না যে, তিনি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন!

লীলা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, শ্বশুরের ভিটায় বাস করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহার জীবনের একটা কর্ত্তব্য পালন করিবে। কিন্তু তাহার সে বাসনা নিষ্ফল হইল। সে সেই ভগ্ন-কুটীর-তলে পতিত হইয়া কুটীরের ধূলিরাশি স্বীয় মস্তকে ও অঙ্গে লেপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পিতার সুখ-ভবনে সে এতদিন প্রাণ ভরিয়া ত কাঁদিতে পায় নাই! ভয়ে ভয়ে, লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিয়া তাহার আশা মিটিত না। আজি সে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু লাভ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া বাঁচিল। —"ওগো, কোথায় তুমি? একবার এস, নারীর সর্ব্বস্ব-ধন! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! একবার দুঃখিনীকে দেখা দাও! হে আমার জীবনসর্ব্বস্ব! আমায় ক্ষমা কর; আমার এ তপস্যার বর দান কর। আমাকে আন্‌বার জন্যে কত চেষ্টা করেছিলে, তখন আন্‌তে পার নি। আজ আমি ভিখারিণীর বেশে আপনি তোমার দ্বারে এসেছি! আমাকে তোমার দর্শন-ভিক্ষা দাও।" লীলার এইরূপ আকুল ক্রন্দন দেখিয়া যামিনী বাবুও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লীলাকে প্রবোধ দিবেন কি? তিনিই কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

কলিকাতা-সহরে কোনও বাটীতে কোনও ঘটনা হইলে, প্রতিবেশীরা তাহার বড় একটা সংবাদ জানিতে পারেন না। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর লোকেরও তাহা অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সে-প্রকার হয় না। পল্লীগ্রামে যদি কোনও বাটীতে সামান্য কোনও ঘটনা ঘটে, তাহা প্রতিবেশীরা সকলেই জানিতে পারে, এবং উক্ত সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া প্রচণ্ড বাতাসের ন্যায় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌছে। লীলার ক্রন্দন শুনিয়া অনেক ব্যক্তি হরনাথবাবুর বাটীর অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অনেক দিন কেহ এ-দিকে আসে নাই। রাত্রিতে হরনাথ-বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিতেও লোকে ভয় পাইত। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, হরনাথ-বাবু "ভূত" হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রে মানুষ দেখিতে পাইলেই নিশ্চয় তিনি তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবেন। কিন্তু দিনের বেলায় ভূতে আর কি করিতে পারিবে?—এই সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাসিগণ একত্রিত হইয়া হরনাথবাবুর বাটীর দিকে গমন করিল। বিশেষতঃ তাহাদের কৌতুহল,—এই পরিত্যক্ত বিবর্জ্জিত ভগ্ন কুটীরে হঠাৎ কে উচ্চ ক্রন্দন করিতেছে! ভূত, না, মানুষ? এই কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্যই অধিকাংশ লোক তথায় উপস্থিত হইল।

যখন সকলে জানিল, যে-রমণীটী ক্রন্দন করিতেছে সে তাহাদের চিরপরিচিত সুহৃদ্ হরনাথ রায়ের পুত্রবধু, তখন তাহাদের

কৌতূহল আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তখন আরও দলে দলে নরনারী সুধীরের বৌকে দেখিতে আসিল। কত লোকে কত কথা, কত প্রশ্ন করিতে লাগিল। একজন বর্ষীয়সী রমণী বলিল, "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে বাছা! দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না! এখন কাঁদ্‌লে কি আর সে ফিরে আস্‌বে? সে কি আর আছে?"

ওগো সে আছে গো, আছে! সে নেই তোমরা বলিও না। তাহা হইলে অভাগিনী লীলা আর বাঁচিবে না। সে আছে, সে আবার আসিবে,—সেই আশায় হতভাগিনী জীবনধারণ করিয়া আছে। নচেৎ তাহার ক্ষীণ দেহপিঞ্জর হইতে জীবন-বিহঙ্গ কবে উড়িয়া যাইত!

অপর একজন বলিল, "আহা বাছা, যে শ্বশুর তোমার ছেল! লোকে অনেক তপিস্যে কর্‌লে তবে অমন শ্বশুর পায়। ঠিক্ দশ-রথের মত শ্বশুর! বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে ঘর-কন্না কর্‌বে,—বুড়োর কত সাধ! তা এমন বৌ হ'ল যে বুড়োকে একদিনের তরেও বৌ নিয়ে ঘর কর্‌তে হ'ল না।" আর একজন বলিল, "তখন যদি আস্‌তে বাছা, তা হ'লে আর এমন সোনার সংসারটা ছারখার হয়ে যেত না। ছেলেটা বিরাগী হয়ে গেল, না আপ্পঘাতি (আত্মহত্যা) হ'ল, তা কেউ জান্‌ল না! বেটার শোকে বুড়ো মধুমতীতে ডুবে ম'ল! তোমার দোষেই ত বাছা, সব ছন্ন ভন্ন হ'ল। এখন আর কেঁদে কি করবে? এখন যতই কাঁদ, যতই বুক চাপ্‌ড়াও, আর তারা ফির্‌বে না!"

এইরূপে লীলার ক্ষত অঙ্গে লবণ-প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিবেশিগণ একে একে প্রস্থান করিল। যামিনীবাবু ব্যথিত হইয়া লীলাকে বলিলেন, "লীলা, চল মা, ফিরে যাই। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে! মানুষের ত কোনো হাত নেই? সব ত শুন্‌লে? আর উপায় কি আছে মা?"

লীলা। কাকা, আপ্‌নি চলে যান্। আমি এখান থেকে আর ফিরে যাব না। এ আমার তপস্যা-ভূমি—তীর্থ স্থান। আমি এই খানে—এই মাটীর সঙ্গে আমার মাটীর দেহ মিশিয়ে ফেল্‌বো। আমি আর কোথাও যাব না।

যা। ছিঃ—মা, ও সব পাগলের মতন কথা কেন বল্‌ছ? এখানে কা'র কাছে আমি তোমায় ফেলে যাব?

লীলা। কাকা, আমার শ্বশুর মধুমতীতে ডুবে মরেছেন, আমিও তাই মর্‌ব। এ পৃথিবীতে আর আমার জুড়ুবার স্থান কোথায়?

যামিনী। লীলা! সুধীরের যে মৃত্যু হয়েছে, এর ত কোনও প্রমাণ নেই? হয় ত, তুমি যা বল্‌ছ তাই হতে পারে; একদিন সে ফিরে আস্‌তে পারে। আত্মহত্যা কর্‌লে ত আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না, মা! ছিঃ তুমি এমন বুদ্ধিমতী হ'য়ে এ-রকম কথা মুখে এন না!

লীলার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছিল না যে, এখান হইতে ফিরিয়া যায়। এখানকার প্রত্যেক অণুকণাটীর সহিত সে মিশিয়া যাইতে চাহে। তাহার ইচ্ছা তাহার এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ এই স্থানের ধূলিরাশির মধ্যে মিশিয়া যাউক্। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মৃত্যুকে ডাকিলেই মৃত্যু আসে না। তাহার আসিবার সময় হইলে, কাহারও অনুরোধে সে ফিরিয়া যায় না।

যামিনীবাবু বলিলেন, "চল, দিন-কতক ডেরাডুনে বেড়িয়ে আস্‌বে। আমার কথা শোন। ইত্যাদি।" অনেক বলা-কহার পর, অনেক বুঝাইয়া তবে যামিনীবাবু লীলাকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন। পাড়ার একজন মাতব্বর লোকের হাতে কিছু টাকা দিয়া তিনি বলিয়া গেলেন, "যদি কখনও সুধীরের কোনও সংবাদ তিনি পান, তাহা হইলে ডেরাডুনে তাঁহাকে অবিলম্বে টেলীগ্রাম করিতে; এবং যদি কেহ তাঁহাকে সুধীরের সংবাদ দিতে পারে, তাহাকে তিনি প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

(১৬)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবিকরতাপে ধরণী এখনও অত্যুত্তপ্তা। মধুমতীর প্রবল বারিরাশি এখন ধীর স্থির; ক্ষীণ-কলেবর! সূর্য্যদেব দিবসের কার্য্যান্তে বিশ্রাম-লাভের আশায় পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী তাঁহারই প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পক্ষিকুল শাখায় বসিয়া কলস্বরে গান করিতেছে। ঝাউ- ও অশ্বত্থ-বৃক্ষসকল সন্‌সন্-শব্দে নদীতীর মুখরিত করিতেছে। জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, বৃদ্ধ হরনাথবাবু নদীতীরে একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহার আর এখন যৌবনের সে উদ্দাম নাই, উৎসাহ নাই, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ নাই! পুত্র-বিরহাতুর বৃদ্ধ জীবন্মৃতবৎ দিনযাপন করিতেছেন। সুধীর সেই যে স্ত্রীকে আনিতে বাটী হইতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। আর তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও সে আসে নাই। আশায়, আশায় বৃদ্ধের কত দিন কাটিয়াছে!—প্রতিপলে, প্রতিদণ্ডে, প্রত্যেক শব্দটীতে বৃদ্ধ ভাবিয়াছেন, "ঐ বুঝি সুধীর আসিতেছে!" কিন্তু হায়! কোথায় সুধীর! বৃদ্ধের সকল আশা আকাশকুসুমে পরিণত হইয়া যায়! বহির্জগতের সহিত বৃদ্ধের আর বড় একটা সম্বন্ধ নাই। অন্তর্জগৎ লইয়াই তিনি এখন অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ কেহ তাঁহাকে ডাকিলে উত্তরই পায় না; অথবা প্রশ্নের বিপরীত উত্তর পাইয়া থাকে।

হরনাথবাবু এখনও তাঁহার নদীতীরটির মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এ-স্থানটী তাঁহার বড়ই প্রিয়! প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় যষ্টিভর করিয়া একাকী আসিয়া এইখানে তিনি বসিয়া থাকেন! আজিও সেইরূপ একাকী বসিয়া তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যও অস্ত গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন! আর ভাবিতেছিলেন, কবে শিশু সুধীর কোন্ কথাটী তাঁহাকে বলিয়াছিল, কোন্ কাজটী করিয়াছিল; কোন্ কোন্ তারিখে তাহার পাশের খবর বাহির হইয়াছিল! সেই যখন সে প্রথম কলিকাতায় যায়, তখন সে পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া পত্র লিখিয়াছিল। একবার সেই যখন তাহার বড় জ্বর হইয়াছিল, সেই যখন সে একাকী মেসের কক্ষমধ্যে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল

এবং "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছিল ও মুদ্রিতনেত্র হইতে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল, তখন হরনাথবাবু সেখানে উপস্থিত হইলে, সুধীর পিতাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল! পিতাকে দেখিয়া তাহার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল! আর আজি সেই সুধীর কেমন করিয়া সকল মমতা বিস্মৃত হইল!

ওরে তুই যে বৃদ্ধের যষ্টি, অন্ধের চক্ষু, দরিদ্রের রত্ন, কত সাধনার ধন! তুই কেমন করিয়া আজি বৃদ্ধকে ফেলিয়া চলিয়া গেলি? হা রে অবোধ সন্তান! তুই পিতার বেদনা বুঝিলি না! পিতার এ বুকভরা ভালবাসার কি এই প্রতিদান দিলি? সকল মমতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া তুই পলায়ন করিলি? কোথায় গেলি? আয় ফিরে আয়! ওরে তোকে বুকে নেবার জন্য যে স্নেহভরা একখানা প্রশস্ত বুক হাহা করিতেছে! তোকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুইখানি বাহু যে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে! কোথায় গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

রাজলক্ষ্মি! তুমি আজি কোথায়? তোমার এত আদরের সুধীর আজি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি দেখিলে না! অথবা তুমি গিয়াছ, বেশ করিয়াছ। তুমি যেখানে গিয়াছ, সেখানে শোক-তাপ নাই; জরা-মৃত্যু নাই; বিচ্ছেদ-বেদনা নাই! সে যে অমৃতময় লোক! শুধু সুখ, শুধু শান্তি! এখানে থাকিলে ত এমনই করিয়া পুত্রবিচ্ছেদে অন্তর দগ্ধ হইত! অথবা তুমি থাকিলে বুঝি বা তোমার সুধীর তোমার মায়া কাটাইয়া এমন করিয়া যাইতে পারিত না!

দূরে সেতু-বক্ষে বাষ্প-শকট গমনাগমন করিতেছিল, ছোট ছোট বাষ্পপোতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রদ্বারা বারিমন্থন করিয়া হু-হু শব্দে ছুটিতেছিল। তরণীগুলি কেহ পাল তুলিয়া, কেহ হাল বাহিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছিল। বৃদ্ধ হরনাথ বালকের ন্যায় তদগতচিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন "ঐ যে শত শত ব্যক্তিকে বহন করিয়া উহারা চলিয়াছে, উহার মধ্যে কি সেই একজন নাই? সেই একখানা মুখ! সে মুখ, সে দেহের ভার বহন করিতে কি উহারা সমর্থ হয় না? এত লোককে বহিয়া আনিতেছে, আর শুধু সেই একজনকে কি আনিতে পারে না? ঐ যে অত লোকের মুখ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে কি সেই একখানা মুখ নাই?' বৃদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ও:—আর যে পারি না! ওরে তুই কোথায় গেলি? আয়, একবার আয়; একবার দেখা দিয়ে যা! আমি তোর কি করেছি রে যে, তুই আমাকে ছেড়ে চলে গেলি? ওরে একবার এসে আমায় 'বাবা' ব'লে ডাক্।"

বৃদ্ধ আবেগভরে কথাগুলি বলিয়া ফেলিলেন। ঠিক্ এমনই সময়, তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথ-বাবুর হৃদয় দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ কি এ! এ কা'র কণ্ঠস্বর? তিনি কি জাগ্রৎ, না নিদ্রিত? তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? এ স্বর যে তাঁহার চিরপরিচিত! তাঁহার হৃদয়-কন্দরে যে প্রতিনিয়ত এই স্বর প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। বুঝি, সেই প্রতিধ্বনিই বাস্তবভাবে প্রকাশিত হইয়া কর্ণপথে প্রবেশ করিল! আবার সেই কণ্ঠস্বর! আবার কে ডাকিল, "বাবা!" হরনাথবাবুর চিত্ত আরও অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিলেন, ফিরিয়া চাহিলে যদি এ সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়? আহা! এ মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ যে শীতল করিয়া দিল! বৃদ্ধ নীরব, নিশ্চল, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন। তখন পশ্চাদ্দেশস্থিত ব্যক্তি বলিল, "বাবা, আমি এসেছি। আমায় ক্ষমা করুন্।"

আর কি হরনাথবাবু স্থির থাকিতে পারেন! যাহার মুখ দেখিবার জন্য তিনি দিবানিশি উন্মত্তবৎ হইয়া আছেন, যাহার কথা শুনিবার জন্য তাহার সমস্ত জীবনটা আকুল, যাহার বিচ্ছেদে তাঁহার জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মনে হইতেছিল, সেই আসিয়া "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, আবার ক্ষমা চাহিতেছে, পুত্রগতপ্রাণ বৃদ্ধ আর কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

তীরবৎ ফিরিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাহা দেখিলেন, তাঁহার ক্ষীণদেহে তত আনন্দ নিশ্চল ভাবে সহ্য করা দুরূহ! আনন্দে, উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হইতেছিলেন। আগন্তুক অতিযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন বৃদ্ধ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; ভাবিলেন, বুঝি, ছাড়িয়া দিলে আবার সে ফাঁকি দিয়া পলাইবে! তাই তাহাকে সজোরে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, বুক চিরিয়া বুকের ভিতরে তাহাকে লুকাইয়া রাখেন! আগন্তুক অপর কেহই নহে; সে সেই আমাদের সুধীর।

(১৭)

দৈব-দুর্ব্বিপাকে সুধীর কারারুদ্ধ হইয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে সে 'ল'-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। তজ্জন্য সে রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুরের নিকটে যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ক্রোধে সে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কিরূপে সে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবে, কি প্রকারে অবিনাশবাবুর এ অপমানের প্রতিশোধ দিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। নিজের পিতার উপরেও তাহার বড় রাগ হইল। কেন তিনি ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন? শ্বশুর যদি পিতার সমকক্ষ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধ্য হইত কি যে, সুধীরকে এরূপ ভাবে অপমান করেন? শেষে যতটা রাগ, যতটা অপরাধ গেল লীলার ঘাড়ে। লীলাকে বিবাহ করিয়াই ত তাহাকে এতটা অপমান সহ্য করিতে হইল। তাহার জন্যই ত এত কাণ্ড! তাই সে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল: এ জীবনে আর লীলার মুখ দর্শন করিবে না। অবিনাশবাবুর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সুধীর আর গৃহে ফিরিল না। কোনও বন্ধুর সাহায্যে সে ইংলণ্ডে গমন করিল। তথায় কয়েকবৎসর থাকিয়া আই, এম্, এস্,-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'সিভিল সার্জ্জন' হইয়া সে ভারতে প্রত্যাগমন করিল।

কার্য্যস্থলে পিতাকে লইয়া যাইবে বলিয়া সুধীর বাটী আসিয়াছিল। লীলা যখন কমলা-

পুরে আসিয়াছিল, তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীর আসিয়া হরনাথবাবুকে লইয়া গিয়াছিল। সুধীর সন্ধ্যাকালে আসিয়া রাত্রের ট্রেনেই পিতাকে লইয়া যায়। গ্রামের কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয় নাই। পরদিবস হইতে কেহ আর হরনাথবাবুকে দেখিতে পাইল না। কাজেই তাহারা অনুমান করিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধ মধুমতীতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। জনরব চিরদিন যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপ ঘটিল। কেহ কেহ বলিল, তাহারা হরনাথবাবুকে নদীতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছে, আবার কেহ বা বলিল, তাহারা বৃদ্ধকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রবল তরঙ্গে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, তাহারা আর দেখিতে পাইল না।

সুধীর পিতাকে লইয়া কার্য্যস্থলে চলিয়া গেল, কিন্তু লীলাকে কোনও সংবাদ দিল না। নির্ব্বোধ যুবক সরলা সাধ্বীর মর্ম্মবেদনা বুঝিল না। দুরন্ত ক্রোধ ও অভিমান তাহাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য করিয়াছিল। সুধীর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য গ্রহণ করিয়া লাহোরে গমন করিলে, অত্যল্পকাল-মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যায় তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও তাহার সমকক্ষ ছিল না। এতদিনে সুধীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। সংসারের মধ্যে সে এখন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বৃদ্ধ পিতারও এখন চরম সুখ। তাঁহার সুদীর্ঘ সন্তান-বিচ্ছেদের যাতনা এখন সুখের পূর্ণমাত্রা প্রদান করিল। এ সুখের অধিকারে কেবলমাত্র একজন বঞ্চিত হইল। সে অভাগিনী লীলা! হরনাথবাবু একবার সুধীরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, যাই হউক্, ভগবানের কৃপায় মানুষ হয়েছ; এইবার বৌমাকে নিয়ে আসা যাক্।" তাহাতে সুধীর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়াছিল, "নিষ্প্রয়োজন!" তাহার পর ভয়ে আর কোন কথা বলিতে বৃদ্ধ সমর্থ হ'ন্ নাই। পাছে আবার তাঁহার পুত্রবিচ্ছেদ ঘটে!

বিনা অপরাধে সরলা রমণী পরিত্যক্তা হইল! হায়! এ-সংসারে মানুষ ভ্রমে পতিত হইয়া কত সময়ে যে কত অবৈধ কার্য্য করিয়া বসে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। এই বুদ্ধি লইয়া মানুষ আবার আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে! ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র কার্য্য! এই ক্ষুদ্র কার্য্যকে মানুষ একটা অনন্ত অসীম কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মানুষের বুদ্ধি-ভ্রংশ পদে পদে! রোগ-শোক-বিপৎ-সঙ্কুল পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের ক্রীড়ার পুত্তলিকা। তাঁহারই ইচ্ছায় জীব চালিত হয়। কিন্তু হায়, মানুষ সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। মানুষের "অহং"-বুদ্ধি যে অতি-প্রবল! (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সুসার ও অসার।

ফেনপুঞ্জ ভাসি'রয় সাগরের জলে।
রতন লুকায়ে থাকে সুগভীর তলে॥
অসার নিয়ত নিজে প্রকাশিতে চায়।
সুসার গোপনে রহে দীপ্ত মহিমায়॥

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ছাগশিশুর উক্তি।

অমার আঁধারে আজ এলি মা গো ধরণীতে,
ভবের তমসা নাশি জ্ঞানের আলোক দিতে।
তাই আজ বিশ্ব জুড়ে এত সুখ, এত প্রীতি ;
তাই বাজে ঘরে ঘরে তোর আগমনী-গীতি !
তাই আজ বেশভূষা, তাই এত আড়ম্বর !
আমি কি মা, বিনা দোষে যাব শুধু যমঘর !
সবারি আননে আজ শোভিছে হাসির রেখা ;
আমি শুধু হেরিতেছি মরণের বিভীষিকা !
আজি এ সুখের দিনে মোর প্রাণ-দণ্ড হবে ?
তোরি রাঙা পাদু'খানি আমার শোণিতে ধোবে!
লোকে বলে বধি মোরে তোর ভোগ প্রয়োজন;
সবে বলে ছাগরক্তে মা মোদের তুষ্ট হ'ন !
যদি মা গো সত্য হোস্, বল্ তবে সত্য করে,
আপন সন্তান-রক্ত মা কি কভু খেতে পারে ?
তাহা হ'লে তুই তবে মাতা ন'স্ কোনোমতে,
রাক্ষসী পিশাচী তুই, এসেছিস্ ছেলে খেতে !
আমি মা গো ছোটছেলে, জননীর স্নেহাধান !
ছিনায়ে এনেছে মোরে দেবে বলে বলিদান !
কি আর কহিব তোরে, এ বিপদে রক্ষা কর !
ছেড়ে দে মা, ফিরে যাব, এই শুধু চাহি বর।
অভয়া, অভয়া হয়ে ভয়ার্ত্তেরে দে মা ত্রাণ !
যতদিন বেঁচে র'ব গা'ব তোর জয়গান ॥"

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভয়।

মরণের ভেরী শুনে রে অবোধ—
শঙ্কিত তোর চিত্ত !
মৃত্যু-রাজের দণ্ড দেখিয়া
শিহরি উঠিস্ নিত্য !
কি যে অমরতা মরণের মাঝে,
কি যে আশ্বাস ঐখানে রাজে !—
ও নহে মরণ—জীবনের শেষ— !
তবে কেন তোর চিত্ত,
মৃত্যুর ঘন কাল ছায়া দেখি
শিহরি উঠিছে নিত্য ?

মরণ সে নহে জীবনের লয়,
নহে জীবনের সাঙ্গ ;
মৃত্যু সে আসি জীবনের খেলা—
করে না-ক কভু ভঙ্গ।
সে আসিয়া কভু জীবনের খেলা,
ভেঙ্গে নাহি দেয় মরতের মেলা ;
সে আসিয়া কভু জীবনের সাথে
করে না নিঠুর রঙ্গ ;
মরণ আসিয়া জীবনের খেলা
করে না-ক কভু ভঙ্গ।

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ ;
সে যে জীবনের মাঝখানে আছে—
চিরদিন অবরুদ্ধ !
মৃত্যু নহে রে জীবনের শেষ ;—
নব-জীবনের নব উন্মেষ !—
ফুটে উঠে ঐ দামামার তালে
হোথা উঠে তার শব্দ !

মৃত্যু সে যে রে জীবনের সাথে
স্নেহ-শৃঙ্খল-বদ্ধ।

মৃত্যু সে করে নব-জীবনের,
নব-গঠনের সৃষ্টি!
ওরে অবোধ! বারেক সেদিকে
ফিরারে ও তোর দৃষ্টি!
মরণের মাঝে ঐ শুনা যায়—
নব-জীবনের নব পরিচয়!
সে রোষ-কুটিল নয়ন মেলিয়া
করে না অনল বৃষ্টি;
সে সদাই ঐ করুণ নয়নে
করিছে অভয় দৃষ্টি!

তবে কেন ওরে অবোধ অন্ধ,
শঙ্কিত তোর চিত্ত?
তবে কেন তুই মরণের নামে
শিহরি উঠিস্ নিত্য?
মরণ সে শুধু জীবনের পরে
নব জীবনের নব বেশ ধরে;
আসে ফিরে ফিরে,
চলে যায় পুনঃ
এমনি করিয়া নিত্য!
এ সকল দেখি তবু রে অবোধ,
শঙ্কিত কেন চিত্ত?

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাপ ও আলোক।

তাপ ও আলোকের ভাণ্ডার সূর্য্য। এই সূর্য্যের কথা একটু বলি। সূর্য্য আমাদের বহুদূরে আছেন। তিনি এত দূরে না থাকিলে আমরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে পারিতাম না। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রেলগাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল চলিতে পারে, সেই রেলগাড়ীর পৃথিবী হইতে সূর্য্যে পৌছিতে ৩৫৩ বৎসর লাগে। মানুষের পরমায়ু হারাহারি ৭০ বৎসর ধরিলে, ৫ পুরুষ লাগে। এইরূপ দ্রুতগামী গাড়ী পৃথিবীকে এক মাসে ঘুরিতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকে ঘুরিতে তাহার দশ বৎসর লাগে। আমাদের পৃথিবী যেমন লাটিমের মত ঘোরে, সূর্য্যও সেইরূপ ঘোরেন্। পৃথিবীর লাগে ২৪ ঘণ্টা; সূর্য্যের লাগে ২৫ দিন। এখন ভেবে দেখ, সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে কত বড়! পৃথিবীর চারিদিকে যেমন আকাশ (Atmosphere) আছে, সূর্য্যের চারিদিকেও সেইরূপ আকাশ (Photosphere) আছে। এই আকাশ জ্যোতিঃ এবং তেজে পূর্ণ। আমাদের আকাশ ২৫ মাইল ঘন, সূর্য্যের আকাশ ৫০০০০০ (পাঁচ লক্ষ) মাইল ঘন। সূর্য্য 'Photosphere' সহ আমাদের পৃথিবী হইতে এক কোটি ত্রিশলক্ষ গুণে বড়।

সূর্য্যেতে এত তাপ যে, সেখানে সমস্ত পদার্থ বাষ্প হইয়া যায়। এই বাষ্প অগ্নিময়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের উপাদান

জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের উপরিভাগের একবর্গ গজ হইতে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা ছয় 'টন' পরিমাণের তাপের সমান। ১টন প্রায় ২॥ মণ। সূর্য্যের আলোকঠ বা কর্ত চূণের গোলা Hydrogen এবং Oxygen মিশ্রিত অগ্নিশিখায় পোড়াইলে এমন আলো হয় যে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। এমন উজ্জ্বল গোলা সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে একটি কাল গোলার মতন দেখায়।

সূর্য্য-কিরণ সৌরজগতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে। সেজন্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষাকৃত অতিশয় অল্প তেজ পায়। সূর্য্যের তেজকে যদি দুইশত সাতাশ মিলিয়ন অর্থাৎ বাইশ কোটি সত্তর লক্ষ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে তা'র মধ্যে পৃথিবী একটি ভাগমাত্র পায়।

সূর্য্যের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয় ? আমরা সকলেই মোটামুটি জানি, সূর্য্য আলোক ও বাষ্প দেন ; কিন্তু এ বিষয়ের বৃত্তান্ত সকলে জানে না। আলোক এবং উত্তাপ ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচে না। যেখানে যতপ্রকার তাপ আছে, কি আমাদের শরীরে, কি আমাদের বাহিরে, সে সমস্তই সূর্য্য-তেজের অংশ। এই তেজ আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে এবং সমস্ত শারীরিক-যন্ত্রচালনায় সহায়তা করে। সূর্য্যতেজে ও আলোকের ফলে উদ্ভিদের এমন নয়নতৃপ্তিকর সবুজবর্ণ হয়। এই বর্ণ আমাদের জীবনের বহু উপকারী। সূর্য্যতেজের chemical বা রাসায়নিক শক্তির দ্বারা carbonকে oxygen হইতে বাহির করিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীবের জীবন রক্ষা হয়। আমাদের দেহযন্ত্র সূর্য্যের শক্তিতেই চলে।

আহা ! আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর জন্য কৃপাময় বিধাতা এতবড় বিশাল সূর্য্য এবং সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ?

"তাঁর গুণে পূর্ণ জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা !
প্রকাশে জগৎ তাঁর মহিমার কণিকা।"

আলোক।

যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য খাইলে আর পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলেও আলোকের অভাবে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি না। আলোক ও উত্তাপ পরস্পর সংযুক্ত। সেইজন্য ঘরের দীপ নিবাইলে ঘর ঠাণ্ডা হয় ; আলোকের অভাবেই রাত্রি দিন অপেক্ষা ঠাণ্ডা।

মাঠে দূর্ব্বা-ঘাসের উপর একখানা ইট রাখিয়া কয়েক দিন পরে তাহা তুলিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, ঘাসগুলি হল্‌দে বা ফ্যাকাসে-বর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাসগুলা অনেক দিন চাপা থাকিলে একেবারে মরিয়া যায়। যে-সকল গাছ ও শাকসব্জি আওতায় পড়ে, সেগুলা একেবারে মরিয়া না গেলেও, ভালরূপ হয় না। অন্ধকার ঘরে বা সঙ্কীর্ণ সহরে যাহারা বাস করে, তাহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। পূর্ব্বকালে বন্দীদিগকে জমির মধ্যে অন্ধকার ঘরে রাখা হইত। তাহারা খাদ্য এবং বাতাস পাইয়াও শীঘ্র মরিয়া যাইত। অন্ধকার ঘরে থাকিলে কেবল যে বর্ণ বিবর্ণ হয়, তাহা নয় ; সমস্ত শরীর দুর্ব্বল হয় এবং রোগ-প্রবণতা বাড়ে।

আলোকের অভাবে এরূপ কেন হয় ? গাছ বাতাস হইতে Carbonic Acid এবং ভূমি হইতে লবণ ও জল লইয়া আপনার দেহ গঠিত করে। প্রথমে 'কারবন'কে

(কয়লা) চিনি করে; চিনির দ্বারা গাছের কাষ্ঠ ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এই জন্য সকল গাছের মধ্যে এত (starch) শ্বেতসার। শ্বেতসার পুড়ালে চিনি হয়। চিনি করিবার কল—গাছের সবুজ পাতা। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা গাছের পাতা দেখিলে দেখা যায় যে, পত্রের কতক অংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা আছে। এই গোলাগুলিই চিনি করিবার কল। সূর্য্যালোক এই কলকে নির্ম্মাণ করে এবং চালায়। গাছের সবুজবর্ণ বাতাস হইতে Carbon লইয়া oxygen ছাড়িয়া দেয় বলে, বাতাস পরিষ্কার হয় এবং উহা আমাদের দেহের নানাপ্রকার কাজ করে।

যেমন গাছ-সম্বন্ধে তেমনি আমাদের রক্ত-সম্বন্ধেও সূর্য্যালোকের প্রয়োজন। রক্তে (serum সিরম আছে। 'ব্লিষ্টারের' ফোস্কা গলে যে প্রকার রস বাহির হয়, সিরম সেই প্রকার। এই সিরমে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল গোলা এবং অল্পসংখ্যক সাদা গোলা আছে। লাল গোলার বর্ণই রক্তের বর্ণ। যে রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, সাদা গোলাগুলি তাহা নষ্ট করে। রক্তের বর্ণ যতই লাল হয়, ততই ভাল। রক্তবর্ণই আমাদের মাংস ও ত্বকের বর্ণ। সূর্য্যের আলোক আমাদের শরীরে পড়িলে, আমাদের শরীর একপ্রকারে উত্তেজিত হইয়া লাল রক্ত তৈয়ারি করে। লাল রক্ত ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য ভাল জীর্ণ হয় না এবং আমাদের নিঃশ্বাসের ঠিক্ রকম কাজ হয় না। সেজন্য আমরা দুর্ব্বল হই এবং আমাদের বর্ণ পাণ্ডু হয়। যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যালোক ও তাপের প্রয়োজন। কিন্তু অতিশয় আলোক বা তেজ মহানিষ্টকর। এমন কি সময়ে সময়ে তাহাতে আমরা মরিয়া যাইতে পারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

কি নাই আমার?

১

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে প্রিয় পরিজন, সহায়-সম্বল-ধন,
যতন-সোহাগ-স্নেহ নিকটে সবার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

২

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
দিলে রম্য সুশোভন, কি প্রাসাদ অতুলন,
দাসদাসী অগণন নিতে সেবা-ভার;—
তা'র বেশী ও চরণে কি চাহিব আর?

৩

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
মিটাতে প্রবল তৃষা, রহে প্রাণে ভালবাসা;
সন্তোষ-সান্ত্বনা দিলে আরাম অপার;—
তা'র বেশী ও-চরণে কি চাহিব আর?

৪

কি নাই আমার প্রভো! কি নাই আমার?
করিলেও এত দান, সবি ভগ্ন, সবি ম্লান!
দাও নি "জীবন" যে গো যা' রহে সবার!—
"সার্থক-জীবন" বিনা নাহি চাহিবার।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

লাবপুর।

ইহা বীরভূম-জেলার সিউড়ী-মহকুমা-ভুক্ত একটী গ্রামমাত্র। আদমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহা প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোক-সংখ্যা ৭৫০। এখানে একটী এন্‌ট্রেনস স্কুল, একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা-বিদ্যালয়, একটী সংস্কৃত টোল, একটী চিকিৎসালয়, সব-রেজেষ্টারি অফিস, পুলিস ষ্টেশন এবং পোষ্ট-অফিস্ আছে। গ্রামটী পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। প্রবাদ এইরূপ যে, সতীর ওষ্ঠাধর এখানে পতিত হয়। এখানকার ফুল্লরাদেবীর মন্দির অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের সংলগ্নীভূত একটী স্থানে শৃগালগণকে আহার দেওয়া হয়। জীবের প্রতি হিন্দুদিগের কিরূপ দয়া, তাহাই দেখাইবার জন্য, বোধ হয়, শিবা-ভোগ হইয়া থাকে। ভাতই ভোগের উপকরণ। শৃগাল যাহা খাইতে না পারিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাই হিন্দুগণ প্রসাদ বলিয়া ভক্ষণ করে। শৃগাল-গুলি একপ্রকার পোষা বলিলেই হয়। রূপী সুপী বলিয়া ডাকিলেই তাহারা সন্নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া নিকটে আগমন করে। মন্দিরের সন্নিকটে ৩০০ বিঘা জমি লইয়া একটী শুষ্ক হ্রদ আছে। ইহা 'দল-দল'-নামে খ্যাত। ইহার কোনও স্থানের উপর দণ্ডায়মান হইলে অনেকটা স্থান স্পন্দিত হইতে থাকে বলিয়া ইহার নাম 'দল-দল' হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহাই রামায়ণোক্ত দেবী-দহ। এইস্থান হইতেই রামচন্দ্র নীলপদ্ম লইয়া দুর্গা-দেবীর পূজা করেন।

নলহাটী।

বীরভূম-জেলার অন্তঃপাতী রামপুরহাট-মহকুমার ইহা একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২৬৩৬। এখানে একটী পুলিস ষ্টেশন, সব-রেজেষ্টারী অফিস, মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয়, ইন্‌সপেক্‌সন বাঙ্গালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। স্থানটী চালের মণ্ডী। চালের ব্যবসায় ব্যতীত এস্থানে কাঁসা ও পিত্তলের দ্রব্যাদিরও ভূরি বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা রাজা নলের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ সহরের সন্নিকটে 'নলহাটী জীলা'-নামক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দৃষ্ট হয়। এখানে মুসলমানগণের সহিত হিন্দু রাজার ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পাহাড়ের নিম্নভাগে একটী শীতল নির্ঝরিণী আছে। অপর প্রবাদ এই যে, সতীর কণ্ঠদেশ এখানে পতিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'নল' হইয়াছে। এখানকার মন্দিরটী 'ললাটেশ্বরী'-নামে খ্যাত। অন্য প্রবাদ এই যে, সতীর ললাটদেশ এস্থানে পতিত হয়। যাহা হউক, স্থানটী যে পীঠস্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-জেলার লাল-মহকুমায় ভাগীরথীর পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে কিরীটেশ্বরীর মন্দির আছে বলিয়া সেই নামে গ্রামটীর নামকরণ হইয়াছে। এখানে সতীর কিরীট পতিত হয়। ভবিষ্য পুরাণে ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে এ বিষয়ের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিরীটাস্থিটী লাল রেশম দ্বারা

আচ্ছাদিত থাকে। সুতরাং, লোকে তাহা দেখিতে পায় না। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটীতে ১৭৬৮ খৃ খোদিত আছে। মন্দিরগুলির সংস্কার আবশ্যক।

জল্পেশ।

ইহা জলপাইগুড়ি-জেলার দক্ষিণে ময়ণা-গুড়ি পরগণার একটী গ্রামমাত্র। লোক-সংখ্যা ২০৮৮। এখানে শিবের মন্দির অবস্থিত। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণনারায়ণ-নামক জনৈক কুচবিহারের রাজার দ্বারা যে পুরাতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানের উপর উক্ত মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর। উপরের খিলানটীর ব্যাস ৩৪ ফিট। মন্দিরটী ঝরোদা-নদী-তটে অবস্থিত এবং খাত-দ্বারা পরিব্যাপ্ত।

এখানকার শিবলিঙ্গটী অনাদি বলিয়া কালিকা-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। শিবরাত্রের সময় এখানে একটী মেলা হয়। মেলাটী তিন সপ্তাহ থাকে। জেলার সকল স্থান হইতে এই মেলায় লোক সমাগত হয়। এতদ্ব্যতীত রংপুর, দিনাজপুর হইতেও লোক আসিতে দেখা যায়। ভুটিয়াগণ দার্জ্জিলিং, বক্সা এবং ভুটান হইতে কাপড়, কম্বল, টাট্টু এবং চাম্‌ড়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে এবং কার্পাস, উলীবস্ত্র, পান এবং তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। মেলাটী খুব জাঁকাল হইয়া থাকে।

বক্‌সর-(বাঘসর)।

ইহা সাহাবাদ-জেলার একটী সহরমাত্র। ইহা গঙ্গানদী-তটে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ১৩৯৪৫। স্থানটী কলিকাতা হইতে ৪১১ মাইল দূরবর্ত্তী। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বারা যাত্রিগণ বক্‌সরে যাইয়া থাকে। সহরটী বাণিজ্যের কেন্দ্র।

বেদ-প্রণেতা অনেক ঋষিই বক্‌সরে বাস করিতেন বলিয়া ইহার পৌরাণিক নাম 'বেদগর্ভ'। অন্য প্রবাদ এই যে, বক্‌সর-নামটী 'অঘসর' নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অঘসর-নামে এখানে একটী পুষ্করিণী আছে। অঘসরের অর্থ পাপ-বিমোচক। কালে অঘসর বঘসরে পরিণত হইয়াছে। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বেদশীরা নামে জনৈক ঋষি দুর্ব্বাষা'কে ভীত করিবার নিমিত্ত ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহাকে সেই ব্যাঘ্র-মূর্ত্তিতেই থাকিতে হয়। অনন্তর তিনি অঘসরে স্নান করিয়া গৌরীশঙ্করের পূজা করিলে স্বীয় পূর্ব্বরূপ ধারণ করেন। পরন্তু তিনি স্বীয় ব্যাঘ্রমূর্ত্তি-পরিগ্রহের স্মৃতি রাখিবার জন্য স্থানটীকে 'ব্যাঘ্রসর' বা 'বাঘসর'-আখ্যা দেন। বক্‌সরের নানা স্থান নানা নামে খ্যাত। যথা—রামেশ্বর, বিশ্বামিত্রের অশ্রম এবং পরশুরাম। এখানকার রামেশ্বর-নাথ মহাদেবের একটী বিখ্যাত মন্দির আছে। দূর দূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

বকসরে অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউ-দ্দৌলা এবং বঙ্গের স্বাধীন নবাব মীরকাসিম পরাজিত হ'ন্।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পরিচয়।

এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি ;
তুমি সীমার মাঝারে অসীম হইয়া
সম্মুখে আসো গো নামি !
তুমি বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে আমার
হঠাৎ কখন আসি,
অন্তর-মাঝে গোপন থাকিয়া
বহু কথা ভালবাসি !
তুমি মথিত কর গো হৃদয় আমার
দারুণ আঘাত দিয়া,
তুমি অন্তর-মাঝে তুষানল জাল
পূত করিবারে হিয়া !
তুমি নির্ম্মল নীল শরদ্-গগনে
চন্দ্রকিরণে ভাস ;
মধুমাসে তুমি দখিন পবন
বেয়ে বেয়ে কাছে আস !
রক্ত রঙীন ফাগুয়ার মত
উদয়-অচল হ'তে,
পূর্ব্ব তোরণে হাসিয়া দাঁড়াও
সোনার কিরণ সাথে !
গোধূলির ধূলি মাখিয়া তুমি গো
দেখাও কতই রঙ্গ ;
শেষে সন্ধ্যার মাঝে লুকাইতে চাও
আঁধারে আবরি অঙ্গ !
সেই সে তুমি গো অন্তরে মোর
আছ অন্তরযামী,
এবার তোমারে চিনেছি হে প্রিয়,
চিনেছি তোমারে আমি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

সমস্ত দিনটা নানা গোলমালে কাটিয়া গেল। নমিতা কেবল ভাবিতে লাগিল, কাল বাদ পরশু, আবার সেই হাঁসপাতালে গিয়া পুরাতন কাজে নিযুক্ত হইতে হইবে। ছিদ্রান্বেষী 'মান্যবর'-গণের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সতর্ক ভাবে চক্ষু-কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নিতান্ত নিরীহ জন্তু সাজিয়া, অকাতরে সব উৎপাত সহিয়া যাইতে হইবে ! কি চমৎকার কর্ত্তব্য-পালন ! মূক-অস্বস্তি-পীড়নে, তাহার অসহায় ক্লান্ত মনটা এক এক সময় নিরুপায় ক্ষোভে জিঘাংসায় উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। নমিতার মনে হইতেছিল, 'আঃ, ভাগ্য-বশে আজ যদি কোন একটা কর্ম্মখালি-বিজ্ঞাপন'-দাতার ঠিকানা হইতে হঠাৎ নিয়োগ-পত্র আসিয়া পড়ে, তবে বড় সুবিধাই হয় ! ডাক্তারসাহেবকে একটি কথা জানাইবার অপেক্ষামাত্র :—আমার ইস্তফা গ্রহণ করুন।' বাস্ তারপর এক মুহূর্ত্তও কালক্ষেপ নয়। এই খল-স্বভাব মানুষগুলার সংস্রব এড়াইয়া হাপ ছাড়িয়া সে বাঁচে ! যমালয়ের নূতনত্বও আজ নমিতার কাছে শ্রেয়স্কর, যদি এই

পুরাতন-পীড়নের সীমা ডিঙ্গাইয়া সে যাইতে পারে!

সন্ধ্যার পরে মা'র ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া সমিতা ও সুশীলকে পড়াইতে পড়াইতে নমিতা অন্যমনস্ক হইয়া ঐ সব কথা ভাবিতেছিল। এইরূপ সময় বাহির হইতে লছ্মীর-মা ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। নমিতা উঠিয়া যাইতেই লছমীর মা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া, চুপি চুপি বলিল, 'মা'র রাত্রে খাইবার দুধ্টুকু সব বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। এখন উপায়? মা ত শুনিতে পাইলে আর কিছু খাইতে চাহিবেন না! কিন্তু তাঁহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল মানুষকে অনাহারে রাখা সম্পূর্ণ অনুচিত। সুতরাং, একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে যে!'

পুরাতন চাক্‌রীতে ইস্তফা দেওয়া এবং নূতন চাক্‌রীতে বাহাল হওয়ার যত কিছু কল্পনা-বিপ্লব চকিতে নমিতার মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সে বলিল, "মা'র দুধ্! সর্ব্বনাশ! না লছ্মীর মা, মা'র দুধ চাই-ই। যেমন করে হোক্ যোগাড় কর।"

লছ্মীর মা শঙ্কর-চাকরকে ডাকিল। সে বলিল, "নগদ পয়সা পাইলে এখনই সে যেরূপে হৌক্, দুগ্ধ আনিয়া দিতে পারে

মা'র কাছে ঐ সামান্য পয়সার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে যাওয়ার ইচ্ছা নমিতার হইল না, কিন্তু তাহার নিজের কাছে যে পাই-পয়সাও একটি অবশিষ্ট নাই, তাহাও খুব ভাল করিয়া তাহার মনে পড়িল। তবুও কি জানি, যদি কোনও দিনের কিছু খুচ্‌রা জমা বাক্সটায় পড়িয়া থাকে! এই ভাবিয়া সংশয়ে উদ্বিগ্ন নমিতা বলিল, "আলোটা একবার দেখাও, লছ্মীর মা! বাক্সটা খুল্‌বো।

স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া নমিতা হাত-বাক্সটা খুলিল; দেখিয়া বলিল,—'কিছু নাই, কিছু নাই!' যখন যাহা পায়, তখনই হিসাব বুঝাইয়া মা'র হাতে সে সব সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়! নিজের খরচ বলিয়া, বা হঠাৎ যদি দরকার পড়ে বলিয়া, কখনও ত এক পয়সা সে সরাইয়া রাখে নাই। পাছে মা'র হাত-খরচে অকুলান পড়ে, পাছে তাঁহার অসুবিধা হয়, ইহাই ভাবিয়া নমিতা সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে; নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও ভাবিবার সময় পায় নাই। আজ সহসা এ যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার!

নিজেকে মূর্খ, নির্ব্বোধ, অর্ব্বাচীন, অপরিণামদর্শী—যা ইচ্ছা তাই বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া, সমস্ত বাক্সটা ওলট্ পালট্ করিয়া দেখিতে দেখিতে, কাগজপত্রের সহিত ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর দেওয়া সেই নোট-দুইখানি নমিতার হাতে উঠিল।—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! সে-দিন সে এই বাক্স'র মধ্যে কখন্ নোট-দুইখানা রাখিয়াছে, কিছুই মনে নাই! নোটের কথাই যে একেবারে সে ভুলিয়া গিয়াছে!

নোট-দুইখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিতে নমিতার সাহস হইল না। একখানা কাগজ টানিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া, নিঝুম হইয়া সে ভাবিতে লাগিল। বুকের ভিতর কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার বস্তু, সবেগে তোলাপাড়া হইতে লাগিল!

খানিকটা পরে, সহসা মুখ তুলিয়া অস্বাভাবিক বিকৃত কণ্ঠে নমিতা বলিল, "লছ্মীর মা, আজকের মত ঐ ক'টা পয়সা

কারো কাছে ধার নিতে পার ?—" নমিতার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। সে মুখ নত করিল।

বহুদিনের পুরাতন-বিশ্বাসী লোক লছ্‌মীর মা অতি-শৈশব হইতে নমিতাকে নিজ-হাতে মানুষ করিতেছে। এই সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখের সহিত তাহার জীবন-স্রোত এক সঙ্গে মিশিয়া বহিয়া যাইতেছে।—এই সংসারের প্রাণীগুলির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। লছ্‌মীর মা নমিতার ভাব দেখিয়া অবস্থা বুঝিল; মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, হাসি-মুখে গর্ব্বিতভাবে বলিল, 'তার জন্য কি হইয়াছে? আমার ভাঙ্গা-তোরঙ্গটা খুঁজিলে পুরাতন কাপড়-চোপড়ের সহিত এখনই অমন দুই দশ আনা খুচ্‌রা পয়সা পাওয়া যাইবে। এতক্ষণ বলিতে হয়!"

আলো রাখিয়া লছ্‌মীর মা চলিয়া গেল। সে পয়সা যোগাড় করিতে পারিল কি না, তাহা জানিতে যাইবার শক্তি বা সাহস কিছুই নমিতার জুটিল না। নমিতার বেশ মনে হইল লছ্‌মীর মা'র হাতে একটি পয়সা নাই। তাহার মাহিনার টাকা ত মাসে মাসে পোষ্ট অফিসে বিমল জমা দিয়া ফেলে। খুচরা পয়সা আসিবে কোথা হইতে?......শুধু নমিতাকে আশ্বস্ত-করিবার জন্যই, বোধ হয়, সে নিজের সঞ্চয়-সম্বন্ধে এত জোরে 'মুখ-সাপট' করিয়া গেল। এইবার নিশ্চয় শঙ্কর-ঠাকর বা গৌরী-পাড়ের নিকট ধার লইবে! ছিঃ! কি লজ্জা! এত দৈন্যগ্লানি!...হে ভগবন্, এ কি লাঞ্ছনা!

নমিতা বড় দুঃখে নীরব হাসি হাসিল! দর্পহারী নারায়ণ এই ত দর্প চূর্ণ করিলেন! কতটুকু শক্তি দিয়া যে তিনি তাহার মত ক্ষুদ্র জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহার ওজনএই এক অভাব-সংঘাতে পরিষ্কার করিয়া দেখাইলেন্ নয় কি? সে দুর্ব্বল, অক্ষম, —জগতের নগণ্য জীব! গণ্যমান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির অন্যায় তাহাকে নীরবে সহিতে হইবে; সহিতে সে বাধ্য! ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠ', তাহার পক্ষে অপরাধ! অপরাধ! মহাপরাধ!

মনের অবস্থাটার সংশোধন না করিয়া মা'র ঘরে যাওয়া চলে না। নমিতা পড়িবার ঘরে আসিয়া চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিল। বিমল এখনও বেড়াইয়া আসে নাই। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছিল। একখানা বই টানিয়া লইয়া নমিতা পড়িতে সুরু করিল।

একটু পরে বারেণ্ডায় জুতার শব্দ হইল। বিমল আসিবে বলিয়া তখনও বাহিরের দুয়ারে খিল বন্ধ করা হয় নাই। কে যেন দুয়ার ঠেলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল। নমিতা মনোযোগ দিল না; ভাবিল বিমলই হইবে। আগন্তুক ধীরে ধীরে আসিয়া, ঐ দিকের দ্বার ঠেলিয়া, সতর্কতা-জ্ঞাপক একটু শব্দ করিল।

"বিমল?"—বলিয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দত্তজায়া ঘরে ঢুকিতেছেন! এ কি অভাবনীয় ঘটনা! ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সসৌজন্যে বলিল, "আসুন্, আসুন্, নমস্কার; সবাই ভাল আছেন্ ত?—"

গম্ভীর মুখে দত্তজায়া বলিলেন, "একলা বসে রয়েছ যে, আর কেউ নাই?—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোধ হইল, তিনি যেন আর কাহারও উপস্থিতি-বিষয়ে খুব আশা করিয়া আসিয়াছিলেন!

সে নাই দেখিয়া, হতাশ হইতেছেন! নমিতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিল না; গোলে পড়িয়া থতমত খাইয়া বলিল, "মেজ-ভাই 'বল' খেল্‌তে গেছে; সমি-সুশীল, মা'র কাছে রয়েছে; পড়্‌ছে তারা।—আপনি বসুন্।"

নমিতা চেয়ারটা টানিয়া তাঁহার দিকে সরাইয়া দিল। দত্তজায়া বসিলেন না; তাচ্ছীল্য-ভাবে সেটা একটু ঠেলিয়া পিছু হটাইয়া দিয়া বলিলেন, "ক'দিন খবর পাই নি, তাই দেখ্‌তে এলুম, হাতটা কেমন আছে—?"

দত্তজায়ার এই অযাচিত আগমনটা নমিতাকে যেন এক মুহূর্ত্তে আনন্দে ও আশ্চর্য্যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; দত্তজায়ার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে, সে সরলা বালিকার মত আগ্রহ-ভরা মুখে তাড়াতাড়ি হাতখানা সাম্‌নে বিস্তার করিয়া, সহাস্যে বলিল, "বেশ আছে। আজও ব্যাণ্ডেজ আছে; কাল থেকে মলম দেব, ভাব্‌ছি। তারপর, আপনি,—হাঁ, এ দিকে এখন কোথায় গেছ্‌লেন্?"

দ্বারের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "একটা 'কলে' গেছ্‌লুম, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন।...... আমি বল্লুম, এর সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন্।"—

বিস্ময়ে চমকিয়া নমিতা বলিল, "সে কি! উনি বাইরে! বল্‌তে হয়!" তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে আলোটা তুলিয়া লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জ হাস্যে নমিতা দত্তজাকে বলিল, "আপ্‌নিও দয়া করে সঙ্গে আসুন্; একবার বস্‌তে বল্‌বেন।"

একটু উপেক্ষার সহিত দত্তজায়া বলিলেন, "তিনি ঐ খানেই আছেন। তুমিই বল না!"

"কি—?" বলিয়া বাহিরের অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া ডাক্তার মিত্র টুপী খুলিয়া দ্বারসম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ অতি গ্রাম্ভারী চালের মর্য্যাদা রাখিয়া ডান পা চৌকাঠের উপর তুলিয়া চকিত-কটাক্ষে গৃহমধ্যে চাহিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নেই দেখ্‌ছি! একলা আছ? ঘরে ঢুকতে পারি?"

কথাটা পরিহাসের দিক্ হইতে গ্রহণ করাই উচিত, ভাবিয়া নমিতা বিনীত হাস্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "অনুগৃহীত হ'ব। আসুন্, আসুন্।"

এমন মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য আরও অনেক বাক্যাড়ম্বর-কৌশল ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু নমিতার অনভ্যস্ত রসনায় তেমন কিছু যোগাইল না। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ চেয়ারটা এ-দিকে ও চেয়ারটা ও-দিকে টানিয়া ঠেলিয়া, বিব্রতভাবে অদ্ভুত হুটাপাটি বাঁধাইয়া, সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাস্তবিক এ-সব রীতি-বদ্ধ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন-প্রথা নমিতা সবই ভুলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে গৃহে অতিথি-সমাগম বন্ধ হইয়াছে। কখন 'ডাক' দিবার জন্য কোন ভদ্রলোক আসিলে, বিমলই নমিতার 'মুস্কিল আসান' হইয়া দাঁড়ায়; আজ এই স্বাগত-সম্ভাষণের প্রয়োজন মুহূর্ত্তে, নিজের অপটুতার সহিত বিমলকুমারের ক্ষমতার উপর নমিতার মনে মনে বেশ একটু শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের উদয় হইল। কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া ত্রুটির জন্য

ক্ষমা চাহিয়া দত্তজায়াকে সে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল। ডাক্তার মিত্র টুপিটা টেবিলে রাখিয়া অন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিলেন। গম্ভীর ভাবে চারিদিকে চাহিয়া গৃহসজ্জা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "হাতটা কেমন আছে, মিস্ মিত্র? ঘা শুকিয়েছে বেশ?"

দত্তজায়ার চেয়ারের পাশে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা সবিনয়ে বলিল, "অনেকটা শুকিয়েছে।"

মনে মনে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে শত সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে নমিতা ভাবিল, ছিঃ, এই শিষ্টস্বভাব ভদ্রলোকটির বিরুদ্ধে কত কথাই সে মনে স্থান দিয়াছে! বুদ্ধির ত্রুটি ধরিয়া কেহ তাহাকে 'ছেলে মানুষ' বলিলে নমিতা রুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে-রাগ নিতান্তই ন্যায়-বিগর্হিত! এই ত তাহার ছেলে-মানুষীর প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িল! সত্যই ত, কখন্ কি ক্ষেত্রে, কি একটু সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া, ভদ্রলোক কি তাহাই ধরিয়া বসিয়া আছেন? তাঁহার কি অন্য কাজ নাই? নিশ্চয়ই তিনি গোলমালে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন! নমিতারই দোষ! সে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মধ্যে, রাজ্যের জঞ্জাল জড় করিয়া, উন্মাদ-বিপ্লবে ধূলা ছড়াইয়া নিজের চোখে-মুখে মাখিতেছে, আর পরের দোষ আবিষ্কার করিয়া নানাবিধ কাল্পনিক অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে! কি দুর্ভাগ্য!

টেবিলের উপর হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া একটুকরা কাগজে কালীশূন্য নিব্‌টা খচ্ খচ্ করিয়া বুলাইতে বুলাইতে, ডাক্তার মিত্র বিজ্ঞভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "গ্রহের ফের! একটা সামান্য ক্রুশ বিঁধে কি কষ্ট পাওয়া! আমি প্রায়ই মনে করি আস্‌ব; হ'য়ে উঠে না।—যে কাজের ভিড়!"

নমিতা দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিল, "আপনারা এখন 'কল' থেকে ফির্‌ছেন? চা খাওয়া হয় নি বোধ হয়? একটু 'চা'য়ের বন্দোবস্ত করি, কি বলুন্?

বাধা দিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, 'না না, চায়ে কাজ নেই; বরং পান-টান্ থাকে ত দুটো দাও—।"

"এই যে আন্‌ছি,—" বলিয়া নমিতা বাড়ীর ভিতর দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল; ক্ষণ পরে ডিবা-শুদ্ধ পান আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল ও নিজে দুইটি পান তুলিয়া লইয়া দত্তজায়াকে দিল।

পান মুখে পূরিয়া দাঁতে করিয়া লবঙ্গ কাটিতে কাটিতে ডাক্তার মিত্র ঠিক্ যেন সম্মুখবর্ত্তিনী দত্তজায়াকেই লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সে দিন এক মজা হয়ে গেছে। মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তা কি আমি জানি? আমি ভাব্‌লুম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ওরা গল্প-সল্প কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা কইছে;——ব্যাঘাত দেওয়া অনুচিত ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম। তাড়াতাড়িও ছিল। 'পোষ্ট-মর্টম কেস্' হাতে। কাজেই অত গ্রাহ্য করি নি; তা ছাড়া তেওয়ারী কম্পাউ-ণ্ডার ছিল ব'লে আমি আর দাঁড়ালুম্ না। তারপর ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্কের কাছে শুন্‌লুম, মিস্ মিত্র দরখাস্ত করেছে, সাত দিন ছুটি চাই। মিস্ স্মিথ্‌ও তা'তে 'সাপোর্ট' করেছেন।—এই সব ব্যাপার! তাই জান্-

লুম। নইলে কে জান্‌ত, মিস্ মিত্রের হাতে ক্রুশ বিঁধেছে—?"

দত্তজায়া অত্যন্ত ভালমানুষীর সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা বৈ কি। না বল্লে আর মানুষ কি করে জান্‌বে? আমিই কি জান্‌তুম?—সেই বল্লুম্ আপনাকে; রাস্তায় হিতলালবাবুর সঙ্গে আস্‌ছিলুম্; নমিতাকে দেখে খেলা-পাগ্‌লা হিতলালবাবু তাস খেল্‌তে যাবার জন্য জেদাজেদি আরম্ভ কর্‌লে। তাঁকে জানেন ত? মান-অপমান জ্ঞান নেই! খেলার সঙ্গী হবার জন্য সবাইকে তিনি সাধেন; নমিতাকেও।—তা'পর ও রেগে উঠ্‌ল, মুখের উপর জবাব দিয়ে চলে এল; তখন ভদ্দরলোক থ' হয়ে গেলেন—।"

নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! হঠাৎ এ কি সুর-বৈচিত্র্য!......মনের মধ্যে অসহনীয় ক্রোধ-উত্তেজনা গর্জ্জিয়া উঠিল!— মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা,—সব মিথ্যা! ডাক্তার মিত্রের কথা মিথ্যা, দত্তজায়ার কথাও ত সব সত্য নহে! আশ্চর্য্য শক্তি! মুখে মুখে ইঁহারা এত মিথ্যা বানাইয়া বলেন কি করিয়া? নমিতার স্কন্ধে ইঁহারা যে-সব দোষ চাপাইতে চাহেন, সে-সকল মিথ্যা দোষকে নমিতা ভয় খায় না, কিন্তু মিথ্যা চাতুরী খেলিবার এই যে চেষ্টা,—ইহা নমিতা ঘৃণা করে, অত্যন্ত ঘৃণা করে! ডাক্তার মিত্র—শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান—অম্লানবদনে এই ঘৃণার্হ মিথ্যায় যোগ দিলেন! আর দত্তজায়া! না। হে ভগবন্, ধৈর্য্য দাও! ইঁহারা গৃহাগত অতিথি! নমিতার রসনা আজ নীরব অসাড় হইয়া যাউক্।

নমিতার কপাল হইতে দর্ দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সে নত-দৃষ্টিতে নির্ব্বাক্ রহিল।

ডাক্তার মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "সুরসুন্দর তেওয়ারী, বুঝি, প্রত্যহ ড্রেস্ কর্‌তে আসে?—"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা উত্তর দিল, "সুর-সুন্দর নয়; সমুদ্রপ্রসাদ সিং আসেন।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কি রকম? আজ আমি যে নিজে দেখেছি, সুরসুন্দর এসেছিল!"

ধীর স্বরে নমিতা বলিল, "হাঁ, শুধু আজ সমুদ্র সিংহের সঙ্গেই এসেছিলেন।—"

"যাই হোক্, এসেছিল ত?" এই বলিতে বলিতে ডাক্তার মিত্রের মুখপানে চাহিয়া দত্তজায়া একটু অর্থপূর্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রের অধরেও হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া টুপিটা টানিয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর নয়, এবার উঠে পড়ুন্—।"

দত্তজায়া উঠিলেন। শঙ্কর চাকর "ভদ্দর আদ্‌মীদের" আগমন-সংবাদ শুনিয়া আলো দেখাইবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে দ্বার-সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। ডাক্তার মিত্র নমিতাকে শুনাইয়া শুনাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী দত্তজায়াকে বলিলেন, "কি জানেন? মিস্ স্মিথ্‌ই বলুন, আর সুর-সুন্দর তেওয়ারীই বলুন,—কাশীমিত্রি, নিম-তলা, সবাইকেই চিনি। যতই যা হোক্, ওঁরা আমাদের পর, বিদেশী; ওদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা কর্‌তে গেলেই যে ঠক্‌তে

হবে, লোকে তাতে ঠাট্টা করতে ছাড়বে কেন?”

দত্তজায়া ততোধিক গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, “তা তো বটেই!—আর শুধু পর? চিরদিনটা ইতর-সংসর্গে বাস! ওঁরা যে কি দরের মানুষ!

খুব একটা প্রকাণ্ড গূঢ়ার্থ-সূচক শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, “থাক্, থাক্, সে কথায় আর কাজ নাই। যাঁরা না জানেন্, তাঁদের কাছে আর ও-সব তোলা কেন?—চেপে যান্। আসি মিস্ মিত্র, নমস্কার!” তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন।

নমিতা বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। তাহার হাত পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। একটা বিশ্রী বিভীষিকার আতঙ্ক তাহার সর্ব্বশরীরে যেন অগ্নি-ঝলক্ ছড়াইয়া দিল। সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রীগুলা যেন যন্ত্রণায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! হে ভগবন্, সে এ কি শুনিল! এ কি ভয়ঙ্কর, এ কি অসম্ভব কথা! মিস্ স্মিথের চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত-ইঙ্গিত! স্মিথ্ চিরদিন ইতর-সংসর্গে বাস করিয়াছেন! ......কি সাংঘাতিক বাণী! তাহা কি সত্য? তবে তিনি দেবতার মত অমন অমায়িক স্নেহভরা হৃদয় কোথা পাইলেন? অমন উদার উন্নত প্রাণ কোথা পাইলেন? মিস্ স্মিথের স্বভাব এত জঘন্য? তবে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার এত মনোরম, এমন শ্রদ্ধাকর্ষক, এত ভক্তিযোগ্য কেন? এ কি জটিল রহস্য!

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া নমিতা গুম্ হইয়া ভাবিতেছিল। মা ঘরে ঢুকিয়া হাপানির টানে থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ডাকিলেন, “নমি,—অ-নমি!” চমকিয়া মাথা তুলিয়া মাকে দেখিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; সজোরে আত্মদমন করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, “আপ্নি এখানে কেন এলেন্? এত কষ্টে উঠা-হাঁটা করা!”

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া মা বলিলেন, “ওঁরা কি বল্‌তে এসেছিল? কোনো দর্‌কারী কাজ আছে?—”

প্রসন্নভাবে নমিতা বলিল, “না, না, কিছুই না! ডাক্ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তাই দেখা করে গেলেন।”

একটু নীরব থাকিয়া মা পুনশ্চ বলিলেন, “স্মিথ্, সুরসুন্দর, এদের নাম করে কি সব বল্‌ছিলেন নয়?”

নমিতা ভীত হইল। মা তাহা হইলে বাহির হইতে ডাক্তারবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছেন! কি উৎপাত! একে দুর্ভাবনা ও উদ্বেগে তাহার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার এই সব ছেঁড়া-ন্যাঠা উপসর্গ!......মা'র মনটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য নমিতা অগ্রাহ্যের ভাবে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, “হ্যাঁ; বল্লেন, ওঁরা বিদেশী, লোক ভাল নয়; ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা অন্যায়।”

শঙ্কিত কণ্ঠে মা বলিলেন, “অন্যায়?”

নমিতা ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর ঈষৎ জোরের সহিত বলিল, “হ্যাঁ, ওদের মতে!......কাজকর্ম্ম না থাক্‌লে পরকুৎসা নিয়ে সময় কাটানই অনেক মানুষের অভ্যাস। যার তার সম্বন্ধে যা-হোক্, তা-হোক, বলে দিতে পার্‌লেই হোল; ওতে ত পয়সা-কড়ির খরচ নেই!”

সংশয়-ভীত দৃষ্টিতে কন্যার মুখপানে

চাহিয়া মাতা বলিলেন, "দ্যাখো, তবু ত বল্‌ছেন্, মা! স্নিথ্—হেন মানুষ, তাঁর সম্বন্ধেও……।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি থামিলেন।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে নমিতার বুক কাঁপিয়া উঠিল। নতমুখে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিল; তারপর ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিল, "যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলুক্, মা!—মাথার উপর যিনি আছেন, তিনি সত্য-মিথ্যা সবই জান্‌ছেন্। তাঁর পানে চেয়ে কাজ করে যাব, তারপর যা তাঁর ইচ্ছা তাই হবে।"

মাতার ভয়ত্রস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হইল। কিছু না বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। নমিতাও পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল।

মা আসিয়া ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নমিতা তাঁহার পায়ের কাছে আড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মুক্ত-মন্দিরে।

রুদ্ধ দুয়ারে আসি', নিতি নিতি ঘা দিয়ে,
ফিরে যাই ভগ্নপ্রাণে, ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে!
ল'য়ে আসি সযতনে ফোটা-ফুলে ভরা সাজি,
ফিরে যাই তাই ল'য়ে—অমুৎসৃষ্ট-ফুলরাজী!
ডেকে বলি, "কে আছ গো? মুক্ত করে দাও দ্বার,
ভিতরে দেবতা মোর; পূজিব পা-দু'টী তাঁর!"
কাহারও সাড়া-শব্দ কোন দিন পাই নাই,
আঁধারেই এসে একা, আঁধারেই চলে' যাই!

* * * * *

একদিন পূর্ণিমার ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায়,
না লয়ে' কুসুম কোন, গেছি সেথা অনিচ্ছায়।
স্থির জানি মনে মনে, রুদ্ধ সে মন্দির মোর;
জানি না যে, অমানিশা হইয়া গিয়াছে ভোর!
চাঁদের আলোয় দেখি মন্দিরের মুক্তদ্বার,
কে যেন সাজিটী ভরে' রেখে গেছে ফুলভার!—
পরিপূর্ণ জীবনের পরিপূর্ণ আশা লয়ে'
প্রবেশিনু জ্যোৎস্নায় স্বরগের সে নিলয়ে।

শ্রীগুণমণি দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগের দেশের নরনারী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক-তাপময় অনিত্য সংসার হইতে মুক্তি-লাভ করিবার জন্য কি গভীর চিন্তা ও কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন! তাঁহাদের সেই তপঃ-সম্ভূত জ্ঞানরাশি অদ্য আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছে! নিরন্তর পরিবর্তনশীল এই ধরাধামের উপর দিয়া ঘোর বিপ্লব-বিদ্রোহের সহস্র ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইলেও, ধনবিভব সমুদয় লুণ্ঠিত হইলেও, পুরুষপরম্পরানুক্রমে

দেশবাসী সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের আবিষ্কৃত সত্যসকল সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হইয়া ঋষিদিগের সেই জ্ঞানালোক অদ্যাপি শত সহস্র বিপথগামী পথিককে সৎপথে পরিচালিত করিতেছে। অষ্টাবক্রগীতা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্বোধক একখানি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম অবধূতানুভূতি * (অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অনুভবের বিবরণ)। ইহা মহর্ষি অষ্টাবক্র-প্রণীত বলিয়া সাধারণতঃ অষ্টাবক্রগীতা-নামেই প্রচলিত। কচিৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র-নামেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, এই গ্রন্থপ্রণেতা মহর্ষি গর্ভবাস-কালেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। মহাভারত ও পুরাণপ্রভৃতিতে তাঁহার জীবনের বহুঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্বের ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪তম অধ্যায়ে তাঁহার জীবনী যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এস্থানে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়-নামে এক ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর গুরুকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে ঋষিকন্যা সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। একদা গর্ভস্থ বালক পিতার বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"হে পিতঃ, আপনি সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করেন, কিন্তু তথাপি তাহা সম্যক্ পঠিত হয় না। আমি আপনার প্রসাদে গর্ভে থাকিয়াই সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; তন্নিমিত্তই কহিতেছি যে, উহা আপনাকর্ত্তৃক সমীচীনরূপে পঠিত হইতেছে না।" মহর্ষি কহোড় তদ্বাক্যে অপমানিত হইয়া কহিলেন, "যেহেতু তুমি গর্ভে থাকিয়াই এতদূর বক্রস্বভাব, তজ্জন্য তোমার অঙ্গের অষ্টস্থান বক্র হইবে।" এই শাপের জন্য বালক অষ্টস্থানে বক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হ'ন্ এবং অষ্টাবক্র-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্দালকের শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি বয়সে অষ্টাবক্রের তুল্য ছিলেন। কহোড় আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বাক্যে ধনার্থী হইয়া বিদেহরাজ জনকের সভায় গমন করেন, এবং তথায় বরুণপুত্র বন্দিকর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া পণানুসারে সমুদ্রমগ্ন হ'ন্। পিতার এই বৃত্তান্ত অষ্টাবক্রের নিকট গোপন করা হয়। অষ্টাবক্র উদ্দালকের প্রতি পিতার ন্যায় এবং মাতুল শ্বেতকেতুর প্রতি ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে অষ্টাবক্র একদিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালকের ক্রোড়ে দেখিয়া আকর্ষণ করেন। তাহাতে শ্বেতকেতু বলেন—"ইহা তোমার পিতার ক্রোড় নহে।" এই বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্র মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'ন্। পরে তিনি মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে লইয়া জনকের সভায় গমন করিয়া, বন্দীকে পরাজিত করিয়া বরুণলোকবাসী পিতাকে উদ্ধার করেন এবং গৃহে প্রত্যাগমনকালে পিতার উপদেশানুসারে সমঙ্গা-নদীর জলে স্নান করিয়া সম-অঙ্গবিশিষ্ট হন্। কিন্তু অঙ্গের

* যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্‌বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে॥
যস্মাঅক্ষরত্বাৎ বরেণ্যত্বাৎ ধূতসংসারবন্ধনাৎ।
তত্ত্বমস্যর্থসিদ্ধত্বাদবধূতোঽভিধীয়তে॥

বক্রতা দূর হইলেও তাঁহার 'অষ্টাবক্র'-নাম দূর হয় নাই।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যানটী প্রচলিত আছে। একদা মিথিলাধিপতি জনক চিন্তা করিতে থাকেন—"এই সংসার সদাই দুঃখপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়! আমরা কিছুক্ষণ সুখভোগ করিতে না করিতেই অতর্কিতভাবে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়! কখন্ কিরূপভাবে দুঃখ আসিবে, তাহার কোনও নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। আমরা যতই সাবধান হই না কেন, যতই শ্রমশীল, উপার্জ্জনশীল অথবা ধনশালী হই না কেন, একেবারে দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। অতি-কষ্টে বর্ত্তমান দুঃখ-সকল হইতে পরিত্রাণের উপায় করিতে না করিতে আবার বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়! এমন কি, সুখভোগ-কালেও দুঃখের আশঙ্কায় বিদ্যমান সুখও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আবার একজাতীয় সুখ বহুবার ভোগ করিলে, তাহা হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ পাওয়া যায় না। তখন যদি পুনরায় সুখের মাত্রা অধিক করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যায়, তবে ভোগাতি-শয্যে শরীর বিকল হইয়া পড়ে এবং চিত্ত অনবহিত ও প্রমাদযুক্ত হইয়া বহুতর বিপদ্-রাশির মধ্যে ধাবিত হয়। বস্তুতঃ, সুখেই হউক্, দুঃখেই হউক্, কোন প্রকারেই আমরা নিজেকে নিরাপদ্ বোধ করিতে পারি না। অতএব কিরূপে এই অসার সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু মুক্তপুরুষ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত, সেই পুরুষ ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট যথার্থ উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে না।" যখন রাজা জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, তখন সেই স্থলে যদৃচ্ছা-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন্। তাঁহাকে দেখিয়া রাজার মনে হয়, 'এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুরূপ।' সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ অষ্টাবক্র রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি-পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হউন্। দেহ বক্র হইলেও আত্মা কখনও বক্র হয় না। হে রাজন্, যেরূপ নদী বক্র হইলেও তাহার জল বক্র হয় না, যেরূপ ইক্ষুযষ্টি বক্র হইলেও তাহার রস বক্র হয় না, সেইরূপ পাঞ্চভৌতিক এই দেহ বক্র হইলেও, আত্মা কখনও বক্র হয় না। আত্মা নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং মুক্ত-স্বভাব। অতএব হে রাজন্, আপনি দেহদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া, আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হউন্।" ইত্যাকার বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু-সন্দর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহর্ষির চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন অষ্টাবক্র যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই অষ্টাবক্রগীতা-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহার মূল ও অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বিশ্বেশ্বরস্বামি-প্রণীত অধ্যাত্মপ্রদীপ-নামে এই গ্রন্থের একখানি উৎকৃষ্ট টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ণানন্দতীর্থ, ভাস্করানন্দস্বামী

এবং মুকুন্দমুনি যথাক্রমে এই গ্রন্থের তিনখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এগুলি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

অষ্টাবক্রগীতা যে কত প্রাচীন, তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু ইহা যে একখানি অতিপ্রাচীন গ্রন্থ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইহার রচনাপ্রণালী অত্যন্ত সরল। দ্বিতীয়তঃ, ইহার সরলতা সত্ত্বেও ইহার চারিখানি বা ততোঽধিক টীকা বিরচিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন না হইলে এই অতিসরল গ্রন্থের এতগুলি টীকা হইত না। তৃতীয়তঃ, ইহা অদ্যোপান্ত সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অতএব সম্ভবতঃ দীর্ঘচ্ছন্দঃসকল উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা বিরচিত হইয়া থাকিবে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থের একবিংশ প্রকরণে প্রত্যেক প্রকরণের শ্লোক-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ইহাতে দেখা যায়। এই সমস্ত শ্লোক কালে কালে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি অতি-প্রাচীন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

অতঃপর মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

অষ্টাবক্র-গীতা।

প্রথম-প্রকরণ।

জনক উবাচ।—

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তি র্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতৎ ত্বং ব্রূহি মে প্রভো ॥১॥

রাজা জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রকে বলিলেন, "হে প্রভো, কিরূপে (মনুষ্য) প্রকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিরূপেই বা (তাহার) মুক্তি হইতে পারে এবং কি উপায়েই বা বৈরাগ্য-লাভ হয়—ইহা আমাকে বলুন্।" ১।

অষ্টাবক্র উবাচ

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযুষবদ্ ভজ ॥২॥

অষ্টাবক্র বলিলেন।—হে তাত, যদি মুক্তির অভিলাষ কর, তবে ভোগবাসনা বিষের ন্যায় ত্যাগ কর এবং ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য অমৃতের ন্যায় গ্রহণ কর।২।

ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥৩॥

(হে রাজন্,) আপনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু অথবা আকাশ নহেন; (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ আত্মা নহে।) মুক্তিলাভার্থ এই সকলের সাক্ষী আত্মাকে চিন্মাত্র বলিয়া অবগত হও।৩।

যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৪॥

যদি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে এই-ক্ষণেই সুখী, শান্ত ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪।

ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥৫॥

তুমি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণী নহ, তুমি ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমধারী নহ। তুমি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর। তুমি চিত্তধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত, নিরাকার এবং জগতের সাক্ষিমাত্র—(আত্মাকে এইরূপ জানিয়া) সুখী হও।৫।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং বাসনানি ন তে বিভো।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥৬॥

তুমি (শুদ্ধস্বরূপ) সর্ব্বব্যাপী আত্মা ; অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ এবং শুভ ও অশুভ সংস্কার, এ-সমস্ত চিত্তধর্ম্মের দ্বারা তুমি লিপ্ত নহ। তুমি দেহাদিদ্বারা অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কর্ত্তা নহ এবং সেই সকল ব্যাপার-জনিত ফলের উপভোক্তাও নহ। বাস্তবিকপক্ষে তুমি সর্ব্বদা মুক্তই আছ ।৬।

একো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা।
অয়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরং ॥৭॥

তুমি সর্ব্বভাবের একমাত্র দ্রষ্টা, তুমি সর্ব্বদা মুক্তপ্রায়। ইহাই তোমার একমাত্র বন্ধন যে, তুমি নিজেকে দ্রষ্টৃভিন্ন অন্যবিধ বিবেচনা কর ।৭।

অহং কর্ত্তেত্যহঙ্কারমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥৮॥

তুমি, "আমিই দেহাদিব্যাপারের কর্ত্তা" এই অহঙ্কাররূপ ভীষণ কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দষ্ট। "আমি ঐ সকলের কর্ত্তা নহি"—এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া সুখী হও ।৮।

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥৯॥

"আমি কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ"—এই স্থিরবিশ্বাসরূপ অগ্নিদ্বারা অজ্ঞানরূপ গহনবন দগ্ধ করিয়া বিগতশোক হইয়া সুখী হও ।৯।

যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।
আনন্দঃ পরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ১০

রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় যাহাতে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়া প্রকাশ পায়, তুমি সেই পরমানন্দময় আনন্দস্বরূপ বোধমাত্র,—ইহা জানিয়া সুখী হও ॥ ১০ ॥

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যোয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ
॥ ১১ ॥

যিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন, তিনি মুক্ত হ'ন্ এবং যিনি আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করেন তিনি বদ্ধ হ'ন্—এই কিংবদন্তী বাস্তবিক সত্য। যাহার যদ্রূপ বুদ্ধি, তাহার গতিও তদ্রূপ ॥ ১১ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কন্যার বিবাহে মাতার উপদেশ।

শ্রীমতি সুকৃতি! প্রেমময়ের অশেষ দয়ায় তুমি আজ জীবনের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করলে, মানবজন্মের চরম পরিণতির সে-টি হচ্ছে প্রধান সোপান। যে অক্ষয় বাঁধনে তুমি আজ বাঁধা পড়্‌লে, সে-টি স্বর্গের পবিত্র বাঁধন। কিন্তু তা সুগভীর দায়িত্ব ও সুকঠিন কর্ত্তব্যভারে ভরা। সেই চিরনির্ভরের উপর স্থির বিশ্বাস রেখে, তুমি যদি সে দায়িত্ব নত-মস্তকে স্বীকার করে নাও ও তোমার কর্ত্তব্য-গুলি যথাসাধ্য পালন করে চলো, তা হলে তাঁর আশীর্ব্বাদে এটিকে তোমার সোনার বাঁধন বলেই মনে হবে।—আর তোমাদের দু'জনের মিলিত-জীবন-ধারা গানের তানের মত চির-সুধাধারে বহে যাবে!

তোমাদের আজ্‌কের এই যে শুভমিলন, এটি আকস্মিক, নিয়তির খেলা নয়, জেনো। কত যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমাদের দুটি আত্মা পরস্পরের দিকে ব্যাকুল আগ্রহে

ছুটে আস্‌ছে! এর আগে তোমরা কতবার মিলেছ; আবার বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়মে কতবার বিচ্ছিন্ন হয়েছ! এ জীবনের আরম্ভেও তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে; দু'জনেই দু'জনকার অজানা, অচেনা ছিলে! কিন্তু মিলনের সেই নিগূঢ় যোগসূত্রটি অলক্ষ্যে কাজ কর্‌ছিল, তাই এতদিন পরেও উভয়ে উভয়কে দেখ্‌বার মাত্রই, তোমাদের পরস্পরের অন্তর অধীর আকুলতার সঙ্গে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল। তোমরা দুটিতে যে চির-আপন, তোমরা দু'জনেই যে দু'জনকার পূর্ণতা, জীবনযাত্রার পথে তোমাদের একজনের অন্যকে নইলে যে-নয়, তোমাদের যে মিল্‌তেই হবে, সে কথা তোমরা নিমেষের মধ্যেই মর্ম্মে অনুভব কর্‌লে। এটি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান যে! তাই এই শুভলগ্নে পুণ্যক্ষণে তোমরা দু'জনে নিবিড় চিরমিলনে মিলিত হলে। যাঁর অসীম প্রেমে তোমরা দু'জনে মিলে, সংসার-সাগরে তোমাদের জীবনতরণীখানি আজকের এই শুভদিনে ভাসিয়ে দিলে, তাঁকেই তোমরা সে তরীখানির কাণ্ডারী কোরো। তোমাদের এই শুভযাত্রার আরম্ভে তিনিই তাঁর অনুকূল প্রসাদ-পবনের সঞ্চার কর্‌বেন; তিনিই তোমাদের অন্তরে চিরকল্যাণের শুভশক্তি দেবেন। তোমরা শুধু সেই চির-সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে "সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে" সম্পূর্ণ নিরলস থেকে, আনন্দিত চিত্তে তোমাদের তরীখানি বেয়ে যেয়ো; তা হলেই তোমাদের জীবন সেই কল্যাণস্বরূপের প্রসাদে মধুময় অমৃতময় হয়ে উঠ্‌বে।

* * * *

বড় সাধ করে আমরা তোমার "সুকৃতি" —এই নাম রেখেছিলাম; এ জীবনে ছোটবড় আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী দরিদ্র, যারই সংস্পর্শে আস্‌বে, সকলকে সুখী করে তোমার সে-নামটি সার্থক কোরো। আমাদের শুভ ইচ্ছা তোমাকে ঘিরে থাক্। ভগবান্ তোমার সহায় হোন্।

মা, আজ তোমাকে যাঁর হাতে সঁপে দিলাম, এ সংসারে তিনিই তোমার সবচেয়ে আপন। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তুমি তাঁর অনুবর্ত্তিনী হয়ো; তাঁর আনন্দ-বিষাদের সমান অংশ নিয়ো; সব বিষয়ে তাঁর চির-সঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী হয়ো; তাঁকে সুখী করে নিজে সুখী হয়ো। সর্ব্বোপরি, তোমাদের সুখশান্তি, কল্যাণ ও অন্য সমস্ত কামনা, বাসনা ঈশ্বরের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিয়ো। এ জীবনে যা কিছু পাবে বা হারাবে, তা তাঁরই দান মনে করে, মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়ো।—অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, যিনি এ পর্য্যন্ত তোমাদের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করে এসেছেন, ভবিষ্যতে চিরদিনই সেই করুণাময় তোমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

হে প্রভু, হে প্রেমময়! তোমার শ্রীচরণ-কমলে আজ আমার পরম স্নেহের ধন-দুটিকে নিঃশেষে সঁপে দিলাম। তোমার অসীম স্নেহের ছায়ায় তুমি এদের ঢেকে রেখো, নাথ! সংসার-পথের এরা দু'টি নবীন পথিক; —এদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তোমার আলোকে এদের পথ দেখিয়ো, স্বামী! এরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি, তুমি এদের তোমার দিকে ফিরিয়ে এনো। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-

বিষাদে এদের যুগল-হৃদয়কে তোমার পানে উন্মুখ করে রেখো। তুমি এদের সম্পূর্ণ তোমার করে নিয়ো, পিতঃ! তেমার কাছে আমার সমস্ত অন্তরের এই একান্ত আকুল ভিক্ষা! এদের চিরজীবনে তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশীর্ব্বাদিকা—

মা।

চক্ষুর দ্বারা মানবের পরিচয়।

চক্ষু মানবের একটী প্রধান সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য। কোনও ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখ, শোক কিংবা আনন্দ উপস্থিত হইলে চক্ষুই তাহার মর্ম্মের গুপ্ত কথাটী অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। যাহার অন্তঃকরণ দুঃখ ও শোকের জ্বালায় জর্জ্জরিত, তাহার নয়ন-দুইটী কি কখনও আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে? বিশ্বাসপূর্ণ নয়নে ও সন্দিগ্ধ নয়নে তুলনা করিয়া দেখিলে, উভয়ের প্রভেদ কি কিছুই পাওয়া যাইবে না? ঐ দুই প্রকারের চক্ষু যে বিভিন্ন গঠনে গঠিত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গোল গোল, ভাসা ভাসা, পটলচেরা, নীল- ও কাল-তারা-বিশিষ্ট চক্ষু-গুলির পরস্পরের কি প্রভেদ এবং নানা গঠনে গঠিত চক্ষু মানব-চরিত্র ও অন্তঃকরণের কি নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা জানিলে, বোধ করি, সদাশয় পাঠক-পাঠিকাদিগের কোনও ক্ষতি হইবে না।

(১) যে-ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতি-নিকটে অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী হয়।

(২) যে ব্যক্তির চক্ষুর্দ্বয় পরস্পরের অতিদূরে থাকে, সেই ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ও সূক্ষ্ম হয়।

(৩) গভীর-কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু বিষাদ ও উৎকণ্ঠার পরিচায়ক।

(৪) কোটর হইতে বহির্গত চক্ষু আত্ম-প্রসাদের লক্ষণ প্রকাশ করে।

(৫) বিস্তৃত গোল চক্ষু যাহার, সে ব্যক্তির আত্মসংযমের শক্তি নাই; তাহার মন সঙ্কীর্ণ, অসন্দিগ্ধ ও জল্পনা-প্রিয়।

(৬) ডিম্বাকৃতি চক্ষু কুটিল-চরিত্রের চিহ্ন।

(৭) ধূসরবর্ণ (Gray) চক্ষু বুদ্ধি, স্বার্থ-ত্যাগ ও কঠোর বিচারকের অভিজ্ঞতা বুঝায়।

(৮) পিঙ্গলবর্ণ (Brown) চক্ষু নির্ভীকতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রীতির পরিচায়ক।

(৯) যখন পিঙ্গল চক্ষুর ভ্রূ ধনুকের ন্যায় বিস্তৃত, তখন উহা অস্থিরতার পরিচয় দেয়।

(১০) একটু কাল মিশ্রিত পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু হইতে প্রগাঢ় সহানুভূতি বুঝা যায়। ঐরূপ চক্ষুর অধিকারীকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই।

(১১) উজ্জ্বল কাল চক্ষু অল্পবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তির চিহ্ন।

(১২) খুব ফিকে নীল চক্ষু প্রতারণা ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

(১৩) রক্তাভ নীল চক্ষু অনুরাগ ও ব্যাকুলতা জানায়।*

শ্রীমতী সুষমা সিংহ।

---

* অনুদিত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাড়ীকে ধৌত করিতে প্রচুর জলের আবশ্যক। সহিসের নিকট ঝাড়ন, গাড়ীর ব্রাস, এবং স্পঞ্জ থাকা উচিত। এগুলি না থাকিলে গাড়ীকে পরিষ্কৃত রাখা সুকঠিন।

অশ্বসজ্জার জন্য প্রদীপের ভূষা সঞ্চিত থাকা আবশ্যক।

অশ্বশালার প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয়।—

মোম-রোসন :—দেড় সের চর্ব্বি, এক সের মোম এবং আধ সের তার্পিন-তৈল মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিলে, যখন তাহা ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহার গাদ কাটিয়া নামাইয়া লইতে হইবে। ইহাকেই মোম-রোসন কহে।

অশ্বসজ্জার কাই :—১ ছটাক চর্ব্বি ও ৩ ছটাক মোম দ্রব করিবে। তাহাতে ৩ ছটাক মিশ্রি-চূর্ণ, ১ ছটাক কোমল সাবান, ১ ছটাক প্রদীপের ভূষা, এবং ½ ছটাক নীলচূর্ণ যোগ করিবে। এগুলিতে এক পেয়ালা তার্পিন তৈল মিশ্রিত করণান্তর টিনের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পালিস করিতে হইলে বা কাল রং চড়াইতে হইলে, ইহা লইয়া ঘর্ষণ করিলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

ধূসর-বর্ণের অশ্ব-সজ্জার মসলা :—একটা লেবু কাটিয়া তাহার অর্দ্ধ ভাগ দ্বারা সজ্জা পরিষ্কার করিবে এবং কোমল সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া মোম-রোসন (যদি আবশ্যক হয়) ব্যবহার করিবে।

মরিচা উঠান—Peroxide of tin এবং oxalic acid জলের সহিত লাগাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট কাল রাখিয়া পরে জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিলেই মরিচা উঠিয়া যাইবে।

চাকার জন্য তৈলময় পদার্থ :—১ সের চর্ব্বি ও ১ বোতল সর্ষপ তৈল গলাইয়া ছাকিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইবে।

ঘোড়া যদি ঘাড়ের লোম বা ল্যাজ ঘসে তবে তাহার প্রতিবিধান—কাঁচা খাদ্য প্রদান ও 'কার্ব্বলিক' তৈল ম্রক্ষণ। কেরোসিন তৈল ম্রক্ষণ করিলে লোম গজাইয়া থাকে।

অশ্বের জন্য সাধারণ ঔষধি।—

চোকর-পিণ্ড :—একসের চোকর একটা নাদায় রাখিয়া, তাহাতে উষ্ণজল ছাড়িয়া দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চোকর না জলে নিমজ্জিত হয় ততক্ষণ উষ্ণজল মিশ্রিত করিতে হইবে। চোকর জলে নিমজ্জিত হইলে আর জল দিবার আবশ্যকতা নাই। জল দেওয়ার পর নাদটীকে আবৃত করিয়া সেই অবস্থায় শীতল হইতে দিবে।

মসীনার মণ্ড :—চারি ছটাক মসীনা-চূর্ণ ৪ সের জলে এক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ কর। তাহাতে সামান্য পরিমাণে লবণ ছাড়িয়া দাও। শীতল জল ততটা ছাড়িবে, যতটা ঘোড়া উত্তমরূপে খাইতে পারিবে। কেহ কেহ মণ্ডটী ঘন করিয়া থাকে। ইহা কাশী এবং প্রদাহ-রোগে ব্যবহৃত হয়।

মসীনা-পিণ্ড :—আট ছটাক আস্ত মসীনা যথেষ্ট পরিমাণ জলে দুই ঘণ্টা সিদ্ধ কর। তাহাকে তরল রাখিবার জন্য অবশ্য মধ্যে মধ্যে জল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে

তাহাতে চোকর মিলাইয়া দাও। তাহা গাঢ় হইলে পূর্ব্ববৎ আবৃত করিয়া উষ্ণ অবস্থায় খাইতে দিবে।

কোনও স্থান মোচ খাইলে তাহার প্রতীকার :—যদি মোচ খাওয়া স্থান খুব উষ্ণ হয়, তবে প্রথম পাঁচ দিন ফোমেণ্ট করিবে। আধ ছটাক নিশাদল ও আধ ছটাক সোরা, ৮ ছটাক জলে দিয়া আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

সর্দ্দি হইলে উল্লিখিত পিণ্ড, উষ্ণ বস্ত্র এবং আধ্ আউন্স সোরা সান্ধ্য মণ্ডের সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি।

কাশি হইলে কচি বংশপত্র খাইতে দেওয়া উচিত। ঘোড়া যদি বিমর্ষ থাকে এবং জ্বর-দ্বারা অক্রান্ত হয়, তবে এক ড্রাম এলোজ, ১ ড্রাম টারটার এমেটিক, ২ ড্রাম সোরা, গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গোলা পাকাইয়া খাইতে দিবে। যদি জ্বর না থাকে, তবে ২ ছটাক হিঙ্গ, ১ ছটাক আদা এবং এক ছটাক গুড় মিশ্রিত করিয়া ১৬টী গোলা পাকাইবে, ও দিনে একটি করিয়া গোলা তিনবার খাইতে দিবে।

শূল-বেদনা :—তিন ড্রাম হিঙ্গ, ২ ড্রাম জিরামরীচ, ১ ড্রাম আদা অথবা দেড় ড্রাম কর্পূর অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। উষ্ণজল পান করাইলেও শূল বেদনার উপশম হয়।

পৃষ্ঠে ঘা হইলে :—লবণ-মিশ্রিত জলে ক্ষতকে ধৌত করিয়া আর্দ্র ন্যাকড়ার দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিয়া দিবে। নীলের গুঁড়া উত্তম ঔষধ। কার্ব্বলিক্ ভেসিলিনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গবালা।—প্রণেতা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ছেদীলাল আগড়-ওয়ালা, ৮ নং মদনমোহন চাটার্জ্জির লেন, কলিকাতা। পুস্তকের বাঁধাই ও কাগজ উত্তম। উপরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে। মূল্য ১।০ মাত্র।

ইহা একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে অবলা বঙ্গবালাদিগের অবস্থা প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। পরিণীত বঙ্গবালাগণ সমাজের পণপ্রথা ব্যতিরেকেও ভাগ্যদোষে, মাতাপিতার কন্যা-বিবাহে অন্যায় অস্থিরতায় এবং বঙ্গবাসিনী গৃহিণীদিগের সুশিক্ষালাভের অভাবে কি দারুণ ক্লেশ ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তাহা এই গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। ভাগ্য সুপ্রসন্ন এবং মাতাপিতা অস্থিরতা-পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলে যে সুফল ফলে, তাহা গ্রন্থের প্রধান চরিত্র পরেশনাথ ও স্বর্ণে দর্শিত হইয়াছে। পরেশনাথ শিক্ষিত, উদার, বিনীত, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। কন্যা-তিনটীর চরিত্রে তিনটী অবস্থা চিত্রিত। স্নেহে বৈধব্য, কনকে অত্যাচার-সহন, এবং স্বর্ণে সুখ। বর্ণাশুদ্ধির আধিক্য গ্রন্থের সৌন্দর্য্যনাশক।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 655. March, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৫ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩২৪। মার্চ্চ, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

স্থলপদ্ম।

মায়ের আমার পদ্ম-চরণ
পড়্‌ল যেথা ধরার গায়,
চিত্তরমণ রক্তকমল
সেথায় ফুটে উঠ্‌ল হায়!

মুগ্ধ হৃদয়-মধুপ আমার
চরণরজঃ-সুবাস-আশে,
পলক-হারা ঘুরে বেড়ায়
স্থলপদ্মের পাশে পাশে!

শ্যামল লতার অন্তরালে
শ্যামল জরীর শাটীর নীচে,
ভক্তবাঞ্ছা কল্প-কুসুম
হাস্‌ছে ওই, নয় রে মিছে!

ঘুচ্‌ল সকল ভবের ভাবন,
ঘুচ্‌ল সকল শঙ্কা লাজ,
তৃষ্ণাতুর পরাণ আমার
হ'ল শীতল কমল-মাঝ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিবরাত্রি

এই জগতে কি উচ্চ কি নীচ সকল জাতিই ঈশ্বর-করুণার সমান অধিকারী। জগদীশ্বরের কর্ণে জাত্যহঙ্কারের পটহধ্বনি ক্ষণমাত্র পৌঁছে না, ধর্ম্মকার্য্যের বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র অনুকুল করে না, জ্ঞানদৃপ্ত তার্কিকের অবিশ্বাস-প্রণোদিত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় তাঁহার মন কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করে না, ধার্ম্মিকম্মন্য পণ্ডিতদিগের আত্মাভি-মানপূর্ণ ধর্ম্মকলহে তাঁহার মন কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না। তিনি চান অভিমান-বর্জ্জিত অকপট হৃদয়ের আড়ম্বরহীন পূজা। এবং তাঁহাকে জানিতে পারুক্ আর নাই পারুক্, জ্ঞানতঃই হউক্, অজ্ঞানতঃই হউক্, যদি কেহ এইরূপ নীরব পূজা তাঁহাকে একবার্ প্রদান করিয়া থাকে, সে যত নীচকুলোদ্ভবই হউক্ না কেন, যত বড়ই পাপাচারী হউক্ না কেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমা ও কৃপার পাত্র হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শিবরাত্রি-কথা আমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দিতেছে।

বারাণসী নগরে এক ব্যাধ ছিল। তাহার খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ শরীর, পিঙ্গলচক্ষু ও পিঙ্গল কেশকলাপ দেখিয়া সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হইত। সে সর্ব্বদাই প্রাণিহিংসা করিয়া বেড়াইত। শল্য, পাশ প্রভৃতি প্রাণিহিংসার উপকরণ-সমূহে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। একবার ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে সেই ব্যাধ অনেক পশুবধ করিয়া প্রভূত মাংসভার বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত দিন অনশনহেতু ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে আর সেই ভারবহন করিতে পারিল না। বনমধ্যে এক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; নিবিড় অরণ্যের পথ নয়নগোচর হইতেছে না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্যজন্তুর ভয়ে সেই মাংসভার লতাপাশ-দ্বারা স্বীয় অঙ্গে বন্ধনপূর্ব্বক সে সেই বিল্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। শীতে তাহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কাঁপিতেছিল, নীহারবিন্দু তাহার শরীর সিক্ত করিতেছিল। আর নিদ্রা আসিল না। সে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল। সেই বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। দৈবক্রমে ব্যাধের গাত্রভ্রষ্ট একটী নীহারবিন্দু সেই শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইল, আর সেই পতনোন্মুখ হিমবিন্দুর ভারে একটী বিল্বপত্রও সেই সঙ্গেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সেদিন ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী শিবরাত্রির তিথি। আর সেই দিনেই মহাদেবের অতিপ্রিয়বস্তু বিল্বপত্র ও জল ব্যাধ-দেহ-সংসর্গে শিবলিঙ্গোপরি পতিত হইল। রক্তমাংসস্পৃষ্ট অনাচারী নিষাদের কিছুমাত্র শৌচ ছিল না। সে সমস্ত দিন স্নান করে নাই, কিংবা আড়ম্বর করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজা করে নাই। অজ্ঞানে সে উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের অতিপ্রিয়দিনে তাঁহার অতি-প্রিয়বস্তু তাঁহার মস্তকের উপর ফেলিবার নিমিত্তমাত্র হইয়াছে! তাহাতেই দেবতা প্রীত হইলেন। অজ্ঞাতসারে নিষাদকে সম্পূর্ণ

শিবপূজার ফল প্রদান করিলেন। নিষাদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন রজনীর অবসানে যখন অরুণ-কিরণ দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া নিবিড় অরণ্যের সেই প্রগাঢ় তিমিরাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল, নিশাচর হিংস্র জন্তুসমূহের চিত্তে একটা আলোকভীতি জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের অবাধসঞ্চারে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক অরণ্যের বিভীষিকা কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত করিল, তখন উপবাসপীড়িত রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট ক্লান্তকায় নিষাদ ধীরে ধীরে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নহে। কালক্রমে নিষাদের আয়ুঃ শেষ হইল। সমস্ত জীবন ধরিয়া সে অনেক প্রাণিহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছে; পুণ্যের ধার দিয়াও যায় নাই। কাজেই ভীষণাকৃতি যমদূত আসিয়া তাহার আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। যমদূত যখন তাহার আত্মাকে বাঁধিতে যাইতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এক শিবদূত আসিয়া তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সে বলিল, "যমদূত, তুমি কাহাকে লইয়া যাইতেছ? আমি যে প্রভু মহাদেবের আদেশে ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

যমদূত বলিল, "আমিও প্রভু যমের আদেশে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।" এইরূপে উভয়েই নিষাদের আত্মা লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিবদূত ও যমদূতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে শিবদূতই জয়ী হইয়া ব্যাধের আত্মাকে শিবলোকে লইয়া গেল।

এদিকে যমদূত শিবদূত-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া যমের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। যমও শিবদূতের এইরূপ প্রগল্ভতায় বিস্মিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একেবারে কৈলাসধামে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারদেশে নন্দীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দিন্, আজীবন পাপাচারী মৃত নিষাদের আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আমার দূতকে পাঠাইয়াছিলাম, শিবদূত কেন সে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল? এবং কোন্ পুণ্যবলেই বা ক্রূরপ্রকৃতি নিষাদের আত্মা যোগিজনবাঞ্ছিত শিবলোক প্রাপ্ত হইল?" যমের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া নন্দী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আজীবন প্রাণিহিংসক নিষাদ ঘোর পাপী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে একদা শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র ও জল প্রদান করিয়াছিল। এইজন্যই মহাদেবকৃপায় তাহার আত্মার এইরূপ সদ্গতি হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। যমও নন্দিবাক্যশ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিবরাত্রির ব্রতকথা হইতে উপরি উক্ত গল্পটী লিখিত হইল। ঐ ব্রতকথায় দেখিতে পাই;—মহাদেব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী আমার অতি-প্রিয়া তিথি। এই তিথিতে যদি কেহ উপবাসী থাকিয়া আমার পূজা করে, তবে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া থাকি। কেবলমাত্র উপবাসেই আমার যেরূপ প্রীতিসাধন করা হয়, পূজায় তত হয় না। এই তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক আমার

জ করিলে গাণপত্য-পদলাভ ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে।”

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়েও এই ব্রতের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত ব্যাধের গল্পটী ব্রতকথোক্ত গল্প হইতে কিছু ভিন্ন। তাহাতে উক্ত আছে যে, মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে * চণ্ড-নামে এক দুরাত্মা ব্যাধ সমস্ত দিন মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত হইয়া জালস্কন্ধে একটী শ্রীফলবৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। সে হস্তে ধনুক লইয়া সমস্ত রাত্রি নির্নিমিষনয়নে জাগিয়া রহিল এবং মৃগমার্গ অবলোকনের জন্য সম্মুখস্থ শাখাসমূহের বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই বিল্ববৃক্ষমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল। দুষ্টস্বভাববশতঃ ব্যাধ তদুপরি এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিল। দৈবক্রমে সেই জল ও ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি, সবই শিবোপরি পতিত হইল। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিবপূজা নিষ্পন্ন হইল। প্রভাত হইলে ব্যাধ বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে মৎস্য ধরিতে লাগিল। এদিকে তাহার পত্নী ঘনোদরী, সমস্তরাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি পতি গৃহে আসিল না, দেখিয়া উৎকণ্ঠায় দিনরাত্রি উপবাসিনী থাকিয়া প্রত্যুষেই পতির জন্য কিছু অন্ন লইয়া তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইল। সে যাইতে যাইতে একটী নদীর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তাহার পতি জালবদ্ধ বহু মৎস্য লইয়া তদভিমুখে আগমন করিতেছে। পতি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে বলিল, “আমি উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন উপবাসিনী থাকিয়া তোমার জন্য এই অন্ন আনিয়াছি। এস, স্নান করিয়া ভক্ষণ করি।” এই বলিয়া উভয়েই স্নান করিতে গেল। ইত্যবসরে একটী কুক্কুর আসিয়া সেই প্রস্তুত অন্ন সমস্ত খাইয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ব্যাধপত্নী কুপিতা হইয়া সেই কুক্কুরকে মারিতে গেল। কিন্তু অজ্ঞাতসারে শিবার্চ্চনা করিয়া ব্যাধ দিব্যজ্ঞান পাইয়াছিল; সেইজন্য সে পত্নীকে নিষেধ করিয়া বলিল—“কুক্কুরকে মারিও না। কুক্কুর অন্ন খাইয়াছে, বেশ করিয়াছে। আমরা অন্ন না খাইয়া মরিব, মনে করিতেছ? জীবন ত চিরস্থায়ী নয়। এই নশ্বর দেহের জন্য মূঢ়েরা কি না করিয়া থাকে? তাই বলি, প্রিয়ে! মান, অভিমান, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকগুণে স্বচ্ছ হও এবং তত্ত্ববোধের উদয়ে স্থির হইয়া থাক।” এইরূপ তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে তাহারা সমস্ত দিবস কাটাইল। পরদিন অমাবস্যার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শিবপ্রেরিত দূতগণ তাহাদের সমীপে আগমন করিয়া, শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, ব্যাধ যে অজ্ঞাতসারে জল ও বিল্বপত্রে শিবপূজা করিয়াছিল এবং তাহার পত্নী যে পতিচিন্তায় ঐ দিনে উপবাস করিয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ দুইজনকেই বিমানে চড়াইয়া স্বশরীরেই শিবলোকে লইয়া গেল।

এই শিবচতুর্দ্দশী তিথি মহাদেবের অতিপ্রিয়া তিথি। এ-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত

* ব্রতকথায় ফাল্গুন-মাসের উল্লেখ আছে। ফলতঃ তন্ত্রোক্ত ফাল্গুনমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও স্কন্দপুরাণোক্ত মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথি নহে। সম্ভবতঃ ব্রতকথায় সৌরমাসের গণনানুসারে 'ফাল্গুন' ধরা আছে, স্কন্দপুরাণে চান্দ্র মাসের গণনানুসারে 'মাঘ' ধরা আছে। দিন ধরিয়া যে মাস গণনা হয়, তাহা সৌরমাস; এবং তিথি ধরিয়া যে মাস-গণনা হয় তাহা চান্দ্রমাস।

আছে যে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন এই জগৎ-সৃষ্টি করেন, তখন রাশি-সমন্বিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। রাশির সংখ্যা দ্বাদশ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক। এই রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে কালচক্রান্বিত কাল অবলীলাক্রমে এই জগৎ-সৃষ্টি করেন। কালই এই আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি- ও বিনাশকর্ত্তা। লোক-সকল এই কালেরই আয়ত্তীভূত। এই জগতে কালই একমাত্র বলবান্ এবং সমস্তই কালাত্মক। প্রথমে কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর লোক-সকলের উৎপত্তি হয় এবং তদনন্তর সৃষ্টিপ্রবৃত্তি ঘটে। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ লব, ক্ষণ, নিমিষ, পল, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও বৎসরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশটী তিথিই পুণ্য-কালযুক্তা। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিমা তিথি দেবতাদিগের প্রিয়া, অমাবস্যা পিতৃগণের প্রিয়া, অষ্টমী শম্ভুর প্রিয়া, চতুর্থী গণেশের প্রিয়া, পঞ্চমী নাগরাজের প্রিয়া, ষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়া, সপ্তমী সূর্য্যের প্রিয়া, নবমী দুর্গার প্রিয়া, দশমী ব্রহ্মার প্রিয়া, একাদশী রুদ্রের প্রিয়া, দ্বাদশী বিষ্ণুর প্রিয়া, ত্রয়োদশী যমের প্রিয়া এবং চতুর্দ্দশী শিবের প্রিয়া।

স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত আছে যে, এই শিবরাত্রির দিনে শিবশাস্ত্রের আলোচনা শুনিয়াই চণ্ডালপুত্র দুর্ব্বৃত্ত দুঃসহ পরজন্মে বিচিত্রবীর্য্যরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিচিত্রবীর্য্যরূপে শিবরাত্রির উপবাস-দ্বারা শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধিলাভ করেন। এই ব্রতের ফলেই মান্ধাতা, ধন্ধুমারি ও হরিশ্চন্দ্রাদি-নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিবচতুর্দ্দশীব্রত অতিপ্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ব্যাধের কথা তুলিয়া এই কথাটী বলি যে, ঘোর পাপপরায়ণ অন্ত্যজজাতীয় নিষাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই মহাদেবের অতি-প্রিয় পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া দুর্লভ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা তাহার অদৃষ্টের ফল হইতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর এইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে করুণা করিয়া থাকেন, আড়ম্বরহীন পূজাতেই যিনি সন্তুষ্ট, আমরা কেন নিজেদের জ্ঞানিগর্ব্ব ও জাত্যহঙ্কারের ঢক্কা বাজাইয়া, বাহ্যাড়ম্বরের ধ্বজা তুলিয়া নিজ নিজ মহিমার ঘোষণার জন্য পরস্পর ধর্ম্মকলহে মত্ত থাকিয়া, সেই ঈশ্বরকে এত দূরে রাখিয়া দুর্লভ করিয়া ফেলি? মায়াবদ্ধ জীব আমরা মায়াচক্রে পড়িয়া মূল পথ হারাইয়া গিয়া থাকি। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া আমরা আবার নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি! শিব-রাত্রির কথা আমাদিগকে চৈতন্য প্রদান করুক্।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

ঝাঁবোয়া মিশ্র—দাদরা। *

(আমি) মন মজায়ে লুকিয়ে রব
জান্‌তে দেব না,
তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল
ছুঁতে দেব না।
ঘুর্‌ব তোমার কাছে কাছে
(ওগো) বল্‌বে তুমি কোথায় আছে,
ধরা ধরি কর্‌তে গেলে
ধরা দেব না।
দূরে দূরে বাজিয়ে বাঁশী
তোমার প্রাণে ছোঁব আসি,
'আসি আসি' বল্‌ব শুধু,
কাছে যাব না।
বুকের কাছে টেনে নোব,
প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে দোব,
চুমুতে ভরিয়ে দেব,
চুমু খাব না—
লুকিয়ে খেলা খেল্‌ব আমি—
খেলায় ভুল্‌ব না ॥

কথা—শ্রী :— স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´[ৰা ন্‌া] ০ ১´ ০
II -া ন্‌া ন্‌া। সা সসা ৰা I ৰা পা পা। মা মা জ্ঞা I
০ আ মি ম নম জা য়ে লু কি য়ে র ব

১´ ০ ॥
I জ্ঞা ৰসা ৰণ্‌া। সা সা -া I
জা ন্‌তে ০দে ব না ০

---

* এই গানটি "নারায়ণ"এর সন ১৩২৪ সালের মাঘ-সংখ্যা হইতে গৃহীত। লেঃ

১ ০ ১´ ০
I সা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পা দা I
ত ফা ৎ থে কে বা স্ ব ০ ভা ল ছু

১´ ০
I পা -া পা। পা পা মা I
তে ০ দে ব না ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পধণা ণা I
ত ফা ৎ থে কে বা স্ ব ০ ভা ল০০ ছু

১´ ০ ১´ ০
I ণা -া দা। পা পা মা I সা ন্া ন্া। সা সসা রা I
তে ০ দে ব না ০ ০ আ মি ম নম জা

১´ ০ ১´ ০
I রা০ পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে দু কি য়ে র ব জা নতে ০দে ব না আমি "আমি"

১´ ০ ১´ ০
II পা -পা পা। পা পা -পা I পা পা ধাণ। ণা -া -া I
(১) ঘু র্ ব তো মা র কা ছে ০কা ছে ০ (ওগো)
(২) দূ রে দূ রে বা জি য়ে বা ০০ শী ০ ০
(৩) বু কে র কা ছে টে নে নো ০০ ব ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I ণা পপা ধপা। মা মা মা I গা রগা মা। মা -া -া I
(১) ব ০ল বে০ তু মি কো থা ০য় আ ছে ০ ০
(২)তো ০মা র০ প্রা ণে ছোঁ ব ০০ আ সি ০ ০
(৩) প্রা ০ণে প্রা০ ণে মি শি য়ে ০০ দো ব ০ ০

১ ০ ১´ ০
I মা ণা ণা। ণা -া ণা I -ধা ধা ধা। পা -া -া I
(১) ধ রা ধ রি ০ ক র্ তে গে লে ০ ০
(২) আ সি আ সি ০ ব ল্ ব শু ধু ০ ০
(৩) চু মু তে ভ ০ রি য়ে ০ দে ব ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I মা -া মা। গা -া গা I মা -া -া। জ্ঞা রা সাণ্ I
(১) ধ ০ রা দে ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(২) কা ০ ছে যা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(৩) চু ০ ম খা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০

১´ ০ ১´ ০
I সা সসা রা। রা পা -পা I মা মা জ্ঞা। জ্ঞা রসা রণ্া I
লু ০কি য়ে খে লা খে ল্ ব আ মি ০খে লা০

১´ ০ ১´ ০
I সা সা সা। সা ন্া -া I -া ন্া ন্া। সা সসা রা I
য় ভু ল্ ব না ০ ০ আ মি ম নম জা

১´ ০ ১´ ০
I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে লু কি য়ে র ব জা নৃতে ০দে ব না আমি "আমি"

বাজাইবার ঠেকা।

১´ ০ ১´ ০
II সা সা রা। সা গা ধা I মা পা ধা। পা মা গা II
॥ সে যায় যাক্। সে যায় যাক্। না যায় থাক্। হে থায় থাক্ ॥
॥ ধা ধিন্ তাক্। ধা তিন্ তাক্। ধা ধিন্ তাক। ধা তিন্ তাক্ ॥

যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে এই প্রলঙ্কর পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের স্রোতে পড়িয়া তথাকার অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধ কিংবা তৎসংযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, য়ুরোপের নারীগণ মিলিত হইয়া পুরুষদিগের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নারীগণ নানা সমিতি স্থাপন করিয়া কিরূপ ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশের ও নারীগণের মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।—বিলাতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে Land Council of National Political League নামে নারীসমিতি স্থাপিত-হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যে নারীশক্তি-নিয়োগ করিবার মানসে কুমারী মার্গারেট্ ফার্কুহার্স´ন, এম, এ ও কুমারী ব্রডহার্ষ্ট´ এম-এ, এক কৃষিসমিতি

স্থাপন করিয়াছেন। ইহারা কিরূপে দেশের খাদ্যাদি দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে রমণীদিগকে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই নারী-সমিতির সহিত সরকারী কৃষি-বিভাগের (Board of Agriculture) ও দেশের সমুদয় কৃষি-বিদ্যালয়ের ও কৃষিসমিতির অত্যন্ত সহানুভূতি আছে। গৃহপালিত পক্ষি-প্রভৃতির পালনের জন্য সমিতি একটী কারখানা (Poultry farm) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানায় রমণীদিগকে ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

রণক্ষেত্রেও সহস্র সহস্র নারী আহত-সৈনিকদিগের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে-স্থানে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষিত হইতেছে, সে-স্থানে রমণীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সৈনিকদিগের আঘাতের প্রথমাবস্থায় সেবা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেছেন। হাস-পাতালে স্ত্রীডাক্তারগণ আহতদিগের চিকিৎসায় নিয়োজিত হইয়াছেন। রমণীগণ দেশের তাবৎ কার্য্যে পুরুষদিগকে অবসর দিয়া আপনারা তাহাদের কার্য্য গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। পুলিসবিভাগে নারী, রেল বিভাগে নারী, কলকারখানায় নারী। নারীগণ সমুদয় কার্য্যের এখন অধিকারী এবং উপযুক্ত বলিয়া গণ্য। (সংগৃহীত)

শ্রীমতী—

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষ।

গাভী পালন করিতে হইলে উত্তমজাতীয়া গাভী পালন করাই উচিত। নতুবা দুগ্ধ অল্প হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উত্তমজাতীয়া গাভী নিম্নজাতীয় বলদের সংস্পর্শে আসিয়া গর্ভধারণ করিলে তাহার প্রসূত সন্ততি মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হয় না। সুতরাং সাঁড়ও উত্তমজাতীয় হওয়া চাই।

ভারতের মধ্যে হাঁন্সি হিসার, হান্সি-নগর এবং সান্‌হিওয়াল (পঞ্জাব) গাভীগুলি উত্তম-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা অত্যন্ত দুগ্ধবতী। কাথিওয়াড়-নামক স্থানের গাভী-গুলি প্রথম প্রথম হান্সিহিসারের গাভীর তুল্য দুগ্ধ দেয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দোষ এই যে, তাহাদিগের দুগ্ধ শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী-জেলাস্থিত সান্‌হি-ওয়াল-নামক স্থান হইতে গাভী ক্রয় করাই উচিত। কারণ, এখানে গাভীর উৎকর্ষসাধন করিবার আগার আছে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হান্সি-হিসারের গাভী প্রত্যহ ২ হইতে ৫ গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের ৪ ছটাক হইতে ২৫ সের ১০ ছটাক) এবং সান্‌হিওয়ালের গাভী ২ হইতে তিন গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের হইতে ১৫ সের) পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উত্তম গাভীর মূল্য ৫০৲ হইতে ১২০৲ টাকা।

জল-বায়ুর গুণে দুগ্ধেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হান্সি-হিসারের গাভী যদি জব্বলপুরে রাখা যায়, তবে তাহার দুগ্ধ কম হইবে; কিন্তু যদি দিল্লীতে রাখা হয়, তবে তাহার দুগ্ধের অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এইজন্য হান্সি-হিসারের বকনা ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্য দেশে রাখিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য করান উচিত। সমতল প্রদেশ হইতে যদি পার্ব্বত্য প্রদেশে গাভী লইয়া যাওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ কমিয়া যায়, কিন্তু যদি তাহাকে রীতিমত আহার দেওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ অধিক হইয়া থাকে।

মহিষের মধ্যে মুর্‌রা-জাতীয় মহিষই উত্তম। ইহাদিগকে হান্সিহিসার, রোহতক, ঝীণ্ড এবং নাভা হইতে পাওয়া যায়। এখানকার মহিষগুলি উত্তম হয় বলিয়া কলিকাতা, বম্বে, কোয়েটা এবং পেশোয়ার হইতে লোক ইহাদিগকে ক্রয় করিতে আসে। মুর্‌রা মহিষের শৃঙ্গ অত্যন্ত বক্র। ইহাই মুর্‌রার পরিচায়ক। ইহারা প্রত্যহ ১০ হইতে ২৬ কোয়ার্ট পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহার অধিক যে তাহারা দুগ্ধ দেয় না, তাহা নহে। তবে সেরূপ মহিষের সংখ্যা অতিবিরল।

অমৃতসহরে দীপমালিকায় এবং বৈশাখ মাসে মহিষ-বিক্রয়ার্থ একটি মেলা হয়। তথা হইতেই লোকে মহিষ ক্রয় করে। জাফিরাবাদের মহিষ উত্তম বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের উত্তমতার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। রোহতক, দিল্লী এবং হিসার জেলাই অধুনা বম্বেকে মহিষ দিয়া থাকে। স্বরাটের মহিষও উত্তম বলিয়া পরিগণিত।

আব্‌হাওয়া যেমন গাভীর দুগ্ধের উপর আধিপত্য করে, মহিষের উপরও অনুরূপ করিয়া থাকে। মুর্‌রা মহিষের জন্য প্রচুর জল ও উত্তম চরাই আবশ্যক।

যদি দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী ক্রয় করিতে হয়, তবে কেহ যেন পয়সার দিকে দৃষ্টি না করেন্। এ-বিষয়ে কার্পণ্য করিলে, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অনেক লোক সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিকৃষ্টজাতীয়া গো বা মহিষী ক্রয় করে। ইহা তাহাদিগের ভ্রম। দুগ্ধবতী গাভী যদি উত্তমজাতীয়া হয়, তবে মহার্ঘতা তাহার সমক্ষে অতিতুচ্ছ বস্তু। একটি গাভী প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (২৫সের) দুগ্ধ দেয়। যদি প্রতিকোয়ার্টের (১ সের ৪ ছটাক) মূল্য দুই আনা রাখা যায়, তবে সে প্রত্যহ আড়াই টাকার দুগ্ধ দিয়া থাকে। আর তাহার পালনে যদি প্রত্যহ এক টাকা খরচ হয়, তবে প্রত্যহ লভ্যাংশ দেড় টাকা, অর্থাৎ মাসে ৪৫৲ টাকা পড়ে। এইরূপে চারিমাসে সেই লভ্যাংশ ১৮০৲ টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং, এরূপ স্থলে গাভীর মূল্য ২০০৲ টাকা দিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। কিন্তু কেহ যদি পয়সার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সস্তায় গাভী ক্রয় করে, তবে তাহার কি ফল হইবে তাহাও বিবৃত করিতেছি। একব্যক্তি ৪ সের দুগ্ধদাত্রী একটা গাভীর প্রতি ৪০৲ টাকা খরচ করিল। তাহার দুগ্ধের মূল্য প্রত্যহ আট আনা হয়। এই আট আনা তাহার পালনেই লাগিয়া যাইবে; সুতরাং লাভ কিছুই থাকিবে না। বরং যে টাকা দিয়া গাভীটী ক্রয় করিয়াছিল তাহা উঠিল না বলিয়া সে টাকাটা ক্ষতি হইল।

গাভী হৃষ্টপুষ্টা হইলেই যে দুগ্ধবতী হইবে,

তাহা নহে। গাভীর স্তনও দুগ্ধ-বিষয়ে ভ্রমাত্মক। সন্তান দিবার অনতিপূর্ব্বে বা পরে যদি গাভীর স্তন বৃহদাকার হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধবতী বলিয়া বিবেচনা করিও না। স্তনের বর্দ্ধিতাবস্থা অতীত হইলে, গাভী দুগ্ধবতী কি না, তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

গাভীর স্তন বৃহদাকার হওয়া চাই; কিন্তু সম্মুখে নাভির দিকে ভার অধিক হওয়া উচিত। পশ্চাৎ হইতে দেখিলে বোধ হইবে যে গাভী অল্পদুগ্ধবতী, কিন্তু সম্মুখের দিকে দেখিলে বোধ হইবে যে স্তনটী একটী থলির মত ও দুগ্ধপূর্ণ। ইহাই উত্তম গাভীর নিদর্শন।

গাভীর চারিটি বাঁটের একের সহিত অন্যটী সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ক্রয়কালে বাঁটটী টানিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ বা গাঁট আছে কি না। যদি গাঁট থাকে, তবে সে গাভী ক্রয় করা কখনও উচিত নহে। কারণ, পরবর্ত্তী প্রসবে হয়ত, তাহার দুগ্ধনিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বাঁটে ফোড়া বা আঘাত লাগিলে বাঁটের মধ্যে কাঠিন্য বা গাঁট জন্মে। বাহিরে দেখিলে বোধ হইবে যে, বাঁটে কোন দোষ নাই; কিন্তু বাঁট টানিলেই দোষটী ধরা পড়িবে। অন্ধ বাঁট অন্যান্য বাঁট অপেক্ষা শীর্ণ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। গাভী যদি শাবক সহিত ক্রয় করা হয়, তবে চারিটী বাঁট দোহন করিয়া লইবে। দোষহীন বাঁটে দুগ্ধ সমানধারে নির্গত হইবে; কিন্তু তাহা দোষযুক্ত হইলে, দুগ্ধ ছিড়্কাইয়া বাহির হইয়া থাকে।

গাভী কত দুগ্ধ দিবে, তাহা দুগ্ধ দিবার কালেই নির্ণয় হইতে পারে। গাভীকে একদিন দোহন করিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রা স্থির করিও না, কিন্তু তিন চারি দিন দোহন করিয়া নিশ্চয় করিবে। একবার দোহন করিয়া দুগ্ধ নিশ্চয় করার দোষ এই যে, গাভীর মালিক দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা না দুহিয়া রাখিয়া দেয়, অথবা অস্থায়িরূপে দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য গাভীকে ফেন খাওয়ায়। অপত্যবতী গাভীই দুগ্ধের মাত্রার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে গাভী ক্রয় করিলে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হয়।

গভীর দুগ্ধ নির্ণয় করিবার যে নিয়ম, মহিষেরও তাহাই। তবে কতকটা পার্থক্য আছে। মহিষের দুগ্ধ কেবলমাত্র নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, বস্তুর উত্তমতা আবশ্যক। দেশীয় লোকমাত্রই উত্তম দুগ্ধের অত্যন্ত ভক্ত। সুতরাং, বস্তুর পার্থক্য তাহারা সহজেই জানিতে পারে। মহিষ যে কিরূপ দুগ্ধ দিবে, তাহা সন্তান প্রসব করার পরই জানিতে পারা যায়। তিন সপ্তাহ পরে যখন মহিষ পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তখনই দুগ্ধ নিরূপণের প্রকৃত সময়। মহিষের দুগ্ধ-শিরা গাভীর দুগ্ধ-শিরা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহা যদি আঁকিয়া বাঁকিয়া স্তনে প্রবেশ করে, তবে তাহা অধিক দুগ্ধের পরিচায়ক। মহিষের স্তন ও বাঁট গাভীর স্তন ও বাঁট অপেক্ষা বৃহৎ। মহিষের পশ্চাতের দুইটী বাঁট সম্মুখের দুইটী বাঁট অপেক্ষা বড়। মহিষ ক্রয় করিতে হইলে সন্তান প্রসব করার পরই ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নির্ম্মলতা।

সূর্য্যের আলোক ব্যতীত কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদ বাঁচে না বটে, কিন্তু একপ্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা সূর্য্যতাপ ও আলোকে মরিয়া যায়। এই পদার্থ অতিক্ষুদ্র এবং বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে। রৌদ্র এ সমস্ত নষ্ট করে। আমরা দেখিতে পাই, কোন খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, তার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে। এই ছাতাই ঐ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ঘরেও নানাপ্রকার দ্রব্যে ছাতা পড়ে। ছাতা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। ছাতা অদ্ভুত রকমের গাছ; অল্প সময়ের মধ্যেই তা'র বংশ-বৃদ্ধি হয়। ছাতার বীজ ঘরের ধূলার সঙ্গে মিশে যায়; বিছনা এবং কাপড়-চোপড়ে লাগে। প্রতিদিন ঘর ঝাটাইবে আর ধুইবে, কাপড় ও বিছানা রৌদ্রে দেবে এবং খাদ্যদ্রব্য-সকল ভাল করে ঢাকিয়া রাখিবে।

ছাতা ব্যতীত আর অনেক প্রকার অনিষ্ট-কর বীজ বাতাসে থাকে। সেগুলি মাংস ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য নষ্ট করে। বসন্ত, হাম, ওলাউঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজও আমাদের শরীরে ও গৃহে প্রবেশ করে। এই সমস্ত বিপদ্ হইতে নিজে নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সকল প্রকারে পরিষ্কার থাকিলে, যথারীতি বায়ুসেবন করিলে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুপক্ক খাদ্য খাইলে এবং যথানিয়মে পরিশ্রম করিলে যে স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেই স্বাস্থ্যই আমাদের বলরক্ষক। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সকল প্রকার রোগবীজ নষ্ট করে। বিধাতার সৃষ্টির প্রণালী ও কৌশল কে বুঝিতে পারে? কিন্তু তিনি আমাদের এতটা বুদ্ধি ও শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম বুঝিয়া চলিলে আমার সুস্থ, সবল ও সুখী থাকিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারি এবং মরণের সময় বিনা কষ্টে মরিতে পারি। কিন্তু তা না করিয়া আলস্য, লোভ এবং রিপুগণের দাস হইয়া থাকিয়া কপালের বিধাতার বা অদৃষ্টের দোষ দিয়া বুক চাপ্‌ড়ান কেবল কাপুরুষতামাত্র।

মরণের মধ্যেই আমাদের জীবন। নানা-প্রকার রোগবীজ অহর্নিশ সকল স্থানে চলিতেছে! একদিকে দেখিতে গেলে প্রকৃতি আমাদের বিরোধী। তাপ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, সকলই আমাদের ধ্বংস করিতে নিয়ত উদ্যোগী। আর মানবীয় নীচপ্রকৃতি আমাদের মহাশত্রু। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, নানাপ্রকার নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পরস্পরের কি অনিষ্টই না করে? এই সমস্ত বিরোধিগণকে জয় করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিধাতা মানুষকে এ শক্তি দিয়াছেন। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটি অপরি-বর্ত্তনীয় গূঢ় মঙ্গলশক্তি চলিতেছে। সেই শক্তি বিধাতার ইচ্ছা (Divine Will)। সেই শক্তি জ্ঞাত হও, তাহার অনুসরণ কর, সেই ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দাও, দেখিবে তুমি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সুখে থাকিবে ও সমস্ত প্রকৃতি তোমার সেবা করিবে।

"আমার পিতার রাজ্য এ বিশ্ব-সংসার
যথা যাই তথা পাই সেবা-উপহার।"

খাদ্য ।

হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কলির (বর্ত্তমান সময়) জীবের অন্নগত প্রাণ । কথাটি খুব সত্য ।

খাদ্য আমাদের শরীরের জ্বালানি কাঠ। সুতরাং, এই কাঠ ব্যতীত আমাদের দৈহিক অগ্নি কিরূপে রক্ষা পাইবে ? আর আমরাই বা কেমন করিয়া বাঁচিব ?

পান-ভোজন করিলে শরীরের মধ্যে কি হয়, তাহাই একটু বলি। আহারের প্রথম কাজ চর্ব্বণ। খাদ্যদ্রব্যকে চিবাইয়া এবং লালার সঙ্গে মিশাইয়া ঠাসা ময়দার মতন করিয়া লইতে হয়। সেই ঠাসা দ্রব্য (stomach) উদরে বা পাকাশয়ে যায় ; তারপর (Bowel) অন্ত্র (Intestine) বা ভুঁড়িতে যায়। এই দুই স্থানে গিয়া নানা-প্রকার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক হয়। তবে ভেবে দেখ, আমাদের খাদ্য তিনবার রাঁধা হয় ; একবার বাহিরে, আর দুইবার উদরে। এইরূপ রন্ধন হইলে খাদ্যের সারাংশ আমাদের (Blood Vessel) রক্তের নলী চুষিয়া লয়। খাদ্যের সারেই রক্ত তৈয়ারি হয় ; আর অসার ভাগ মলমূত্র হইয়া বাহির হইয়া যায়। খাদ্য রক্তে পরিণত হয় এবং মাংস, মাংসপেশী (muscles), হাড়, চর্ব্বি, ত্বক্, ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুত করে। এখন ভেবে দেখ, অন্নগতপ্রাণ বলা কত সত্য ।

আমরা যদি এক দিনরাত উপবাস করি, তবে আমাদের দেহের ভার একটু কমে যায়। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমাদের দৈহিক অগ্নি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুড়াইয়া ফেলে। উপবাস করিলে চক্ষু ও হাত-পা যে জ্বালা করে, তাহার কারণ—ঐরূপ দহন। দীর্ঘ উপবাসে মানুষ মরিয়া যায়। নিয়মিতরূপে যথাপরিমাণে খাইলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

কিরূপ খাদ্য খাইতে হয়, তাহা এখন বলি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাদ্য-দ্বারাই রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি সকলই জন্মে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা চাই। করুণাময় বিধাতা আমাদের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন্। সমস্ত জড়, উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সর্ব্বদা আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে।

সকলপ্রকার উপাদান একই প্রকার খাদ্যে পাওয়া যায় না। সেজন্য আমাদের বিবিধ-প্রকার খাদ্য খাইতে হয়। কিন্তু দুই প্রকার খাদ্য আছে যাহাতে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়।—দুগ্ধ ও পক্ষীর ডিম্ব। দুগ্ধ রক্ত হইতে জন্মে, তাই রক্তের সমস্ত উপকরণই ইহাতে আছে। মা'র দুগ্ধ মানবশিশু ও নানা-জাতীয় পশু-শাবকের প্রথম খাদ্য—শিশু-খাদ্য—বলিয়া অতিতরল। দুগ্ধে ৮১ হইতে ৯০ ভাগ জল, আর বাকি কয়েক ভাগ সার। দুধে একটু দম্বল দিলে দই হয় ; দই মথিলে মাখন বাহির হয়। মাখন উঠাইয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই ঘোল। শরীরের পক্ষে ঘোল বড় উপকারী। ইহার দ্বারা অনেক রোগবীজ নষ্ট হয়। ঘোল দই অপেক্ষা লঘু। সেইজন্য পেট-রোগাদের ইহা উত্তম পথ্য। আবার দুধ জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে একটু ঘোল বা দই দিলে অনেকটা ছানা হইয়া উপরে ভাসে। আর তলায় অনেকটা জলের

মতন যে জিনিষ থাকে, তা'র নাম Whey বা ছানার জল। ছানার সঙ্গে কতকটা মাখন মিশে যায়, আর কতকটা মাখন ছানার জলের সঙ্গে থেকে যায়। ছানার জলে আরও অনেক পদার্থ থাকে। জাল দিলে ইহা হইতে চিনি বাহির হয়। কেবল তাহাই নয়। খুব জাল দিয়ে জলভাগ উড়াইয়া দিলে একপ্রকার সাদা সাদা গুড়া পাওয়া যায়। তাহা ছাই বা একপ্রকার লবণ। এখন জানা গেল, দুধে এই কয়েকটী দ্রব্য পাওয়া যায়:—যথা, জল, চিনি, লবণ, স্নেহপদার্থ (fat) এবং ছানা। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

সন্ধ্যাকালে সুধীর রোগী দেখিয়া গ্রাম হইতে ফিরিতেছে, এরূপ সময়ে পথিপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাটী হইতে একটা মর্ম্মভেদী আকুল আর্ত্তনাদ ও কাতরক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহা শুনিয়াই সুধীরের প্রাণে সহসা কেমন দয়ার সঞ্চার হইল। সে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়-হেতু আপনার সহিস্‌কে উক্ত বাটীতে পাঠাইয়া দিল। সহিস্ আসিয়া সংবাদ দিল, যোগেশচন্দ্র বসু নামক জনৈক রেল-কর্ম্মচারীর প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী ঐইরূপ কাঁদিতেছেন। বাটীতে অপর আত্মীয়ও কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া সুধীর ভাবিল, গৃহস্বামী মৃত; কার্য্যোপলক্ষে বোধ হয়, পরিবার লইয়া তিনি এখানে ছিলেন। এখন এই বিদেশে একা বাঙ্গালীর মেয়ে এ মৃত ব্যক্তিকে লইয়া কি করিবে? যদি তাহার কোনও উপকার করিতে পারে, এই মানসে সুধীর তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু অপরিচিত পুরুষ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইবেই বা কিরূপে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর তাঁহার সহিস্‌কে অন্দর মধ্যে গিয়া এই খবর দিতে বলিল যে, "বল্‌গে যা, ডাক্তারসাহেব একবার দেখ্‌তে চান।"

সহিস্ ভিতরে গিয়া সংবাদ দিলে গৃহস্বামিনীর দাসী আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া সুধীরকে বলিল, "সাহেব, আউর ক্যা দেখে গা? আদ্‌মী ত মর্ গিয়া!"

সুধীর বলিল, "তা আমি শুনিছি। মৃতদেহের সৎকারের তোমরা কি করছ? শুনলুম, তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই! যদি তোমাদের কোন উপকার হয়, তাই এসেছি।"

দাসী সুধীরের বাক্য শুনিয়া বাটীর মধ্যে এই সংবাদ দিল, এবং অনতিবিলম্বে সুধীরকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুধীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটী প্রৌঢ় মহানিদ্রায় নিমগ্ন। সংসারাসক্তির লেশমাত্রও তাহাতে লক্ষিত হইতেছে

না! সে আজ নির্ব্বিকার! নিশ্চল নিস্পন্দ জ্যোতির্হীন দেহখানি আজ শয্যোপরি নিষ্কাম-ভাবে পতিত রহিয়াছে! সুধীর ভাবিল, কি বৈচিত্র্য! ক্ষণপূর্ব্বে যাহার কত আশা, কত উৎসাহ, কত সুখকল্পনা, কত উদ্যম, মৃত্যুর দুর্নিবার যবনিকা আসিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সে-সমস্তই লুক্কায়িত করিয়া ফেলে! কি আশ্চর্য্য! নিমেষে সুধীরের দৃষ্টি অনাবদ্ধ-বেণীকা, শোকে মুহ্যমানা, অসংযতবাসা, অনাহার- ও রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্টা, পতিশয্যা-বিলগ্না, ভূলুণ্ঠিতা, রোরুদ্যমানা, তারুণ্য-সৌন্দর্য্যশোভিতা, রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীর দেখিল যোগেশের পত্নী ষোড়শবর্ষীয়ার অধিক হইবে না—সে তরুণী! তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সুধীরের চক্ষে জল আসিল। সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই নিকটে নাই। বালিকা মৃতস্বামীকে লইয়া বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছে! তাহাকেই বা রক্ষা করে কে? স্বামীর সৎকারই বা কিরূপে হয়? সংসারানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র রমণী একে পতিশোকে কাতরা, তাহার উপর এই সকল দুশ্চিন্তায়, সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না! একমাত্র ক্রন্দন ও হিন্দুস্থানী দাসী তাহার সহায়। এইরূপ চিন্তাভারে যখন সে পীড়িতা, তখন সহসা সুধীর তথায় উপস্থিত হইলেন। সুধীরকে দেখিয়া শোকাপহৃতলজ্জা রমণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া, মস্তকের কাপড় উঠাইয়া দিল। অজ্ঞাতসারে সুধীরের নয়ন-যুগল বারেক রমণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া লইল! সুধীর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইল! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ মুখ তাহার অতি-পরিচিত! যেন রমণীকে সে কোথায় দেখিয়াছে! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, কি-সূত্রে দেখিয়াছে, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না।

যাহা হউক, মনের কৌতূহল মনে দমন করিয়া সত্বর সুধীর যোগেশচন্দ্রের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং তাহার পর রমণীর জন্য সে বিশেষভাবে চিন্তিত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহার এই চিন্তার উদয় হইল, বিদেশে যুবতী রমণী একাকিনী কাহার কাছে থাকিবে? তাহার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, সুধীর ত তাহা কিছুই জানে না! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় সুধীর সাতপাঁচ ভাবিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে এখানে ছিলেন। কিন্তু তিনি ত এখন সংসারের সকল মমতা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন; আপনি একা কিরূপে এখানে বাস কোর্‌বেন? আপনার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, বলুন, তাঁদের সংবাদ দিই; তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন!"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্বশুর-বাড়ীতে ত আমার এমন কেউ নেই যে, আমাকে নিয়ে যাবে! আমার বাপের বাড়ীতে অনুগ্রহ ক'রে আমার দাদাকে খবর দিন্।"

"ঠিকানা বলুন" বলিয়া পকেট হইতে 'নোট্‌বুক' বাহির করিয়া সুধীর ঠিকানা লিখিয়া লইতে লাগিল।

রমণী বলিল, "অতুলকৃষ্ণ মিত্র—৩৬ নং চোরবাগান।"

সুধীর বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অতুল মিত্তির! চোরবাগান?"

রমণী বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"।

সুধীর পুনশ্চ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বিভা ?"

যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি করে ?"

সুধীর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বিভা, বিভা, পাষাণে প্রাণ বেঁধে তোমার বিবাহ দেখেছিলুম ! আবার ঘটনাচক্রে চক্ষের উপর তোমার বৈধব্যও আমাকে দর্শন কর্ত্তে হল !"

এই শোকের মধ্যেও বিভার মনে বিলক্ষণ কৌতূহল জন্মিল। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি ? আমি ত আপ্‌নাকে চিন্‌তে পাচ্ছি না !"

সুধীর। আমি কিছুদিন তোমাদের পাড়ায় ছিলাম। অতুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তুমি তখন খুব ছেলে মানুষ। বোধ হয়, তোমার মনে নেই—আমার নাম সুধীর।

বিভা। (আশ্বস্ত ভাবে) ওঃ—আপনি এখানে ! বোধ হয়, ভগবান্ দয়া করে আমার এ বিপদের সময় আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন।

সুধীর বলিল, "বিভা, যখন তোমার পরিচয় পেলুম, তখন আর তোমাকে ত একলা এখানে রেখে যেতে পারি না। এখন আমার বাসায় চল। তারপর অতুলকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি ; সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বিভা সম্মতা হইল। সম্মত না হইয়া সে করে কি ? বিদেশে সে একাকিনী বালিকা মহাবিপদেই পতিত হইয়াছে ! জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন স্রোতের মুখে কাষ্ঠখণ্ড পাইলেও তদবলম্বনে জীবনরক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, বিভাও তদ্রূপ সুধীরকে পাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(১৯)

একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তথাপি অতুল আসিয়া পৌঁছিল না ; কিম্বা তাহার কোনও সংবাদও পাওয়া গেল না ! সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিল, এ ব্যাপার কি ! এরূপ সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-বন্ধু কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে ?

বিভা প্রত্যহ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে, "দাদার কোনও পত্র এসেছে কি ?" সুধীরও প্রত্যহই তাহার উত্তর দেয়, "কাল আস্‌বে।" যদিও সুধীর বিভাকে "কাল আস্‌বে" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিত, কিন্তু নিজে সে অতুলের জন্য বড়ই চিন্তিত হইল।

সুধীর অতিযত্নেই বিভাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিল। তাহার জন্য একজন দাসী এবং একটী কক্ষও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। নিজে অবসর পাইলেই বিভার কাছে বসিয়া তাহার শোকাপনোদনের জন্য সে গল্প করিত, কখনও বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিভাকে শুনাইত, এবং কখনও বা ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশ সে দেখিয়াছে, সেই সকল দেশের বর্ণনা করিত।

উভয়ের এইরূপ একত্রে অবস্থান উভয়েরই, বিশেষতঃ বিভার পক্ষে যে কতটা অনিষ্টকর হইতে লাগিল, তাহা উভয়ের কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। বিভার বিবাহ হইয়া-

ছিল সত্য, কিন্তু দশবৎসরের পাত্রীর ৪৫ বৎসরের পাত্রের সহিত বিবাহে কখনও দাম্পত্যপ্রণয় জন্মিতে পারে না। বিবাহের পর কয়েক বৎসর বিভা স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রকৃত প্রেম যে বস্তু, তাহা বালিকা তাহার স্বামীর প্রতি কোনও দিন অর্পণ করিতে পারে নাই বা শিখে নাই। গুরুজন বলিয়াই যোগেশকে সে শ্রদ্ধা করিত, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই যত্ন ও সেবা করিত, কিন্তু যোগ্যা পত্নী যাহাকে বলে, তাহা সে হইতে পারে নাই। যোগ্যাপত্নী কাহাকে বলে, তাহা বিভার অবিদিতই ছিল। তাই বিভা সুধীরকে দর্শনমাত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই আপন অন্তরে নরকাগ্নি জ্বালিতে আরম্ভ করিল। বিভা সুধীরের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে ভাবিত, বাবা যদি তখন সুধীরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি না করতেন, তা'হলে এই রুগ্ন, বৃদ্ধ, জীর্ণ স্বামীর পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর স্বামী, ও এত সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই আমার হইত!"

বিধবা যুবতীর এরূপ চিন্তা মনে আনাও যে পাপ, তাহা বিভার অন্তরে উদয় হইত না। ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী সংসারের কুটিল গতি-বিধির জানেই বা কি! সংসারের ভোগ-লালসার বাসনা তাহার ত কিছুই নিবৃত্তি হয় নাই। অকালে সমাজের স্বেচ্ছাচারে এরূপ রমণীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্রদান করিলে, সে মন্ত্র তাহার অন্তরস্পর্শ করিতে পারে কি? অনেকেই হয় ত বলিবেন, "ষোল বছরের মেয়ে নেহাৎ কচি খুকিটি নয়; তাহার বুঝিয়া চলা আবশ্যক।" কিন্তু এ আবশ্যক কয়জনে বুঝে? কত পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরেও ভোগবিলাসের স্রোত প্রবাহিত! আর ষোল বৎসরের তরুণী যুবতীর প্রাণে যে এ বাসনা উদয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এ কর্ত্তব্য পালন করিলে, দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

সুধীর বাল্যকাল হইতেই বিভাকে মনে মনে যথার্থ ভালবাসিত। বিভার বৃদ্ধ পিতৃতুল্য বরের সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। এবার বিভার বৈধব্য-দর্শনে তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, আপনি হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিভাকে বিবাহ করিয়া বিভার এ দুঃখজ্বালা দূর করিয়া দিবে এবং তাহাতে তাহার নিজেরও অভিষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু অতুলের না আসা পর্য্যন্ত সে এ প্রস্তাব বিভার নিকটে উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; বিধবা-বিবাহে কোনও দোষ মনে করিল না। ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন যুবক সমাজের রীতি-নীতি জানিয়াও এ দুরাশা হৃদয়ে দিন দিন পোষণ করিল।

লীলার কথাটী যে সুধীর একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুধীর পূর্ব্বাভিমান স্মরণ করিয়া ভাবিল, "লীলা! লীলা আমার কে? কেউ নয়! তার বাপ্ আমার বড় অপমান ক'রেছে। তার একটা বড় রকম প্রতিশোধ নেওয়া চাইই! বিভাকে বিয়ে করলেই তার উচিত প্রতিবিধান হ'বে। এত স্পর্দ্ধা! মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দেবে না! আর লীলা! লীলারই

কি বড়মানুষের মেয়ে বলে মনে অহঙ্কার নেই? হাঁ, আছে বই কি! না হ'লে তার বাপ্ কি এতটা সাহস করত? থাকুক্ সে তার বড়মানুষ বাপ নিয়ে;—আমি তাকে চাই না! সে তার পথ চিনেছে, আমিও আমার পথ বেছে নেব!"

হায় বাঙ্গালী যুবক! তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে ধিক্! তোমাদের দেশহিতৈষিতাকেও ধিক্। তোমরা গৃহের হীরকখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের চাক্‌চক্যময় কাচখণ্ডের অন্বেষণ কর। দেশহিতৈষণার ভান করিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় লালায়িত হও!

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময়, সুধীর তাহার বিশ্রাম-কক্ষে একখানি 'কৌচের' উপর শয়ন করিয়াছিল এবং বিভা পা ছড়াইয়া ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া সেই কক্ষতলে বসিয়াছিল। সুধীর গল্প করিতেছিল, বিভা একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিল, অথবা সুধীরের রূপসুধা পান করিতেছিল কি না, তাহা সেই জানে।

এরূপ সময় একব্যক্তি সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। বলা-কহা নাই, একেবারে ডাক্তার-সাহেবের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ! কি সাহস! লোকটী কে? একেবারে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া সে গৃহ-প্রবেশ করিল! আগন্তুক সুধীরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিভা তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সুধীরের এবংবিধ ভাব দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "সুধীর, আমায় চিন্‌তে পার্লে না?"

তখন সুধীর উঠিয়া আগন্তুকের হস্ত ধারণ করিয়া সযত্নে তাহাকে 'কৌচের' উপর বসাইল। এতক্ষণ পরে বিভা "দাদাগো" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আগন্তুক অতুল। সে যথাসময়ে সুধীরের টেলিগ্রাম পায় নাই। সুধীর যখন টেলিগ্রাম করিয়াছিল, অতুল তখন বাটীতে ছিল না। মানুষের বিপদ্ যখন আসে, তখন তাহা উপর্য্যুপরিই আসে। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। যে সময়ে যোগেশচন্দ্র মারা যান্, ঠিক্ ঐ সময়েই অতুলের আর একটী ভগ্নী-পতি মারা যায়। অতুল সেই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থাভাব-হেতু অতুলের পিতা কোন কন্যাকেই উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই। সকলেই দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের হাতে পড়িয়াছিল। অতুলের এই ভগ্নীপতিটিও দ্বিতীয় পক্ষে বার্দ্ধক্যের আহ্বান শুনিতে শুনিতে অতুলের ভগ্নীটীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের অনেকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে ছিল। তাঁহার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তিনি মারা যাইবামাত্রই, তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পুত্রেরা তাহা লইয়া তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মহা বিবাদ বাধাইয়া দিল। অতুল গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক ডাকাইয়া তাহাদের সম্পত্তি-ভাগ করিয়া দিল। এই সকল কারণে অতুলের সেখানে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতুল সুধীরের টেলিগ্রাম পাইল। তখন দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ্ জানিয়া, বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুধীরের টেলি-গ্রামখানি গোপনে রাখিয়া, অতুল বিভাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লাহোরে আসিলেন।

অতুল বলিল, "সুধীর, তুমি এত বড়লোক হয়েও যে গরীবের উপর তোমার এত দয়া, এত স্নেহ—এইটেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব। তুমি যে উপকার করেছ, তোমার সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পার্ব্বো না।"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মানুষের বিপদে মানুষকে দেখা, মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এতে আর মহত্ত্বই বা কোন্‌খান্‌টায়, দয়াই বা কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লে তুমি?"

সুধীরের অনুরোধে অতুল কয়েকদিন লাহোরে থাকিল। দুই বন্ধুতে পূর্ব্বের ন্যায় আবার একত্রে আহার, একত্রে বিহার ও এক সঙ্গে শয়ন করিয়া এ দুঃসময়ের মধ্যেও বড় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। সুধীরের ইচ্ছা হইতেছিল না যে, অতুলকে যাইতে দেয়। কিন্তু অতুল আফিসের কেরাণী। তাহার নির্দ্দিষ্ট ছুটি ফুরাইয়া আসিল। তাহার আর থাকিবার উপায় নাই। এ দিকে যোগেশ-চন্দ্রের শ্রাদ্ধাদিরও সময় নিকটবর্ত্তী। কাজেই, অতুলকে বাধ্য হইয়া সুধীরের নিকটে বিদায় লইতে হইল।

সুধীর বিভাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিল। কিন্তু অতুলের কাছে একথা "বলি" "বলি" করিয়াও সে বলিতে পারে নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাহার জিহ্বায় জড়তা আনিয়া দিতেছিল। একদিন কিন্তু অবসর বুঝিয়া সে অতুলের নিকট নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অতুল বিচক্ষণের ন্যায় সুধীরের সকল কথা মনোযোগ-সহকারে শুনিল এবং তাহার পর ধীর ও সংযতভাবে বলিল, "ভাই, তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মত যুবকের বিবাহের ভাবনা কি? একটা কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সমাজ হয়ত দশটা মেয়ে তোমার গলায় দিতে প্রস্তুত হবে! যাক্ সে-কথা। তুমি নিজেই ভেবে দেখ ভাই, তোমার গলায় মালা দিতে পার্‌লে কত কুমারী কৃতার্থ হবে। তোমার হাতে মেয়ে দিতে পার্‌লে কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে কর্‌বেন। তুমি কেন ভাই, বিধবাকে বিয়ে ক'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হ'বে?"

সুধীর সগর্ব্বে বলিল, "সমাজ! যে সমাজের আইন কেবল রমণী-নিগ্রহ, তেমন সমাজকে আমি গ্রাহ্যই করি না।"

অতুল। তুমি না কর্‌লেও আমাদের, ভাই, গ্রাহ্য করতে হয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে যে একজনের জন্যে আমরা সকলে সমাজের কাছে নতমস্তকে থাক্‌ব, ততটা মনের বল আমাদের এখনও নেই!"

অতুলের কথা শুনিয়া সুধীর শিহরিয়া উঠিল। কি নিষ্ঠুরের মত কথা! ওঃ—অভাগিনী বাল-বিধবাদের মুখ চাহিতে কি এদেশে কেউ নেই? সে প্রকাশ্যে বলিল, "কেন অতুল, এতে দোষটা কি? হিন্দু-শাস্ত্রেও ত বাল-বিধবার বিবাহের বিধি আছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এত নিগ্রহ না করে,—তাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া কি উচিত নয়? ইয়োরোপ প্রভৃতি সকল দেশেই দেখ, বিধবা-বিবাহের চলিত আছে। আমাদের দেশেও এ-রকম বিবাহ ত হয়ে গেছে।"

অতুল। ভাই, ইয়োরোপে বাস ক'রে তোমার মন যত উন্নত ও সাহসী হয়েছে,—আমরা গরিব বাঙ্গালী, আমাদের ততটা

সাহস নেই। আর হিন্দুনারীর দু'বার বিবাহের চেয়ে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন-টাই আমাদের কাছে অতিমহৎ কার্য্য বলে মনে হয়। আমাদের এই কলিযুগে বর্ত্তমান বিলাস-পঙ্কিল দেশে যা একটু মহত্ত্ব, যা একটু উদারতা, যা একটু পবিত্রতা ও যা একটু ধর্ম্মভাব দেখ্‌তে পাই, তাত কেবল আমাদের এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবাদের হৃদয়ে। বাস্তবিক পূতচরিত্রা এই রকম বিধবা দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হয়। আমি বিভাকে সেই ভাবে গঠিত কোর্ব্বো; তাকে হিন্দু বিধবার আদর্শ কর্‌বার জন্যে যত্ন কোর্ব্বো। তার আবার বিবাহ দিয়ে সমাজে পতিত হ'তে পার্‌ব না, ভাই! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। আর তাহার বলিবার কি আছে? তাহার আশালতা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। একটা নিরাশার গভীর হাহাকার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল।

অতুল আবার বলিতে লাগিল, "সুধীর! বিভা এমন কি তপস্যা করেছে যে, সে তোমার মতন স্বামী লাভ কর্‌বে? তোমার কি মনে নেই, আমি গোড়াতেই তোমার সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্যে বাবাকে কত বলে-ছিলুম? তুমিও ত তাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমরা বঙ্গজ আর আমরা রাঢ়ী, শুধু এইটুকুমাত্র আপত্তির জন্যে সমাজের ভয়ে বাবা তখন তোমার সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে পারেন নি! যদি তা তখন দিতেন, তা হ'লে বৃদ্ধ যোগেশবাবুর পরিবর্ত্তে তোমার মত সর্ব্বগুণান্বিত যুবকের পত্নী হয়ে বিভা আজ অপার সুখভোগ কর্‌ত। কিন্তু অভাগিনীর কপালে সে সুখ নাই! বিধাতার ইচ্ছা অন্যপ্রকার। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এখন আর সে-কথা নিয়ে আন্দোলন করা বৃথা!

অতুল সেইদিনেই তাড়াতাড়ি বিভাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে বিভার মনে কোন রকম বিকৃত ভাব ঘটিয়া থাকে।

সুধীর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। ট্রেন হু-হু-শব্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সুধীর একটা নিরাশার গুরু বেদনা বক্ষে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(২০)

আমাদের দেশে একটা মেয়েলি প্রবচন আছে যে, "ভালবাস কেমন? না, ভালবাস যেমন।" অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসাকে আক-র্ষণ করে। কিন্তু সকল স্থানে সে কথাটা খাটে না। মাতা পুত্রগতপ্রাণা; কিন্তু কত কুসন্তান আছে, যে মাতার সে-স্নেহের বিন্দুমাত্র প্রতিদান করে না! কত পতিপ্রাণা রমণী পতির ধ্যানে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পতি সেই সাধ্বীর প্রতি ফিরিয়াও চাহে না! কত ভগিনীর হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভ্রাতা হয় ত, ভগ্নীকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

সুধীর ভ্রমেও তাহার পরিণীতা ভার্য্যা লীলার কথা মনে করে না, কিন্তু লীলার

প্রাণ সুধীরময়। লীলা শয়নে স্বপনে, চিন্তা-জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে সুধীর ব্যতীত আর কিছুই জানে না। অহর্নিশ সুধীরের প্রতিমূর্ত্তিরই সে পূজা করে।

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী যুবক কিছুতেই বুঝিল না যে, পবিত্র প্রেম-ভরা একখানি হৃদয় প্রাণভরা ভালবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া তাহারই মহাপূজার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! নির্ব্বোধ যুবক তাহা না বুঝিয়াই, ব্যর্থ ক্রোধ লইয়া সংসারের এক-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া মনের আগুনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে! তাহার গৃহে স্বর্গীয় বিমল সুধা অযত্নে অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে বিষ-পানের আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে!

কমলাপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লীলা একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি আর নাই বলিলেই হয়। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায়, হতাশতায়, তাহার হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলার এই অবস্থা দেখিয়া অবিনাশবাবু বড়ই ব্যথিত। বাস্তবিকই, তিনি লীলাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-গণকে লীলার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন, বটে, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না! এমন কি রোগ-নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইলেন না। শেষে সকলেই এক-মতাবলম্বী হইয়া নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হায়! মনের বিকার ঔষধে কি উপশমিত হইবে? কাজেই, লীলার পীড়ার কোনও উপশম হইল না। আর সে ঔষধ সেবনও করিত না। তাহার বাসনা, যদি সুধীরের সহিত তাহার মিলনই না হইল, তবে যেরূপে হউক, দেহ হইতে জীবনটা বহির্গত হইয়া যাউক্।

বিখ্যাত বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া লীলার জন্য যে-সব ঔষধ আসিত, লীলা তাহা আদৌ খাইত না। ঔষধগুলি বাতায়নপথ দিয়া কার্ণিসে, রাজপথে, অথবা পিকদানীতে স্থান পাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'খাইয়াছি।' কেহ যদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিত, লীলা তাহাতে বড় বিরক্ত হইত; বলিত, "থাক্, আমি নিজেই খাব এখন।"

চিকিৎসকগণ যখন লীলার পীড়ার কিছু উপশম হইতে দেখিলেন না, তখন সকলে এক-মত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

চিকিৎসকগণ যখন লীলার চিকিৎসা ছাড়িয়া "চেঞ্জের" ব্যবস্থা করিলেন, তখন অবিনাশবাবু লীলার জীবনসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন। যাহা হউক্, "যা করেন ভগবান্" এই বলিয়া তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন হইল যামিনীবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অবিনাশ-বাবু লীলাকে লইয়া সেইখানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, লীলা তাহার কাকাকে বড় ভালবাসে। কাকার সঙ্গে বেড়াইতে, কাকার কাছে গল্প করিতে লীলার বড় আনন্দ হয়। লীলার যাহাতে মন ভাল থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাই অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। কাকা সেখানে আছেন জানিয়া লীলা যাইতে কোনও আপত্তি করিল না। কাকাকে আর একবার জন্মশোধ দেখিতে, কাকার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে, তাহার বড় সাধ হইয়াছিল।

যামিনীবাবু অগ্রজের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা-হেতু পুত্রকন্যা-সহ, রেলষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলেন। ট্রেন আসিয়া পৌছিলে লীলা দেখিতে পাইল, তাহার কাকা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া 'প্ল্যাটফর্ম্মে'র উপর দাঁড়াইয়া আছেন। অবিনাশবাবু লীলার হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া, যামিনী বাবু তাঁহার নিকটে আসিলেন। লীলাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি লীলাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন লীলা তদপেক্ষা বহু শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"লীলা! এ কি হয়ে গেছিস্ মা!" বলিয়া তিনি সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিলেন। সে স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। তাহার আর্দ্র চক্ষুর্দ্বয়ই এ কথার উত্তর প্রদান করিল। অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও লীলার ছিল না। ধীরে ধীরে তাহার মস্তকটী হেলিয়া যামিনীবাবুর স্কন্ধের উপর পড়িল।

নিকটেই যান প্রস্তুত ছিল। যামিনীবাবু সযত্নে লীলাকে ধরিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা লতিকা তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিল। যামিনীবাবুর বাসা অধিক দূর নহে। সকলে কথা-বার্ত্তা করিতে করিতে যামিনীবাবুর বাসার দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে লতিকা লীলাকে কত কথা বলিতে লাগিল; নানা স্থানে দার্জ্জিলিং-য়ের দৃশ্যাবলি-সকল দেখাইতে লাগিল। লতিকা লীলারই সমবয়স্কা। লীলাকে পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

গৃহে উপস্থিত হইলে যামিনীবাবুর পত্নী অতিযত্নে অতিথিদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর বাটীতে আর কখনও আসেন নাই। এই তাঁহার প্রথম আগমন। যামিনীবাবুর স্ত্রীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কোথায় তাঁহার গর্ব্বিতা পত্নী! আর কোথায় এই শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূ! উভয়ের চরিত্রের যতই তিনি মনে মনে তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন! বস্তুতঃ, গৃহিণীর গুণেই যামিনীবাবুর সংসারে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

গৃহিণী লীলাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। আর লতিকার ত কথাই নাই। সে লীলাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, ভাবিল। সে একদণ্ডও লীলার কাছ ছাড়া হইত না; সর্ব্বদাই লীলার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখন বা লীলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লীলার পার্শ্বে লীলার শয্যায় শুইয়া পড়িত; কত কথা, কত গল্প বলিত! তাহার সেই সরলতামাখা সুমিষ্ট কথাগুলি বাস্তবিকই লীলার প্রাণে তৃপ্তিদান করিত। লতিকার স্বামী সুহৃদ্‌ও আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের গল্পে যোগদান করিত।

লীলার উঠিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা ছিল

না। শয্যায় শুইয়া বাতায়নপথ দিয়া সে দার্জ্জিলিংয়ের আকাশচুম্বি-শিখরমালা ও মেঘের বিচিত্র খেলা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। কখনও বা মেঘের কণারাশি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া কক্ষতল সিক্ত করিয়া দিত। লীলা তাহা দেখিয়া হাসিত। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সে আর কখনও দেখে নাই। পাহাড় হইতে নানাপ্রকার রঞ্জিত বৃক্ষপত্রসকল চয়ন করিয়া সুহৃদ্ লীলাকে আনিয়া দিত। লীলা সেই সকল অপূর্ব্ব বস্তুর বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত!

লীলার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই প্রয়াসী ছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া সে অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঁচিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। সে দিবানিশি প্রার্থনা করিত, "ঐ মেঘের তলায়, ঐ পর্ব্বতের উপরে আমার এই ব্যর্থ দেহ ভস্মীভূত হউক; এই শান্তিময় স্থানে আমি যেন চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকি! আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক্। হে ঠাকুর! আমায় তোমার চরণতলে স্থান দাও! আর যেন আমাকে সংসারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিও না।" কিন্তু ঠাকুর তাহার সে প্রার্থনা শুনিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

(ইমন কল্যাণ)

বসন্ত ঐ জাগ্‌লো মনে
তোমা তরে;
ফাল্গুন-হাওয়া লাগ্‌লো বনে
তোমা তরে!
মন-কোকিল উঠ্‌লো ডাকি
মুখরিয়া কুঞ্জ-শাখী,
গোলাপ-কমল উঠ্‌লো জাগি
তোমা তরে!

মন-ভ্রমরা গুঞ্জরিল,
সকল তরু মুঞ্জরিল,
গোপন সুধা সঞ্চারিল
তোমা তরে!
উঠলো ফুটি তারার পাঁতি,
নাম্‌লো প্রেমের গহন রাতি,
দিকে দিকে জ্বল্‌লো বাতি
তোমা তরে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥১১॥

দেহাদিতে আত্মভ্রম হয় বলিয়া আত্মা সংসারী বলিয়া প্রতীত হ'ন; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা কেবল দেহ-মন-প্রভৃতির দ্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, একরূপ, স্বভাবতঃ মুক্ত, চৈতন্যমাত্র, নিক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ ও শান্ত।১১।

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোহহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥১২॥

যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে কর সেই 'আমি' ভ্রম। "এই দেহাদি আমার" এই বাহ্যভাব ও "আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি অন্তঃকরণের ভাব বর্জন করিয়া নির্ব্বিকার একরূপ বোধমাত্রকে আত্মা বলিয়া জান।১২।

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোহসি পুত্রক।
বোধোহং জ্ঞানখড়্গেন তং নিকৃত্য সুখী ভব ॥১৩॥

হে বৎস, তুমি চিরকাল দেহাত্মবোধরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ। "আমি (দেহাদি নহি) বোধ মাত্র" এই জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা সেই পাশ ছেদনপূর্ব্বক সুখী হও।১৩।

নিঃসঙ্গো নিক্রিয়োহসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৪॥

তুমি স্বভাবতঃ নির্লিপ্ত, নিক্রিয়, স্বপ্রকাশ এবং নির্ম্মল। ইহাই তোমার বন্ধন যে, তুমি যোগানুষ্ঠান করিতেছ।১৪।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥১৫॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বাস্তবিকই তোমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। তুমি স্বরূপতঃ নির্ম্মল এবং জ্ঞানময়; অতএব ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না।১৫।

নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥১৬॥

তুমি ভোজনাদি-নিরপেক্ষ, জন্মাদিবিকাররহিত, দেহাদিভারশূন্য, শান্তস্বরূপ, অগাধবুদ্ধি, অবিদ্যাদিক্ষোভশূন্য। অতএব কেবল বোধমাত্রে অবস্থিত হও।১৬।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥১৭॥

সাকার শরীরাদিকে মিথ্যাভূত' বলিয়া জান (অতএব বিষয়-সকল বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে); এবং নিরাকার আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র স্থিরবস্তু বলিয়া জান। এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে এবং তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বে অবস্থান ঘটিলে, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না।১৭।

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৮॥

দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরের ভিতরে, বাহিরে চারিদিকে যেমন দর্পণই বিদ্যমান, সেইরূপ অস্মদাদির শরীরের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে পরমেশ্বর রহিয়াছেন।১৮।

একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥১৯॥

যেরূপ ঘটের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে

এক সর্ব্বব্যাপী আকাশ বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল জীবের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে নিত্য অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন।১৯।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আত্মানুভব-নামক প্রথম প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইত্থং গুরূক্তিপীযূষাস্বাদাদনুভবমাত্মনঃ।
আবিশ্চকার সাশ্চর্য্যং শিষ্যো নিজগুরুং প্রতি॥১

এইরূপ গুরুবাক্যামৃত আস্বাদন করিয়া শিষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় গুরুর উদ্দেশ্যে নিজের অনুভব বর্ণনা করিলেন।১।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তং মহাকালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥১॥

অহো, আমি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত; আমি প্রকৃতির অতীত, স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র। আমি এই সুদীর্ঘকাল মোহবশতঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বারা) বিড়ম্বিত হইতেছি।১।

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বম্ অথবা চ ন কিঞ্চন॥২॥

যেরূপ এই দেহকে আমি প্রকাশিত করিতেছি, সেইরূপ সমস্তজগৎকেও প্রকাশিত করিতেছি। অতএব (যদি দেহ আমার, তবে) সমস্ত জগৎই আমার, অথবা কিছুই আমার নহে (কেন না আমি স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র; দেহও আমার নহে, জগৎও আমার নহে।)।২।

সশরীরমিদং বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥৩॥

দেহ-সহিত সমস্ত বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া আমি এখন গুরূপদিষ্ট কৌশলক্রমে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি।৩।

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্‌বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্॥৪॥

তরঙ্গ, ফেন এবং বুদ্‌বুদ যেরূপ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মোপাদানে বিনির্ম্মিত বিশ্বও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।৪।

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥৫॥

যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বস্ত্র যেরূপ সূত্রমাত্রই হয়, সেইরূপ যদি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করা যায়, তবে জগৎও আত্মা বলিয়াই বিবেচিত হইবে।৫।

যথৈবেক্ষুরসে কৢপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি কৢপ্তং ময়াব্যাপ্তং নিরন্তরম্॥৬॥

যেরূপ ইক্ষুরসে অবস্থিত শর্করা তাহার দ্বারাই ব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাতে অবস্থিত (অধ্যস্ত) বিশ্বও আমার দ্বারাই অবিচ্ছেদে ব্যাপ্ত।৬।

আত্মাজ্ঞানাজ্‌জগদ্‌ভাতি আত্মজ্ঞানান্নভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্‌জ্ঞানাদ্ভাসতে নহি॥৭॥

আত্মার জ্ঞান না থাকিলে জগৎ প্রতিভাত হয়; আত্মজ্ঞান হইলে আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে সর্প আর প্রতিভাত হয় না।৭।

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
সদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহংভাস এব হি॥৮॥

নিত্যবোধই আমার আপন স্বরূপ; আমি নিত্যবোধমাত্র হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহি। জগৎ যে প্রকাশিত হয়, তাহা আমার চৈতন্য

হইতেই ; (অন্যথা আত্মচৈতন্য না থাকিলে জগৎও থাকিত না) ।৮।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥৯॥

অহো, এই জগৎ অজ্ঞানবশতঃ আমার নিকট প্রতিভাত হয়! যেমন (অজ্ঞানবশতঃ) শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অথবা সূর্য্যকিরণে (মরীচিকায়) জল-ভ্রম হয়।৯।

মত্তো বিকল্পিতং বিশ্বং ময্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥১০॥

এই জগৎ আমা হইতেই বিকল্পিত (উৎপন্ন) এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কলস মৃত্তিকাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, যেমন জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ জলেই বিলীন হয় অথবা যেমন স্বর্ণ হইতে বিনির্ম্মিত বলয় স্বর্ণেই লয় পায়।১০।

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥১১॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু আব্রহ্মস্তম্ব জগৎ বিনষ্ট হইলেও আমার নাশ নাই।১১।

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
কচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্যবিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু (নানাবিধ সুখ-দুঃখাশ্রয়) দেহধারণ করিলেও আমি একই। আমি কোথায়ও যাইও না, আসিও না ; সকল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। ১২।

অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্যশরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥১৩॥

— অহো আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার ন্যায় দক্ষতা আর কাহারও নাই ; আমি স্পর্শ না করিয়া চিরকাল এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্ বাঙ্মনসগোচরম্ ॥১৪॥

অহো আমার মহিমা, আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার কিছুই নাই, অথবা যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর, তাহা সমস্তই আমার। (যেহেতু আমি আছি বলিয়াই সমস্ত আছে, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না)।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥১৫।

জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু এবং পরিজ্ঞাতা এই ত্রিতয় বাস্তবিকপক্ষে নাই। এ-সকল অজ্ঞান-বশতঃ যে আমাতে প্রকাশিত হয়, সেই আমি নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার মলিনতাশূন্য) পুরুষ। ১৫।

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বমেকোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥১৬

অহো! সকল দুঃখের মূল আমাদের দ্বৈত-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি! বাস্তবিক পক্ষে এই পরিদৃশ্য-মান জগৎ সমস্তই মিথ্যাভূত, আমি অদ্বিতীয় নির্ম্মল চৈতন্যমাত্র—এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দ্বৈতভ্রান্তিজন্যদুঃখনিবারণের আর কোনও ঔষধ নাই। ১৬।

বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥১৭॥

আমি বোধমাত্র (চিদেকস্বরূপ)। আমিই অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি উপাধির কল্পনা করিয়াছি (তদ্দ্বারাই জগৎ

প্রতিভাত হয়)। এই সত্য নিত্য বিচার করিলে দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হইবে ও চিৎ-স্বরূপে অবস্থান ঘটিবে।১৭।

অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা নিরাশ্রয়া ॥ ১৮ ॥

অহো! এই জগৎ আমাতেই অবস্থিত (অধ্যস্ত)। বাস্তবিক পক্ষে অবার ইহা আমাতে নাই (কেন না আমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র)। আমার বন্ধন নাই (অতএব) মোক্ষও নাই। ভ্রান্তি নিরাশ্রয় হইয়া নষ্ট হইল। (এতদিন উহা আমাতে ছিল, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমার জ্ঞান জন্মিলে, উহা আর কোথায় থাকিবে?)। ১৮।

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কস্মিন্ কল্পনাধুনা ॥ ১৯ ॥

আমার শরীরাদি সমস্ত জগৎ কিছুই নহে —ইহা স্থির করিয়াছি; আমিও বিশুদ্ধচৈতন্য-মাত্র; তবে এখন দ্বৈতভ্রান্তিরূপ কল্পনা কোথায় থাকিবে? (১৯)।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, সংসারবন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি এবং অনিষ্টের ভয় এ সমস্তই কল্পনামাত্র। চিৎস্বরূপ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। (অবিদ্যাবশতঃ যাঁহারা দ্বৈত স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিধিনিষেধ মানিতে হয়; কেন না তাঁহাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাহার পক্ষে অন্য নাই, তাহার কর্ত্তব্য কোথায়? নিজের প্রতি কর্ত্তব্যও নাই; কেন না, নিজে নির্বিকার চৈতন্যমাত্র)।

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥২১॥

অহো! অদ্বৈতদর্শী আমার নিকট এই জনসমূহের মধ্যেও যেন সমস্ত অরণ্যপ্রায় হইয়াছে! (মিথ্যাভূতবস্তু-সমূহের মধ্যে) কোথায় প্রীতিবন্ধন করিব? (২১)

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যজ্জীবিতেস্পৃহা ॥২২॥

আমি দেহ নই, আমারও দেহ নহে, আমি জীব নই, আমি কেবল চৈতন্য। ইহাই আমার বন্ধন যে, আমার জীবনে স্পৃহা ছিল। ২২।

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব। ইহাতে চিত্তরূপ বায়ু যেমন বহিতে লাগিল, অমনি নানাবিধ বিচিত্র-ভুবনরূপ তরঙ্গসকল প্রকাশ পাইল। ২৩।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

মদ্রূপ চৈতন্যমহার্ণবে যদি চিত্তবায়ু প্রশান্ত হয়, তবে ভাগ্যহীন জীববণিকের জগৎরূপ নৌকা (অচল হইয়া) বিনাশ পায়। ২৪।

ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥২৫॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব; ইহাতে জীবরূপ তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছে, পরস্পর আঘাত করিতেছে, খেলা করিতেছে ও বিলীন হইতেছে।—ইহাই জীবরূপ তরঙ্গের স্বভাব। ২৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার শিষ্যোল্লাস-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

'ঈশ্বর কি আছে ভাব ?' নাস্তিকেতে কয়,
পদে পদে যাঁর সবে পায় পরিচয় !
আকাশ অবনী যাঁরে করিছে বিকাশ,
নাস্তিকের কাছে তিনি হন্ অপ্রকাশ !
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তারা-সমুদয়,
একতানে মহেশের নাম সদা কয় !
নদ নদী রত্নাকর উন্নত ভূধর,
ফুল-ফল-তরুরাজি প্রকৃতি সুন্দর,
পশু পক্ষী কীট যত পতঙ্গ-নিচয়,
কেহই তাঁহার গানে বিরত ত' নয় !
নরের প্রত্যেক কার্য্যে যাঁর অধিষ্ঠান,
কি করে তাঁহার সত্তা মোরা করি আন ?
খাই পরি চলি বলি যাঁহার কৃপায়,
কি করে কৃতঘ্ন হয়ে ভুলিব তাঁহায় ?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নবীনালোক।

মরণে লুকায়েছিল কি মহামঙ্গল !
জাগিল কুহেলি ভেদি সবিতা উজ্জ্বল !
অন্ধ এ হৃদয়াকাশে ঘুচিল তমসা,
ম্লানতম মৃত প্রাণ লভিল ভরসা ;
খুলিল নয়নে এক নবীন আলোক,
হেরিনু তাহার মাঝে অজর অশোক
দিব্যধাম পুরী এক মনোহর অতি ;
করি তুমি আমি তাহে আনন্দে বসতি !

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেওঘর (দেবঘর)—

ইহা সাঁওতাল-পরগণার 'হেড কোয়াটার'। এখানকার জন-সংখ্যা ৮৮৩৮। স্থানটীতে ২২টী শিবমন্দির আছে। তীর্থ করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই এখানে লোক সমাগত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরটী বৈদ্যনাথ বা বাইজ্‌নাথ-নামে খ্যাত। ভারতে যে সকল বহুপুরাতন শিবলিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটী। মন্দির-গুলি উচ্চপ্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। মির্জ্জাপুরের জনৈক সমৃদ্ধ সওদাগর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনটী মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মন্দিরেই শিবমূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী মন্দিরে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিব-মন্দিরের শিখর-দেশ হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত একগাছি রেশমের দড়ি সম্বদ্ধ আছে। এই দড়িটী ৪০ বা ৫০ গজ লম্বা। দড়িতে রঙ্গিন কাপড়, ফুলের মালা, ইত্যাদি বিলম্বিত থাকে।

শিবকে হিন্দুরা পরমব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই ইনি মহাকাল-নামে ব্যাখ্যাত। তিনি অপক্ষয়, বিনাশাদিরহিত কালাত্মার অবস্থাদিশূন্য, অথচ সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন আকার নাই, অথচ তিনি বাহ্যাকার-বিশিষ্ট। কালের কোন রূপ নাই, অথচ তিনি সর্ব্বরূপবান্। কালই জগদুৎপাদক, জগৎপালক ও জগৎ-সংহারক। সর্জ্জন, পালন, নিধন—এইগুলি কালের একপ্রকার অবস্থা। অপর অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, ইহাও তদবস্থারূপে পরিগণিত হয়। বাল্য যৌবন, জরা—জীব-সম্বন্ধে এই তিন অবস্থাকেও কালাবস্থা বলা যায়। অনাম, অরূপ হইয়াও কাল সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট। শ্রুতি বলেন, কাল স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু ও স্থূলাতিস্থূল কল্পাদি; (অর্থাৎ কল্প হইতে সূক্ষ্মমন্বন্তর, মন্বন্তর হইতে দিব্যযুগ, যুগ হইতে বৎসর, বৎসর হইতে অয়ন, অয়ন হইতে ঋতু, ঋতু হইতে মাস, মাস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে দিবা, দিবা হইতে প্রহর, প্রহর হইতে যামার্দ্ধ, যামার্দ্ধ হইতে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে পল, পল হইতে বিপল, বিপল হইতে অনুপল, অনুপল হইতে কলা, কলা হইতে বিকলা, বিকলা হইতে কাষ্ঠা, কাষ্ঠা হইতে নিমেষ, নিমেষ হইতে ক্ষণ, ক্ষণ হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে অণু, অণু হইতে পরমাণু ইত্যাদি।) এইরূপে স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপে কালের অনেক অবয়ব। কাল যে ভূত-ভবিষ্যদ্-বর্ত্তমান-ত্রিকালদর্শী, একারণ শিব ত্রিলোচন-বিশিষ্ট। সংসার জরাবস্থায় নিধন-দশা প্রাপ্ত হয় বলিয়া শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়া থাকে। কালের প্রলয়াগ্নিতাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়; তন্নিদর্শনার্থ শিব ভস্ম-ভূষণ। কালে জীবনিকায়ের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, এজন্য অনাদিনিধন শিব কঙ্কালমালী। কালে নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; এ-কারণ শিবরূপের করকমলে নরকপাল সংস্থিত। মুক্তিকালে জীব-সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করেন, আর পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হন্ না, এ-কারণ শিবকে মহাশ্মশানালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এতদ্ভিন্ন শ্মশানভূমিতে মহাদেবের বাসের আরও কারণ এই যে, কালরূপী শঙ্কর সর্ব্বসংহারক। আর মুণ্ডমালা-ধারণের এই কারণ যে, কালে সকল জীবেরই শির নিরস্ত হয়। এতন্নিদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষণ। নীলকণ্ঠরূপে কালের কালিমার প্রদর্শন করা হইয়াছে। কালের অপরিচ্ছিন্নতায় সর্ব্ব-ব্যাপকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ শিব দিগ্বাসা হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, সে সকল অঙ্গের মধ্যে প্রধানাঙ্গ পঞ্চ মহাভূত। এ-কারণ কালস্বরূপ শিবরূপের পঞ্চাননত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শিত হয়; তাহাতে উত্তমাধম-মধ্যম পক্ষে নিয়তি কালের প্রধানা শক্তি। সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল। তাহা কোনমতেই ব্যর্থ হয় না; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্র হউক না কেন, কালে তাহার নিধন হয়। তাহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন। এই-হেতু শিব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ভুজঙ্গকুলও কালের বশীভূত; এ-কারণ শিব সদা ভুজঙ্গভূষণ। জ্ঞানস্বরূপ

মহাকাল শিবরূপ; তাঁহার বাহন বৃষ। এতদর্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অতএব বৃষরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করেন; অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ ফললাভ হয়। কোন কোন মতে শিবকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহাতে চতুর্ব্বর্গই সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতেছে। যথা—"পরশুমৃগবরাভীতিহস্তমিত্যাদি"। যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তই কাম, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পূরক মৃগমুদ্রা। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তই অর্থ; অর্থাৎ বিনা শক্রনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে পারে না। যে-হস্তে বর, সেই হস্তই ধর্ম্ম। অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সন্দর্শন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তই মোক্ষ। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয়-শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্ত্তি যে পরমাত্মা শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শিবকে দশবাহুরূপেও ধ্যান করেন। তদর্থে কালের কর দশদিকেই বিস্তৃত আছে। দশবিধ অস্ত্র-ধারণের অর্থ, আত্মা হইতে কালে জীবের নানোপকরণ দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি কাল, তিনিই জগৎকর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা। সুতরাং, যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এ-কারণ শিবকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেন।

বৈদ্যনাথের মন্দির-সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইহা ত্রেতাযুগ হইতে বিদ্যমান আছে। শিবপুরাণ বলেন যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ বহু-ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার বাটীতে মহাদেব না থাকিলে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি কৈলাসে গমন করতঃ মহাদেবকে তাঁহার বাটীতে চিরতরে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। মহাদেব তাহাতে কিন্তু সম্মত হইলেন না। রাবণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি তাঁহাকে একটী জ্যোতির্লিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ইহার স্থাপনায় যে ফল তাঁহার স্বয়ং থাকিলেও সেই ফল। সুতরাং, তিনি সেই লিঙ্গ লইয়া রাবণকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন এবং ইহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন, যেন লিঙ্গটী কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় অথবা তাহাকে স্বীয় বাটী ভিন্ন অন্যত্র রাখিয়া দেওয়া না হয়। কারণ, তাহা হইলে তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। রাবণ হৃষ্টচিত্তে লিঙ্গটী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন যে, শক্রগৃহে জ্যোতিলিঙ্গ-স্থাপনা দেবতাদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। সুতরাং, যাহাতে সেটী না হইতে পায় তদ্বিষয়ে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া বরুণদেবকে রাবণের উদরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বরুণ তাহাই করিলেন। বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাবণের সহিত বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিলেন। রাবণ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটী ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণও সম্মত হইলেন। তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গটী প্রদান করিয়া রাবণ প্রস্রাব করিতে গমন করিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্যোতির্লিঙ্গটীকে আর দেখিতে পাইলেন না। অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে-স্থানে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার বহুদূরে লিঙ্গটী স্থাপিত রহিয়াছে। লিঙ্গটী উঠাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া বলপ্রয়োগ করিলে লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। রাবণ তখন প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রত্যহ হিমালয় হইতে গঙ্গোদক লইয়া আসিয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জলের জন্য প্রত্যহ হিমালয়ে গমন করা অসুবিধাজনক ভাবিয়া রাবণ লিঙ্গের সন্নিকটে একটী কূপ খনন করিয়া তাহা সকল তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। রাবণ যে-স্থানে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "হরলাজুরী"। দেওঘর হইতে ইহা চারিমাইল দূরে অবস্থিত। যে স্থানে লিঙ্গটী স্থাপিত হয়, তাহার নাম দেওঘর (দেব ঘর)। লিঙ্গটী বৈদ্যনাথ-নামে খ্যাত।

পদ্মপুরাণের মতে রাবণ ব্রাহ্মণের হস্তে শিবলিঙ্গটী অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ বিধি-অনুসারে কূপোদক-দ্বারা তাহার পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনাকালে তথায় একজন ভীল উপস্থিত ছিল। দেবতার পূজা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভীলকে কহিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হ'ন। রাবণ ফিরিয়া আসিলে ভীল সমস্ত ঘটনা রাবণকে বলে এবং সে ইহাও বলে যে, ব্রাহ্মণ আর অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। রাবণ তখন বাণদ্বারা একটি কূপ খনন করিয়া পূজার জন্য সর্ব্বতীর্থের জল-দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।

অন্যান্য পুরাণের মতে বৈদ্যনাথের সত্তা সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সতী দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহাকে ত্রিশূলোপরি লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন চক্রদ্বারা সতীদেহ ৫২ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। সতীর যে যে খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বৈদ্যনাথে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হয়। অন্য আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে দ্বাদশটী স্থানে আবির্ভূত হন্। তন্মধ্যে বৈদ্যনাথ একটী। সতী এই লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন। তিনি কেতকীপুষ্পরূপ পরিগ্রহ করিয়া শিবের উপর বাস করিতেন, এরূপ প্রবাদও শুনা যায়। এইজন্য বৈদ্যনাথের আর একটী নাম কেতকীবন।

বৈদ্যনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকারী রাস্তা ও দক্ষিণে নহবতখানা। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সন্নিকটে একটি ফটক আছে। ইহার উপর বনাইলির রাজা পদ্মানন্দ একটী ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ফটকই মন্দির-প্রবেশের প্রধান দ্বার। অঙ্গনের উত্তর প্রান্তে সদর পাণ্ডার বাটী। যে গৃহে লিঙ্গটী অবস্থিত তাহা ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দুইটী ঘৃতপ্রদীপ লিঙ্গের সম্মুখে জ্বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটী চাঁদনীযুক্ত। সন্নিকটে একটী বণ্ড-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছাদের ভিতর হইতে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান

রহিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে তীর্থযাত্রিগণ ঘণ্টাটী বাজাইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এখন এই কার্য্যটী পাণ্ডাই করিয়া থাকে। বৈদ্যনাথের মন্দিরের অঙ্গনে অপর ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাদিগের নাম:— (১) বৈদ্যনাথ, (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ, (৩) সাবিত্রী (তারা), (৪) পার্ব্বতী, (৫) কালী, (৬) গণেশ, (৭) সূর্য্য, (৮) সরস্বতী, (৯) রামচন্দ্র, (১০) বগলাদেবী, (১১) অন্নপূর্ণা এবং (১২) অন্নদা-ভৈরব।

উল্লিখিত মন্দির ব্যতীত ভুধনাথের মন্দিরও এখানে দেখা যায়। শৈলজানন্দ ওঝা-নামক জনৈক ব্যক্তি একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত পঞ্চমুখী লিঙ্গ দান করেন। মনসা-দেবীরও একটী মন্দির এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিত্রয় হিন্দুদেবতারূপে পূজিত। তন্মধ্যে লোকনাথটী কার্ত্তিকেয়রূপে, অন্যটী সূর্য্যরূপে ও বুদ্ধমূর্ত্তিটী কালভৈরবরূপে পূজিত হইতেছে।

মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী কূপ আছে। ইহা চন্দ্রকূপ-নামে খ্যাত। রাবণ ইহাকেই সমস্ত তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি 'মনুমেণ্ট' আছে। ইহা একটি পাকা ধাপের উপর অবস্থিত। ধাপটী উচ্চতায় ছয় ফিট এবং চতুষ্কোণের পরিসরটী ২০ ফিট। ধাপের উপর তিনটী বৃহৎ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলিতে কুম্ভীরের মূর্ত্তি খোদিত। বোধ হয়, পূর্ব্বে দোলযাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণদেবকে এখানে দোল খাওয়ান হইত। কর্ম্মনাশার জল অপবিত্র। প্রবাদ এই যে, রাবণের প্রস্রাবই কর্ম্মনাশা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূজার উপকরণ জল, পুষ্প, চন্দন এবং আতপতণ্ডুল। পূজা সমাপনান্তে দেবতাতে টাকা বা স্বর্ণ সাধ্যানুসারে চড়াইতে হয়। তাম্র দেবতার সংস্পর্শে আইসে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণ, গাভী, ঘোড়া, পাল্‌কি, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেবতার ভেট্‌ দিয়া থাকেন। যদি কেহ কোন বস্তু পরে দান করিতে চাহে, তবে সেই বস্তুর নাম বিল্বপত্রে লিখিয়া সন্ধ্যা-কালে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই লেখাই তীর্থকামী ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। একবার বিল্বপত্রে লেখা হইলে কেহ দেব-তাকে প্রতারণা করে না। শিব বিল্বপত্র, জল, চন্দন এবং পুষ্পেই সন্তুষ্ট হ'ন্। তবে বিল্বপত্রগুলি ত্রিকূট- (তিউর) পর্ব্বতের হওয়া চাই। জল-সম্বন্ধে রাবণ-খনিত-কূপো-দকই যথেষ্ট; তবে বদরিনাথ বা মানস-সরো-বরের জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

রোগিগণ রোগমুক্ত হইবার জন্য এখানে হত্যা দেয়। তাহারা প্রত্যূষে শিবগঙ্গা-পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করতঃ বারান্দায় শয়ন করে। পরদিন প্রভাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া মুখপূর্ণ-জলমাত্র পান করিয়া পুনরায় শয়ন করে। এইরূপে তিন চারি দিন হত্যা দিলে তাহারা স্বপ্নে বৈদ্যনাথের আদেশ পায়। সেই আদেশমত কার্য্য করিলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের রোগ অসাধ্য তাহা-দিগকে স্বপ্নে বলা হয় যে, "তুমি রোগমুক্ত হইবে না" ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুস্তকে বৈদ্যনাথের অনেক নাম

আছে ;—যথা, হারদাপীঠ, রাবণবন, কেতকী-বন হরিতকীবন এবং বৈদ্যনাথ ! বঙ্গদেশে স্থানটী বৈদ্যনাথ নামেই খ্যাত।

(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম)

পোনাবালিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামস্থিত বাকরগঞ্জের সাব-ডিভিসনের ইহা একটি গ্রামমাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৯৮। এখানকার জমিদার রামভদ্র রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে সতীর নাসিকা পতিত হয়। সুতরাং, ইহাও একটি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত।

ঢাকা-দক্ষিণ

আসামের সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলার একটী গ্রাম মাত্র। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে চৈতন্য-মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মন্দিরে অনেক যাত্রীই প্রতিবৎসর সমাগত হয়। পঞ্চখণ্ডে সুপাতাল-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। স্থানটী খুবই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২)

অবাধ্য ছেলের গোয়ার্ত্তমী-জেদ সংশোধনের জন্য স্নেহময়ী মাতা যেমন নিষ্ঠুর-কঠোর হইয়া উঠেন, নিজের অধীর উত্তেজনাদৃপ্ত মনটা শাসন করিবার জন্য নমিতাও তেমনই রূঢ়-কঠিন হইতে চেষ্টা করিল। সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইল, "কে কোথায় কি বলিতেছে না-বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অত উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া সর্ব্বত্যাগী সাজিতে হইবে ! কিন্তু সে বৈরাগ্য-গ্রহণ যখন আপাততঃ আদৌ সম্ভবপর নহে, তখন সাধারণ সংসারী মানুষের মত শান্ত-সংযত হইয়া নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্যটা পালন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।" দুর্ব্বিষহ অপমান-গ্লানি, অসহ্য দৈন্যলাঞ্ছনা, সব মাথায় থাক্ ; চোখের জল চোখে শুকাইয়া যাক্, মনের ব্যথা মনে মরিয়া যাক্ ! হে ভগবন্, তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু অন্তরে উজ্জ্বল-দীপ্ত থাকুক, ইহাই প্রার্থনা ; মানুষের হাসিখুসি কাণাকাণির কোলাহলের ঊর্দ্ধে, তোমার সান্ত্বনা-অভয়বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে ! তাহা যেন স্থির কর্ণে অহরহঃ শুনিতে পায়। সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, সে যেন তোমার কার্য্যসাধনের জন্যই আপনাকে লঘু করিয়া লইতে পারে ! ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

রাত্রে আহারাদির পর সুশীলকে লইয়া বিছানায় আসিয়া নমিতা নিস্তব্ধতার অব-কাশে বিস্তর সংশয়-দ্বন্দ্বের সহিত যুঝিয়া সুশীল ঘুমাইবার অনেক পরে অস্বস্তি-পূর্ণচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে শুনিল, কে বাহির

হইতে ডাকিতেছে—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" কণ্ঠস্বরটা যেন সুরসুন্দরের বোধ হইল। চট্ করিয়া মাথা হইতে নিদ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, স্পষ্টরূপে জাগিয়া নমিতার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কারণ, আজ রাত্রের গাড়ীতে, এতক্ষণ সুরসুন্দর ত দেশে চলিয়া গিয়াছে! তবে এ ডাকে কে? অন্য কেউ?

আবার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল,—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" এবার সন্দেহ নয়;—নিঃসংশয় সত্য, সুরসুন্দরই বটে! সহসা নমিতার আপাদমস্তক কেমন একটা ভয়-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বুকের কাছে হাঁটু গুটাইয়া প্রাণপণে গুটিসুটি মারিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সে নিজে সাড়া দিতে পারিল না, বা পার্শ্বের ঘরে গিয়া নিদ্রিত বিমলকে জাগাইতেও সাহস করিল না। আজ চারিদিক্ হইতে খোঁচা খাইয়া, তাহার মনটা নিজের অসঙ্কোচ-নির্ভীকতার উপর তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে!......সরল বিশ্বাসে, প্রশান্ত নির্মল দৃষ্টি তুলিয়া, বড় উচ্চ আশায় জগতের সহিত অকপট সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে সে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে এমন উগ্র-বিকট-দুর্গন্ধময় কর্দ্দমের ঝাপ্‌টা চোখে মুখে লাগিয়া তাহার শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, তাহা ত তাহার জানা ছিল না! কিন্তু, যখন সে জানিয়াছে, তখন আর দুঃসাহস প্রকাশ করা নয়!

উপর্য্যুপরি ডাক শুনিয়া বিমলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া সাড়া দিল। সুরসুন্দর বলিল, "আমি তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার। মিস্ স্মিথের কাছ থেকে আস্‌ছি। দিদিকে উঠিয়ে দেন; একটা 'কল' আছে; যেতে হবে।"

একটা শঙ্কিত আগ্রহ নমিতার বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিল! "কল!"—এতরাত্রে 'কল'!......নিশ্চয়ই খুব গুরুতর প্রয়োজন! সে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বিমল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এখনই যেতে হবে? রাত্রি ১টা যে বাজে!'

উত্তরে আর এক ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "ম'শাই, ডবল ফি দেওয়া হবে। আমাদের বড় বিপদ্। 'কলেরা কেস' তার ওপর অসময়ে আটমাসে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, একটি নার্শের বড় দরকার। মিসেস্ দত্তকে আন্‌তে গেছ্‌লুম; পাই নি। তাই আপনাদের এখানে আস্‌ছি। যেতেই হবে। আজ রাত্রিটা সেখানে থাক্‌তে হবে। যা চা'ন দেব।"

"কলেরা কেস্"—"অসময়ে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু"—"নার্শের বড় দরকার"......কথা কয়টা যেন বজ্রঝঞ্ঝনায় আঘাত জাগাইয়া, ক্ষিপ্র-আলোড়নে নমিতার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া তুলিল! নিস্তেজ মনের সমস্ত আলস্য-জড়তা, মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়া গেল; কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের সমস্যা লইয়া হিশাব মীমাংসার সময় রহিল না। 'প্রয়োজন!.....বড় প্রয়োজন!'......তাহার দাবী সকলের ঊর্দ্ধে!

পাছে সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সাবধানে খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া, নমিতা অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আল্‌নার দিকে অগ্রসর হইল। অনুমানে জামা-কাপড়গুলা

টানিয়া নামাইয়া, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পরিতে লাগিল। বিমল আলো হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি!"

সন্ত্রস্ত হইয়া নমিতা বলিল,"চুপ!—সুশীল উঠে পড়বে। আমি শুনেছি সব; জামা কাপড় পর্‌ছি। তুমি চট্ করে যাও, লছ্‌মীর মাকে উঠিয়ে দাও। চেঁচিও না; মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিমল গিয়া লছ্‌মীর মাকে উঠাইয়া দিল। লছ্‌মীর মা প্রস্তুত হইয়া আসিল। বেশী রাত্রে, বা দূরতর স্থানে ড'কে যাইতে হইলে লছ্‌মীর মা নমিতার সঙ্গে যাইত। তবে মিসেস্ স্মিথ্ সঙ্গে থাকিলে নমিতা কাহাকেও লইত না।

কার্ত্তিক মাস, নূতন শীত পড়িতেছে। নমিতা বিমলের গরম মলিদার চাদরখানা চাহিয়া লইল। এতরাত্রে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় বাহির করিবার সময় নাই। লছ্‌মীর মা কম্বল জড়াইয়া ঠিক্ হইয়া আসিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর তাহারা বাহিরে আসিল। বিমল আলো লইয়া সঙ্গে আসিল।

বাহিরে রাস্তায় সুরসুন্দর ও আর একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকটী দেখিবামাত্র খাস-বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনি সুরসুন্দরেরই সমবয়স্ক। মূর্ত্তিটি বেশ সৌম্য-সম্ভ্রান্ততা-পরিচায়ক। তাঁহার মুখে চোখে উদ্বেগ-বিবর্ণতার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিমল সুরসুন্দরকে বলিল, "আপ্‌নার বাড়ী যাওয়া হোল না বুঝি?"

সুরসুন্দর বলিল "না, রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় স্মিথের সঙ্গে এঁদের ওখানে গেছ্‌লুম; এখন ফিরে এসে আবার ঔষধ-পত্র নিয়ে যাচ্ছি।" (নমিতার প্রতি) "মিস্ মিত্র, আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজটা আছে ত?"

নমিতা বলিল, "আছে।"

সুরসুন্দর বলিল, "হাতে ঘা আছে বলে স্মিথ্ আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মিসেস্ দত্তকে যখন পেলুম না—"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল,"আমার ব্যাণ্ডেজ ত' খুব ভাল রকমেই বাঁধা আছে। একটু সাবধানে কাজ করব। তা হলেই হবে। চলুন্, কতদূরে যেতে হবে?"

সু। গঙ্গার ও-পারে, লালবাজারে'—সাম্‌নে ঘাটে নৌকা আছে।

"বেশ চলুন্"। এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সুশীল একলা আছে, তুমি তার বিছানায় শোওগে যাও। মাকে বোলো যেন না ভাবেন্। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে যাও।"

তাহারা শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খুলিয়া দিল। চারিজন দাঁড়ি প্রাণপণ-বলে দাঁড় বহিতে লাগিল। গঙ্গার উপর খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সকলে 'ছই'এর মধ্যে আশ্রয় লইল। লছ্‌মীর মা সুরসুন্দরের সহিত আলাপ জুড়িল। অপরিচিত 'বাবুটির' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, তিনি এখানকার বাসিন্দা নহেন;—ভাগিনেয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন; সঙ্গে মাতাও আসিয়াছেন। ভাগিনেয়টি মারা গিয়াছে। এখন ভগিনী পীড়াক্রান্তা!—একে সদ্যঃ পুত্রশোক, তাহাতে সাঙ্ঘাতিক-ব্যাধি!

তাহার উপর অসময়ে প্রসব!—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নমিতা শুনিল ভদ্রলোকটির নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রবাবু সমস্ত পথ একটিও কথা কহিলেন না; বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে নৌকা আসিয়া ও-পারে ভিড়িল। সকলে নামিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া, বাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। দুই তিন জনের কথার সাড়াও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া সেখানে উঠিলেন।

ঘরের দুয়ার জানালা সব বন্ধ; তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দুইজন হিন্দুস্থানী ভৃত্যশ্রেণীর লোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের একজন এক কোণে, মেঝের উপর পড়িয়া আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে; অন্য ব্যক্তি নিদ্রালস-চক্ষে বসিয়া বসিয়া 'তামাকুল' ভরিয়া কলিকা সাজাইতেছে। ঘরের মেঝেময় টিকা, তামাক, ছাই-গুল ছত্রাকারে ছড়ান রহিয়াছে। এখানে যে অবিশ্রাম তামাক পুড়িতেছে, সেগুলি যেন তাহারই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য!

ঘরের মাঝখানে তক্তাপোষের উপর ময়লা সতরঞ্চি ও ততোধিক ময়লা তাকিয়া লইয়া দুইজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। একজন শীর্ণাকৃতি, ফর্সা-রং, প্রৌঢ়;—অপর ব্যক্তি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুবিশাল, গ্যাট্যা-গোটা বলিষ্ঠ চেহারার যুবা। তাঁহার রং আধ্ময়লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখের গঠনে সুন্দর শ্রীছাঁদ, কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব যেন সেখানে নিষ্ঠুর-কর্কশ ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।—দেখিলেই মনে হয়, লোকটি দানে-খুনে, সকলতাতেই সমান সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার গায়ে উৎকৃষ্ট সিল্কের কোট ও তাহার উপর জরির হাঁসিয়াদার মূল্যবান্ শাল। কিন্তু দুইটাই অত্যন্ত ময়লা-ধরা। মাথায় সযত্নে কোঁকড়ান চুলে চক্চকে-মাজা টেড়ি!—যেন যত কিছু সৌখীনতা ও পরিচ্ছন্নতা মগজ ফুড়িয়া চুলের উপর ঢেউ খেলাইতেছে! প্রৌঢ় লোকটির বেশভূষা সাধারণ, তবে তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া খুব সতর্ক-চতুর স্বভাবের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানিতেছেন, আর মাঝে মাঝে থামিয়া খুব দ্রুত স্বরে তড়্বড়্ করিয়া বকিতেছেন।

সুরসুন্দর প্রভৃতি ঘরে ঢুকিতেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হোল, কি হোল? ওসুধ্ পেলে? যন্তর?—বহুৎ আচ্ছা! নার্সের কি হোল? মিসেস্ দত্ত এলেন্ না বুঝি?—"

সুরসুন্দর বলিল, "তাকে পাই নি। আর একজন এসেছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 656. April, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ।	চৈত্র, ১৩২৪। এপ্রিল, ১৯১৮।	১১শ কল্প।
৬৫৬ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

গান।

(পূরবী—তেওরা)

কেমনে র'ব একেলা—
দিবস-যামিনী কেটে যায় কত
বিজন ঘরে নিরালা!
শুকায়ে যায় প্রাণ, লুকায়ে যায় গান,
নিভিয়া যায় দীপ, থামিয়া যায় তান,
ফুরায়ে আসে ফুল, ঝুরায়ে দু'নয়ান
নিভৃতে কাটে দু'বেলা!
একা বসে আছি তিমিরে—
কেহ নাহি মোর সরাতে এ ঘোর
বিজন মানস-কুটীরে!
তোমারে আজিকে ডাকিতেছি প্রাণে,
আলোকে পুলকে এসো প্রেমে গানে
ভরিয়া জীবন প্রসূনে কুসুমে
গাঁথ নবীন জীবন-মালা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"কই কই ;"—এই বলিয়া তিনি ব্যগ্র-ভাবে দ্বারের দিকে চাহিলেন ; তারপর বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থরনয়নে নমিতাকে দেখিতে লাগিলেন। টেড়িওয়ালা বাবুটিও চকিত-নয়নে সে-দিকে একবার চাহিলেন ; তারপর একটু কাশিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণপরে মুখ হইতে সিগার নামাইয়া তিনি ছাই ঝাড়িয়া, ডানদিক্ হইতে তাকিয়াটা টানিয়া বাঁ-দিকে সরাইলেন ও তা'র উপর হেলিয়া বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে একমনে সিগার টানিতে টানিতে আড়-চোখে দুয়ারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, এখন অবস্থা কেমন ?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, "ভাল,—কিছু ভাল। আমার সঙ্গে মেমের মতের মিল হয়েছে। আমি যা বল্লুম, মেম্ সেই ওষুধ্ই দিলেন। পনের মিনিট ঘুম হয়েছিল। মেম বল্লেন, 'কিছু সুরাহা।'—নয় হে গৌর ?"—

'গৌর'-নামধেয় শ্যামবর্ণ বাবুটি বলিলেন, "হুঁ, আমরা এই কতক্ষণ সেখান থেকে আস্‌ছি।" তক্তপোষের কোণে ঠেকিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রবল মুরুব্বি-আনার ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিহাসের হাসি হাসিয়া গৌরবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "তাপর বড়কুটুম চন্দরবাবু, সতীশও এবার চম্পট্ দিলে !"—

"বড়কুটুম" চন্দ্রবাবু উক্ত সুরসাল সম্ভাষণে কিছুমাত্র স্নিগ্ধ হইতে পারিলেন না ; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সতীশ চলে গেল ! বাড়ী ছেড়ে চলে গেল ? কোথায় গেল ?"—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রৌঢ় বাবুটি তড়্‌বড়্ করিয়া বলিলেন, "ও ছোক্‌রার শরীরে আক্কেলগন্ধ কিছুই নাই। আরে বাবু ! বাড়ীতে রোগ, পালাপালি করলে চল্‌বে কেন ? এই যে আমরা—আমরা রইছি না ? হুঁ, কে বলে বল ? মুরুব্বি হলে নানা দোষ ! বড় ভাইটা অমনি, বাড়ীতে এমন বিপদ্, চেয়ে দেখ্‌লে না ; ছেলে-পরিবার নিয়ে চোঁ-চা চম্পট্ দিলে শ্বশুর-বাড়ীতে ! এইটে কি যতীশের উচিত কাজ হোল—!"

বুক চিতাইয়া উর্দ্ধমুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া, গম্ভীরভাবে গৌরবাবু বলিলেন, "আরে যতীশটা গাধা, গাধা।"

চন্দ্রবাবু অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সতীশ গেল কোথা ম'শাই ?—"

প্রৌঢ়বাবুটি সে-কথা শুনিতে পাইলেন না ; তড়্‌বড়্ করিয়া নিজের কথাই কহিতে লাগিলেন,—"তবে বল্‌বে, তোমরা কর্‌ছ কেন ? কি করি ? পরের উব্‌কার ! আমায় কেউ 'সময়ে' মানুক্, না মানুক্—অসময়ে কিন্তুন্, এই মিঞাই বুক দিয়ে পড়ে সবার ভাল করে ! লছমন্ ভকত, গণেশবাবু, এরা বলেন লালবাজারে মানুষের সেরা মানুষ হচ্ছে, মহেশ-ডাক্তার !—কি হে গৌর বল ?—"

গৌর কিছু বলিবার আগেই চন্দ্রবাবু

অধীর হইয়া বলিলেন, "গৌরবাবু, বলুন্ ম'শায়, সতীশ কি আর আস্‌বে না, বলে গেছে ?—"

গৌরবাবু অধিকতর মুরুব্বি-আনার সহিত হাসি-হাসি-মুখে পরম মনোযোগসহকারে সিগারেটে তুইটা বড় বড় টান দিয়া, হ্যাঃ-হ্যাঃ করিয়া আধা-হাসির আধাকাশির অভিনয় করিয়া ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আস্‌বে না কেন ?—তবে এখন কি না, শ্রীঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত'!—এখন উপাসনা, ওর নাম কি নিদ্রা চলুক্। শয়নে পদ্মলাভ আর কি ?—" বলিতে বলিতে ডানপায়ের হাঁটু উঁচু করিয়া, তাহার উপর বাঁ পা উঠাইয়া, আড়ভাবে রাখিয়া, সুকৌশলে লীলাভঙ্গি-সহকারে মৃদু মৃদু পা নাচাইতে নাচাইতে খুব একটা গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক সরস হাসি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অসাময়িক রসিকতা নমিতার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল ; কিন্তু কি বলিবে,—এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানকে ? কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রবাবুও যেন থতমত খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন! সুরসুন্দর বিরক্ত ভাবে বলিল, "ম'শাই মাপ্ করুন্, রোগীর প্রাণসঙ্কট অবস্থা!—সোজা কথায় বলুন, শ্রীঘর কি ?"

তাকিয়া ছাড়িয়া, তীরবেগে সোজা হইয়া বসিয়া গৌরবাবু হঠাৎ অতিশয় উদ্ধত ভাবে তর্জ্জন করিয়া মোটা গলায় বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু! তুমি থাম ; এখানে চালাকি কর্‌তে এস না। বুড়ো মোল্লারে ফয়দা শেখাতে এসেছ ? ওঃ! ভারী তো হে কম্পাউণ্ডার তুমি !"

সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্! অকস্মাৎ এ প্রচণ্ড গর্জ্জনের কারণ কি ?—অবাক্ হইয়া সুরসুন্দর ও চন্দ্রবাবু পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। নমিতার কান-তুইটা গরম আগুন হইয়া উঠিল! পরিচ্ছদের মূল্য-মহার্ঘতায় যে, মানুষ ভদ্রলোক হইতে পারে না,—ইচ্ছা হইল, সেটুকু সবিনয়ে উক্ত শাল-ওলা বাবুকে বুঝাইয়া দেয়! কষ্টে আত্মদমন করিয়া চন্দ্রবাবুকে সে বলিল, "ম'শাই রুগীর ঘর দেখিয়ে দিন্ ;—আমাদের কাজ সেখানে।"

চন্দ্রবাবুর চমক ভাঙ্গিল ; বলিলেন—"এই যে আসুন—।"

তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যখন দ্বারের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন কি ভাবিয়া কে জানে, প্রৌঢ় মহেশবাবু বলিলেন, 'সতীশ আড়ং-ঘরে গেছে। বাড়ীতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই এখানে রইল না ; সেইখানে ঘুমুচ্ছে।"

"উত্তম"—বলিয়া চন্দ্রনাথবাবু ঘর পার হইয়া গেলেন। অন্য সকলে নিঃশব্দে তাহার পিছু চলিল।

নানাজাতীয় জঙ্গলে ভর্ত্তি একটা প্রকাণ্ড সান-বাঁধা উঠান পার হইয়া একটা দালান পাওয়া গেল। দালানেও গৃহস্থালীর বিস্তর রকম তৈজসপত্র ছড়ান ছিল। সে দালান পার হইয়া আর একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব্‌সা-গন্ধ-ধরা ঘর পাওয়া গেল ; সে ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া, আর একটি ছোট দালান পার হইয়া, তাহারা রোগীর ঘরে ঢুকিল।

ঘরে স্তূপাকারে নানাদ্রব্য ছড়ান, পা বাড়াইবার স্থান নাই। একপাশে কতগুলা-

ময়লা তেল-চিটা দুর্গন্ধে ভরপূর বালিশ ও বিছানা স্তূপাকার করা রহিয়াছে। খাটের উপর সামান্য বিছানা ও অয়েল ক্লথের উপর একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের ক্ষীণকায়া যুবতীর অচৈতন্য দেহ পড়িয়া আছে। স্মিথ্ নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন, আর একটি বর্ষীয়সী বিধবা,—বোধ হয় চন্দ্রবাবুর মাতা,—একপাশে বসিয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন! ঘরের একপাশে গুলের আগুন জালিয়া, একটি সদ্যঃপ্রসূত ক্ষুদ্র শিশুকে একজন হিন্দুস্থানী দাই সেঁক দিতেছে।

ইহারা ঘরে ঢুকিতেই, স্মিথ্ মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "নমি এলে!—তেওয়ারী, তুমি সব জিনিস পেয়েছ? আচ্ছা, ওসুধ্‌টা চট্ করে তৈরী কর। শোন শোন, কিছু খেয়ে এসেছ বাবা?—"

কুণ্ঠিত বিনয়ের হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "চাকর'রা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল;—ওঠাতে গেলে দেরী হবে বলে—"

ভর্ৎসনার স্বরে স্মিথ্ বলিলেন,"নির্ব্বোধ! সব জিনিস তৈরী ছিল, বলে দিই নি? আমার বাড়ী!—তুমি ত' সেখানকার জামাই নও বাবা? যাও, এখন ক্ষুধা পরিপাক কর! —এমন অবাধ্য!"

সুরসুন্দর ঔষধ প্রস্তুতের অছিলায় তাড়াতাড়ি বাহিরে পলায়ন করিল। নমিতার দিকে চাহিয়া স্মিথ্ বলিলেন, "হাতটা পুড়িয়ে দেব না কি? এস ত দেখি ব্যাণ্ডেজটা।"

নমিতা হাত দেখাইল। স্মিথ ব্যাণ্ডেজটা ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা চল্‌বে;—কাজ কর। কিন্তু তোমায় অৰ্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করাই আজ আমার উচিত নয় কি?—ভারী দুঃসাহস!......এই যে বুড়ী দাইজী সঙ্গে আছে; ভালই। মা নিশ্চিন্ত থাক্‌বে! যাও লছ্‌মীর মা, পাশের ঘরে সতরঞ্চি বিছান আছে; ঘুমাও গিয়ে।"

দু-একটা কথার পর, লছ্‌মীর মা চলিয়া গেল। স্মিথ চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, মিসেস্ দত্ত কি বলে ফিরিয়ে দিলেন?—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাসার চাকর বল্লে, তিনি ডাক্তার মিত্রবাবুর সঙ্গে 'কলে' বেরিয়েছেন, আজ ফিরিবেন না।"—

স্মিথ্ একটু সংশয়ের স্বরে বলিলেন, "কলে বেরিয়েছেন? ফির্‌বেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বিস্ময়ের সহিত নমিতার মনের মধ্যেও একটা তীক্ষ্ণ সংশয় সজোরে বহিয়া গেল। কিন্তু এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই বলিয়া, সে চুপ করিয়া রহিল। নমিতা স্মিথের ইঙ্গিত মত কাজ আরম্ভ করিল। সুরসুন্দর নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিতে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। হাঁসপাতাল হইতে ঔষধপত্র সব আনা হইয়াছিল, এখন আবার নূতন ঔষধ আনা হইল।

সুরসুন্দর ঔষধের 'গ্লাশ' লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত গৌরবাবু ও মহেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশবাবু দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ওসুধ্ দিচ্ছ হে?"

গ্লাশের উপর হাত চাপা দিয়া সুরসুন্দর বলিল, "অনুগ্রহ করে একটু সরুন, আগে ওসুধ্‌টা খাইয়ে দিই; ঝাঁজ উড়ে যাচ্ছে।"

ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহেশবাবু একটু জিদের সহিত বলিলেন, "আহা, বলেই যাও না বাপু!"

এবার সুরসুন্দর চটিল। রুক্ষস্বরে বলিল, "ভাল গ্রহ ত! ম'শাই, আমি সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। ও-ঘরে 'প্রেসক্রপসান' পড়ে আছে, খুসি হয় গিয়ে দেখুন।"

সহসা রুখিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধত-কর্কশ ভাবে রূঢ় চীৎকারে গৌরবাবু হাঁকিলেন,—"ইউ আর ভেরি ব্যাড্, ফুল! তুমি জান, উনি একজন মেডিকেল প্র্যাক্‌টিসানার!"

গৌরবাবু অকস্মাৎ এত জোরে চীৎকার করিয়াছেন যে, গৃহস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল;—এমন কি মহেশবাবু পর্য্যন্ত! তিনি ভয়ে থতমত খাইয়া, পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, যাও।"

সুরসুন্দর দীপ্তনেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য গৌরবাবুর দিকে চাহিল; তারপর আত্মসংবরণ করিয়া নম্রভাবে বলিল, "ম'শাই, রোগীর ঘর দাঙ্গার জায়গা নয়; গুণ্ডামী করতে হয়, বাইরে যান্।"

সুরসুন্দর অগ্রসর হইয়া রোগীর কাছে আসিল। নমিতা ক্ষিপ্রহস্তে চাম্‌চে করিয়া চাড় দিয়া রোগীর মুখ খুলিলে, সুরসুন্দর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া, নাক টিপিয়া ধরিতেই সংজ্ঞাহীন রোগী ঢোক গিলিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করিল।

সুরসুন্দর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "ম'শাই, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার সম্মানে আঘাত করতে আমি চাই না।—তবে এটুকু বলে রাখ্‌ছি, মনে রাখ্‌বেন—পয়সার গরমে মানুষ ভদ্রলোক হতে পারে না। ভদ্রতার পরিচয় ব্যবহারেই প্রকাশ পায়!"

মহেশবাবুর দিকে চাহিয়া গৌরবাবু বলিলেন, "শুনুন্ শুনুন্, তেজের কথা শুনুন্।"—সুরসুন্দরের দিকে কট্‌মট্ চক্ষে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি জান, গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় এ বাড়ী থেকে দূর করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?"

স্মিথ্ এতক্ষণ চুপচাপ্ বসিয়া সব দেখিতেছিলেন; এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কখনই না।—এ বাড়ীর ওপর তোমার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা থাক্‌তে পারে; কিন্তু এই ঘরে,—রোগীর ঘরে শান্তিরক্ষার জন্য সকল রকম ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার আমার আছে! বেশী বাড়াবাড়ি কোর না; আমি পুলীশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব; রোগীর প্রাণের জন্যে তোমায় দায়ী কর্‌ব।—যাও, সসম্মানে বল্‌ছি—স্থান-ত্যাগ কর।"

গৌরবাবু মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর অপমানের কোন প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, নিষ্ফল আক্রোশে হাতদুইটা ঊর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দাঁত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখ্‌ব!—প্রমথ-ডাক্তার আমার হাতে আছে!—" তিনি সশব্দ পদাঘাতে দালান কাঁপাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মহেশবাবু ভয়বিহ্বলস্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুড়্‌তে সাপ! বাবা! গৌর! ও কি সহজ ছেলে! ওকে চটান, ও বাবা!"

মিস্ স্মিথ্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গী ঐ অদ্ভুত মেজাজের কর্ত্তৃত্বপ্রিয় নবাবটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

মহেশবাবুর তড়্‌বড়ে কথাবার্ত্তা সব জড়াইয়া গেল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শুষ্ককণ্ঠে থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "ও গণেশবাবু, এখানকার প্রধান গোলাদার মহাজনের ছেলে! ও কি সাধারণ লোক! ও ইচ্ছে করলে এখনই পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল্‌ এখানে হাজির করতে পারে! সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তাই এ বাড়ীতে এসে বসে আছে; নইলে, ওর পায়া ধরে কে? ও মনে করলে, পঞ্চাশ কি? পাঁচশো লাঠিয়াল্‌ এনে হাজির করতেও পারে......"

গল্পবাজ ভদ্রলোকটির অনুমানের বহর ও গল্পের দৌড় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, স্মিথ্‌ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন, "তবেই ত সাঙ্ঘাতিক। এবার থেকে দেখ্‌ছি, দুশো-পাঁচশো শরীররক্ষী সঙ্গে না থাক্‌লে এ-রকম সব ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অসম্ভব!"

নিজের মতের বিরুদ্ধে কথা শুনিলে অনেকে যেমন ক্ষেপিয়া উঠেন, মহেশবাবুও তেমনই খেপিয়া উঠিলেন; ঘন ঘন গোঁফ কাঁপাইয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া, উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কি বলেন গো!—জিজ্ঞেসা করবেন মিসিস্‌ দত্তকে: গণেশ চক্রোবর্তীর ছেলে গৌরাঙ্গ চক্রোবর্তীকে চেনেন সে, তিনি। জলজ্যান্ত মানুষকে খুন ক'রে ও-লোক সাম্‌লে নেয়! বিধবা বোন্‌ ছেলেমানুষ,—সে না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছিল! তা ব'লে খুন করবে!—পেরমথ মিত্তির কন্‌কনে আড়াই হাজার টাকা গুণে মোট বেঁধে নিয়ে গেল, আর মিসিস্‌ দত্ত নগদ সাত-শ!—পুলীশের দারোগা ভ্যাবাচ্যাকা মেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল!—"

গৃহস্থ সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্‌! কেবল অবিচলিত রহিলেন মিস্‌ স্মিথ্‌। বেশ শান্ত ভাবে, তিনি মহেশবাবুর হাত ধরিয়া নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটির উপর বসাইয়া দিয়া, নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "ধীরে—মহাশয় ধীরে! আমার রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু আস্তে কথা বলুন্‌ অনুগ্রহ করে।—হাঁ, তারপর বলুন্‌ এই জুলাই মাসে, ডেড্‌?—হাঁ স্মরণ হয়েছে; সতেরই জুলাই সেই লাশ 'পোষ্টমর্টেম করবার জন্যে হাঁসপাতালে যায়, না?—আর আপনি এবং ঐ ভদ্রলোক, আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি—তিনজনে একদিন ডাক্তার প্রমথবাবুর সঙ্গে, হাঁসপাতালে, আমাদের বসবার ঘরে বসেই ঐ টাকার কথা নিয়েই তর্ক করছিলেন নয়? ডাক্তারবাবু বোধ হয়, এই রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্যই তিন হাজার টাকা চাইছিলেন না?"

অতিক্রোধীর মাথায় খুন চাপিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; অতিবক্তা মানুষের মনে বক্তৃতার ঝোঁক চাপিলে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে না। মহেশবাবু সদর্পে বলিলেন, "তিন হাজার! পাঁচ হাজার চেয়েছিলেন!—আমি মাঝে ছিলুম, তাই আড়াই হাজারে পার পেলে! হয়-নয় সুধুন গৌরকে!—"

গম্ভীরভাবে স্মিথ্‌ বলিলেন, "ধন্যবাদ মহাশয়, গৌরকে জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন; আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা

করি। অনুগ্রহ করে রোগীর ধমনী-গতি গণনা করুন। এই নিন্ আমার ঘড়ি।—মনো-যোগ দিয়ে গুণ্‌বেন, ভুল না হয়। নমিতা, আলোকটা দেখাও। সুরসুন্দর, একবার এ ঘরে এস।"

মিস্ স্মিথ, সুরসুন্দরকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটা অভাবনীয় আতঙ্কে নমিতার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। এ সব কি ভীষণ কথা সে শুনিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!......আজ সন্ধ্যার পর ডাক্তার মিত্রের নিকট যে-সব কথা সে শুনিয়াছে, তাহার আবছায়াগুলাও মনে পড়িতে লাগিল। নমিতার মাথার মধ্যে যেন গোলমাল বাঁধিয়া গেল।

স্বভাব-চঞ্চল মহেশবাবু দুই তিনবার গণনাকার্য্যে ভুল করিয়া, অনেক কষ্টে স্থির হইয়া, শেষে গণনা শেষ করিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাণ্ড্রেড টোয়েণ্টি ফাইব!—এ-রকম অবস্থায় এও ত বেশী;—খুবই বেশী।"

সংযত হইয়া নমিতা অনুমোদনের স্বরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশী বৈ কি!—"

নিজের মত সমর্থন হওয়ায় মহেশবাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বেশী! কি বল এঁ্যা?"—তারপর "ক্ষীণে চ প্রবলা নাড়ী......"ইত্যাদি গড়্‌গড় করিয়া একনিঃশ্বাসে কতকগুলা কথা বলিয়া শেষে, হঠাৎ বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, তোমার নামটি কি মা?—"

"মা!"—নমিতার কান জুড়াইল! লোক-টির এতক্ষণকার যথেচ্ছ বক্‌বকানি ও অতি-বক্তৃতার চোটে তাহার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল; এতক্ষণে তাহার মনের সমস্ত অবজ্ঞা-বিরক্তি মুছিয়া গেল। স্মিতমুখে সবিনয়ে সে বলিল, "আমার নাম,—কুমারী নমিতা মিত্র।—"

তিনি বলিলেন, "নমিতা মিত্র? নমিতা মিত্র?—কই, তোমার নাম ত শুনি নি! তুমি আর কখনো এদিকে 'কলে' আস নি, কি বল?—"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে না। এই প্রথম!"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ তাই বল। এ তল্লাটে এলে আমি নিশ্চয়ই জান্‌তে পারতুম। এদিকে সবই ত আমার রোগী!—আমায় না জানিয়ে কেউ অন্য লোককে আন্‌তে পারে না।—আমি যাকে বলে দেব, তাকেই আন্‌বে! বুঝ্‌লে মা, মিসেস্ দত্তকে,—সেও আমি তাঁর এদিকে পসার করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আলাপ-পরিচয় ত হোল; এবার থেকে তোমাকেও 'কল' দেব।"

নমিতা মনে মনে হাসিল; ভদ্রলোকের অভ্যাসটি বড় নিদারুণ! আত্মশ্লাঘা-প্রচারের ধুয়াটি কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যশীল লোক হইলে ইহার সহিত সমানে বকিয়া বেশ কৌতুক জমাইতে পারে, কিন্তু নমিতার যে তত কথা কহিবার শক্তি নাই! বিপদ্ এড়াইবার জন্য নমিতা সদ্যঃ-প্রসূত শিশুটিকে দেখাইয়া বলিল, "ওর অবস্থা একবার দেখুন্;—অনেকক্ষণ দেখা হয় নি।"

তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মিস্ স্মিথ্ ও সুরসুন্দর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেশবাবু আর উঠিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ, গম্ভীর-নম্রস্বরে বলিলেন, "আপনাদের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করছি; বাধ্য হয়ে এখানে একটি অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। ত্রুটি নেবেন্ না।—" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

যাত্রী।

এস ওগো খেয়ার মাঝি,
পার করে' নেও মরে;
সারাদিনটী বসে' আছি
একলা নদীর পারে:
আঁধার নেমে আস্‌ছে ধীরে
ঐ যে দূরের সুনীল নীরে;
একা বসে' রইব কিরে
নির্জন নদীর ধারে?

ছিল যারা সাথের সাথী
গেল অপর পারে,
কেউ আমারে নেয়নি ডেকে'
কেউ চাহে নি ফিরে'!
পারের সময় যায় যে তরে',
একা বসে' আছি তীরে,
ওগো মাঝি, ত্বরা করে'
দেও গো নদী পারটী করে'।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় প্রকরণ।

শিষ্যানুভবপীযূষে জ্ঞাতেঽপি করুণাবশাৎ।
তদ্বিজ্ঞানপরীক্ষার্থং শিষ্যমাহ গুরুঃ পুনঃ ॥১॥

শিষ্য আত্মানুভবরূপ অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে—ইহা বুঝিয়াও করুণাবশতঃ গুরু তাহার জ্ঞানের দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ পুনরায় বলিলেন।১।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জনে রতিঃ ॥১॥

অবিনাশী অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব যথার্থতঃ জানিয়াও আত্মজ্ঞ ও ধীর তোমার অর্থার্জ্জনে অনুরাগ কেন?

আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ে ভ্রমগোচরে।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥২॥

অহো! আত্মজ্ঞান না হইলেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট বিষয়ে প্রীতি জন্মে; যেমন শুক্তি বলিয়া জ্ঞান না থাকাতেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের প্রতি লোভ হয়।২।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥৩॥

যেমন সাগরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। সেই আত্মাই আমি—ইহা বুঝিয়াও (অর্থাদির প্রতি) কেন কাতরভাবে ধাবিত হও।৩।

শ্রুত্বা বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেঽত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি ॥৪॥

বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্র আত্মাকে সুন্দর বস্তুরও অতিক্রমকারী শুনিয়াও সমীপস্থ ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া লোকে কেন মালিন্য প্রাপ্ত হয় ?৪)

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে ॥৫॥

যিনি সর্ব্বজীবে আত্মাকে অবলোকন করেন ও আত্মাতে সর্ব্বজীব অবলোকন করেন, এতাদৃশ স্থিরধী ব্যক্তি বিষয়ে মমত্ব-বোধ করিবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য (অসম্ভাব্য) ৫।

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥৬॥

পরমাদ্বৈততত্ত্বে স্থিরচিত্ত এবং মোক্ষ-বিষয়ে একপ্রবণ ব্যক্তি কামবশীভূত হইয়া কেলিশিক্ষায় বিকল হইবেন—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য।৬।

উদ্ভূতং কামদুর্মিত্রমবধার্য্যাতিদুর্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ॥৭॥

জ্ঞানের বৈরী কাম চিত্তে উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিয়া (সংসারের) অন্তকালে অবস্থিত জ্ঞানীরা জ্ঞানবলশূন্যের ন্যায় কামবিষয় আকাঙ্ক্ষা করিবেন ;—ইহা অতি আশ্চর্য্য (অর্থাৎ জ্ঞানিগণের পক্ষে কাম-বশীভূত হওয়া অসম্ভব ৭।)

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥৮॥

ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র সুখভোগে নিস্পৃহ এবং নিত্য আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে আর সমস্তই অনিত্য, এইরূপ যিনি অবধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ সচ্চিদানন্দসুখাভিলাষী ব্যক্তির তাদৃশ চিৎস্বরূপে বিভীষিকা হইবে—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। (অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বিষয়াদিতে কথনই আসক্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ অদ্বৈতদর্শীরা বিধিনিষেধের অতীত হইলেও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না) ।৮।

ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্বদা।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্নতুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥৯॥

ধীরব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিষয়ভোগ করিতেই দাও আর সর্ব্বদা পীড়াই দাও, তিনি কেবল আত্মদর্শন করেন ; হৃষ্টও হ'ন্ না, কুপিতও হ'ন্ না ।৯।

চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যন্নন্যশরীরবৎ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ ॥১০॥

জ্ঞানবান্ মহাশয়েরা কর্ম্মনিরত নিজের শরীরকে অন্যশরীরের সহিত অবিশেষ জ্ঞান করেন ; এজন্য এক শরীর অন্য শরীরের স্তব বা নিন্দা করিলে, কেন তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন ? ।১০।

মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকম্।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥১১॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে যিনি কৌতুক-হীন মায়ামাত্র অবলোকন করেন, এতাদৃশ ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিহিত হইয়া কেন ভীত হইবেন ? (১১)

নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥১২॥

নৈরাশ্যেও যে মহাত্মার মন নিঃস্পৃহ, সেই আত্মজ্ঞানতৃপ্ত ব্যক্তির কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে ? (১২)

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্নকিঞ্চন।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥১৩॥

যিনি দৃশ্যজগৎ স্বভাবতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন, সেই ধীরমতি ব্যক্তি কি "ইহা গ্রহণীয়, ইহা পরিত্যাজ্য" এইরূপ অবলোকন করেন ? (১৩)

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥১৪॥

যাঁহার অন্তঃকরণ হইতে রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত প্রকার মলিনতা দূর হইয়াছে, যিনি সুখদুঃখের অতীত এবং জীবিতাদি-বিষয়েও নিরাকাঙ্ক্ষ, তাঁহার পক্ষে স্বভাবোপনত ভোগ দুঃখকরও হয় না, সুখকরও হয় না।১৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আক্ষেপ দ্বারা শিষ্যোপদেশ-নামক তৃতীয় প্রকরণ।

চতুর্থ প্রকরণ।

গুরুণৈবমুপাক্ষিপ্তঃ শিষ্যো জ্ঞানদশোল্লসন্।
জ্ঞানিন্যশেষচেষ্টানাং স্পষ্টমাচষ্ট সত্তমম্॥

গুরুকর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত শিষ্য আত্ম-জ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়া জ্ঞানিগণের সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যই যে শোভা পায়, তাহা স্পষ্ট বলিলেন।

হন্তাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া।
নহি সংসারবাহীকৈর্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥১॥

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যিনি আত্মজ্ঞ এবং ধীর, তিনি যদি ভোগলীলায় ক্রীড়া করিতে থাকেন, তথাপি সংসার-ভারবাহী মূঢ়গণ তাঁহার সহিত সমান হইতে পারে না।১।

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপাগচ্ছতি ॥২॥

অহো! ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা যে সচ্চিদানন্দপদ পাইবার জন্য লালায়িত, যোগী সেই পদে অবস্থান করিয়াও হর্ষবিহ্বল হ'ন্ না (কিংবা তদপগমে উদ্বিগ্নও হ'ন্ না) ॥২॥

তজ্‌জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥৩॥

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পুণ্য বা পাপের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। যেমন ধূমের সহিত আকাশের সঙ্গতি দেখা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে আকাশ ধূমের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না।৩।

আত্মৈবেদং জগৎসর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥৪॥

এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ কেবল আত্মাই —এই কথা যে মহাত্মা জানেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলে, তাঁহাকে কে নিষেধ করিতে পারে ? (৪)

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে ভূতগ্রামে চতুর্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥৫॥

আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত চারিপ্রকার (অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ্, ও আধিকারিক বা জ্ঞানী পুরুষ) জীবসমূহের মধ্যে যিনি আত্ম-জ্ঞানী, তিনিই রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগে সমর্থ।৫।

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিৎ জানাতি জগদীশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥৬॥

কোন ব্যক্তি যদি আত্মাকে অদ্বিতীয় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি যাহা জানেন তাহাই করেন। তাঁহার ইহ-লোক বা পরলোকে কোনও ভয় থাকে না।৬।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার অনুভাবোল্লাস-নামক চতুর্থ প্রকরণ।

পঞ্চম প্রকরণ।

এবমুল্লাসষট্‌কেন স্বশিষ্যেঽপি পরীক্ষিতে।
গুরুর্দৃঢ়োপদেশার্থং লয়যোগমথাব্রবীৎ ॥১॥

এইরূপ উক্ত উল্লাসষট্‌কের দ্বারা স্বশিষ্যের জ্ঞানের যাথার্থ্য পরীক্ষিত হইলেও, গুরু উপদেশ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পুনরায় লয়যোগ বলিলেন।১।

নতে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥১॥

হে শিষ্য, তোমার কোন বস্তুর সহিতই সম্পর্ক নাই, তুমি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ (অন্য বস্তুর দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অমিশ্রিত); অতএব তুমি কি ত্যাগ করিবে? (কিই বা গ্রহণ করিবে?) তুমি এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হও।১।

উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদাঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥২॥

হে শিষ্য, সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তোমা (আত্মা) হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা জানিয়া সকলপ্রকার-ভেদশূন্য আত্মস্বরূপে লীন হও।২।

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্ বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৩॥

জগৎ প্রত্যক্ষ হইলেও কিছুই নহে; ইহা তোমাতে নাই। রজ্জুতে যেরূপ সর্প (ভ্রমবশতঃ) প্রত্যক্ষ হইলেও নাই, জগৎ সেইরূপেই প্রকাশিত; অতএব (যখন তোমা ছাড়া হেয় বা উপাদেয় আর কিছুই নাই, তখন) আত্মস্বরূপে লীন হও।৩।

সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমো জীবিতমৃত্যো সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৪॥

হে শিষ্য, তুমি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণস্বভাব (সকল অভাব- বা অপূর্ণতা-বিরহিত); অতএব তুমি সুখে দুঃখে, আশা নিরাশায়, জীবনে মরণে সমান জ্ঞান করিয়া আত্মস্বরূপে লীন হও।৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় লয়চতুষ্টয়-নামক পঞ্চম প্রকরণ।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

গুরুণৈবং পরীক্ষার্থমুপদিষ্টে লয়ে সতি।
পূর্ণাত্মনো লয়াদীনাং শিষ্যোঽসম্ভবমব্রবীৎ ॥১॥

পরীক্ষার্থ গুরু এইরূপ লয়যোগের উপদেশ দিলে, শিষ্য পূর্ণস্বভাব আত্মার লয় অসম্ভব দেখাইলেন।১।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥১॥

আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, আর আকাশের তুলনায় ঘট যতটুকু আত্মার তুলনায় প্রকৃতি-বিনির্মিত জগৎও ততটুকু। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই।১।

এতদ্দ্বারা আকাশ হইতে ঘট ভিন্ন-অতএব জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত;—এই শঙ্কা-নিরাসের জন্য বলিতেছেন।—

মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ॥২॥

আমি সেই আত্মা মহাসমুদ্রের ন্যায়, আর জগৎ তাহার তরঙ্গের তুল্য। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই।২।

এতদ্দ্বারা আত্মা সমুদ্রের মত বিকারী, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—

অহং স শুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্ বিশ্বকল্পনা।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥৩॥

আমি সেই আত্মা শুক্তির ন্যায়, আর জগৎ-কল্পনা শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়।

ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই। ৩।

এতদ্দ্বারা আত্মা শুক্তির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—

অহং বা সর্বভূতেষু সর্বভূতান্যথো ময়ি।
ইতিজ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ॥৪॥

আমিই সর্বভূতে বর্ত্তমান, এবং সর্ব্বভূত আমাতে বর্ত্তমান। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই॥৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার উত্তরোপদেশচতুষ্ক-নামক ষষ্ঠ প্রকরণ।

সপ্তম প্রকরণ।

লয়যোগানস্থানে ব্যবহারং নিরঙ্কুশম্।
আশঙ্ক্য শিষ্যঃ প্রোল্লাসাদব্রবীদ্ গুরু-
মুত্তরম্॥১॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যদি লয়যোগের অনুষ্ঠান না করেন, তবে হয়ত তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, এই আশঙ্কার উত্তরে শিষ্য আত্ম-জ্ঞানোল্লাসিত হইয়া বলিতেছেন।১।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা॥১॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ, জগৎরূপ জাহাজ ইহাতে চিত্তরূপ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে আমার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। (অর্থাৎ জাহাজ যদি জলমগ্ন হয়, তাহাতে সমুদ্রের যেরূপ কোন ক্ষতি নাই, সেইরূপ দেহ-সহিত বিশ্বের পরিবর্ত্তনেও আমার কোন ক্ষতি নাই)।১।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষতিঃ॥২॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে জগৎ তরঙ্গস্বরূপ। সেই তরঙ্গ নিজের স্বভাবানুসারে (অর্থাৎ চিত্তের অবিদ্যা-কামকর্ম্মানুসারে) উত্থিত হউক্ বা বিলীন হউক্; তাহাতে আমার কোন লাভও নাই, ক্ষতিও নাই।২।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৩॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে নাম (ও রূপের) কল্পনাই জগৎ। আমি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার-ক্ষোভ-বিবর্জ্জিত ও নিরাকার; সেই অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া আছি (অতএব লয়যোগানুষ্ঠান নিরর্থক)।৩।

নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রানন্তে নিরঞ্জনে।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৪॥

আত্মা দেহাদিপদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এবং দেহাদি পদার্থ তাহাতে নাই (অর্থাৎ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট বা মিশ্রিতভাবে নাই); কেন না, আত্মা অনন্ত এবং সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বর্জ্জিত। অতএব আমি অসক্ত (কোনবস্তুর সহিত সংলগ্ন নহি, অতএব বিশুদ্ধ), নিঃস্পৃহ (কারণ কোন বস্তুর দ্বারা আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেননা সে বস্তু আমাকে স্পর্শই করিতে পারে না) এবং শান্ত (কারণ, কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই)।৪।

আহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥৫॥

অহো! আমি কেবল চৈতন্যস্বরূপ, আর এই জগৎ ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজীর প্রায়; অতএব কোন বস্তুতেই এবং কি করিয়াই বা হেয় বা উপাদেয় বোধ হইবে? (অর্থাৎ

সুখকর বস্তুই হউক্ আর অসুখকর বস্তুই হউক্, সমস্তই অচিরস্থায়ী; অতএব তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ততা কেন? সে-সকল ত আপনিই যাইবে। আর সে-সকল বস্তু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণও তাহার দ্বারা চৈতন্য-স্বরূপ আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমার স্বরূপ কোনরূপেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তাহার বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই; তবে আর সুখ দুঃখ লইয়া রাগ-দ্বেষ কেন? সুখেও কিছু বাড়িবে না, দুঃখেও কিছু কমিবে না; চৈতন্য চিরকালই আছে এবং থাকিবেও।) ।৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার অনুভবপঞ্চক-নামক সপ্তম প্রকরণ।

অষ্টম প্রকরণ।

ইত্থং পরীক্ষিতজ্ঞানং শিষ্যমেবাভিনন্দিতুম্।
গুরুর্বন্ধস্য মোক্ষস্য ব্যবস্থাং সম্যগব্রবীৎ ॥ ॥

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া, শিষ্যের যথার্থ জ্ঞানলাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গুরু তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য বন্ধন ও মোক্ষের যথার্থ ব্যবস্থা বলিলেন ।১।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্লাতি কিঞ্চিদ্ধৃষ্যতি কুপ্যতি ॥১॥

যতক্ষণ চিত্ত কিছু পাইতে ইচ্ছা করে বা কিছুর জন্য দুঃখ করে, কিছু ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, অথবা কিছুতে হৃষ্ট বা কিছুতে কুপিত হয়, ততক্ষণই জীবের বন্ধন। (অর্থাৎ কোন কিছুর অপেক্ষা থাকিলেই বন্ধন, সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইলেই মুক্তি) ।১।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্লাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥২॥

যখন চিত্ত কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না, কিছুর জন্যই দুঃখ করে না, কিছুই ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, কিছুতে হৃষ্ট বা কিছুতেই কুপিত হয় না, তখনই মুক্তি ।২।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপিদৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥৩॥

যখন চিত্ত কোনপ্রকার অনাত্মবস্তুতে আসক্ত, তখনই বন্ধন; যখন চিত্ত সকল অনাত্মবস্তুতে স্পৃহাত্যাগ করিয়াছে, তখনই মোক্ষ ।৩।

যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চমা ॥৪॥

যখন অহংভাব দূর হইয়াছে, তখনই মোক্ষ; যতক্ষণ অহংভাব আছে, ততক্ষণই বন্ধন। এই কথা বুঝিয়া অবহেলার সহিত কোন বস্তু গ্রহণ করিও না বা কোনবস্তু ত্যাগ করিও না ॥৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার বন্ধমোক্ষোপদেশ-নামক অষ্টম প্রকরণ।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীদীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা।

স্বভাবটি যেন পুণ্য আনন্দ-নির্ঝর,
বহি যায় কুলু কুলু জুড়ায়ে অন্তর;
কৃত্রিমতা কৃষ্ণ-শিলা কুটিল কঠোর,
রোধি ধারা-পথে তারে বাধা দেয় ঘোর!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

গানের স্বরলিপি।

মেঘরাগ—ঝাঁপতাল। *

প্রবল ঘন মেঘ আজি নীল ঘন ব্যোম 'পরে
আঁধার ঘন ঘোর ভানু চন্দ্র ছাই হে।
বরষিছে মুষলধার নাহি বিরাম আর,
বিশ্বপতি রাখ এ বিপদে বাঁচাই হে।
ত্রস্ত ধরণী 'পরে সকলি হে শঙ্কা করে,
পশু পক্ষী জল স্থল নদী নদ বায়ু
সকলি শঙ্কিত আজ ঘন ঘোর বরষায়,
জগপতি, চরণে রাখ শান্তি বিছাইহে॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২´			৩				০			১			
II	না	না	।	না	র্সা	র্সা	।	না	-া	।	-পা	মা	পা	I
	প্র	ব		ল	ঘ	ন		মে	০		০ঘ	আ	জি	

	২´			৩				০			১			
I	না	-া	।	-পা	মা	পা	।	মা	-গা	।	মা	রা	-সা	I
	নী	০		ল	ঘ	ন		ব্যো	ম		প	রে	০	

	২´			৩				০			১			
I	সা	রা	।	-মরা	মা	পা	।	পা	-া	।	-পা	মা	পা	I
	আঁ	ধা		০র	ঘ	ন		ঘো	০		র	ভা	নু	

* ভারতীয় সঙ্গীত-পুস্তকাদিতে লেখা আছে যে, ছয়টী রাগের শব্দ বা সুরের দ্বারা ছয়টী ঋতুর আদর্শ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। কয়েকটি রাগের গান মিসেস্ বি, এল্, চৌধুরী-মহাশয়ার দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত-সম্মিলনীর গত বারের অভিনয়ে, কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট্ হলে গীত হইয়াছিল। ঐ রাগগুলির গানের মধ্যে,এই গানটিও গাওয়া হইয়াছিল। গানটি আধুনিক মার্জ্জিত ভাষাতে রচিত নহে। সম্ভবতঃ, কবিকঙ্কন বা চণ্ডিদাস বা বিদ্যাপতির ধাঁচে রচিত; কিম্বা মেদিনীপুর বা বিষ্ণুপুরের গান-রচয়িতাদের ধাঁচে রচিত। কিন্তু একটি হিন্দি গানের ঠিক্ মাপে, সহজ ও ছোট ছোট বাণীনে রচিত বলিয়া গানটিকে রীতিমত অঙ্গরাঙ্গের ও মৃদঙ্গের ঠেকার সহিত, ঠাঠের ভিতরে, দিনযামিনীর যে সময়েই হউক না কেন, গাহিতে পারিলে, অনেকটা অনুভব করা যাইতে পারিবে যে, বর্ষাকালের ভাবভঙ্গী বা ক্রিয়া-কলাপ যেন সে সময়ে উপস্থিত। শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
I সা -া। -না পা -া। মা -পা। -না -মা -পা II
চ ন্ দ্র ছা ই হে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II মা পা। পা না না। র্সা র্সা। র্সা -া -সা I
ব র ষি ছে মু ষ ল ধা ০ র

২ ৩ ০ ১
I র্মা -া। র্রা -া র্সা। না পা। না -া -পা I
না ০ হি ০ বি রা ম আ ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্মা -া। -র্মা র্রা র্মা। র্রা র্সা। না মপা মপা I
বি শ্ ব প তি রা ০ থ এ ০ বি প

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা। না -পা -া। মা -পা। -না -মা -পা II
দে বা চা ০ ই হে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II মা -রা। -রা মা পা। না -া। না না -পা I
ত্র স্ ত ধ র ণী ০ প রে ০

২´ ৩ ০ ১
I না না। র্সা র্সা -া। না -পা। -না পা পা I
স ক লি হে ০ শ ঙ্ কা ক রে

২´ ৩ ০ ১
I মা গা। রা পা -া। মা গমা। -রা সা -া I
প শু প ক্ষী ০ জ ল ০ স্থ ল ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা। মা পা -া। না -া। পা -া -া I
ন দী ন দ ০ বা ০ য়ু ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা পা। পা না -া। -র্সা র্সা। র্সা -া -র্সা I
স ক লি শ ঙ্ কি ত আ ০ জ

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা। র্রা র্মা -র্রা। না র্সা। না -া -পা I
ঘ ন ঘো ০ র ব র ষা ০ য়

২´ ৩ ০ ১
I র্মা র্গা। র্মা র্রা র্সা। না র্সা। না -পা র্সা I
জ গ প তি চ র ণে রা ০ থ

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া। -না পা -া। মা -পা। না -মা -পা II II
শা ন্ তি বি ০ ছা ই হে ০ ০

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডিম।

ডিমের মধ্যে দুইটী পদার্থ দেখা যায়; দুইটিই তরল। একটি সাদাটে; আর একটি হল্‌দে; এইটিকে কুসুম বলে। ডিম ফুটন্ত জলে ফেলিলে, সাদাটে জিনিষটি বেশ শক্ত হয় এবং বেশ শ্বেত-বর্ণ হয়। কুসুমও শক্ত হয়, কিন্তু অত নয়। দুই ভাগেই ছানার মত জিনিষ আছে। কুসুমের মধ্যে ছানা ব্যতীত এক প্রকার স্নেহ-পদার্থ আছে, আর অল্প-পরিমাণে চিনি ও লবণ আছে। ডিম শুখাইয়া পুড়াইলে ছাই হয়; ছাই-ই লবণ। ডিমে এক প্রকার তৈলও আছে। ডিমে জল নাই বলিলে হয়। এখন দেখা গেল দুধ আর ডিমে একই প্রকার পদার্থ-সকল আছে। এই দুইই আদর্শ খাদ্য বা পূর্ণ-খাদ্য। ইহাদের মধ্যে জীবন-ধারণের সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়। এই উপকরণ-গুলি অন্য কোন একটি খাদ্যে পাওয়া যায় না।

এখন মাংসের কথা বলি। মাংসে শতকরা ৭৫ ভাগ জল; বাকি ২০ অংশে Albumin (ছানাজাতীয় পদার্থ) (আর ৫ ভাগ fat-স্নেহজাতীয় পদার্থ বা চর্ব্বি)। চর্ব্বি-বিহীন মাংসকে Lean বলে। খাঁটি মাংস Leanতে দুধের ছানা, ডিমের সাদা, Fat) চর্ব্বি, দুধের মাখম আর ডিমের স্নেহ-পদার্থের মতন জিনিষ থাকে। মাংসে শ্বেতসার (Starch) বা চিনি নাই। শ্বেতসারই শরীরে গিয়া চিনি হয়।

(Starchy) food শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের কথা বলি। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য শরীরে গিয়া চিনি হইয়া পড়ে; তাহাতে শারীরিক অগ্নি রক্ষা হয়। ইহা heat-making food অগ্নিপ্রদ খাদ্য পুষ্টিকর নয়। ফল, মূল, শাক, সব্‌জি, আনাজ, আলু, কপি ইত্যাদি সকলই শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য; ইহাতে proteid অতি অল্পই আছে। আলুতে ৭৫ জল। ডাল-কলাই-জাতীয় খাদ্যে অপেক্ষা-

কৃত পুষ্টিকর পদার্থ বেশী থাকে। আমাদের দেশে চাল ও গম প্রধান খাদ্য। এই দুইটিতেই শ্বেতসার অধিক; পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। গম অপেক্ষা চালে পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। আমিষের proteid নিরামিষের proteid অপেক্ষা সহজ-পাচ্য এবং শীঘ্র রক্তের সঙ্গে মিশে।

আমাদের সকল প্রকার খাদ্যে জল থাকে, তথাপি আমাদের জল-পান করিতে হয়; শুষ্ক খাদ্যে শরীর রক্ষা হয় না। জল শরীরে শীঘ্র জ্বলে না বটে, কিন্তু জ্বলনের কার্য্যে সহায়তা করে। খাদ্যের সঙ্গেই আমরা নানা-প্রকার লবণ খাই, তথাপি (Table Salt) সামুদ্রিক লবণ খাইতে হয়। লবণ হাড়-পুষ্টি করে এবং শরীরের কব্জিগুলিতে তেল দেয়।

আমরা প্রতিদিন অনেক প্রকার খাদ্য খাই; কিন্তু সমস্তের মধ্যে প্রাধানতঃ তিনটি পদার্থ থাকে।—Proteid মাংসজনক, Starch শ্বেতসার এবং Fat স্নেহ-পদার্থ; এই কয়টিই প্রকৃত খাদ্য। মানুষ-মাত্রেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে এই প্রকার খাদ্য খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকে। বড়মানুষরা নানাপ্রকার মুখ-রোচক স্বাদু খাদ্য ভোজন করেন; গরীবলোকেরা তা পায় না। তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে। অনেক মসলা ও ঘি-তেলযুক্ত তরকারীতে অজীর্ণ-রোগ হইতে পারে।

Real and helpful অর্থাৎ প্রকৃত ও সহকারী খাদ্য ব্যতীত আর একপ্রকার পানীয় আছে। এইরূপ খাদ্যের সহায়তায় শারীরিক উপার্জ্জিত শক্তির নিকট হইতে অধিক কার্য্য লইতে হয়। এইরূপ খাদ্যকে whip বা চাবুক বলে। চাবুকের দ্বারা ঘোঁড়াকে যেমন চালাতে হয়, এই খাদ্যও সেইরূপ। এই whip বা চাবুক-খাদ্য উপার্জ্জন করে না; কিন্তু উপার্জ্জিত সামর্থ্য খরচ করে। ইহা খরচ করায় বলিয়াই আমাদের অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঘোঁড়াকে খাইতে না দিয়া শুধু চাবুকে কি চালান যায়!

Tea (চা), Coffe (কাফি), Coco (কোকো)—চাবুক-জাতীয় এইগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। কেহ এইগুলি ব্যবহার করিয়া ভাল থাকে, কেহ বা মন্দ থাকে।

চা ইত্যাদিতে কি উপকার হয়? চা শরীরে গিয়া জ্বলে না এবং কোন প্রকার নূতন শক্তিও উপার্জ্জন করে না। পরন্তু ইহা উপার্জ্জিত শক্তি খরচ করায়। উপার্জ্জিত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, চা ইত্যাদির সহায়তায় মানুষ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। অধিক ব্যয় হইলেই অধিক আয় চাই, সে-জন্য পরিশ্রমী লোকদের অধিক খাইতে হয় এবং তাঁহারা খাদ্যও বেশ জীর্ণ করিতে পারেন।

মদ একটি চাবুকজাতীয় দ্রব্য। চা এবং মদের ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক বিধি-ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত কথা এখানে বলা যায় না। মোটের উপর সুস্থ ও সবল লোকের পক্ষে মদের কোন প্রয়োজন নাই। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং convalescent (যাহারা রোগ হইতে উঠিয়াছেন), তাহাদের পক্ষে হয়ত মদ্য-পান প্রয়োজনীয় হইতেও পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ-ব্যতীত কাহারও মদ্য-ব্যবহার করা উচিত নয়। মদের অন্যান্য অনেক দোষ ব্যতীত একটি দোষ

এই যে, ইহার পানের প্রবণতা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

চা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এবং কাহার তাহা পান করা উচিত, আর কাহার বা পান করা উচিত নয়, সে বিষয়ে একটু বলি। আমাদের জঠরাগ্নি অল্প হইলে তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। মন্দাগ্নি দুই-প্রকার হয়। খাদ্য-দ্রব্যের অল্পতা-বশতঃ, আর জঠরাগ্নির দৌর্ব্বল্য-বশতঃ মন্দাগ্নি হয়। প্রথম-শ্রেণীর মন্দাগ্নিতে চা-পান অনুপকারী এবং দ্বিতীয়-টিতে উপকারী।

চা-দানীটি বেশ শুষ্ক করিয়া তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিবে এবং তাহাতে চা ফেলিয়া দিবে। ৩।৪ মিনিটের উপর উহা রাখিবে না। কারণ, বেশীক্ষণ রাখিলে Tanic Acid হয় (যাহাতে চামড়া হয়)। ইহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খালি পেটে চা-পান করিবে না। চা-পান করিবার সময় অন্ততঃ একটু কিছু খাইবে। পূর্ব্বে যদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিপাক-কার্য্য বাড়াইবার জন্য চা আবশ্যক। চা একপ্রকার Stimulant বা উত্তেজক দ্রব্য; অর্থাৎ ইহা রক্তের Circulation (গতি) বৃদ্ধি করে।

আহারের সময় ও পরিমাণ ঠিক্ রাখিতে হয়; এবং Proteid, Starch, Fat, Salt, Water—এই সমস্ত যথাপরিমাণ হওয়া চাই। পরিমাণ বেশী বা কম হইলে অমৃতেও বিষ হয়। খাদ্যের মধ্যে লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকা চাই; কারণ আমাদের রক্তে লোহা আছে। কোন কারণে রক্তের লোহার ভাগ কম হইলে আমাদের বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। রোগ হইতে আরোগ্য হইবার পর ডাক্তারে যে 'টনিক' ঔষধ দেন, তাহাতে প্রায়ই লৌহ থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

কামাখ্যা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কামরূপ-জেলায় কামাখ্যা অবস্থিত। এখানকার মন্দিরটী সতীর নামে উৎসর্গীকৃত। উক্ত মন্দির নীলাচল-পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এস্থানে ব্রহ্মপুত্র-নদ প্রবাহিত। মহাভারতের সমসাময়িক নরক-নামে জনৈক রাজপুত্র মন্দিরটী প্রথমে নির্ম্মাণ করেন। পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য যে বাঁধ তিনি বাঁধিয়া-ছিলেন, তাহার অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। কালে মন্দিরটী লোপ পায়। পরে বিশ্বসিং পূত স্থানটীর আবিষ্কার করিয়া তথায় একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালা-পাহাড়-নামক জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান তাহার ধ্বংস করে। ১৫৬৫ খৃঃ, নরনারায়ণ-নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে দেবীর নিকট ১৪০টী নরবলি পড়ে। নরনারায়ণের মন্দিরের এখন কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। মন্দিরটী যে-স্থানে অবস্থিত তথায় সতীর যোনিদেশ পতিত হয়। সতীর মৃত্যুতে মহাদেব যখন সতীকে স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ

ঘুরিতেছিলেন, তখন সংসাররক্ষা-হেতু বিষ্ণু সুদর্শনচক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। যে যে স্থানে সতীর অংশ পতিত হয়, তথায় একএকটী পীঠস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। কামাখ্যায় দেবীর যোনীদেশ পতিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহা হিন্দুতীর্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সকল স্থান হইতেই এস্থানে লোক তীর্থ করিবার জন্য সমাগত হয়। পর্ব্বতোপরি আরও ছয়টী মন্দির আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গার মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই মন্দিরগুলির অস্তিত্ব ১৮৯৭ খ্রীঃ, ভূমিকম্পের পর হইতেই হইয়াছে। শৈলোপরি আরোহণ করিলে, নদী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির দৃশ্য এত রমণীয় বোধ হয় যে, তাহা ব্যক্ত করার শক্তি মানবলেখনীর নাই। আসামের রাজগণ কামাখ্যাদেবীর সেবার জন্য ২৬০০০ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তররূপে দান করিয়াছেন। সহৃদয় ব্রিটীশরাজও তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। খৃষ্টমাস বা বড়দিনের সময় এখানে পৌষ-বিয়া নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে। যে-সময়ে কামাখ্যা-দেবীর সহিত কামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল, এই উৎসবটী তাহারই স্মারক। এতদ্ব্যতীত বাসন্তীপূজা ও দুর্গোৎসব যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে।

এখানে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় আছে, তেমনই তান্ত্রিকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইঁহারা পঞ্চ-মকারের সাধক। পঞ্চ-মকার যথা, (১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা ও (৫) মৈথুন। অন্যান্য সম্প্রদায় পঞ্চ-মকারের যেমন বিকৃত অর্থ করে, ইঁহারা তেমন করেন না। ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত অমৃতধারা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, তাহাকেই ইঁহারা মদ্যসাধক বলেন। মাংস-সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, মা-শব্দে রসনা; তদংশ-ভক্ষণশীল ব্যক্তি মাংস-সাধক। অর্থাৎ বাক্য-সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগিব্যক্তিকে ইঁহারা মাংসভুক্ বলেন। ছাগ-মেষাদি-মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া যে, ভগবদারাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, এরূপ অর্থ ইঁহারা মনে করেন না। মৎস্য-সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, গঙ্গা-শব্দে ইড়ানাড়ী, যমুনা-শব্দে পিঙ্গলা-নাড়ী। এই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গতায়াতকারী যে নিঃশ্বাস- ও প্রশ্বাস-রূপী মৎস্যদ্বয় যিনি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ যিনি প্রাণায়াম-সাধক শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকেই মৎস্যাশী বলিয়া ইঁহারা উক্ত করেন। নতুবা সামান্য-জলচর-মৎস্যাদি-ভক্ষণপটু ব্যক্তিকে ইঁহারা মৎস্য-সাধক বলেন না। মুদ্রা-সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, শিরসি স্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ আত্মার অবস্থিতি; কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। অতিশয় কমনীয়-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার জন্মে, তাঁহার নাম মুদ্রাসাধক; নতুবা কতকগুলি মদ্যোপযোগী সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্যকে মুদ্রা বলিয়া ইঁহারা উপদেশ করেন না। মৈথুন-সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে, মৈথুন-শব্দে রমণ। যাঁহারা আত্মাতে রমণ করেন, তাঁহাদিগের

নাম আত্মারাম। এতাদৃশ রমণশীল ব্যক্তির নাম মৈথুনসাধক। নতুবা স্ত্রী-সঙ্গমকে ইঁহারা মৈথুন বলেন না। পঞ্চ-মকারের এই ব্যাখ্যাটি "আগমসার"-নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কামাখ্যাতে দুর্গা- ও বাসন্তী-পূজার খুব ধূম হয়। হিন্দুরা দুর্গাকে পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। দুর্গ-শব্দে সংসার, অব্যয়ার্থ আ-নিস্তার। যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-দুঃখের নাশ হয়, তাহাই দুর্গা-নামে অভিহিত। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মস্বরূপা, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দুর্গাপূজায় আমরা রাজনীতির উপদেশ পাইয়া থাকি। রাজাগণ এই ধরণীমণ্ডলকে পরাক্রম-দ্বারা লাভ করেন। সেই পরাক্রমের প্রধান উপকরণ—বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী। ইঁহাকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে ইঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজারা পররাজ্য-জয় করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রুবিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া রত্ন-পেটিকাকে দক্ষিণ-হস্তের আয়ত্ত স্থানাদিতে রক্ষা করিতে হয়। যুদ্ধকালে হস্ত্যশ্বাদির আরোহী সেনাপতি দুইপার্শ্বে-সৈন্যকে রক্ষা করে। পরসৈন্য-বন্ধনের জন্য পাশাদি বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত থাকে। সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-মৃত্যুকে জর্জ্জরীভূত করিয়া বিশিষ্টরূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। এবং ক্ষুদ্র শত্রু যদি নিরস্ত্র হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র-জ্ঞানে নিষ্পীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যক। কেবল সুশিক্ষিত একাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, এজন্য নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হতপরাক্রম করা উচিত। যুদ্ধকালে রাজাকে বহুদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি এরূপ আয়োজনের ন্যূনতা হয়, তবে কখনই রাজা সম্যক্ জয়লাভ করিবার পাত্র হইতে পারেন না। লোককে এই উপদেশ দিবার জন্য পরমেশ্বর মহিষমর্দ্দনচ্ছলে দুর্গারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

দশভুজা দেবী দশভুজচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। রাজ-সকল বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবেন, এ-কারণ বিদ্যা-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে তিনি বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় হয়; কিন্তু যাহাতে বহুকালাত্যয় না হয়, সে-জন্য রত্নপেটিকা দক্ষিণ হস্ত-সন্নিধিতে রাখিতে হইবে; ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সর্ব্ব-রত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে রত্নপেটিকার ন্যায় দক্ষিণ ভাগে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আরোহি-সৈন্য-নায়কের প্রয়োজন জন্য কার্ত্তিকেয়কে বামপার্শ্বে, ও হস্ত্যারোহি-সৈন্য-নায়করূপে গজানন গণেশদেবকে দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রুপক্ষে সিংহ-বিক্রমে যাইতে হইবে, তাহা দেখাইবার জন্য দেবী সিংহবাহিনী হইয়াছেন। সর্ব্বসমুদ্যোগি-রাজা কখন শত্রু-কর্ত্তৃক হত হয়েন না, এ-কারণ মৃত্যুজয়াখ্যাপনার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশে বদ্ধ করতঃ অস্ত্রক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র শত্রু হইতেও সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার জন্য মহিষ-মুখ হইতে শস্ত্রপাণি-পুরুষোত্তব দেখাইয়াছেন। এরূপ সমুদ্যোগি-রাজা দশদিক্‌কে অধিকৃত করিয়া একসাম্রাজ্য লাভ করেন। এইজন্য দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিক্‌পতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোককে

উপদেশ করিয়াছেন যে, এই সমুদ্রমেখলা ধরণীর দিক্‌পতি-সকল এবম্ভূত রাজার অঙ্গতলে অধিবাস করেন। ত্রিনয়ন-ধারণের উদ্দেশ্য—রাজা বহুদৃক্ হইবেন; অর্থাৎ রাজার উর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদিকেই দৃষ্টি থাকিবে। অর্দ্ধচন্দ্র-ধারণচ্ছলে সর্ব্বত্র সমান স্নেহের বিরাম অর্থাৎ সাধুপালন ও অসাধুপীড়ন রাজার ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণচ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী, ইহাই জানাইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গাকে হিন্দুরা পরমাত্মা বলিয়া মান্য করেন। সেই দুর্গার শরৎকালীন দুর্গোৎসব ও বসন্তকালের বাসন্ত্যুৎসব হইয়া থাকে। একই দুর্গার বৎসরে দুইবার পূজা করারও একটু অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুইটী পথ। দক্ষিণায়ন পিতৃযান, এবং উত্তরায়ণ দেবযান। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গে যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম দক্ষিণায়নে এবং নিবৃত্তি-মার্গের কর্ম্ম উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ-কারণ শাস্ত্র বলেন যে, দেবতা-দিগের দিন উত্তরায়ণ এবং রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং, দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই অসময়-বোধে দেবতাকে জাগাইতে হইবে। ইহারই নাম বোধন। উত্তরায়ণ জাগ্রদাবস্থা; এই সময়ে দেবগণ স্বভাবতঃ চৈতন্যবিশিষ্ট হওয়াতে বোধনের আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভের প্রত্যাশা করিলেই, ঐ প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তি-মার্গ করিয়া তাহাকেই বোধন বলে। প্রবৃত্তি-মার্গ সংসার এবং নিবৃত্তিমার্গ সন্ন্যাস। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সংসারী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যসুখ-সম্পত্তি-লাভার্থ অশ্বমেধানুকল্প দুর্গোৎসব করিয়া তৎপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরে স্বরলোকে গমন করেন। নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানিগণের ইহাতেই মোক্ষ-নিবৃত্তি লাভ করেন। সুরথ ও সমাধি উভয়েই দুর্গোৎসব করেন; কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সাধিতা দেবী সুরথকে মনুষ্যপদ প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন। নির্ব্বিণ্ণচেতা সমাধি নিবৃত্তি-মার্গে ঐ দুর্গোৎসব করেন; এজন্য তাঁহাকে আপনার স্বরূপতত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা ঐ জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে উত্তরায়ণ বসন্তকালকে শুদ্ধকাল বলিয়া বাসন্তী-পূজার বোধন করে না। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা থাকেন। উত্তর-শব্দে সর্ব্বশেষ। অয়ন-শব্দে আশ্রয়। সর্ব্বশেষ তদ্‌বিষ্ণুর পরমপদে আশ্রয় ইত্যর্থে উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন শরৎকালে দেবীবোধনের প্রথা আছে। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রাবস্থায় থাকেন। পিতৃলোককামী সংসারী ব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করে, ও পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ-করতঃ পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিয়ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান-ফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে এবং ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত-রূপে লোকেরা পরিশ্রমের অনুভব করিতে থাকে, কোন মতে বিশ্রান্তি-সুখলাভ করে না। দেবযানে আরূঢ় হইয়া নিষ্কারণে কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে সূর্য্যলোকে গমন-

করতঃ আদিত্যদ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আর তাহার পুনরাবৃত্তি থাকে না। হিন্দুরা পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া দেবার্চ্চনা করেন। ইহার নাম পক্ষ-ব্রত। এই ব্রত অবলম্বন করিলে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবরোধ করিতে হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চভূত-তন্মাত্র—এই পঞ্চদশবৃত্তি আচরণের নাম পক্ষব্রত। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হয়। এই ষষ্ঠি তিথি উপাসনা-ভেদের সময়বিশেষমাত্র। ষষ্ঠী যেমন কালাবয়ব তেমনই যোগাবয়ব। যোগাবয়ব উপাসনার ছয়টী আকৃতির নাম—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহাই ষড়ঙ্গ যোগ-নামে খ্যাত। প্রতিপৎ আসন-যোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমন-যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম-যোগ, চতুর্থী ধ্যান-যোগ, পঞ্চমী ধারণাযোগ, ষষ্ঠী সমাধি-যোগ; ইহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিপদাদি দ্রব্যদান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে। ইহাতেই আসন-যোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ-সংযমনার্থ ডোরক-দানচ্ছলে ইন্দ্রিয়-সংযমন প্রত্যাহারযোগ উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণরজত-নির্ম্মিত-তিলকদানচ্ছলে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ইড়া, স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী পিঙ্গলা, ইহারা নাসাভ্যন্তরচারিণী পূরক-রেচকাদি-লক্ষণান্বিতা। সুতরাং, ইহাতে প্রাণায়ামযোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্থীতে উচ্চাবচ-ফলদানচ্ছলে জগতের অভিলষিত ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরণরূপ মনন-ধ্যানযোগের উপদেশ করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে কঙ্কতিকা-দানচ্ছলে ধারণাযোগ কথিত হয়; অর্থাৎ অসারবর্জ্জন-পুরঃসর সার-সন্ধারণ ধারণাযোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য-মধুপর্ক-প্রদানচ্ছলে সমাধিযোগোপ-দেশ করা হইয়াছে; অর্থাৎ মধুধারা-পানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান যায়, সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং, সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী একএক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্ত কালাবয়ব প্রতি-পদাদি তিথি-ক্রমে এক এক দ্রব্য-দানচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগোপদেশ বুঝান হইয়াছে। কোষত্রয়ে উত্তীর্ণ সাধক অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ, অর্থাৎ সমাধির অবসানে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিবে। তাহাই সঙ্কেত-দ্বারা প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজোপলক্ষে ষষ্ঠীর অবসান-বেলাতে অর্থাৎ সায়ংকালে বোধন করিতে কহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রাপ্তির নাম বোধন। সুতরাং, সমাধির পর প্রাপ্ত বিজ্ঞানকোস-সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়। তদ্বোধন-ব্যতীত বিশ্রান্তি-সুখলাভ হয় না। অনন্তর সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে আনন্দময়-কোষপ্রাপ্ত জীব জীবন্মুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। এ-কারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয়; অর্থাৎ ইহাকেই শারদোৎসব বলে। তবে যে শ্রীফল-বৃক্ষে বোধন-শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থ এই যে, শ্রী-শব্দে ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য হইয়াছে যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সুতরাং শ্রীফল বলাতে ব্রহ্মাণ্ড বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে, কলেবরেও তাহা আছে। যথা, "ব্রহ্মাণ্ডে

যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে"। শ্রীই শরীরের ফলরূপ ; এ-কারণ দেহকে শ্রীফল বলিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপ-জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীব-শরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্যশক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্নিদ্রাভঙ্গ-পদে চৈতন্যরূপা কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগরিত-করণ বুঝায়। প্রাণায়াম-জপ-যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না। সুতরাং, দুর্গোৎসবোপলক্ষে অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষণ-পক্ষে, ভোগপর তমোময় অজ্ঞান-রূপ রাত্রিতে, প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত, অপর পক্ষে নবম কলায় শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ করা হইয়াছে।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-নগরের গঙ্গার অপর পারে ডাহাপাড়া-নামক একটী পল্লী আছে। ডাহাপাড়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে অবস্থিত। এই ডাহাপাড়ার সার্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্রপল্লী আছে। ইহাই কিরীটকণা-নামে খ্যাত। কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, পরন্তু শান্তিময়ী। প্রবাদ এইরূপ, দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেন। সেই সময় দেবীর কিরীটের একটী কণা এই স্থানে পতিত হয়। তজ্জন্য ইহা উপপীঠ-মধ্যে পরিগণিত। কালীঘাটে যেমন একটী স্পষ্টমূর্ত্তি আছে, কিরীটেশ্বরীর সেরূপ নাই। একটী উচ্চ বেদীর পশ্চাতে একখণ্ড বিশাল প্রস্তর ভিত্তির ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত। স্থানটী নানাবিধ শিল্পকার্য্যে অলঙ্কৃত। বেদীর উপর দেবীর মুখমাত্র অঙ্কিত। বেদীর নিম্নে বসিবার স্থান আছে। গৃহভিত্তির কতকটা কৃষ্ণমর্ম্মর-প্রস্তরে মণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত বারাণ্ডা। এখানকার শিবমন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত শিবলিঙ্গ এবং ভৈরব-মন্দিরে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ভৈরবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হরিনারায়ণ রায় ইহার খননকর্ত্তা। কিরীটেশ্বরীর মন্দির জীর্ণাবস্থায় অবস্থিত। পৌষমাসের প্রতিমঙ্গলবারে এস্থানে মেলা বসিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

যে-দিন শচী-বক্ষশ্চ্যুত মন্দার-পুষ্পের মত নির্ম্মল দুইটি ক্ষুদ্র বালকবালিকাকে স্বামীর হস্তে সঁপিয়া গৃহিণী চক্ষু মুদিলেন, বিপন্ন রাম-দয়ালের যথার্থই সে-দিন জগৎ অন্ধকারময় হইয়া গেল। তাঁহার এমন অর্থ ছিল না যে সংসারের ও অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন ; এমন কোন স্নেহশীল আত্মীয় ছিল না যে, এই নিরা-শ্রয়দের স্নেহের বক্ষে তুলিয়া তাহাদের মাতৃহীনতার দারুণ ব্যথার লাঘব করে! সুতরাং, একা রামদয়ালের উপরেই শিশু-পালন, ও গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই আসিয়া পড়িল। তবে, পৈতৃক কিছু জমী-জমা থাকায় উদরান্নের চিন্তা হইতে ভগবান্

রামদয়ালকে মুক্তি দিয়াছিলেন। পৈতৃক ভিটায় বসিয়া সামান্য সম্পত্তিটুকু নাড়িয়া চাড়িয়াই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত।

কিন্তু এই দীনহীনের ঘরে ভগবান্ কোন্ সাধনার ফলে এই জীবন্ত ছবি-দুইখানি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন! অদৃষ্টের ঘনান্ধকারের ভিতরে এই সমুজ্জ্বল রত্ন-দুইটি রামদয়ালের ভগ্ন কুটির আলো করিয়াছিল। নবনীকোমল দেহ-মাধুর্য্য, সে অমরলাঞ্ছিতা রূপপ্রভা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! রামদয়ালের শত দুর্ভাগ্যের ভিতরেও তাহাকে এই অমূল্য রত্নের অধিকারী দেখিয়া লোকে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। আর তাহাদের ভাগ্যপীড়িত বেদনা-ক্লিষ্ট পিতা সেই মুখ-দুইখানির প্রতি চাহিয়া নিজের সমস্ত দুর্ভাগ্য বিস্মৃত হইত।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অন্ধকার-ললাটে দুঃখের যে গুরু আসন পাতিয়া স্থান লইয়াছিল, সরল বালকবালিকা তাহার কোন ধারই ধারিত না। সর্ব্বদুঃখহারী একমাত্র পিতৃস্নেহে তাহাদের সকল অভাবের মোচন হইয়াছিল। নন্দনের প্রস্ফুট পারিজাতের মত কোমল কোরক-দুইটি তাহাদের বাগানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; প্রাতে পিতার পূজার পুষ্প চয়ন করিত এবং যথাসাধ্য গৃহ-কার্য্যে পিতার সাহায্য করিত। এমনি করিয়া রামদয়ালের সেই ক্ষুদ্র সংসারখানি সুখে দুঃখে কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! সমুদ্র যেমন অতল, দুঃখও বুঝি তাই! হতভাগ্য মাতৃহীনদের ভাগ্যে এ-সুখটুকুও সহিল না! হঠাৎ এই অনাথ-দুইটিকে অকূলে ভাসাইয়া রামদয়াল একদিন চক্ষু মুদিলেন। স্নেহের পুত্র সরোজ তখন সবে অষ্টাদশবর্ষের বালকমাত্র; গৃহে তাহার ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া অবিবাহিতা ভগ্নী লাবণ্য! জগতের একমাত্র-আশ্রয়-চ্যুত হইয়া ভাইভগ্নী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভীষণ সংসার অকূল সমুদ্রের মত হু হু করিতেছে! এই বিপুল পৃথিবীতে ধনহীন বন্ধুহীন নিরাশ্রয় অনাথ-দুইটি আজ কাহার চরণে মাথা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পায় না।

২

অনাথদিগের এই বিপদের দিনে অতি-দূর-সম্পর্কীয়া এক পিসীমা আসিয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা ঘোষবংশীয় জমীদার-গৃহের বধূ। চির-প্রসন্না কমলা তাঁহার সুপ্রসন্ন হস্তখানি আজ-কাল ধীরে ধীরে ঘোষ-বংশের উপর হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন; তবে কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভক্তির মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার প্রস্থান-দ্বার যে অবারিত হইয়া উঠিবে, তাঁহাদের বংশধরদের আচার-ব্যবহারে এ-কথা সকলেই স্বীকার করিত। ধর্ম্ম, বিনয় ও সৌজন্যের স্থলে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি আসিয়া আশ্রয় লইতেছিল।

পিসীমা যখন সকল দুঃখ, সকল দৈন্য নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়া অনাথ-দুইটিকে নিজ-বক্ষে স্থান দিলেন, তখন তাঁহারই পুত্র বিপিন লাবণ্যের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর সরোজকে জীবিকার চেষ্টায় ক্রমাগত নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। সে-সময় লাবণ্য পিসীমার গৃহে বাস করিত।

সেই সুযোগে বিপিন লাবণ্যকে আশা মিটাইয়া দেখিয়া লইত। ইহার ফলে বিপিন আত্মহারা হইয়া পড়িল। লাবণ্যকে পাইতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, সে কথা মোটেই তাহার মনে স্থান পাইল না; বরং দারিদ্র্য-নিপীড়িতা লাবণ্যলতা অতিশয় অনায়াস-লভ্যা, ইহা ভাবিয়াই সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, সুবিধা মত তাহার মা তাকে জানাইয়া সরোজকে একবার বলিলেই' হইবে। এ-বিবাহে দুইপক্ষের কাহারও অমতের কারণ সে দেখিতে পাইল না। সম্প্রতি তাহার পিতা এক মোকদ্দমায় ব্যস্ত আছেন; সেটা চুকিয়া যাইলেই সে কথাটা পাড়িবে স্থির করিল।

৩

"সরোজ! বাড়ীতে আছ কি?" এই বলিয়া একটি সুন্দর দেবমূর্ত্তি যুবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য তখন প্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পূজার জন্য ফুল তুলিতেছিল; স্বর শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই দুইজনেই ক্ষণেক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উভয়েরই পরস্পরকে মনে হইল—কি সুন্দর! দুই জনেরই চক্ষু আর ফিরিতে চায় না! একটু পরেই লাবণ্যের সংজ্ঞা হইল; সে চক্ষু নমিত করিয়া লইয়া উত্তর করিল, "দাদা তো বাড়ী নেই।"

"ওঃ, আচ্ছা। সে আসিলে বলিবে, প্রমোদ আসিয়াছিল।" এই বলিয়া যুবা বাহির হইয়া গেল।

"প্রমোদ!" আহা, নামটিও কি মিষ্ট! রূপের অনুরূপ বটে! নবীনা লাবণ্যলতা তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যমনা হইয়া পড়িল!

সরোজ আসিলে, তাহার স্নানের উদ্যোগ করিতে করিতে লাবণ্য বলিল, "দাদা তোমার কাছে একটি লোক এসেছিলেন। তাঁর নাম বল্লেন—প্রমোদ। তিনি কে দাদা?"

স। কে! প্রমোদ এসেছিল! বড় ভাল রে বড় ভাল! আহা, ওর কপালও আমাদেরই মত। অগাধ সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু ছোট বেলাতেই ওর মা মারা গেছেন! সম্প্রতি মাস-দুই হ'ল, ওর বাপও মারা গেছেন। তাই একলা থাকতে না পার্‌লেই মাঝে মাঝে পিসীর বাড়ী আসে। আমায় বড় ভালবাসে। এত বড়-লোকের ছেলে, তবু ওর স্বভাবের গুণে একটুও পর বলে মনে হয় না; ওকে ঠিক্ আমার নিজের ভাইয়ের মত মনে হয়।

লাবণ্য ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ওঁর পিসি, দাদা?"

স। আমাদের অরুণের জ্যাঠাই-মা।

লা। ওঃ বটে!

লাবণ্য সেদিন সকল কাজের মধ্যে এক-খানি মধুর মূর্ত্তির ধ্যানে বিভোর রহিল।

সন্ধ্যাকালে, 'সই! ঘাটে যাবি না, ভাই?"—বলিতে বলিতে নির্ম্মলা দাওয়ায় উঠিয়া ঘরে উঁকি দিল; দেখিল এই প্রদোষকালেও লাবণ্য শয্যার উপর পড়িয়া আছে। নির্ম্মলার ডাক তাহার কাণে পৌঁছিল কি না বলিতে পারা যায় না; কারণ, তখনও লাবণ্য উদাস-দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। নির্ম্মলা একেবারে তাহার গায়ের উপর গিয়া হাসিয়া পড়িল ও বলিল, "কি ভাই! কাকে ভাবছিস্? ধ্যানের ছবি পেয়েছিস্ না-কি?"

"না পেলে তুই ঘাড়ের উপর এলি কি ক'রে ?" বলিয়া দুই হাতে লাবণ্য নির্ম্মলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

নির্ম্মলা বলিল, "না ভাই, আজ তোর এ-ছল রেখে দে। আমায় ভালবাসিস্ বটে, তা আমার জন্যে জান্‌লার বাইরে চাইবি কেন ? আমায় যদি ভাব্‌তিস্, ওই দাওয়ায় বসে দোরের দিকে চেয়ে থাক্‌তিস্! বল না সই, কা'কে ভাব্‌ছিলি ?"

ঈষৎ হাসিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "আর কা'কে ভাই! নিজের অদৃষ্টকে।"

"বটে! তা ভাই, তোর অদৃষ্ট কি বল্লে? আমার কিন্তু ভাই, একটা বড় সাধ উঠেছে! তোর যুগ্যি একটি বর এখানে এসেছে। তার সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হ'ত—।" কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া দুইহাতে নির্ম্মলার কপোলযুগল নাড়া দিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "কে সে কার্ত্তিকপুরুষটি ?—সয়া না-কি ? নইলে তুই অত সুন্দর কা'কে পেলি!"

মধুর হাসিতে ঠোঁট নড়িয়া নির্ম্মলা কহিল, "ঠাট্টা করিস্ নে ; কাল্‌কে যাই অত ভালবেসেছিলাম, তাই তুই সুন্দর নিয়ে ঘর ক'রে বাঁচ্‌বি। চল্ ভাই, সন্ধ্যে হয়, ঘাটে চল্।"

দুই সখীতে নদীতে অঙ্গ ডুবাইয়া গল্প করিতে লাগিল। সে গল্পের আর শেষ নাই। কথায় কথায় নির্ম্মলা বলিল, "সই আস্‌চে মাসে বোধ হয় আমায় নিয়ে যাবেন্। তোর বিয়েটা আর দেখা হ'ল না।"

প্রফুল্লমুখী লাবণ্য একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, "তাই তো,—বরমহাশয় তো বিষয়-কার্য্যে অবসর পেলেন্ না যে, একবার যমপুরী থেকে গাত্রোত্থান করবেন! তা সই, তোমার মনের সাধ মনেই রইল বই কি! চল, এদিকে যে রাত হ'য়ে এল ; বাড়ীতে তো আবার কাজ আছে!"

নি। তুই দেখ্‌চি একেবারে হাল্ ছেড়ে দিয়েছিস্! ভয় কি সই ? আর কেউ না আসে, সইকে সতীন কর্‌তে পারবি নে ?

"দূর হ" বলিয়া লাবণ্য নির্ম্মলার গা ঠেলিয়া দিল।

দুইজনে যখন জল হইতে উঠিয়া বাড়ীর পথ ধরিল তখন অর্দ্ধেক পথ আসিয়াই দুই সখীই থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ ও সরোজ ঠিক্ সেই পথ দিয়াই আসিতেছিলেন। তাঁহারাও মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা লাবণ্যের গা টিপিয়া বলিল, "সই, দেখেছিস্! লাবণ্য চাতুরী করিয়া বলিল, "কে বল্ দেখি ?"

নির্ম্মলা কানে কানে বলিল, "আমার সয়া।"

"তোমার মাথা" বলিয়া লাবণ্য মুখ ফিরাইল। প্রমোদ ও সরোজ সে-পথ ছাড়িয়া অন্যদিকে ফিরিলেন। পথে প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ! তোমার ভগ্নীর কোথায় বিবাহ হয়েছে ?" একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরোজ উত্তর দিল, "সে এখনও কুমারী।"

বাড়ী গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজের বোন্‌কে দেখেছ পিসীমা ?"

এক গাল হাসিয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "তা আর দেখি নি! সে যে আমাদের লাবণ্য রে!"

মৃদুকণ্ঠে প্রমোদ বলিল, "বেশ সুন্দরী!—"

প্রমোদের মুখের অসমাপ্ত কথা কাড়িয়া লইয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "সে আর বল্‌তে!

প্রমোদ, তোর ওকে বৌ কর্‌তে ইচ্ছে করে?” সলাজ হাসি হাসিয়া প্রমোদ মুখ নত করিল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, “তা হ’লে, সে আর যে কি ভাল হয়, আর তোকে কি বল্‌ব! গরিবের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ভাগ্যের সীমা নেই! তার ওপর তুই তো রাজ্যেশ্বর, প্রমোদ! গরিবের এ দায় উদ্ধার কর্‌লে স্বর্গে থেকে দাদা তোকে সহস্র আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।”

নিম্নস্বরে প্রমোদ উত্তর দিল, “আমি অত শত জানি না। তোমাদের ইচ্ছা হয়, ঠিক্‌ কর। তবে আমি একবার পশ্চিম যাব ঠিক্‌ করেছি। তুমি তো জানো, পিসীমা, এবার হরিদ্বারে গিয়ে স্বামীজীর কাছে দীক্ষিত হ’য়ে আস্‌বার কথা আছে। ফির্‌তে মাস-ছয়েকের বেশীও হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে ফিরে না এলে, ও-সব কিছু হবে না।”

“তা তুই ঘুরে ফিরে আয় না? আমি এদের তা হ’লে কথাটা দিয়ে রাখি। আহা, সরোজের এই দুঃখের ওপর বোনের বিয়ের ভাবনা কি কষ্টকরই হয়েছে! ছেলেটা তবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।”

হাসিয়া প্রমোদ বলিল, “সে যত না বাচুক্‌, তুমি দেখ্‌চি বেশী আরাম পাও। পরের দুঃখে গলে যাওয়া তোমাদের ভাই-বোনের জন্ম-গত স্বভাব!”

পিসী। আশীর্ব্বাদ করি তোরও তাই হোক্‌, প্রমোদ!

৪

প্রমোদ ও লাবণ্যের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা অচিরেই গ্রামময় প্রচারিত হইয়া গেল। বিপিন ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। হাজার রূপ থাক্‌, তবু অত দরিদ্রের কন্যা কেহ যে সাধিয়া লইবে, এ-চিন্তা ভ্রমেও তাহার মনে আসে নাই। সে জননীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা একি সত্যি?”

মাতা। কি সত্যি রে?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বিপিন বলিল, “এই লাবণ্যর বিয়ের কথা।”

জননী হর্ষগদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন, “হ্যাঁ বাবা! রামদয়াল-দাদা পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এইবার তার ফল ফলেছে। যেমন জগদ্ধাত্রীর মতন মেয়ে, তেমনি বর মিলেছে।

বিপিন দেখিল মাতার কথার সুর ভিন্ন পথেই বহিয়া যায়। সে ঈষৎ বিরক্তস্বরে বলিল, “কেন? এ গ্রামে কি আর ভালঘর বর নেই! তুমি প্রমোদকে দেখেই যে একেবারে গলে গেলে!”

পূর্ব্ববদ্‌ভাবেই জননী বলিতে লাগিলেন, “অমনটি আর কই বাবা! তা ছাড়া, যাদেরই ছেলেটি ভাল, তা’রাই তো গরিবের মেয়ে বলে নাক্‌ সিঁটুকে সরে যাচ্ছে! রূপগুণের আদর কি আর আছে! তা’ হ’লে অমন মেয়ে কি আর এতদিন আইবুড় থাকে?”

তীব্রস্বরে বিপিন বলিল, “কেন? আমাদের ঘর কি প্রমোদের চেয়েও খাট? না, আমরা গরিব ব’লে কোন দিন নাক সিঁটুকুই?”

জননী এইবার বিপিনের মনের কথা ধরিলেন; বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “তুই বিয়ে ক’র্ত্তে চাস্‌?”

বিপিন নতমস্তকে সম্মতি জানাইল। জননী তখন ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, “তা তো হয় না, বিপিন! তা হ’লে কি এতদিন বাকি থাক্‌ত!”

বিপিন একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন হয় না?"

মাতা বলিলেন, "কুলে বাধে বাবা! সে সব বোঝাতে গেলে তুমি এখন বুঝবে না; তাও যদি না হ'ত, এখন, যখন এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেছে, তখন কি সেটা ভেঙে দিতে আছে?" পরে পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন, "আমার বিপিনের বৌ আন্‌তে সুন্দর মেয়ের জন্যে ভাব্‌তে হবে না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বিপিন আপন মনে উচ্চারণ করিল, "লাবণ্য কি আর দু'টো জন্মেছে?"

বিপিন জানিত, নির্ম্মলা আজ-কাল শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে; লাবণ্য একাই ঘাটে কাপড় কাচিতে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘাট হইতে ফিরিবার পথে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া বিপিন লুকাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল। ঐ না লাবণ্য আসিতেছে? হাঁ, ঐ তো বটে! ঐ তো সেই অপূর্ব্ব চলন-ভঙ্গী! পথ-ঘাট আলো-করা ঐ তো সেই রূপ! বিপিন নিকটে একটু অন্তরালে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই আবছায়ার মধ্যে হঠাৎ সম্মুখে একজন পুরুষ দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল ও সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিল, "কে?" কিঞ্চিৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া স্নেহকোমল স্বরে বিপিন বলিল, "ভয় কি লেবু! আমি বিপিন! চিন্‌তে পার্‌ছ না?"

একটু আশ্বস্ত স্বরে লাবণ্য উত্তর করিল, "ওঃ, বিপিন-দা! আমার হঠাৎ এমন ভয় হয়েছিল! তবু ভাল, তুমি!" এই বলিয়া লাবণ্য পুনরায় গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

বিপিন ডাকিল, "শোন লেবু, একটা কথা আছে।

ফিরিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

বি। লেবু! আমি ছোটবেলা থেকে তোমায় কত ভালবাসি জান তো?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তা আর জানি নে, বিপিন-দা! দাদা আর তুমি কি আমার ভিন্ন? পিসীমার পেটে হয়েছ বটে, কিন্তু এক মায়ের পেটের ব'লেই আমরা জানি।"

বি। লেবু দিনে দিনে তুমি যত বড় হয়েছ—আমার অন্তর্নিহিত ভালবাসাও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়েছে! তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপশ্রীর দিকে চেয়ে তা'রই আশায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি দিন কাটাচ্চি, লাবণ! এখন শুন্‌চি না-কি তুমি অপরের পত্নী হবে? লেবু! আমার চেয়ে কে তোমায় ভালবাস্‌বে?

বিস্ময়বিস্ফারিত-চক্ষে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া লাবণ্য উত্তর দিল, "আমায় এ কথা বল্‌ছ বিপিন-দা!"

বি। হ্যাঁ লেবু!

"বিপিন-দা তোমার মনের অবস্থা প্রকৃতিস্থ আছে তো? কা'কে কি বল্‌ছ বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি? আমি যে লাবণ্য!"

'হা হা' করিয়া হাসিয়া বিপিন বলিল, "তুমি লাবণ্য জেনেই তো তোমার কাছে এসেছি। শোন লাবণ্য! আমি জান্‌তাম যে-দিন চেষ্টা কোর্ব্বো, সেই দিনই আমি তোমার স্বামী হ'তে পার্‌ব। কিন্তু মাঝে থেকে প্রমোদ এসে পড়ে যে আমার সকল সুখে বাদ সাধ্‌বে তা কখনো ভাবি নি। তার উপর আজ মা'র কাছে জেনেছি

তোমার সঙ্গে আমার সামাজিক বিবাহে বাধা পড়ে। লেবু, ছার সে-বিধি, ছার সে সমাজ! প্রেমের চেয়ে উচ্চ কি? শুধু তুমি আমায় ভালবাস্‌বে, এইটুকু জান্‌বার অপেক্ষায় আছি। শুধু একটি কথা বল, লাবণ্য! তুমি আমার হ'বে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "বটে! আচ্ছা, সে কথা শুন্‌লে, তারপর?"

বি। তারপর পিতা, মাতা, দেশ, ঘর, সব ছেড়ে শুধু তোমায় নিয়ে পৃথিবীর নির্জ্জন প্রান্তে গিয়ে বাস কোর্ব্বো, লেবু! আমাদের সে-রাজ্যের প্রাণী কেবল তুমি আর আমি—।

"থাম! ছিঃ ছিঃ বিপিন-দা কথাগুলো মুখে একটু বাধ্‌ল না? সরে যাও সাম্‌নে থেকে; আমায় বাড়ী যাবার পথ দাও।"

নির্লজ্জ বিপিন আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন লাবণ্য! প্রমোদের কাছে কি আমার চেয়ে ভালবাসা পাবে? সে কি আমার চেয়েও তোমায় সুখী কর্‌বে মনে কর?"

তীব্র ঝঙ্কারে লাবণ্য উত্তর করিল, "কি মনে করি, না করি, তা শুন্‌বার তোমার কোন দরকার নেই। যদি ভাল চাও, স'রে দাঁড়াও।"

বি। বটে! দীন-দরিদ্রের কন্যা ধনীর বধূ হবে ভেবে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছ! জেনে রেখো লাবণ্য! আমার বক্ষে আঘাত দিয়ে কখনও—কখনও সুখী হ'বে না। এখনও ভেবে দেখ!

লা। বিপিন-দা, এখনও বল্‌ছি স'র, নইলে এখনি চীৎকার কর্‌ব! দেখ আমরা বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নেই।"

বি। আচ্ছা দেখে নেবো। মনে থাকে যেন এর শোধ তুলে তবে ছাড়্‌ব।

বিফল আক্রোশে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বিপিন স্থানত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

ননীবালা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভাইস-চ্যান্সেলার।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি সার ল্যান্সেলট সাণ্ডারসন ভাইস-চ্যান্‌সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিকেল দু-আনি।—রূপার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় নিকেলের মুদ্রা প্রচলন করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্প্রতি নিকেলের নূতন দু-আনি বাহির হইয়াছে। দেখিতে ইহা একআনির ন্যায় চক্‌চকে; তবে চৌকোণা। একদিকে চারিভাষায় দুই আনা লেখা; অপর দিকে ভারতসম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। আকারে ইহা দু-আনি হইতে অনেক বড়।

বাঙ্গালা-অনুবাদক।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায়, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালার অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় অবিনাশবাবুও এই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।

হোমরুল লীগের প্রতিনিধিগণের ইংলণ্ড যাত্রা।—হোমরুল লীগের পক্ষ হইতে গত ২৭শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত তিলক, খাপার্দ্দে, করণ্ডীকর, কেলকার ও বিপিনচন্দ্র পাল বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন; তথা হইতে কলম্বো যাইয়া জাহাজে উঠিবেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ড গমন করিবেন।

বঙ্গে বস্ত্র-সমস্যা।—বস্ত্রের বাজার দিন দিন চড়িতেছে। ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য সম্প্রতি এক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনারেবল মিঃ পি আর ক্যাডেল, সি, আই, ই, মূল্য-নিয়ামক নিযুক্ত হইয়াছেন। বস্ত্রের এবং কার্পাসের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া যায় কি না, কার্পাসের ব্যবসায়ে বাঁধাবাঁধি করা চলে কি না, এই বিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ক্যালেড সাহেবই সেই কমিটির অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব বোম্বাই সহরে এই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে। বোম্বাইয়ের চেম্বার অব-কমার্স, মিলওনার্স এসোসিয়েশন, আমদাবাদের মিলওনার্স এসোসিয়েশন, করাচীর চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতার চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি কয়েকটী বাছা বাছা বণিক-সমিতি কমিটির নিকট এ-সম্বন্ধে অভিমত জানাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

ইংলণ্ডে নারীর অধিকার-বৃদ্ধি।—ইংলণ্ডের নারীরা ব্যবহারজীবের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মে যে বিল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি লর্ড সভায় উহা তৃতীয়বার পাশ হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি।—ফ্রান্সের জেনারল ফক্ ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যের প্রধানসেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল ফকের বয়স এখন ৬৭ বৎসর। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত। রণ-কৌশল-সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ফ্রান্সে যে দেশের যত সৈন্য আছে, তাহাদিগকে একজনের আজ্ঞাধীন না করিলে জর্ম্মণবল-বিনাশ করার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই, এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

লণ্ডন সহরে আহত সৈনিকদিগের জন্য একটী বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আহত নৌ-সৈনিকেরা এখানে বয়নশিল্প শিক্ষা করিবে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বন্ধুতা।—যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত

উপাধি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইত না, কিন্তু জর্ম্মণ বিশ্ব-বিদ্যালয় সে উপাধির সম্মান করিতেন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, আমেরিকার উপাধি গ্রাহ্য করিতে হইবে।

আবর্জ্জনার মধ্য হইতে অর্থলাভ।—ইংলণ্ডে আবর্জ্জনার মধ্য হইতে রত্ন সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডের খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ গৃহস্থদিগকে নেকড়া, পুরাতন কাগজ, তামা ও লোহার বাসন, ভাঙ্গা কাঁচ, নানাপ্রকার টিন, কৌটা ও রান্নাঘরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি একত্র করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ পচা মাছ ও মাংস হইতে তৈল বাহির করিয়া এঞ্জিনে ব্যবহার করাইতেছেন। পচা ডিম, বাঁধাকপির পাতা প্রভৃতির দ্বারা হাঁস-মুরগী প্রভৃতির খাদ্য তৈয়ার করিতেছেন। কসাইখানা ও কলকারখানার আবর্জ্জনা হইতে চর্ব্বি ও গ্লিসারিণ সংগ্রহ করিতেছেন। কলার কাঁদি হইতে 'পটাস' তৈয়ার করা হইতেছে।

মাছ, মাংস, মাখন প্রভৃতি যে-সকল কার-খানায় কৌটাবদ্ধ করা হয়, তাহার পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে আহারের উপযুক্ত উত্তম চর্ব্বি পাওয়া যাইতেছে। পুরাতন টিন, ভাঙ্গা পিত্তল, তামা, কেট্‌লি, কড়াই, হাতা, পেরেক প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইতেছে। নটিংহাম নগরে এক বৎসরে যে ভাঙ্গা টীন সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে ১০ হাজার ৮০০ মণ লোহা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের উপকরণ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

ভদ্রবংশের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ।

জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকারের সৌন্দর্য্যের আদর। এক দেশের সুন্দর ব্যক্তি অপরদেশে কুৎসিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় শিষ্টাচারও নানাদেশে নানাপ্রকার। কয়েকটী দেশের শিষ্টাচারের কতকগুলি নিয়ম প্রায় একই প্রকার। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভদ্র-বংশের মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কতকগুলি আদব-কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সবগুলি সকলের, বোধ হয়, মনঃপূত হইবে না। যেগুলি তাহাদের অপছন্দ হইবে, সেইগুলি তাঁহারা বর্জ্জন করিতে পারেন।

১। গৃহে প্রবেশ ও গৃহ হইতে বহির্গমন কালে ভদ্রবালিকাগণ সর্ব্বদা বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পশ্চাৎ গমন করে।

২। শকটে আরোহণ বা উৎসবালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ভদ্রবালিকা বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর পশ্চাদ্‌গামিনী হয়।

৩। গৃহে সমবয়স্কাদের সহিত কোন আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় ভদ্রবালিকা

পরিবারের জ্যেষ্ঠগণের প্রতি বিনয়-প্রকাশ করিতে তাচ্ছীল্য করে না।

৪। ভদ্রবালিকা afternoon tea বা dinnerএতে নিমন্ত্রিত হইলে অযথা গল্প, জল্পনা, উচ্চহাস্য ইত্যাদি করে না; বরং নিজের সম্মানরক্ষা করিয়া মৃদুহাস্য করিয়া থাকে।

৫। কাহারও সহিত পরিচিত হইতে হইলে বয়োজ্যেষ্ঠাগণ অগ্রে আলাপ করে; সর্ব্বপশ্চাতে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালিকা পরিচিত হয়।

৬। ভদ্রবালিকা অহঙ্কৃত হয় না; কোনও প্রকার খোষামোদও কাহার নিকট করে না।

৭। কেহ কোন গোপনীয় কথা বলিলে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।

৮। ভদ্রবালিকা এমন ভাবে চলে, যাহাতে অন্যেরা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা রটাতে বা আলোচনা করিতে না পারে।

৯। ভদ্রবালিকা পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করে না। সর্ব্বপ্রকার ধৃষ্টতা তাহার পরিত্যাজ্য। তাহার আত্মসম্মান-বোধ থাকে।

১০। ভদ্রবালিকা কর্কশতা-পরিত্যাগ করিয়া বরং নম্র হয়; কিন্তু প্রতিশোধ লয় না।

১১। ভদ্রমেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা কর্ত্রীর নিকট আতিথ্যের গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

১২। ভদ্রবালিকা জনসাধারণের মধ্যে কোনও পুরুষের নিকট হইতে মাথা নোওাইয়া বা "thank you" না বলিয়া কোন কাজ নেয় না। কোন দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া দিতে, ছাতা মাটি হইতে উঠাইয়া দিতে, কিংবা ঐরূপ সামান্য কাজ করিবার জন্য পুরুষ ব্যস্ত হয়, ভদ্রবালিকাও ধন্যবাদ না দিয়া উহা গ্রহণ করে না।

১৩। ভদ্রমেয়েরা এমন কোন কাজ খুব কম করে, যাহার জন্য তাহাদের অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

১৪। ভদ্রবালিকা অন্যের নিকট নিজেকে ভদ্রবংশের বলিয়া বেড়ায় না। সে যে ভদ্রবংশের, তাহা তাহার আকার-ইঙ্গিতেই বুঝা যায়।

শ্রীসুষমা সিংহ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষের বয়স দাঁত দেখিলেই নির্ণীত হইতে পারে। কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ দাঁত উঠে, তাহার তালিকা নিম্নে দিতেছি :—

২½ বৎসরে	২ স্থায়ী দাঁত
৩½ বৎসরে	৪ ঐ
৪ হইতে ৪½ বৎসরে	৬ ঐ
৫ বৎসরে	৮ ঐ

শেষোক্ত স্থায়ী দাঁতের জোড়া, মাড়ি হইতে তৃতীয় জোড়া বাহির হইলেই, পড়িয়া যায়; এবং ৫½ বৎসর বা তত্তোধিক কাল অতীত না হইলে, সে স্থান পূর্ণ হয় না। উত্তমরূপ আহার পাইলে দাঁত শীঘ্র বাহির হয়। যখন সকল দাঁত সমতল হইয়া যায়, এবং তৃতীয়বার সন্তান দিবার সময় আইসে, তখন গো বা মহিষের পূর্ণ যৌবন জানিবে। দাঁতগুতি সমতলভাবে কিছুদিন থাকে ও পরে দন্তাগ্রগুলি মাড়ি ছাড়াইয়া উপরে উঠে। কখনও কখনও যৌবন-প্রাপ্তা গাভীর সম্মুখের একটা বা দুইটা দাঁত থাকে না। যে-সকল গাভী পরের মূত্র পান করে, তাহাদেরই এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। এই অভ্যাসটা বলদদিগের প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরীক্ষা-দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, দাঁতটা বয়সের দোষে বা মূত্র-পান-জনিত দোষে পড়িয়া গিয়াছে। গাভীরা দ্বিতীয় প্রসব হইতে পঞ্চম প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে এবং পঞ্চম প্রসবের পর হইতে বিক্রয়কাল-পর্য্যন্ত তাহাদিগের মূল্য কমিয়া যায়। মহিষেরা তৃতীয় প্রসব হইতে ষষ্ঠ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে।

যদি গাভী বা মহিষ দূরদেশে ক্রয় করা হয়, তবে তাহাকে রেলযোগে বাটী পাঠানই শ্রেয়ঃ। রেলে পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, হাঁটাইয়া পাঠাইতে তদপেক্ষা অধিক খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বনে মন্দ- বা বিশৃঙ্খলদোহন-জনিত যে দোষ জন্মে, রেলে পাঠাইলে তাহা ঘটিতে পারে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভীকে পদব্রজে পাঠাইয়া স্বস্থানে পঁহুছিবার সময় তাহার দুগ্ধ প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রেলে পাঠাইলে গাভীরা সুবিধার সহিত নীত হয় এবং তাহাদিগকে উত্তমরূপে দোহনও করা যাইতে পারে। প্রসবের দুই তিন মাস সময় থাকিলে, গাভীকে হাঁটাইয়া আনা চলে। পদব্রজে যাইবার সময় তাহাদিগকে শুষ্ক ঘাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। রেলভাড়া বাঁচাইতে যাইলে অনেক সময় রাস্তায় গাভী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পদব্রজে পাঠাইলে যে খরচ পড়ে, রেলে পাঠাইলে দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা সে খরচের কতটা উঠিতে পারে; কিন্তু পায়ে হাঁটাইয়া পাঠাইলে সে খরচ উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। রেলে গাভীকে উত্তম-রূপে খাইতে দিবে ও দোহন করিবে। এইজন্য গাড়িতে একজন গোয়ালা থাকা আবশ্যক। যদি রেল গাড়িতে গাভী প্রসব করে, তবে তাহাকে সামান্য গুড় খাইতে দিবে এবং সাবধানের সহিত নবদুগ্ধ বাহির করিয়া লইবে; নতুবা স্তনে স্ফীতি বা তাহাতে স্ফোটক হওয়া সম্ভব।

নূতন গাভী ক্রয় করিয়া আনিলে তাহাকে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ স্বতন্ত্র রাখিবে;—বাটীর অন্যান্য গাভীর সহিত মিলিতে দিবে না। মিলিবার পূর্ব্বে সাবান এবং phenyl (ফিনাইলে)এ অধিক পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া নবাগত গাভীর শরীর ধৌত করিয়া দিবে।

যদি অনেক গরু থাকে, তবে তাহাদিগের শৃঙ্গে দাগ দেওয়া উচিত। প্রত্যেক গাভীর নাম রাখিয়া সেই নাম খাতায় তুলিবে।

গাভী বা মহিষকে দুই প্রকারের খাদ্য

দেওয়া হয়। যথা, (১) চূর্ণ ও (২) চারা। ভূষি, মসীনার খৈল, কার্পাস-বীজ প্রথমটীর অন্তর্গত; এবং খড়, ঘাস, দেবধান্যের খড়, করবী, (মক্কার গাছ), গাজর, ঝাঁকড়ি, কাঁচা গম বা জৈ ইত্যাদি দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত।

দুগ্ধবতী গাভী, সাধারণতঃ প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে আহার করিয়া থাকে :—

অড়হর ভূষি (অথবা, ছোলা এবং কলাইয়ের ভূষি) ৬ পাউণ্ড (৩ সের)
মসীনার খৈল ৪ „ (২ সের)
কাঁচা চারা ৪০-৫০ „ (২০ হইতে ২৫ সের)
অথবা শুষ্ক ঘাস ২০ „ (১০ সের)

এতদ্ব্যতীত উত্তম চরাই আবশ্যক।

খৈলকে চূর্ণ করিয়া জলে তিন বা চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া দিবে এবং ভূষি ও শস্য তাহাতে মিলাইয়া, কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করণান্তর গাভীকে খাইতে দিবে। জল অধিক দিবে না। যতটা জলে উক্ত পদার্থ মাখ মাখ হয়, ততটাই জল দেওয়াই বিধি। খৈল চূর্ণ না করিলে বা তাহা জলে না আর্দ্র করিলে গাভী খায় না। সুতরাং, তাহাতে ক্ষতি হইয়া থাকে। ভূষি স্বতন্ত্র খাইতে দিবে। কিন্তু খৈল অন্যান্য বস্তুর সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি। সমগ্র গাভী বা মহিষগুলিকে প্রতিমাসে প্রায় ২ পাউণ্ড (১ সের) লবণ খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের খাদ্যের সহিত সামান্য-পরিমাণে লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষার কয়েক দিবস, যত দিন না ঘাস গজায় ততদিন, কাঁচা চারা খাওয়ানই শ্রেয়ঃ। শুষ্ক ঘাস আহরণ করিতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে গম, এবং জবের ভূষি মিশ্রিত করিয়া দিবে। শীতকালে তাহা এবং শুষ্ক চারার পরিবর্ত্তন করিবে। গ্রীষ্মকালের দারুণ গ্রীষ্মে কাচা ঘাস যদি পাওয়া যায় তবে ভালই।

চারা-দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কাঁচা চারা না দিয়া শুষ্ক চারা দাও, তবে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইবে—কাঁচা চারা দুগ্ধের বৃদ্ধিকারক। বর্ষাকালে গাভীগুলি কাঁচা চারা খাইলে তাহাদিগের দুগ্ধও নীলাভ হয় এবং তাহা হইতে নবনীত কম উঠিয়া থাকে।

বর্ষা ও শীতকালে প্রত্যহ এক পাউণ্ড (আট ছটাক) কার্পাস-বীজ গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা নবনীত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যদি নবনীত প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তবেই কার্পাস-বীজের আবশ্যক; নতুবা মসীনার খৈল যথেষ্ট।

আহার এরূপ দেওয়া উচিত যাহাতে একদিকে দুগ্ধের মাত্রা অধিক হয় ও অন্যদিকে দুগ্ধের উত্তমতা বজায় থাকে। আব্‌হাওয়া এবং খাদ্যের গুণে দুগ্ধের তারতম্য হইবে বটে, কিন্তু এই বিষয়ে একটা তথ্য-নির্ণয় করা উচিত।

গাভী যদি প্রত্যহ পূর্ণমাত্রায় ১০ কোয়ার্ট অর্থাৎ ১২½ সের দুগ্ধ দেয়, তবে তাহার আহার-হ্রাস করা উচিত নহে। দুগ্ধ কমিয়া গিয়া ৬ কোয়ার্টে (৭½ সের) দাঁড়াইলে আহারের হ্রস্বতা করা বিধেয়। যদি একবারে আহার কমাইয়া দেওয়া হয়, তবে গাভীও একেবারে অর্দ্ধেক দুগ্ধ দিতে থাকে। যে কোন সময়েই হউক না কেন, আহার কমাইলে দুগ্ধও কমিয়া যাইবে। উক্ত গাভী যখন ৬ বা

৪ কোয়ার্টের (৭½ বা ৫ সের) মধ্যে দুগ্ধ দিলে, তখন তাহার চূর্ণ-খাদ্য অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ তিন পাউণ্ড (১½ সের) এবং ২ পাউণ্ড (১ সের) মসীনার খৈল দেওয়া উচিত; কিন্তু কোন মতে চারার হ্রস্বতা করিবে না। একমাসের জন্য চূর্ণ খাদ্য দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া যাইলে উহা একপক্ষ মাত্র দিবে। এইরূপে যদি ৭০টী পূর্ণদুঘা এবং ২০টী অর্দ্ধদুঘা গাভী থাকে, তবে তন্মধ্যে ৮০টী পূর্ণ মাত্রায় আহার পাইবে মাত্র।

গাভী দুই কোয়ার্ট (২ সের আট ছটাক) বা তদপেক্ষা কম দুগ্ধ দিলে তাহার দুগ্ধ যত শীঘ্র শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, ততই উত্তম। এরূপ করিতে হইলে বিশৃঙ্খল ভাবে অথবা কমবারে দোহন করিতে হইবে। যে-সকল গাভী অতিশয় অল্প দুগ্ধ দেয়, তাহাদিগকে পূর্ণ-মাত্রায় খাইতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, তাহার দুগ্ধ-বিক্রয়ে যাহা না আয় হয়, তদপেক্ষা অধিক খরচ করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়।

পূর্ণদুঘা মহিষী গাভী অপেক্ষা দুই পাউণ্ড (১ সের) চূর্ণ খাদ্য অধিক পাইবে :—

ভুষি ৮ পাউণ্ড (৪ সের)
মসীনার খৈল ৬ „ (৩ সের)

এতদ্ব্যতীত শীতকালে উহারা ২ পাউণ্ড (১ সের) কার্পাস-বীজ অধিক পাইবে। ইহাদিগের দুগ্ধ নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে চূর্ণ-খাদ্য দেওয়া বিশেষ আবশ্যক; কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধের উৎকর্ষের বৃদ্ধি হয়।

ছোলা এবং এবংবিধ অন্যান্য শস্য দুগ্ধবতী পশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। এ বিষয়টী যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন অন্যান্য সকলপ্রকার চারা যেন উত্তমরূপে কাটা হয়। ভুষির অনভিষেে ছোলা দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহার ফল তত উত্তম হয় না।

খাদ্য ও জল ঠিক্ সময়ে দেওয়া উচিত। আহার দিবার সময় সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। দুগ্ধ দোহন করিবার অনতিপূর্ব্বেই আহার দেওয়া উচিত। যদি প্রাতঃকালে ৬ টার সময় দোহন করিবার সময় হয়, তবে পাঁচটার সময় পশুকে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। আহার দিবার সময় একবার নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহার যেন কোনক্রমে ভঙ্গ করা না হয়।

সর্ব্বদা আহার দিবার পূর্ব্বে পশুদিগকে জলপান করিতে দিবে। শীতকালে প্রত্যূষে পশুরা সাধারণতঃ জলপান করে না; কিন্তু তাহাদিগকে জলপান করিবার সুযোগ দিবে। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগুলিকে ঈষদুষ্ণ জল দেওয়াই কর্ত্তব্য; সম্পূর্ণ শীতল জল দেওয়া নিষিদ্ধ।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে হইলে পশুকে বিশুদ্ধ জল পান করান উচিত। দূষিত জল পানে দূষিত দুগ্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মহিষের জন্য একটা জলাশয়ের আবশ্যক। তাহারা সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই জলে গিয়া পড়ে।

মহিষশিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিলে তাহার উদরে পোকা জন্মিয়া থাকে। যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করা হয়, তবে শিশুর মৃত্যুও হইতে পারে। এ রোগের ঔষধই নিমপাতা। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া অথবা চাপ দ্বারা নিমফল হইতে তৈল নিষ্কাষিত

করিয়া ৩ আউন্স হইতে ৫ আউন্স (দেড় ছটাক হইতে আড়াই ছটাক) পর্য্যন্ত ১২ বা ১৪ দিন অন্তর মহিষশিশুকে খাইতে দিবে। মহিষশিশু বাঁট ধরিবার পূর্ব্বে ইহা খাওয়ান উচিত। বাঁট ধরিবার পরে বা অধিক পূর্ব্বে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শে না। উক্ত ঔষধ দ্বারা মহিষশিশুর দাস্ত হয় এবং তদ্দ্বারা পোকা নির্গত হইয়া যায়। শিশুগুলি যেন নবদুগ্ধ অধিক পান না করে। প্রসবের পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ বাহির করা হয়, তাহাকে নবদুগ্ধ কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

মহাশ্মশানে শবের প্রতি।

কোথায় চলেছ তুমি সকলই ত্যজিয়া,
পিতা মাতা দারা সুত, সকলই ছাড়িয়া!
ধন-জন আত্ম-বন্ধু রয়েছে কোথায়!
কোথায় চলেছ আজি, কেবা নিয়ে যায়!
অসার সংসার মাঝে সকলি অসার,
অনিত্য জগতে নহে কেহ আপনার!
কৌপীন-সম্বল চলেছ পথিকবর,
ধীরে ধীরে স্বর্গ-পথ হ'তে অগ্রসর!
চন্দনে চর্চ্চিত তব করিয়াছে কায়,
এসেছে দেবের দূত লইতে তোমায়!
জীবন-নাটক মাঝে এক অভিনেতা,
অনন্ত জগতীখানি তাঁহারি রচিতা!
দীনবন্ধু হরি তিনি পরমদয়াল,
সমভাবে সবারে পালেন্ চিরকাল!
সৃষ্ট এ জগত তাঁর বড়ই সুন্দর,
যে-দিকে ফিরাই আঁখি সবি মোনহর!
রচিতা তাহারি শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা,
মহিমা দেখিয়া সদা হই দিশাহারা!
সুগন্ধ মলয় বহে তাঁরি মহিমায়,
জীবনের স্রোত মম ধীরে বহে যায়!
ফলভারে বৃক্ষগুলি রয়েছে গো নত,
জগদ্-বাসীরে শিক্ষা দিতেছে নিয়ত।
অধমা তনয়া, নাথ, রাখ রাঙা পায়,
আমার জীবন তব পদে হোক্ লয়!
কতকাল রব বিভু তোমাকে ছাড়িয়া?
চিরকাল থাকি যেন তোমাতে মজিয়া!

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

শ্মশান।

অঙ্গে ভস্ম মাখি হে শ্মশান,
চিরদিন রহ বর্ত্তমান;
জানাইছ উদাসীনপ্রায়—
হে মানব! ভুলো না মায়ায়;
কেহ না রহিবে হেথা হায়!
সকলের সম অবসান!

চিতানল বক্ষোমাঝে ধরি'
দেখাইছ সমাধান করি'—
কেমন সোণার অঙ্গ যায়,
ক্রন্দন রাখিতে নারে তা'য়!
ব্যাকুলতা গুমরে হিয়ায়;
যায় কাল নিজ কাজ সারি'!

জানাইছ শিবার চীৎকারে,
তটিনীর কুলুকুলু স্বরে—
ধিক্ অর্থে, ধিক্ আকাঙ্ক্ষায়!
সাথে কিছু যাবে না'ক হায়!
রূপগর্ব্ব অঙ্গারে মিশায়!
তুচ্ছ লয়ে কেন মর ঘুরে?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩১ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১ কল্প—২য় ভাগ।

১৩২৪ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক

চিত্রসূচী।